ফয়যুল হাদী
শরহে তিরমিযী ছানী

তিরমিযী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ
ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ

(প্রথম খণ্ড)

فيض الهادى
شرح جامع ترمذى

সংকলন ও সঙ্গ্রহ
মাওলানা মুহাম্মদ উমায়ের কোব্বাদী
মুহাদ্দিস
মাদ্‌রাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা

সম্পাদনা
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
শাইখুল হাদীস
মাদ্‌রাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।

আল কাউসার প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার   পাঠক বন্ধু মার্কেট
১১, বাংলাবাজার ঢাকা।   ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা।
ফোন -৭১৬৫ ৪৭৭ -- ০১৭১ ৬ ৮৫ ৭৭ ২৮

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
বাসা নং -২১৭, ব্লক ত
মীরপুর -১২, পল্লবী, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ
জুলাই-২০০৭ ঈ. জুমাদাস সানী
১৪২৮ হিজরী

কম্পোজ
মনোয়ার হোসাইন
আল কাউসার কম্পিউটার্স

মূল্য
চারশত টাকা মাত্র।

মূদ্রণ
মাসুম প্রেস ঢাকা

কৈফিয়ত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর অন্যতম প্রাজ্ঞহাদীস বিশারদ ইমাম তিরমিযী রহ. সনদের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাঁচাইয়ের পাশাপাশি ফিক্হের আলোকে পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস সাধনের যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন তা আজ অবধি অনবদ্য, অদ্বিতীয় ও মুসলিম উম্মাহর অনন্য সম্পদরূপে বিবেচিত। মুহাদ্দিসগণের বিবেচনা মতে, তাঁর 'জামিউত তিরমিযী' ব্যাপকতা ও বিশুদ্ধতার বিচারে সহীহ বুখারীর পথচারী বিন্যাসের বিচারে সহীহ মুসলিমের রঙধারী এবং ফিকহের বস্তুনিষ্ঠতা বিশ্লেষণ ও নিরূপনের বিচারে সুনানু আবীদাউদের অনুগামী, বিধায়, এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, হাদীসশাস্ত্রের ত্রিমূখী নির্ঝরিণীর অপূর্ব মিলনকেন্দ্র এ **জামিউত তিরমিযী**। এজন্য সিহাহ সিত্তাহকে নিজের মত করে বুঝতে হলে এ কিতাবের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

সাধারণত একারণে এ কিতাব নিয়ে আলোচনা পূর্বের মত আজও অব্যাহত আছে। বাংলাদেশেও এ প্রক্রিয়া আপন বিভায় দেদীপ্যমান। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে, ইতোপূর্বে কিতাবটির প্রথম খণ্ডের উপর বাংলা ভাষায় উত্তুঙ্গ কিছু খেদমত হলেও দ্বিতীয় খণ্ডের উপর উল্লেখযোগ্য কোনও খেদমত হয়নি। তাই মাতৃভাষায় 'তিরমিযী সানী'র একটি সরল কিন্তু প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও যথার্থ তাহকীক-তাশরীহ্ সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রয়োজনয়ীতা উলামা ও তালাবা মহলে দীর্ঘ দিন থেকে অনুভূত হয়ে আসছে। দেশের মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে কলম ধরার প্রকৃত হকদার। হয়ত অন্যান্য দ্বীনী ব্যস্ততার কারণে তার এ খেদমতে প্রয়োজন মাফিক এগিয়ে আসতে পারছেন না।

হাদীসের উপর কিছু খেদমত করার অধমের দীর্ঘদিনের এক লালায়িত স্বপ্ন। অপরদিকে 'তিরমিযী সানী'র একটি প্রামান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রয়োজন– এ অনুবোধও মনের মাঝে জীবন্ত ছিলো। অথচ নিজের যোগ্যতা তো সম্পূর্ণ ঈর্ষাশূন্য। তাই স্বপ্ন পূরণের এহেন নিরাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে এ মহান কাজে হাত দেওয়ার সৎসাহস আদৌ জাগতো না; যদি না ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা নিকেতন মাদরাসা দারুর রাশাদ -এর শাইখুল হাদীস, মুহতারাম হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান দা. বা. আরবী-উর্দু প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করে না দিতেন এবং তাঁর সুদক্ষ হাতে সম্পাদনার আসি না চালাতেন।

ব্যাখ্যাগ্রন্থটির সংকলন ও বিন্যাস সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য যে প্রচেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, তা যেহেতু এ খেদমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই লৌকিকতা ব্যতীত বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ বলা যায়, ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সাবলীলতা ও সহজ, সরল স্বতস্ফুর্ত প্রকাশভঙ্গির কারণে সর্বস্তরের ছাত্রদের উপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য ও সারগর্ভ হওয়ার কারণে মুহতারাম উসতাদদেরও কাংক্ষিত হিসেবে 'ইনশাআল্লাহ' ব্যাপক সমাদর পাবে। তাছাড়া আধুনিক মাসআলাসমূহের সমাধানও জীবন্ত করা হয়েছে বিধায়, পাঠকবর্গ 'ইনশাআল্লাহ' স্বাচ্ছন্দবোধ করবেন।

এ পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছি যে, হাদীস শরীফ দরস-তাদরীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের বাস্তবায়ন। মনে রাখবেন, তাঁর পবিত্র সুন্নাতের শীতল স্নিগ্ধ সরোবরে অবগাহন করে পূত পবিত্র হয়ে উঠতে পারলে মানুষের হৃদয়রাজ্যে নিজেই নিজের অবস্থা করে নিতে পারবেন। তখন অতীতের মত আজও পৃথিবী আপনাদের পদতলে লুটিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। আলহামদুল্লিাহ ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! সবই আল্লাহ তা'আলার করুণা ও অপার অনুগ্রহ। পবিত্র হাদীসের খেদমতের এ আনন্দঘন মুহূর্তে দুর্বলতা ও বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার প্রয়াস চালিয়েছি এবং পাঠকবৃন্দের হৃদয়ের সন্নিকটে পৌঁছার চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি সেই বিচারের দায়িত্ব আপনাদের। ভুল-ত্রুটি হওয়াটাই স্বাভাবিক। নজরে পড়লে আমাদেরকে অবহিত করলে আল্লাহ উত্তম জাযা দিবেন। আমরা তা ইহসান হিসাবে গ্রহণ করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবো –ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর রহম ও করম প্রার্থনা করি। তিনি এ ক্ষুদ্র খেদমতকে কবুল করে নিন– আমীন।

বিনীত

মুহাম্মদ উমায়ের

ফয়যুল হাদী
শরহে তিরমিযী (ছানী)
এর বৈশিষ্ট্যাবলী

- সর্বস্তরের হাদীস অধ্যয়নকারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
- তিরমিযী শরীফের হাদীস সনদসহ উল্লেখ করা হয়েছে।
- তিরমিযী শরীফের পূর্ণাঙ্গ তরজমা করা হয়েছে।
- হাদীসের সনদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
- মাযহাব ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর আলাদাভাবে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।
- ইমাম তিরমিযী রহ.এর উক্তি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- হাদীস ও শিরোনামের নম্বর দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি শিরোনামের সাথে মূল কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া হয়েছে।
- হাদীসের সনদ ও মতন দরসী কপির সাথে মিলানো হয়েছে।
- অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ব্যখ্যায় উল্লেখিত প্রামাণ্য আরবী ইবারতকে পৃথক করে লেখা হয়েছে।
- জটিল আরবী শব্দগুলোতে হরকত দেওয়া হয়েছে।
- কিতাবে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে শিরোনাম ও উপ-শিরোনামে সাজানো হয়েছে।
- প্রামাণ্য কিতাবগুলোর নাম আরবীতে লেখা হয়েছে।

সূচীপত্র

اَبْوَابُ الْاَطْعِمَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ص ١

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ঃ খাদ্য সম্পর্কিত

اَبْوَابُ الْاَشْرِبَةِ

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায় ঃ পানপাত্র ও পানীয়

اَبْوَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صـ١١
সপ্তবিংশ অধ্যায় ঃ সৎব্যবহার ও সম্পর্ক

أَبْوَابُ الطِّبِّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ صـ٢٣

অষ্টবিংশ অধ্যায় ঃ চিকিৎসাপ্রসঙ্গে

اَبْوَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

উনবিংশ অধ্যায় ঃ ফরায়েযপ্রসঙ্গে

اَبْوَابُ الْوَصَايَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
বিংশ অধ্যায়ঃ অছিয়ত প্রসঙ্গে

اَبْوَابُ الْوَلَاءِ وَالْهِبَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
বিংশ অধ্যায় ঃ ওয়ালা এবং হেবা

أَبْوَابُ الْقَدَرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
একবিংশ অধ্যায়ঃ তাকদীর

ﷺ

أَبْوَابُ الْفِتَنِ: عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

দ্বাবিংশ অধ্যায় ঃ ফিত্না ফাসাদ

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ঃ খাদ্য সম্পর্কিত অধ্যায়

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন বিধান। এর শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনাকে মৌলিকভাবে বড় ছয়টি শাখায় বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) আকাইদ। (২) ইবাদাত। (৩) মুয়ামালাত তথা লেন-দেন, কামাই-রুযি ইত্যাদি। (৪) আখলাক বা নৈতিকতা। (৫) ছিয়াছাত তথা রাজনীতি। (৬) মু'আশারাত তথা সামাজিকতা।

এ ছয়টি শাখার প্রত্যেকটিই দ্বীনের আবশ্যকীয় অংশ। যার কোনটিকে দ্বীন থেকে পৃথক করাও সম্ভব নয়। আবার কোনো একটিকে পরিপূর্ণ দ্বীন বলাও সম্ভব নয় বরং এ ছয়টির সমন্বয়ে দ্বীনের পরিপূর্ণতা ফুটে উঠে।

(যিকর ও ফিক্র ঃ ১৮)

ইমাম তিরমিযী রহ. ابواب الاطعمة والاشربة وابواب البر و الصلة ইত্যাদিতে সামাজিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন। কোনও কোনও হাদীসে আখলাক-চরিত্র ও নৈতিকতা সম্পর্কেও আলোচনা এসেছে।

মু'আশারাত তথা সামাজিকতার পরিচয়

সমাজ থেকে সামাজিকতা। ব্যক্তির সমষ্টিগত নামই 'সমাজ'। মানুষ সামাজিক জীব, এ জগতে সে একাকী থাকতে পারে না। বাঁচতে হলে তাকে সামাজিকতার আশ্রয় নিতেই হয়। পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, বাজার বন্দরসহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন লোকজনের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। তখন তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে, কিভাবে চলতে হবে– এসবের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের নামই 'সামাজিকতা'।

সামাজিকতার ব্যাপারে অবহেলা ও তার কারণ

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, এ সম্পর্কিত সর্বাধিক ও ব্যাপক জ্ঞান-দর্শন হল, দ্বীনকে মনে করা হয় শুধুমাত্র আকাইদ ও ইবাদতের নাম। জীবনের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যেন এর কোনও ভূমিকাই নেই। এ ভ্রান্ত ধারণাকে ব্যাপক রূপ দেওয়ার কাজে তিনটি বস্তু খুব জোরেসোরে ভূমিকা পালন করেছে।

প্রথমতঃ মুসলিম বিশ্বের উপর অমুসলিম শক্তি সমূহের রাজনৈতিক আধিপত্য, যা দ্বীনের কতৃত্ব ও প্রভাবকে অফিস-আদালত,বাজার-ঘাট শহর-বন্দরও সামাজিক কার্যকলাপ থেকে নির্বাসিত করে তাকে শুধুমাত্র মসজিদ, খানকাহ এবং কোনও কোনও স্থানে ধর্মীয় মাদরাসার গণ্ডি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার প্রচলন না থাকায় মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এই চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটেছে যে, দ্বীন শুধুমাত্র নামায-রোযার নাম।

দ্বিতীয়তঃ ধর্মনিরেপক্ষ চিন্তা-চেতনা, যা সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে প্রবৃদ্ধি লাভ করে। এই চেতনা মনে করে যে, দ্বীন-ধর্ম শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিজীবনের একান্ত ব্যাপার। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি পর্যন্ত একে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া পশ্চাতপদতরাই নামান্তর।

তৃতীয়তঃ আমরা স্বয়ং নিজ নিজ কাজকর্মে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছি, তা হল, অনেক ধার্মিক ব্যক্তি আকাইদ ও ইবাদাতকে যে পরিমাণ গুরুত্ব প্রদান করে, মুয়ামালা, মু'আশারা ও আখলাকের ব্যাপারে তার এক দশমাংশ গুরুত্বও প্রদান করে না।

এসব কারণে আজ মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাক সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষাসমূহ অনেক পিছনে পড়ে গেছে। এ সম্পর্কে অজ্ঞতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এগুলো যেন দ্বীনের কোন অংশই নয়।

আকাইদ ও ইবাদাত যে দ্বীনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ সবের গুরুত্ব কিছুমাত্র কম করে দেওয়া দ্বীনের মূলকাঠামো বিগড়ে দেওয়ারই নামান্তর। তবে একথাও বাস্তব সত্য যে, দ্বীনী শিক্ষা আকাইদ ও ইবাদাতের গণ্ডি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। একজন মুসলমানের দায়িত্ব শুধুমাত্র নামায-রোযা আদায় করার দ্বারা শেষ হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং ইরশাদ করেছেন, 'ঈমানের সত্তরাধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা তাওহীদ তথা একত্ববাদের সাক্ষ্য দান করা আর সর্বনিম্ন শাখা পথের আবর্জনা সরিয়ে ফেলা।'

বস্তুতঃ মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাক-চরিত্রের ব্যাপারগুলো অধিক জটিল। কারণ, এগুলোর সম্পর্ক বান্দার হকের সঙ্গে। আর স্বতঃসিদ্ধ কথা হল, তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা নিজ হকসমূহ মাফ করে দেন। কিন্তু বান্দার হক শুধু তাওবা-ইসতেগফার দ্বারা মাফ হয় না। তা মাফ হওয়ার দুটি মাত্র পথ রয়েছে। হকদারের হক পরিশোধ করতে হবে, নতুবা হকদার খুশী মনে মাফ করে দিতে হবে। বিধায় দ্বীনের এ শাখাগুলো বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। মু'আমালাত মু'আশারাত ও আখলাক –এই শাখাত্রয়ের মধ্য থেকেও আবার সর্বাধিক অবহেলা করা হয় মু'আশারাত তথা সামাজিকতার ব্যাপারে। আজ সামাজিক দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের মহাপ্লাবন যেন আমাদের সকলকে গ্রাস করে ফেলেছে। অনেক দ্বীনদার লোকও এ ব্যাপারে এত উদাসীন যে, তারা এসব দ্বীনী সামাজিক বিষয়কে দ্বীনের কোন অংশই মনে করে না।

সামাজিক বিধিবিধানের গুরুত্ব

ইসলাম তার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতি পদে পদে এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে, কোন মানুষ যেন অপরের কষ্টের কারণ না হয়। ইসলামের বেশীর ভাগ সামাজিক শিক্ষা এ মূলনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে যে, কবির ভাষায়– تمام عمر اسی احتیاط میں گزری + یہ آسیاں کہ شاخ چمن پہ بارنہ ہو

'সারাটি জীবন এ সাবধানতা অবলম্বন করে অতিবাহিত করি, যেন আমার অস্তিত্ব কারও জন্য বোঝা বা কষ্টের কারণ না হয়।'

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা সামাজিকতার আহকাম সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। যেমন– ঘরে প্রবেশের সময় অনুমতি প্রার্থনা করা। এটি একটি সামাজিক বিষয়। কুরআন মজীদে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

সামাজিকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেই মানুষকে কষ্ট দিয়ে "হাজর আসওয়াদ" চুমো খেতেও নিষেধ করা হয়েছে। অন্যদের ঘুম ও আরামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহাজ্জুদের সময় অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে নিষেধ করা হয়েছে। মোটকথা, সামাজিকতার গুরুত্ব অনেক, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এ বিষয়ে জোর তাগিদ করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ক্বামূছ-এ রয়েছে– اطعمة। এটি طعام এর বহুবচন। هو البر وما يؤكل অর্থাৎ গম ও খাদ্যদ্রব্য।

মিসবাহুল লুগাতে আছে– الطعام। অর্থ, খাদ্য। যার جمع হল أطعمة এবং جمع الجمع হল, اطعمات। অর্থাৎ গম। الطعم والطعائم। অর্থ, বিলাসী খাদ্য। বলা হয়ে থাকে– انا طاعم عن طعامكم। 'তোমাকে খাবারের প্রয়োজন নেই আমার।' (س، طعما) طعم সে স্বাদ গ্রহণ করল।

قوله عن رسول الله ﷺ : عن رسول الله الخ এর দ্বারা এ দিকে ইংগিত করা উদ্দেশ্য যে, এখানে مسند এবং مرفوع রেওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করা হবে। অবশিষ্ট আলোচনা আনুসঙ্গিক। যথা الكوكب। এ রয়েছে-

فيه اشارة الى ان المقصود الاصلى ايراد الروايات المرفوعة، فاما ما يذكر فيه من بيان المذاهب واحوال الرواة والروايات فتبع واشتطراد (ص٨ ج ١)

"এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, মূল উদ্দেশ্য হল مرفوع রেওয়ায়াতসমূহ আলোচনা করা। এছাড়া মাযহাব, রাবী ও রেওয়ায়াতসমূহের অবস্থা, যেগুলো এখানে আলোচনা করা হবে সেগুলো প্রাসঙ্গিক বিষয়।

মোটকথা, এখানে খাদ্যদ্রব্যের সেসব প্রকারের বর্ণনা আসবে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেয়েছেন অথবা খাননি এবং কি পদ্ধতিতে তিনি খেয়েছেন, কোন্ পদ্ধতিতে খেতে তিনি নিষেধ করেছেন ? কোন্ কোন্ জিনিস খাওয়া জায়িয আর কোন্ কোন্ জিনিস খাওয়া জায়িয নয়। খাবারের শিষ্টাচার ও বিধান প্রভৃতিও এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

"আল্লাহ পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন।"

এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, সব কিছুই আহারযোগ্য বরং সৃষ্টিকূলের মাঝে কিছু রয়েছে আহারের জন্য, কিছু রয়েছে বাহনের জন্য। আর কিছু রয়েছে চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য। খাদ্যদ্রব্যের বিবরণও আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ

"পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হালাল আর অপবিত্র গুলো তোমাদের জন্য হারাম।"

মূলতঃ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল, ইবাদত করা। সুতরাং যেসব বস্তু ইবাদত ও আ'মলের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করবে, قوت عملية এবং قوت علمية এর মধ্যে বিঘ্ন ঘটাবে, সে সব জিনিস আহার করা জায়িয নয়। যেমন, নেশাদ্রব্য, হিংস্র পশুর গোশত ইত্যাদি قوت عملية তথা আ'মলী শক্তির জন্য বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। বিধায় এগুলো হারাম।

কোন পদ্ধতিতে আহার গ্রহণ করা হবে ? এখানেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকা লক্ষণীয়। তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ না করলে মানুষকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, পশু থেকে রক্ত প্রবাহিত না করে রক্তসহ আহার করলে মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সুতরাং এসব বিষয়ের জ্ঞান নিতে হবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ, অবস্থা তথা সীরাতে তাইয়িবা থেকে। তাঁর বর্ণিত পদ্ধতিতেই আমাদেরকে আহার গ্রহণ করতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ عَلٰى مَا كَانَ يَأْكُلُ النَّبِيُّ ﷺ صــ١

অনুচ্ছেদ ঃ ১. কিসের উপর খাদ্য রেখে নবীজী ﷺ আহার করতেন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى خِوَانٍ وَلاَ فِىْ سُكُرُّجَةٍ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَالَ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلَامَ كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ؟ قَالَ عَلٰى هٰذِهِ السُّفَرِ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ يُوْنُسُ هٰذَا هُوَ يُوْنُسُ الْاَسْكَافُ وَقَدْ رَوٰى عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ نَحْوَهُ

১. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ........ আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঁচু টেবিলে এবং নানা রকমের মুরাব্বা চাটনি ও হজমির পেয়ালায় রেখে আহার করেননি। তাঁর জন্য পাতলা রুটিও পাকানো হয় নি। বর্ণনাকারী ইউনুস রহ. বলেন, আমি কাতাদা রাযি. কে বললাম, তাহলে কিসের উপর খাদ্য রেখে তাঁরা আহার করতেন? তিনি বলেন, এসব চামড়ার দস্তরখানে রেখে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

মুহাম্মদ ইবনে বাশশার বলেন, এ ইউনুস রহ. হলেন ইউনুস আল-আসকাফ। আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ রহ.ও সাঈদ ইবনে আবী আরূবা-কাতাদা-আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

خوان ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেছেন, خوان শব্দটি خ এর নিচে যের -এটাই প্রসিদ্ধ। অবশ্য পেশও বর্ণিত আছে। কাযী ইয়ায রহ. এর মতে, খাবারবিহীন খাঞ্চাকে خوان বলে। এ সম্পর্কে ফক্বীহুন নফ্স

✪ আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেছেন–

خوان هو ما له قوائم غير صغار

'যার মধ্যে বড় বড় খুঁটি লাগানো আছে' অর্থাৎ টেবিল বা চেয়ার।

✪ শায়খুল আদব আল্লামা ই'যায আলী রহ. বলেছেন– خوان بمعنى خوانچه এখানে خوانچه শব্দটি ফার্সী। হাদীসটি ইসলামের বিজয়যুগের। خوانچه শব্দকে আরবী করে خوان করা হয়েছে। যার নিচে খুঁটি থাকে, তাকে বলা হয় خوانچه বা خوان।

অহঙ্কারীদের খাবার গ্রহণের রীতি হল, এরূপ বস্তুর উপর রেখে খাবার গ্রহণ করা, যেন মাথা নিচু করতে না হয়। এ পদ্ধতিতে খাবারকালে পেটের উপর চাপ পড়ে না। চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হয়ে আহার করা সত্যিই কষ্টকর। আল্লাহর নেয়ামত আহার করার সময় এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা অনুচিত। শোকর ও বিনয় প্রকাশ পায়– এমন পদ্ধতিতে আহার করা বাঞ্ছনীয়। গোলাম যেভাবে নিজের মুনিবের সম্মুখে খায়, সেভাবে খাওয়াই কাম্য। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন – كل كما يأكل العبد عند سيده

قوله سكرجة ঃ سكرجة প্রসঙ্গে এসেছে –

قال الحافظ بضم السين والكاف والزاء الثقيلة بعدها جيم مفتوحة قال العياض كذا قيدناه، ونقل عن ابن مكى انه صوب فتح الراء (الكوكب)

অর্থাৎ 'হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, শব্দটি س،ك،ر সবগুলো অক্ষরের উপর পেশ। অবশ্য ر এর উপর তাশদীদ আছে, পরবর্তী ج এর উপর যবর।

✪ কাযী ইয়ায রহ. বলেন, এভাবেই আমরা লিপিবদ্ধ করেছি। ইবনে মক্কী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি ر এর উপর যবরকে ও সঠিক বলেছেন।

এটি মূলতঃ ফার্সী শব্দ। মূলতঃ ছিল سكوية অর্থ ছোট প্লেট, ডিস। শব্দটি আরবী করার পর سكرجة হয়েছে। তার جمع سكارج।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও ছোট প্লেট পিরিচে খাবার খেতেন না। কারণ, এ জাতীয় প্লেটে রকমারি খাবার রাখা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই জাতীয় খাবারের অধিক খাবার নিজের দস্তরখানে জমা করতেন না। তাছাড়া পিরিচের মধ্যে সাধারণতঃ আচার-টক জাতীয় বস্তু রাখা হয়। যেগুলো ভোজনবিলাসীদের জন্য হজমিবর্ধক। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও ভোজনবিলাসী ছিলেন না। ইবাদতে সহায়ক হবে পরিমাণ খাবারই তিনি খেতেন। পেটুকের মত অতিরিক্ত খাবার খেতেন না।

ولا خبز له مرقق ঃ এখানে خبز শব্দটি ماضى مجهول এর সীগাহ। (خبز (ض، خبزا 'সে রুটি বানাল।' خبز مرقق পাতলা রুটি, চাপাতি রুটি। خبز محمص টোষ্ট।

(১) কাযী ইয়ায রহ. বলেছেন, مرقق অর্থ হল, নরম ও সুন্দরকৃত। যেমন- ময়দার রুটি তথা চাপাতি। ترقيق শব্দের অর্থ হল, পাতলা করা, নরম করা। আগের যুগে চালনি ছিল না। কখনও কখনও مرقق হয় পাতলা ও প্রশস্ত। এটাই প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ কখনও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশেষভাবে চাপাতি তৈরী করা হয়নি। না কখনও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাপাতি রুটি খেয়েছেন। যেমন, হযরত আনাস রাযি. এর এক হাদীসে রয়েছে-

ما أعلم النبى ﷺ رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا شاة سمينا بعينه قط (رواه البخارى)

فقلت ঃ এখানে বক্তা ইউনুস।

فعلى ما ঃ বুখারীর অধিকাংশ সংস্করণে অনুরূপ রয়েছে। আর কোনও কোনও সংস্করণে فعلام এসেছে। অর্থাৎ কোন জিনিসের উপর রেখে ? এর দ্বারা প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সম্পর্কে এ কথা জানা। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের অনুসারী ছিলেন, এর উপর আ'মল করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা মানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা। অথবা يأكلون এর যমীর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম উভয়ের দিকে ফিরেছে। (মা'আরিফুল হাদীস)

قال ঃ এখানে বক্তা কাতাদাহ।

سفر ঃ س এর উপর পেশ, ف এর উপর যবর।এটি سفرة এর বহুবচন। অর্থ চামড়ার দস্তরখান। শুধু দস্তরখানকেও سفرة বলা হয়। নিহায়াহতে আছে, سفرة অর্থ হল, মুসাফিরের তৈরী পাথেয় খাবার। অধিকাংশ সময় চামড়ার গোল দস্তরখানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে সকল দস্তরখানের ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগ হতে থাকে। চাই দস্তরখানা চামড়ার তৈরী হোক কিংবা অন্য কিছুর। (হিদায়া ঃ ৫/৩৯৮)

قوله هذا حديث حسن غريب ঃ ইমাম তিরমিযী রহ. প্রায় ক্ষেত্রে حسن ও غريب হাদীসকে এক সাথে আনেন। জমহূরের মতে حسن ও غريب এর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞার আলোকে এতে কোন আপত্তি নেই। কেননা জমহুর এর মতে এতদুভয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কারণ, কোন হাদীস حسن হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক

রাবীর স্মরণশক্তি ও নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে حديث غريب রাবীর একাকিত্বের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং উভয় প্রকার হাদীস এক সাথে হতে পারে। কিন্তু ইমাম তিরমিযী রহ. এর বক্তব্যের আলোকে উভয় প্রকার হাদীস পরস্পর এক সাথে হতে পারে না। কারণ, ইমাম তিরমিযী রহ. حديث حسن এর যে পরিচয় كتاب العلل এ দিয়েছেন, সেটি জমহূরের মতের পরিপন্থী। তিনি حديث حسن এর সংজ্ঞায় বলেছেন–

كل حديث يروى لا يكون فى اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذالك فهو عندنا حديث حسن .

যে হাদীসের সনদে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন রাবী না থাকে, হাদীসটি 'শায'ও না হয় এবং একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়– সেটি আমাদের মতে 'হাসান' বলে গণ্য। তুহফাতুল আহওয়াযী ঃ ১/৫১৯

এ সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম তিরমিযী রহ. এর মতে হাসান হাদীস– এর জন্য 'একাধিক সূত্র' আবশ্যক। পক্ষান্তরে حديث غريب এর সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন– كل حديث يروى ولا يروى الا من وجه واحد, অর্থাৎ "একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে 'গরীব' বলা হয়।" সুতরাং বুঝা গেল, ইমাম তিরমিযীর মতে حسن এবং غريب মধ্যে বৈপরিত্ব আছে। তাই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, ইমাম তিরমিযী রহ. هذا حديث غريب কেন বললেন ? এর কয়েকটি জবাব রয়েছে, যথা–

(১) কোন কোন আলেম এর উত্তরে বলেছেন, অনেক সময় গোটা সনদের একটি অংশ تفرد (একক রাবী কর্তৃক বর্ণিত) হয়। যাকে হাদীসের পরিভাষায় مدار اسناد বলা হয়। مدار اسناد এর পূর্বের বিবেচনায় হাদীসটি 'গরীব' পক্ষান্তরে مدار اسناد এর পরে যেহেতু تفرد নেই বিধায় সেই বিবেচনায় হাদীসটি 'হাসান'। তাই তিনি উভয় দিক বিবেচনায় বলে দিয়েছেন– هذا حديث حسن غريب অর্থাৎ হাদীসটি হাসানও গরীবও।

(২) হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'শরহে নুখবাহ'তে এর উত্তর এভাবে পেশ করেছেন যে, ইমাম তিরমিযী রহ. كتاب العلل এ حسن এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন– সেটি-ই 'হাসান' হাদীসের সংজ্ঞা, যার সঙ্গে غريب শব্দ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যেখানে حسن غريب বলেন, সেখানে উদ্দেশ্য নেন জমহূরের পরিভাষা। আর জমহূরের পরিভাষায় তো 'হাসান' ও 'গরীব' এক সাথে আসতে পারে।

(৩) হাফেয ইবনে সালাহ রহ. তাঁর 'মুকাদ্দামাহ'তে এর উত্তরে বলেন, ইমাম তিরমিযী রহ. كتاب العلل এ حسن لغيره এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। আর যেখানে حسن এর সাথে غريب শব্দও আছে, সেখানে حسن দ্বারা حسن لذاته উদ্দেশ্য।

(৪) সবচেয়ে সুন্দর জবাব দিয়েছেন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.। তিনি বলেন, যদি ইমাম তিরমিযী রহ. كتاب العلل এর ইবারত গভীরভাবে পড়া হয়, তাহলে আলোচ্য প্রশ্নের সমাধান এমনিতেই বের হয়ে যাবে। ইমাম তিরমিযী রহ. كتاب العلل এ লিখেন–

وما ذكرنا فى هذا الكتاب هديث غريب فان اهل الحديث يستغربون الحديث لمعان رب حديث يكون غريبا الا من وجه واحد

অর্থাৎ আমরা এ কিতাবে যা উল্লেখ করেছি, তা হাদীসে গরীব। হাদীস বিশারদগণ কোন 'গরীব' আখ্যায়িত করেন কয়েকটি কারণে। কখনও একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে 'গরীব' বলেন। তারপর ইমাম তিরমিযী তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে উদাহরণ পেশ করে বলেন,

ورب حديث انما يستغرب لزيادة تكون فى الحديث

কখনও কখনও হাদীসের মধ্যে কোন অতিরিক্তিতার কারণে হাদীসকে غريب মনে করেন।

এরপর তিনি তারও উদাহরণ পেশ করে বলেন,

ورب حديث يروى من اوجه كثيرة وانما يستغرب لحال الاسناد

কখনও কখনও একাধিকসূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার পরও মুহাদ্দিসগণ সেটিকে সনদের বিবেচনায় غريب বলেন।

ইমাম তিরমিযী রহ.এর এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, কোন হাদীস غريب হয় তিনটি সূরতে। তন্মধ্যে প্রথম সূরত অবশ্যই 'একক রাবী'র ভিত্তিতে হয়। ইমাম তিরমিযীর মতে 'গরীব' এ সূরতে 'হাসান' এর সাথে আসতে পারে না। এ ছাড়া অবশিষ্ট দুই সূরত 'হাসান' হাদীসের সাথে আসতে পারে। সুতরাং ইমাম তিরমিযী রহ. যেখানে 'হাসান' এর সাথে 'গরীব' শব্দটিও আনেন, সেখানে 'গরীব' এর শেষোক্ত দুই সূরত উদ্দেশ্য নেন। (দরসে তিরমিযী)

চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খাওয়ার শরঈ বিধান

যমীনের উপর দস্তরখান বিছিয়ে খাবার গ্রহণ করা সুন্নত। চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খাওয়া ইসলামী শিষ্টাচার ও সুন্নত পরিপন্থী। হ্যাঁ ওযর বশতঃ চেয়ার-টেবিলেও খাওয়া যেতে পারে। তবে শর্ত হল, অহংকার ও লৌকিকতা প্রদর্শন উদ্দেশ্য হতে পারবে না। ওযরের সূরতে চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া জায়িয হলেও এতে সুন্নত আদায় হবে না। (ফতওয়ায়ে মাহমূদিয়া ঃ ১১৬/৫, রহিমিয়া ঃ ৪৩০/৬; মাযাহেরে হক্ব ঃ ৭৭/৫)

উল্লেখ্য, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. হিন্দুস্তানে খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্যতার কারণে চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়া মাকরূহ তাহরীমী বলেছেন। কিন্তু যেহেতু বর্তমান যুগেএটি খ্রিস্টানদের জাতীয় প্রতীক থাকেনি বরং চেয়ার-টেবিলের ব্যবহার ব্যাপক হয়ে গেছে, সেহেতু এখন আর সাদৃশ্য নেই। অতএব বর্তমান যুগে চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়া মাকরূহে তাহরীমী হবে না।

সাদৃশ্য না থাকার অথ–

হযরত থানভী রহ. বলেন, সাদৃশ্য না থাকার অর্থ হল, যেখানে কোন কিছু কারো প্রণীত হয় এবং জানা যায় যে, এটি কাফিরদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং তাদের বৈশিষ্ট্যের দিকে মন যায়– সেখানে সাদৃশ্য হবে, অন্যথায় নয়। অন্যত্র তিনি বলেছেন, সে সব জিনিস দেখার ফলে সাধারণ মানুষের মনে "এটি তো অমুকের তৈরী" বলে খটকা লাগবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এ বৈশিষ্ট্য থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে; নতুবা নিষিদ্ধ থাকবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اَكْلِ الْاَرْنَبِ صـ١

অনুচ্ছেদ ঃ ২. খরগোশ খাওয়া

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا اَبُوْدَاؤُدَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ انس قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ اَنْفَجْنَا اَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَهَا فَاَدْرَكْتُهَا فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُ بِهَا اَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ فَبعث مَعِى بِفَخِذِهَا اَو بِوَرِكِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَكَلَهُ قَالَ قُلْتُ اَكَلَهُ قَالَ قَبِلَهُ

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمَّارٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ وَ يُقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِيٍّ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِأَكْلِ الْاَرْنَبِ بَأْسًا وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اَكْلَ الْاَرْنَبِ وَقَالُوْا اِنَّهَا تَدْمَى

(২) মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ........... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাররুয্ যাহরান-এ একটি খরগোশকে আমরা তাড়া করলাম। সাহাবীগণ এর পিছনে ধাওয়া করলেন। আমি তা পেয়ে গেলাম এবং তাকে ধরে ফেললাম। এরপর আবূ তালহা রাযি.-এর কাছে তা নিয়ে এলাম। তিনি তাকে একটি ধারালো পাথর দিয়ে যবাহ্ করলেন এবং আমাকে দিয়ে এর একটি রান (বর্ণনান্তরে 'চতুর') রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা আহার করলেন। বর্ণনাকারী হিশাম ইবনে যায়দ বলেন, আমি বললাম, তিনি কি তা খেয়েছেন? আনাস রাযি. বলেন, তিনি তা গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে জাবির, আম্মার, মুহাম্মদ ইবনে সাফওয়ান, যাকে বলা হয় মুহাম্মদ ইবনে সায়ফী রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

অধিকাংশ আলিমদের এতদনুসারে আমল রয়েছে। খরগোশ আহারে কোন দোষ আছে বলে তারা মনে করেন না। কতক আলিম খরগোশ খাওয়া অপছন্দনীয় বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, এর ঋতুস্রাব হয়ে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

الأرنب : ارنب অর্থ খরগোশ। শব্দটি اسم جنس বিধায় مذكر ও مؤنث উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। ارانب তার বহুবচন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি শুধু مؤنث এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

কথিত আছে, প্রাণীটি شديد الجبن وكثيرة الشهوة অর্থাৎ অত্যধিক ভীতু, প্রচুর যৌনশক্তি সম্পন্ন এবং খুব দৌড়াতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, এটি চোখ খুলে ঘুমায়। প্রাণীটি এক বছর পুরুষ থাকে, আরেক বছর স্ত্রী থাকে। স্ত্রী খরগোশের ঋতুস্রাব হয়। (কাওকাব)

انفاج : انفاج অর্থ, গর্ত থেকে বের করা। উত্যক্ত করে দৌড়ানো।

قوله مرالظهران- : (بفتح الميم والظاء) মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে একটি স্থানের নাম।

مروة : সাদা পাথর, ধারালো পাথর।

ورك : রানের গোড়ার দিক, নিতম্ব, পাছা।

قوله فأكله فقلت اكله قال قبله : আল্লামা ত্বীবী রহ.বলেনঃ যমীরটি المبعوث এর দিকে ফিরেছে। অথবা এটি اسم اشاره এর অর্থে এসেছে। অর্থাৎ ذاك এটি المذكور এর দিকে ফিরেছে। এ দ্বিধাদ্বন্দ্ব হিশাম ইবনে যায়েদের। হিশামের দাদা আনাস তার উক্তির উপর موقوف রেখেছেন। যেন তিনি দৃঢ়তার ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। আর গ্রহণের ব্যাপারে একীন করেছেন। ইমাম দারাকুতনী রহ. হযরত আয়েশা রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন–

اهدى الى رسول الله ارنب وانا نائمة فخبالى منها العجز فلما قمت اطعمني

এ হাদীস যদি সহীহ হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খরগোশের খেয়েছেন। তবে এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। (আল-কাওকাব ৩/৫, তুহফা ৫/৪০০)

قوله فقلت أكله ؟ قال قبله : যেহেতু খাবার গ্রহণ করা আবশ্যক এবং সাধারণতঃ এরূপ স্থানে খাবার গ্রহণ করা হয়ে থাকে খাওয়ার জন্যই, সেহেতু হযরত আনাস রাযি. অর্থগত বিবরণ দিতে গিয়ে খাওয়াকে গ্রহণের স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর হিশাম কর্তৃক জিজ্ঞেস করার পর স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখানে খাওয়া দ্বারা ভক্ষণ উদ্দেশ্য নয়। মূলতঃ এখানে শুধু গ্রহণই করেছিলে। (কাওকাব ঃ ৩/৬)

৩০ নংপৃষ্ঠায় যাবে

وقد اختلف اهل العلم فى اكل الضب فرخص فيه بعض اهل العلم من اصحاب النبى ﷺ وغيرهم وكرهه بعضهم ويروى عن ابن عباس رضـ انه قال اكل الضب على مائدة رسول الله ﷺ وانما تركه رسول الله ﷺ تقذرا

وقد روى هذا الحديث عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس رضـ ان النبى ﷺ سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة اصح وروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة عن النبى ﷺ نحوه

উলামায়ে কিরামের অভিমত

আহলে সুন্নহ ওয়াল জামাআতের অধিকাংশ আলেম বলেছেন, খরগোশ খাওয়া হালাল। রাফেযীরা এবং পূর্ববর্তী কোন কোন ফক্বীহ বলেছেন, খরগোশ খাওয়া জায়িয নয়। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, হযরত ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলা রাযি. এবং ইকরামা রাযি. প্রমুখের মতামত হল, খরগোশ ভক্ষণ করা মাকরূহ।

মাকরূহ হওয়ার দলীলসমূহঃ

দলীলে নকলী ঃ যেমন, নিম্নের হাদীস–

ان عبد الله بن عمرو كان بالصفاح وان رجلا جاء بأرنب قدصادها فقال يا عبد الله بن عمروا ما تقول؟ قال قد جيئ بها الى رسول الله ﷺ وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم انها تحيض (ابو داؤد كتاب الاطعمة)

দলীলে আকলী

স্ত্রী খরগোশের হায়েয আসে। সুতরাং আশঙ্কা আছে যে, দৈহিক কাঠামো বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে এমন কোন অতীত জাতির অবশিষ্ট বংশধর এরা। যাদেরকে উপদেশসূচী হিসাবে এখানে জীবিত রাখা হয়েছে। অতএব, এরা আল্লাহর আযাবের নিদর্শন বিধায় এগুলো ভক্ষণ না করাই উচিত।

দলীলে কিয়াসী

যেহেতু তার রক্ত বের হয়, যে রক্ত ঋতুস্রাবের রক্ত এবং মানুষের মাঝেও পাওয়া যায়, তাই খরগোশ মানুষের সাথে এ দিক থেকে সাদৃশ্যতা রাখে। আর স্বতঃসিদ্ধ কায়েদা হল, مشابه حرام কেও শরী'আত নিষেধ করেছে। আর মানুষের গোশত হারাম বিধায় মানুষের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে এমন প্রাণীর গোশতও হারাম হবে।

হালাল-সম্পর্কীয় দলীলসমূহ

নকলী দলীল

(১) এ অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীসটি–

حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابوا داؤد ثنا شعبة عن هشام بن زيد بن قال سمعت انسا يقول انفخنا ارنبا بمر الظهران فسعى اصحاب النبى ﷺ خلفها فادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحة فذبحها بمروة فبعث معى بفخذها او بوركها الى النبى ﷺ فاكله قال قلت اكله قال قبله (ترمذى، كتاب الأطعمة)

আবু দাউদ শরীফে উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত শব্দে এসেছে–

عن هشام بن زيد عن انس بن مالك قال كنت غلاما حزورا فاصدت أرنبا فشويتها فبعث معى ابو طلحة بعجزها الى النبى ﷺ فأتيت بها فقبلها (ابو داؤد كتاب الأطعمة)

(২) হিদায়া গ্রন্থকার বলেন,

ان النبى ﷺ اكل منه حين اهدى اليه مشويا وامر اصحابه بالاكل منه (الهدايه)

আকলী দলীল

ইসলামী শরী'আতের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, স্থলচারী যে সমস্ত প্রাণী হারাম, সেগুলো দু'প্রকার।

(১) হিংস্র পশু-পাখি। যেমন– বিড়াল, কুকুর, বাঘ, চিল, বাজপাখি, কাক ইত্যাদি। এগুলো নিজের পা দ্বারা চিরে ফেঁড়ে শিকার ভক্ষণ করে, বিধায় এগুলো হারাম। এ মর্মে হাদীস শরীফে এসেছে–

ان النبى ﷺ نهى عن اكل ذى مخلب من الطيور وكل ذى ناب من السباع

(২) যে সমস্ত প্রাণী নাপাক ভক্ষণ করে, সেগুলোও হারাম। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে–

عن ابن عمر نهى رسول الله ﷺ عن اكل الجلالة والبانها (ترمذى)

বলাবাহুল্য, খরগোশ হিংস্র প্রাণী নয় কিংবা নাপাক ভক্ষণকারী প্রাণীও নয়। তাই খরগোশ ভক্ষণ করা হারাম নয় বরং হালাল।

প্রতিপক্ষের জবাব

যারা খোরগোশ খাওয়কে মাকরূহ বলেন, তারা স্বপক্ষে যে নকলী দলীল পেশ করেছেন– তার প্রথম জবাব হল, হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। যেমন, আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. তাঁর بذل المجهود গ্রন্থে এ দিকে ইংগিত করেছেন।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, হাদীসটিতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খরগোশ খাননি। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধও করেননি। আর এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, খরগোশ খাওয়া হালাল।কেননা হারাম হলে তিনি তা খেতে অবশ্যই নিষেধ করতেন।এমনিতেই ছেড়ে দিতেন না।

(আল-কাওকাবুদ দুররী)

অবশ্য রাসূলুল্লাহ ,সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নিজে কখনও খরগোশ খাননি। আর প্রত্যেক হালাল জিনিসই খেতে হবে– এমনটি জরুরী নয়।

আর তাদের কিয়াসী ও আকলী দলীলের উত্তরে বলা হবে, সহীহ ও স্পষ্ট হাদীসের বিপরীতে কিয়াস ও আকলের কোনও গুরুত্ব নেই।

হানাফী মাযহাবের ফতওয়া

খরগোশ দু' প্রকার। (১) নখ বিশিষ্ট। (২) পাঞ্জাবিশিষ্ট। হানাফীদের মতে উভয় প্রকার খরগোশ খাওয়া হালাল।
(হিদায়াহ ঃ ৪/ ৪৪১; ফতওয়ায়ে রশীদিয়া ৪৫০, ফতওয়ায়ে রহিমিয়াঃ ২/ ৩৬৮; ফতওয়ায়ে শামী ঃ ৯ / ৪৪০)

بَابُ مَاجَاءَ فِى أَكْلِ الضَّبِّ ص-١

অনুচ্ছেদ ঃ ৩. গুইসাপ খাওয়া

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ اَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا اٰكُلُهُ وَلَا اُحَرِّمُهُ

وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وابْنِ عَبَّاسٍ وَثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَقَدْ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى اَكْلِ الضَّبِّ فَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَيُرْوٰى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّهُ قَالَ اُكِلَ الضَّبُّ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّمَا تَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقَذُّرًا

৩. কুতায়বা রহ............. ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি তা আহার করি না এবং তা হারামও বলি না।

এ বিষয়ে উমর, আবূ সাঈদ, ইবনে আব্বাস, ছাবিত ইবনে ওয়াদীআ, জাবির ও আবদুর রহমান ইবনে হাসানা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফকীহ সাহাবী ও অন্যান্য ফকীহগণ এর অনুমতি দেন আর কতিপয় আলিম তা হারাম বলে মত পোষণ করেন। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্তরখানে গুইসাপ খাওয়া হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনীহাবশতঃ তা পরিত্যাগ করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

الضب ঃ বহুবচন ضباب، ضبان আল্লামা সুয়ূতী রহ. লিখেছেন, ضب এক প্রকার ছোট প্রাণীকে বলে।

এর বৈশিষ্ট্য হল,

তার লিঙ্গ দু'টি। সে পানি পান করে না। কেবল পূর্বদিকের বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকে। প্রতি চল্লিশ দিন পর এক ফোঁটা পেশাব করে। তার দাঁত পড়ে না। সাতশ' বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। উর্দূতে তাকে گوہ বলা হয়। ফার্সীতে سوسمار বলা হয়। بذل المجهود এর টীকাকার حياة الحيوان এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন–

ومن العجيب أن له ذكران، ولأ نثاه فرجان، ويأكل أولاده ظنامنه إذا خرجوا عن البيض، أنهم يفسدون البيض

আল-মু'জামুল ওয়াফীতে ضب এর অর্থ লেখা হয়েছে, গুইসাপ, গিরগিট।

উলামায়ে কেরামের অভিমত

ضب খাওয়া হালাল এবং হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

- ইমাম শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক, আবু লায়লা, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবরাহীম নাখঈ এবং আসহাবে যাওয়াহির -এর মতে এটি মাকরূহ নয়; হালাল।
- হানাফী উলামাদের মতে যমীনের অন্যান্য কীট-পতঙ্গের মত এটি ভক্ষণ করা মাকরূহ।
- হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহ. বলেন, হানাফী উলামাদের পক্ষ থেকে মাকরূহে তাহরিমী ও তানযীহি উভয় ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। ইমাম তাহাবী রহ. এর বর্ণনামতে এটি খাওয়া মাকরূহে তানযীহী। কিতাবুল আছারে উদ্ধৃত ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর আলোচনা থেকে বুঝা যায়, এটি মাকরূহে তানযীহী। তবে অগ্রাধিকারযোগ্য মতে এটি ভক্ষণ করা মাকরূহে তাহরীমি।
- আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেনঃ ফুকাহায়ে-আহনাফ এটিকে মাকরূহে তাহরীমি বলেন। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসীনে আহনাফ বলেন, মাকরূহে তানযীহি।
- শাইখুল আদব ইযায আলী রহ. বলেনঃ ইমাম মালেক রহ. এর মতে এ ব্যাপারে ছাড় রয়েছে। তাঁর মতে স্পষ্ট ঘোষিত হারাম কীট-পতঙ্গ ছাড়া সব ধরনের কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করা হালাল। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ রহ. ضب এবং ضبع উভয়টি ভক্ষণ করাকে জায়েয বলেন। আর হানাফী উলামাগণ উভয়টিকে ভক্ষণ করা হারাম বলেন। (ফাওয়ায়েদে ইযাযিয়া)

হালাল হওয়ার দলীল

- ইমাম শাফিঈ রহ. প্রমুখ দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো পেশ করেন।

(১) আলোচ্য অনুচ্ছেদের নিম্নোক্ত হাদীস–

عن ابن عمر ان النبي ﷺ سئل عن أكل الضب، فقال : لا اكله ولا احرمه

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে হারাম আখ্যা দেননি।

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর বর্ণিত হাদীস –

أكل الضب على مائدة النبي ﷺ - وفيهم أبو بكر

যদি এটি হারাম হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্তরখানে এটি খাওয়া হত না। সুতরাং বুঝা গেল যে, ضب ভক্ষণ করা হালাল।

মাকরূহ হওয়ার দলীল

হানাফী উলামাগন দলীল হিসেবে পেশ করেন।

(১) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবলীর নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

إن النبي ﷺ - نهى عن أكل الضب (ابوداؤد، [illegible]ب الأطعمة)

(২) হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণিত [illegible]ক্ত হাদীস ঃ

إنه أهدى له ضب، فأتاها رسول الله ﷺ - فسألته، فنهاها عنه، أى عن أكله، فجاءت سائلة، فأرادت ان تطعمها إياه - فقال لها رسول الله ﷺ - أتطعمينها مالا تأكلين حاشية الترمذى والطحاوى)

(৩) আলী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

إنه نهى عن أكل الضب والضبع (حاشية الترمذى)

(৪) বুখারী, মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার প্রায় প্রতিটি হাদীসগ্রন্থে শব্দের কিছুটা পরিবর্তনসহ এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে স্বভাবগত অরুচির কারণে ভক্ষণ করেন নি।"

এখন দেখার বিষয় হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব তবীয়ত কি শরী'আতের অনুকূলে কিনা ? এটাতে নিশ্চিত কথা যে, তাঁর তবীয়ত শরী'আতের সম্পূর্ণ অনুকূলে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তবীয়ত কর্তৃক অরুচিকর হওয়ার অর্থ শরী'আত কর্তৃক তা অসমর্থিত। তবে যেহেতু এটি ভক্ষণ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনও বিধান নাযিল হয়নি বিধায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সরাসরি একে হারাম ঘোষণা করেন নি। অন্য দিকে তিনি ভক্ষণও করেননি।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশা করছিলেন, এটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও বিধান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসবে। একারণেই হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবলী রাযি. এবং হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি নিষেধ করেছেন। তথা এর মাধ্যমে এটি হালাল হওয়ার বিধানকে রহিত করে দিয়েছেন।

উক্ত দলীল হালাল হওয়ার প্রবক্তাদের বিপক্ষে একপ্রকার উত্তর বটে। তাছাড়া এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, হালাল এবং হারাম এর হাদীস যখন মুখোমুখী হয়, তখন হারামের বিধানই কার্যকর হয়।

هذا حديث حسن صحيح ঃ ইমাম তিরমিযী রহ. আলোচ্য হাদীসের স্তর চিহ্নিত করতে حسن এবং صحيح শব্দ একই সাথে এনেছেন।

আরও অনেক হাদীসের ক্ষেত্রেও তিনি এরূপ করেছেন। এতে একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্ন সৃষ্টি হয় অর্থাৎ, উসূলে হাদীস এর আলোকে বুঝা যায়, حسن এবং صحيح পরস্পর বিপরীত। কারণ, صحيح এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

مارواه العادل التام الضبط من غير انقطاع فى الاسناد ولا علة ولا شذوذ

"অর্থাৎ যার রাবী আদিল ও পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং হাদীসটি মুত্তাসিল এবং হাদীসটি মু'আল্লালও নয় শাযও নয়।"

✪ পক্ষান্তরে حسن ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার মধ্যে صحيح হাদীসের একটি শর্ত ছাড়া সমস্ত শর্ত বিদ্যমান। সে শর্তটি হল, রাবী পূর্ণ স্মরণশক্তিস ম্পন্ন হওয়া। সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, কোনও হাদীস একই সাথে صحيح এবং حسن হতে পারে না। অথচ ইমাম তিরমিযী রহ. এ উভয় প্রকারকে একই হাদীসে আসলেন কিভাবে?

উলামায়ে কিরাম এর অনেক উত্তর পেশ করেছেন, নিম্নে তার কয়েকটি আলোচনা করা হল–

(১) হাফিয ইবনে হাজার রহ. নুখবাতুল ফিকার এ লিখেছেন–

فإن جمعا (حسن وصحيح) فللتردد فى الناقل حيث التفرد وإلا فاعتبار اسنادين

দারুল উরম দেওবন্দ এর স্বনামধন্য মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.) উল্লেখিত ইবারতে ব্যাখ্যায় تحفة الدرر এ লিখেছেন,

ইমাম তিরমিযী রহ. حسن এবং صحيح কে একই সাথে দুই কারণে উল্লেখ করেন।

✪ **প্রথম কারণ,** যেখানে হাদীসের সনদ মাত্র একটি হয়, সেখানে حسن ও صحيح কে একই সাথে আনার কারণ হল, ইমাম তিরমিযী রহ. সন্দেহ পোষণ করেন যে, রাবী تام الضبط তথা পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন না কি خفيف الضبط তথা দুর্বল স্মরণশক্তি সম্পন্ন? তখন حسن এবং صحيح এর মধ্যখানে একটি أو (অথবা) মাহযূফ থাকে। অর্থাৎ হাদীসটি হাসান অথবা সহীহ।

✪ **দ্বিতীয় কারণ,** যেখানে হাদীসের সনদ একাধিক হয় সেখানে حسن ও صحيح শব্দ একসাথে আনার কারণ হল, হাদীসটি এক সনদের বিচেনায় 'সহীহ' এবং অন্য সনদের বিবেচনায় 'হাসান'।

(২) কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন, حسن দ্বারা حسن لذاته উদ্দেশ্য। আর صحيح দ্বারা صحيح لغيره উদ্দেশ্য। আর এ দুটি এক সাথে আসতে পারে। কারণ, যে হাদীসটি কোনও রাবীর স্মরণশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে حسن لذاته হয়, সে হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হলে صحيح لغيره হয়ে যায়।

(৩) আল্লামা ইবনু কাসীর রহ. বলেন– حسن এবং صحيح এর পরিভাষা ইমাম তিরমিযী রহ. এর নিকট ভিন্ন। যে ভিন্নতা منزلة بين المنزلتين তথা দুই স্তরের মধ্যখানে তৃতীয় আরেকটি স্তরের মত অর্থাৎ উদ্দেশ্য হল, যে হাদীস খানা صحيح এর নিচে এবং حسن এর ওপরে।

(৪) আল্লামা ইবনু দাকীক আল ঈদ রহ. তাঁর الاقتراح নামক গ্রন্থে এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, মূলতঃ حسن এবং صحيح এর মাঝে পরিভাষাগত বৈপরিত্ব নেই। কেননা এটা 'হাদীস' এর কোন প্রকার নয় বরং স্তর। صحيح হল, উচ্চস্তরের হাদীস; حسن হল নিম্নস্তরের হাদীস। আর প্রতিটি উঁচুস্তরের বস্তু নিম্নস্তরের বস্তুকেও শামিল করে। হাদীস যদি 'যঈফ' না হয় তাহলে 'হাসান'। আর 'হাসান' হওয়ার পাশাপাশি যদি সহীহ হাদীসেরও সমস্ত শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে হাসান সহীহ। অনুরূপভাবে বলা যায়, উভয়ের মাঝে রয়েছে عموم خصوص مطلق এর নিসবত। সুতরাং كل صحيح حسن ولاعكس অর্থাৎ প্রত্যেক 'সহীহ' হাসানও। কিন্তু প্রত্যেক 'হাসান' সহীহ নয়।

উপরিউক্ত সমস্ত উত্তরের মধ্যে শেষোক্ত উত্তরটি উলামায়ে কেরামপছন্দ করেছেন। (দরসে তিরমিযী অবলম্বনে) আহনাফের ফতওয়া মতে গুইসাফ বা গিরগিট খাওয়া হারাম।

(আলমগীরি ঃ ৫/ ২৮৯, দুররে মুখতার ঃ ৯/৪৪৩; হেদায়াহ ঃ ৪/৪৪১

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اَكْلِ الضَّبُعِ صــ١
অনুচ্ছেদ ঃ ৪. খট্টাশ খাওয়া

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ اَلضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِىَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اٰكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهٗ اَقَالَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ.

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِلٰى هٰذَا وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِاَكْلِ الضَّبُعِ وَهُوَ قَوْلُ اَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ وَرُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَدِيْثٌ فِىْ كَرَاهِيَةِ اَكْلِ الضَّبُعِ وَلَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِالْقَوِىِّ ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اَكْلَ الضَّبُعِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ يَحْيٰى بْنُ الْقَطَّانِ وَرَوٰى جَرِيْرُبْنُ حَازِمٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍعَنْ عُمَرَ قَوْلَهٗ وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ اَصَحُّ

৪. আহমাদ ইবনে মানী' রহ.............. আবূ 'আম্মার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির রাযি. কে বললাম, খট্টাশ কি শিকারযোগ্য প্রাণী? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, আমরা কি তা খাব ? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তা বলেছেন? তিনি বললেন, হাঁ।

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

কতক আলিম এতদনুসারে মত পোষণ করেন। তাঁরা খট্টাশ খাওয়ায় কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। এ হল, আহমাদ ও ইসহাক রহ. এর অভিমত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে খট্টাশ আহার করা অপছন্দনীয় বলে একটি হাদীস বর্ণিত আছে আর কাত্তান বলেছেন, জারীর ইবনে হাকিম রহ. এ হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়দ ইবনে উমায়র – ইবনে আবূ আম্মার – জাবির – উমার রাযি. সূত্রে তাঁর বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত আছে। তবে ইবনে জুরায়জ রহ. এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جُزْءٍ عَنْ اَخِيْهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ اَوَيَأْكُلُ الضَّبُعَ اَحَدٌ وَسَأَلْتُهٗ عَنْ اَكْلِ الذِّئْبِ فَقَالَ اَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ اَحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ ، هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِالْقَوِىِّ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبِىْ اُمَيَّةَ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ اَهْلِ الْحَدِيْثِ فِىْ اِسْمٰعِيْلَ وَعَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبِىْ اُمَيَّةَ وَهُوَ عَبْدُا الْكَرِيْمِ بْنُ قَيْسٍ هُوَ ابْنُ اَبِى الْمُخَارِقِ وَعَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِىُّ ثِقَةٌ

৫. হান্নাদ রহ.......... খুযায়মা ইবনে জায রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমি খট্টাশ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, খট্টাশ কি কেউ খায় ? আমি তাঁকে নেকড়ে বাঘ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, যার মাঝে মঙ্গল আছে, এমন কেউ কি নেকড়ে খায় ?

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসের সনদ শক্তিশালী নয়। ইসমাঈল ইবনে মুসলিম – আবদুল কারীম আবূ উমাইয়া সূত্র ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ ইসমাঈল এবং আবদুর করীম আবূ উমাইয়া -এর সমালোচনা করেছেন। এ আবদুল করীম হলেন, আবদুল করীম ইবনে কায়স। তিনি হলেন, ইবনে আবুল মুখারিক। পক্ষান্তরে আবদুল কারীম ইবনে মালিক জাযারী হলেন নির্ভরযোগ্য রাবী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

الضبع ঃ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, একে হিন্দীতে هنڈار ফার্সীতে كفتار আর উর্দূতে بجو বলা হয়। মিসবাহুল লুগাত (বাংলা) তে রয়েছে, الضبع এর বহুবচন ضباع، أضبع، ضبع، ضبوعة، ضبعات অর্থ, হায়েনা। আল্লামা ওহীদুজ্জামান রহ.বলেন, হিন্দীতে একে جزغ ও বলা হয়। আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. بذل المجهود এর লিখেছেন–

قال النيل : الضبع هو الواحد الذكر، والأنثى ضبعان، ولا يقال: ضبعة ـ ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرا وسنة أنثى، فليقع فى حال الذكورة ويلد فى حال الأنوثة (بذل المجهود صـ ٣٥٨)

অর্থাৎ الضبع পুংলিঙ্গ একবচন। তার مونث হল ضبعان এবং ضبعة তার مؤنث ব্যবহৃত হয় না। আশ্চর্যের বিষয় হল, এটি এক বছর নর থাকে এবং এক বছর মাদী থাকে। নর থাকাবস্থায় গর্ভধারণ করে আর মাদী থাকা অবস্থায় প্রসব করে। এটি এক প্রকার ছোট প্রাণী। মানুষের গোশত ভক্ষণ করে। কিন্তু ক্ষুদ্র বিধায় মানুষের উপর সরাসরি আক্রমণ করতে পারে না। তবে কোনও মানুষকে ঘুমন্ত পেলে মাটি খুড়ে তার পর্যন্ত পৌঁছার এবং গোশত খাওয়ার চেষ্টা করে। এটি কবর খুঁড়ে লাশ বের করে মানুষের গোশ্‌ত খায়।

উলামায়ে কিরামের অভিমত

এটি হালাল না কি হারাম –এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম ইখতেলা্‌ফ করেছেন। আলোচ্য অনুচ্ছেদের দু'টি হাদীসের একটি দ্বারা বুঝা যায়, এটি ভক্ষণ করা হালাল। পক্ষান্তরে অপর হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, এটি ভক্ষণ করা হারাম। ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর অভ্যাস মাফিক স্বীয় মাযহাব সাব্যস্ত করার জন্য হালাল সংক্রান্ত হাদীসটি প্রথমে এনেছেন এবং দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাপারে পর্যালোচনা করে সেটিকে 'যঈফ' আখ্যায়িত করেছেন।

আহনাফ এবং এক বর্ণনা মতে ইমাম মালিক রহ., আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ., সাঈদ ইবনে মুশাইয়াব রহ., সুফিয়ান সাওরীসহ প্রায় সকল উলামায়ে কিরাম বলেন, ضبع তথা হায়েনা ভক্ষণ করা হারাম।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ রহ., ইমাম আহমদ রহ. এবং ইমাম মালেক রহ. এর দ্বিতীয় বর্ণনা মতে ضبع তথা হায়েনা ভক্ষণ করা হালাল।

হালাল হওয়ার দলীল

১. আলোচ্য অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস।

২. হযরত সাহারানপুরী রহ. বযলুল মাজহুদ গ্রন্থে (৩৫৮) লিখেছেন–

قال الشافعى مازال الناس يأكلونها ويبيعونها (أى الضبع) بين الصفا والمروة من غير نكير .

হারাম হওয়ার দলীলসমূহ

১. ইমাম আবূ হানীফা রহ., সুফিয়ান সাওরী রহ., আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকসহ জমহূর উলামায়ে কিরাম দলীল হিসাবে পেশ করেন, মশহুর হাদীস حرم عليكم كل ذى ناب "তোমাদের উপর প্রত্যেক হিংস্র প্রাণীকে হারাম করা হয়েছে।" বলা বাহুল্য, ضبع ذى ناب "হায়েনা ও হিংস্র প্রাণী সুতরাংএটিও হারাম হবে।

২. আলোচ্য অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস। যদিও ইমাম তিরমিযী রহ. অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসকে 'যঈফ' বলেছেন, কিন্তু মূলতঃ এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে হারাম আখ্যা দেওয়া হয়নি বরং হারাম আখ্যায়িত করা হয়েছে حرم عليكم كل ذى ناب এ পূর্বোক্ত হাদীসের আলোকে। দ্বিতীয় হাদীসখানা প্রথমোক্ত হাদীসের সমর্থনে নেওয়া হয়েছে।আর সমর্থনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক গ্রন্থেও এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৩. তরমিযীর টীকাকার বর্ণনা করেছেন, عن على انه نهى عن اكل الضب والضبع

৪. হযরত শাইখুল আদব ই'যায আলী রহ. বলেন, কুরআনের আয়াত يُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ এর মাধ্যমেও হানাফী মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশ করা যেতে পারে।

প্রতিপক্ষের দলীলের উত্তর

(১) হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. بذل المجهود গ্রন্থে বলেন, সম্ভবতঃ হযরত জাবির রাযি. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ان الضبع صيد থেকে ইজতিহাদ করে বলে দিয়েছেন, এটি খাওয়া যেতে পারে। আর যেহেতু হযরত জাবির রাযি. এ ইজতিহাদটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য থেকে করেছেন, তাই তিনি হালাল হওয়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন।

(২) তাছাড়া স্বতঃসিদ্ধ কায়েদা আছে, হালাল এবং হারামের বিধান পরস্পর বিরোধী হলে হারাম সাব্যস্তকারী বিধান কার্যকর হয়। আর এতেই অধিক সতর্কতা।

(৩) قلت لجابر أصيد هى؟ এখন প্রশ্ন হল, صيد কাকে বলে ? মূলতঃ صيد এর সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে শিকার করা প্রত্যেক হালাল জন্তুকে صيد বলা হয়। তাঁর মতে হারাম জন্তুর ক্ষেত্রে صيد শব্দটি ব্যবহার হয় না। পক্ষান্তরে আবু হানীফা রহ. বলেন, صيد প্রত্যেক শিকারী বন্য পশুকে বলে। চাই তা হালাল হোক কিংবা হারাম।

সে মতে ইমাম শাফিঈ রহ. এর নিকট কুরআন মজীদের আয়াত-
وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ এর অর্থ لاتقتلوا صيدا حلالا وانتم حرم । সুতরাং তাঁর মাযহাব অনুযায়ী হালাল পশু শিকার করলে এ বিধানের শামিল হবে। হারাম জন্তু শিকার করলে এ বিধানের আওতাভুক্ত হবে না।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হল, لا تقتلوا حيوانا متوحشا وانتم حرم হালাল কিংবা হারাম যে কোন জন্তু শিকার করলেই আয়াতে উল্লেখিত বিধানের আওতাভুক্ত হবে। ইমাম সাহেব صيد এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার সমর্থনে আলোচ্য অনুচ্ছেদের উল্লেখিত হাদীসখানাও পেশ করা যায়। অর্থাৎ ইবনে আবি কাতাদাহ যখন জাবির রাযি. কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, الضبع أصيد هى؟ তখন হযরত জাবির রাযি. উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। ইবনু আবি কাতাদাহ পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন, اكلها। সুতরাং এখানে যদি صيد দ্বারা শুধু হালাল জন্তুকেই বুঝানো হত, তাহলে ইবনে আবি কাতাদাহর পুনরায় এ প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিল না। তার দ্বিতীয় প্রশ্নটি থেকে এটাই সাব্যস্ত হয় যে, صيد হালালও হতে পারে; হারামও হতে পারে।

হানাফীদের এর ফতওয়া ঃ হায়েনা ভক্ষণ করা হারাম।

(দুররে মুখতার ঃ ৯/৪৪৩, আলমগীরি ঃ ৫/২৮৯, হেদায়াহ ঃ ৪/৪৪১)

بَابُ مَاجَاءَ فِي اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ ص-١

অনুচ্ছেদ ঃ ৫. ঘোড়ার গোশত আহার

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ اَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ ، قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ وَرِوَايَةُ ابْنُ عُيَيْنَةَ اَصَحُّ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ اَحْفَظُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ

৬. কুতায়বা ও নাসর ইবনে আলী রহ......... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ঘোড়ার গোশত আহার করিয়েছেন। কিন্তু গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে আসমা বিনতে আবূ বাকর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

আমর ইবনে দীনার – জাবির রাযি. সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে যায়দ রহ. এ হাদীসটি আমর ইবনে দীনার – মুহাম্মদ ইবনে আলী – জাবির রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে উয়াইনা রহ. এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ। মুহাম্মদকে (ইমাম বুখারী রহ.) বলতে শুনেছি যে, সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. হাম্মাদ ইবনে যায়দ রহ. অপেক্ষা অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারে আইম্মায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

(১) ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, সাহেবাইন, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, হাসান বসরী, আ'তা ইবনু আবী রাবাহ এবং সাঈদ ইবনে যুবাইর প্রমুখের মতে ঘোড়ার গোশত কারাহাত (অপছন্দনীয়তা) ছাড়াই মুবাহ।

(২) ইমাম আবু হানীফা রহ থেকে এ ব্যাপারে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন, আল্লামা কাশ্মিরী রহ. العرف الشذى গ্রন্থে এবং হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. الورد الشدى গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহ. থেকে ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারে মাকরূহে তাহরীমী এবং মাকরূহে তানযীহী উভয় বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে মাকরূহে তানযীহী সম্পর্কিত বর্ণনাটি অগ্রাধিকারযোগ্য।

আল্লামা কাশ্মিরী রহ. আরও বলেন, দুররে মুখতার-এ রয়েছে, ইমাম আ'যম রহ. এ ব্যাপারে তাঁর পূর্বোক্ত মত থেকে ফিরে এসেছেন। আল্লামা সাহারানপুরী রহ. بذل المجهود গ্রন্থে লিছেন–

اختلف الروايات عن الامام ابى حنيفة رح فى لحوم الخيل فعلى رواية الحسن انه يحرم اكل لحم الخيل واما على ظاهر الرواية عن ابى حنيفة رح عن ابى حنيفة انه يكره اكله ولم يطلق التحريم لاختلاف الاحاديث المروية فى الباب (بذل المجهود ج ٤ ص ٣٥٥)

আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন –

ذهب الى الحرمة ابو حنيفة ومالك والاوزاعى وغيرهم (كوكب :٢/٤)

শাইখুল আদব আল্লামা ই'যায আলী রহ. বলেন, ইমাম আ'যম রহ. থেকে আলোচ্য মাসআলার ব্যাপারে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। যে তিনটি বর্ণনার ভিত্তি তিনটি দলীলের ওপর। যথাক্রমে –

(১) কুরআন মজীদের আয়াত والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর দানকৃত অনুগ্রহের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে 'ঘোড়ায় আরোহন'-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ঘোড়ার গোশত ভক্ষণ করা যদি জায়িয হত, তাহলে অনুগ্রহ হিসেবে 'ভক্ষণ' এর কথা বলতেন। আর 'ভক্ষণ' আরোহনের চেয়েও অধিক উপকারী। সুতরাং বুঝা গেল, ঘোড়ার গোশত আহার করা জায়িয নয়। এ দলীল দ্বারা ইমাম আবু হানীফা রহ. ঘোড়ার গোশত হারাম সাব্যস্ত করেন।

(২) **দ্বিতীয়তঃ** ঘোড়া যুদ্ধের অবলম্বন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل

এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে ঘোড়ার বহু ফযীলত এসেছে। সুতরাং ঘোড়া সম্মানযোগ্য জন্তু। সম্মানযোগ্য হওয়ার কারণে এটি ভক্ষণ করা মাকরূহে তাহরীমী। এ দলীলের মাধ্যমে তিনি ঘোড়ার গোশত মাকরূহ সাব্যস্ত করেন।

(৩) **তৃতীয়তঃ** ঘোড়া ভক্ষণ শুরু করলে যুদ্ধের হাতিয়ার হ্রাস পাবে। তাই ঘোড়ার গোশত ভক্ষণ করা মাকরূহে তানযীহী। এ দলীলের মাধ্যমে তিনি মাকরূহে তানযীহী সাব্যস্ত করেন।

ইমাম শাফিঈ রহ. প্রমুখের দলীল

তাঁদের দলীল হল, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস–

عن جابر قال : أطعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر الاهلية

হানাফীদের দলীলসমূহ

১. কুরআনের শরীফের আয়াত– والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة (الاية)

২. নিম্নোক্ত হাদীস–

عن خالد بن الوليد ان رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل.. الخ (رواه ابو داؤد والنسائى وابن ماجة)

৩. ঘোড়া সম্মানের জন্তু। (বিস্তারিত দেখুন শাইখুল আদবের প্রাগুক্ত আলোচনায়।)

৪. ঘোড়া যুদ্ধের বাহন। এর মাধ্যমে মুসলমানরা কাফির-মুশরিকদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে। কাজেই এটি ভক্ষণ করার অনুমতি দেওয়া হলে জিহাদের আসবাবপত্রে শূন্যতা সৃষ্টি হবে। ফলে মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং তাতে ভক্ষণ না করাই উচিত।

ইমাম শাফিঈ রহ. প্রমুখের দলীলের উত্তর

ইমাম শাফিঈ রহ. প্রমুখের পেশকৃত দলীল জাবির রাযি. এর হাদীসটির একাধিক উত্তর রয়েছে। যথা–

(১) আয়াতের মোকাবেলায় হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. এর উত্তরে বলেন, জাবির রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির সম্পর্ক খায়বরের সঙ্গে। কেননা অবু দাউদ শরীফে স্পষ্ট ভাষায় এসেছে,

عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله ﷺ يوم خيبر.......... (الخ)

এ হাদীস হালাল সাব্যস্ত করার জন্য প্রমাণস্বরূপ। আর খালেদ রাযি. খায়বরের পরে মুসলমান হয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, 'হারাম সংক্রান্ত' হাদীসটি 'হালাল সংক্রান্ত' হাদীসটিরও পরের। সুতরাং 'হারাম সংক্রান্ত' হাদীসখানা 'নাসিখ' (রহিতকারী) এবং 'হালাল সংক্রান্ত' হাদীস 'মানসূখ'।

(৩) এ উত্তরটি প্রসিদ্ধ অর্থাৎ হারামের দলীল এবং হালালের দলীল পরস্পর বিরোধী হলে উসূল হল, হারামের দলীল অগ্রাধিকার পায়। অতএব খালেদ রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসই অগ্রাধিকার পাবে।

উক্ত আলোচনার সুবাদে আরেকটি মাসআলা বের হয় যে, জিহাদের মাধ্যম কি ঘোড়ার সত্তা নাকি ঘোড়া থেকে উপকৃত হওয়া জিহাদের মাধ্যম? এর উত্তরে বলা হয়, ঘোড়ার সত্তা হল, জিহাদের সম্বল। সুতরাং ঘোড়ার অন্যান্য অঙ্গ থেকে উপকৃত হওয়াতে কোন বাঁধা নেই। যেমন, গোড়ার দুধ পান করা হারাম হবে না।

আহনাফের ফাতওয়া

ঘোড়ার গোশত ভক্ষণ করা মাকরূহে তানযীহী। এটাই বিশুদ্ধ মত। (আলমগীরি ঃ ৫/২৯০, দুররে মুখতার ঃ ৯/৪৪২, হেদায়াহ ঃ ৪/ ৪৪১)

بَابُ مَاجَاءَفِى لُحُوْمِ الْحُمُرِالْاَهْلِيَّةِ ص۔۲

অনুচ্ছেদ ঃ ৬. গৃহপালিত গাধার গোশত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ

৭. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার ও ইবনে আবূ উমার রহ...... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মুত'আ বিবাহ এবং পৃহপালিত গাধার গোশত আহার করতে নিষেধ করেছেন।

সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী রহ...... মুহাম্মদ ইবনে আলীর দুই পুত্র আব্দুল্লাহ ও হাসান থেকে বর্ণিত। ইমাম যুহরী রহ. বলেন, এই দুইজনের মধ্যে হাসান ইবনে মুহাম্মদই রহ.-ই হলেন অধিকতর সন্তোষজনক। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ব্যতীত অন্যরা ইবনে উয়াইনা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. হলেন অধিকতর সন্তোষজনক।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْاِنْسِىَّ

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَالْبَرَاءِ وَابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى وَاَنَسٍ وَالْعِرْبَاضِ ابْنِ سَارِيَةَ وَاَبِىْ ثَعْلَبَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَرَوٰى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هٰذَا الْحَدِيْثَ وَاِنَّمَا ذَكَرُوا حَرْفًا وَاحِدًا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

৮. আবূ কুরায়ব রহ......... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁতাল হিংস্র পশু, মুজাচ্ছামা (যে পশু বেঁধে রেখে তীর ছুড়ে হত্যা করা হয়) এবং গৃহ পালিত গাধা হারাম ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে আলী, জাবির, বারা, ইবনে আবু আওফা, আনাস, ইরবায ইবনে সারিয়া, আবু সা'লাবা, ইবনে উমার ও আবু সাঈদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ প্রমুখ রহ. হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা এই একটি মাত্র বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁতাল হিংস্র পশু হারাম ঘোষণা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

حمر ঃ শব্দটি حمار এর বহুবচন। حمار এর مؤنث হল حمارة। কথায় আছে, حمار اهلى অর্থাৎ গৃহপালিত গাধা, নীল গাভী। حمار وحشى অর্থাৎ বন্য গাধা। এখানে حمار এর সাথে اهلى শব্দ যোগ করা হয়েছে। যেন حمار وحشى বের হয়ে যায়। কারণ, حمار وحشى সর্বসম্মতিক্রমে হালাল। (শামী ঃ ৯/৪৯১)

(১) عن عبد الله والحسن ابنى محمد ঃ অর্থাৎ আবু তালিবের ছেলে মুহাম্মদ ইবনে আলী। তিনি ইবনুল হানাফিয়া নামেই প্রসিদ্ধ।

(২) عن ابيهما ঃ অর্থাৎ মুহাম্মদ আলী যিনি ইবনুল হানাফিয়া হাশেমী নামে প্রসিদ্ধ।

(৩) عن لحوم الحمر الاهليه ঃ অর্থাৎ এখানে আলী রাযি. গৃহপালিত গাধা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ও মুত'আ বিয়ে সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা উভয়টিই একত্রে উল্লেখ করেছেন। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এক সাথে এ দু'টিরই অবকাশ দিতেন। তাই হযরত আলী রাযি. এ দুটি বিষয়কেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। (তাকমিলাহ)

متعة النساء ঃ শব্দটি تمتع শব্দ থেকে চয়নকৃত। অর্থ– ভোগ করা, উপভোগ করা, আনন্দ লাভ করা, উপকৃত হওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় متعة বলা হয়, কোন নারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে تمتع শব্দ দ্বারা বিয়ে করা। تمتع শব্দের স্থলে যদি نكاح শব্দ উল্লেখ করা হয়, তাহলে তাকে نكاح مؤقت বলে।

'মুত'আ বিবাহ' এর বিষয়টি যেহেতু কিতাবুন্নিকাহ-এর সাথে সম্পৃক্ত। বিধায় বিস্তারিতভাবে সেখানেই আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি এসেছে বলে এখানেও তার কিঞ্চিত আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

ইবনু দাকীক আল–ঈদ বলেছেন– نكاح المتعة تزوج المرأة الى اجل

হিদায়াহ গ্রন্থকার বলেন– نكاح المتعة باطل وهو ان يقول لامرأة اتمتع بك كذا مدة بكذا المال

মুত'আ বিবাহের বিধান

সকল ইমামের মতে নিকাহে মুত'আ হারাম। কিন্তু শী'আরা মুত'আ বিবাহকে হালাল বলে থাকে।

শী'আদের দলীল

(১) শী'আরা প্রথমতঃ কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করার অপচেষ্টা চালায়। কুরআন মাজীদে এসেছে– فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة...... الاية

তাদের মতে এখানে استمتاع শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে; نكاح শব্দ উল্লেখ করা হয়নি। আর এ শব্দ থেকেই متعة শব্দ উৎপত্তি। অনুরূপভাবে এখানে 'বিনিময়' দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর 'বিনিময়' মুত'আতেই দেওয়া হয়; বিবাহতে নয় বরং বিবাহতে দেওয়া হয় 'মহর'।

(২) নিম্নোক্ত হাদীসও তাদের দলীল–

عن ابن عباس رض قال انما كانت المتعة فى اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة

فيتزوج المرأة بقدر مايرى انه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم اوما ملكت ايمانهم (جامع الترمذى ج١)

মুত'আ হারাম হওয়ার দলীল

আইম্মায়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের পক্ষ থেকে বাদাই'-এর রচয়িতা বলেন, لنا الكتاب والسنة والاجماع والقياس অর্থাৎ আমাদের পক্ষে রয়েছে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস।

(১) কুরআনুল কারীম ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– والذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم اوما ملكت ايمانهم (الاية)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুই ধরনের নারীদের সাথে যৌনসম্ভোগ হালাল করেছেন।

(ক) বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ নারী। (খ). নিজের বাঁদী।

এ দুই ধরনের নারী ছাড়া অন্য যে কোন নারী পুরুষের জন্য হালাল নয়। বলা বাহুল্য, মুত'আহ মূলতঃ বিবাহ নয় কিংবা বাঁদীসূত্রও নয়। কেননা মুত'আহ তালাক কিংবা আযাদ ছাড়াই শেষ হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতেরই শেষভাগে বলেছেন– فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون মূলতঃ যারা মুত'আকে হালাল বলে, তারাই العادون। তথা সীমালংঘনকারীর অন্তর্ভুক্ত।

(২) হাদীস শরীফঃ

☆ প্রথম হাদীস আলী রাযি. থেকে বর্ণিত–

عن على ان النبى ﷺ نهى عن متعة النساء (رواه الصحاح الستة)

☆ দ্বিতীয় হাদীস সালামা ইবনুল আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত–

عن سلمة بن الاكوع قال رخص النبى ﷺ عام اوطاس فى المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها (رواه مسلم)

☆ তৃতীয় হাদীস রবী ইবনে সাবযা রাযি. হতে বর্ণিত–

عن ربيع بن سبزة ان النبى ﷺ قال يا ايها الناس! انى كنت اذنت لكم فى الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم الى يوم القيامة (رواه مسلم)

(৩) **ইজমা ঃ** অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, উম্মতের ইমাম বরং আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সকলেই এ মত পোষণ করেন যে, মুত'আ জায়িয নেই বরং হারাম।

(৪) **কিয়াস ঃ** কিয়াস মতেও মুত'আহ হারাম। কেননা বিবাহের বৈধতা কেবল কামানল ও যৌন ক্ষুধা মেটানোর উদ্দেশ্যে নয়। বরং একাধিক উদ্দেশ্যে বিবাহের বৈধতা দেওয়া হয়েছে। সে সব উদ্দেশ্য মুত'আর মাধ্যমে কখনও অর্জিত হয় না। বিধায় মুত'আহ বৈধ না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যেমন, বিবাহের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হল, নারী জাতির মর্যাদা রক্ষা করা। কোন নারী যদি মুত'আ পদ্ধতিতে নিজের সারাটা জীবন ব্যয় করে দেয়, তাহলে জীবনের শেষ ভাগে এসে যখন তার রূপ ও সৌন্দর্য্য বিলীন হয়ে যাবে, তখন তার ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করারও কেউ থাকবে না। অনুরূপভাবে মুত'আর সময়ে যে সন্তান তার গর্ভে আসবে, সে সন্তানের দায়িত্বভারও কেউ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে না। এ জন্য নারী জাতির মর্যাদা রক্ষা এবং সন্তানের জীবন রক্ষার এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উম্মতের সকল উলামায়ে কিরাম মুত'আকে হারাম সাব্যস্থ করেছেন।

শী'আদের দলীলের জবাব

শী'আরা দলীল হিসাবে কুরআন মজীদের যে আয়াতটি পেশ করে থাকে অর্থাৎ فما استمتعتم به الخ এর জবাবে 'বাদাই' গ্রন্থের লেখক বলেন, যেহেতু এ আয়াতের পূর্বে ও পরে 'বিবাহ' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে استمتاع দ্বারা استمتاع بالنكاح উদ্দেশ্য। আর আয়াতের মধ্যে যে 'বিনিময়' এর কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 'মহর'। কেননা মহরকে কখনও কখনও أجر (বিনিময়) শব্দ দ্বারাও ব্যক্ত করা হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن

এ আয়াতে اجورهن এর তাফসীর মুফাসসিরীন কিরাম مهورهن দ্বারা করেছেন।

শী'আদের দ্বিতীয় দলীল ছিল, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণিত হাদীস। এর জবাবে বলা হয়, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তাঁর প্রথমোক্ত মত থেকে ফিরে এসেছেন। যেমন, বর্ণিত আছে,

ان علينا قال له اما علمت ان النبى ﷺ حرم المتعة يوم خيبر؟ فرجع ابن عباس وكان يقول اللهم انى اتوب اليك من قول فى المتعة (تنظيم الاشتات: ٢/ ١٧٥)

উপরন্তু মুত'আ হারাম হওয়া সম্পর্কীয় হাদীসগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায়, এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিভিন্নভাবে এসেছে। যেমন, আলী রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসটি ছিল- نهى عن متعة النساء يوم خيبر

সালামা থেকে বর্ণিত হাদীসটি ছিল- رخص فيها عام أوطاس ثلاثا نهى عنها এখানে 'আওতাছ' এর বছরটি ছিল ফতহে মক্কার পর পরই। আর রবী রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসটি ছিল- نهى يوم الفتح عن متعة النساء এসব হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে ইমাম নববী রহ. বলেন, মুত'আ হারাম এবং হালাল দুই বার হয়েছে।

(১) খায়বরের পূর্বে মুত'আ হালাল ছিল। খায়বরের সময় তা হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

(২) ফতহে মক্কার বছর, যেটা আওতাছের বছরও। এ সময় কয়েক দিনের জন্য মুত'আহ হালাল করা হয়েছিল। তারপর চিরতরে মুত'আ হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, আমি বড় সন্দিহান যে, ইসলামে কখনও মুত'আহ হালাল করা হয়েছে কিনা। কারণ, ফতহে মক্কা সম্পর্কীয় বর্ণনাতে এসেছে,

فكان نكاحا بمهر قليل بنية ان يؤيد النكاح (العرف الشذى :١/٢١٥)

বস্তুতঃ সেটি ছিল অল্প মহরে সহজ বিবাহ। বিবাহকে সহজ করার উদ্দেশ্যে অল্প মহরে বিবাহের অনুমতি তো বর্তমানেও আছে।

হানাফীদের এর ফতওয়া

মুত'আ এবং মুআক্কাত বিবাহ হারাম এবং বাতিল।

(শামী ঃ ৩/১৪৯, হেদায়াহ ঃ ২/৩১২, আলমগীরি ঃ ১/২৮২, বাদাঈয়ুস সানায়ে ঃ ২৭২/২)

গৃহপালিত গাধার গোশতের বিধান

বন্য গাধা সর্বসম্মতিক্রমে হালাল। গৃহপালিত গাধার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন, ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং জমহূরের নিকট গৃহপালিত গাধার গোশত হালাল।

ইমাম মালেক রহ. থেকে এ প্রসঙ্গে একাধিক অভিমত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মত জমহূরের অনুরূপ। দ্বিতীয়টি মত হল, গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম।

বযলুল মজহূদ গ্রন্থে হায়াতুল হাইওয়ান –এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, গৃহপালিত গাধা জমহূর ইমামগণের মতে হারাম। আর ইমাম মালেক রহ. এর মতে হারাম। (বযলুল মজহূদ ঃ ৪/৩৫৯)

হালাল-এর দলীলসমূহ

(১) ইমাম মালেক রহ. কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে দলীল পেশ করেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير.......... الخ

তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে গৃহপালিত গাধার উল্লেখ নেই। সুতরাং গৃহপালিত গাধা হালাল।

(২) তিনি দ্বিতীয় দলীল পেশ করেন নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে ঃ

عن غالب بن ابجر قال اصابتنا سنة فلم يكن فى مالى شئ اطعم اهلى الا شئ من حمر وقد كان النبى ﷺ حرم لحوم الحمر الاهلية فاتيت النبى ﷺ فقلت يا رسول الله اصابتنا السنة فلم يكن فى مالى ما اطعم اهلى الا سمان حمر وانك حرمت الحمر الاهلية فقال : اطعم اهلك من سمين حرمك فانما حرمتها من اجل حوال القرية (ابو داؤد ، كتاب الاطعمة)

(৩) তাঁর তৃতীয় দলীল হল, কিয়াস। বন্য হোক কিংবা গৃহপালিত গাধা হোক। গাধা তো গাধাই। যেরূপভাবে বন্য গাধা হালাল, অনুরূপভাবে গৃহপালিত গাধাও হালাল হওয়া উচিত।

হারাম-এর দলীলসমূহ

(১) ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহ. এবং জমহূর দলীলস্বরূপ প্রথমতঃ নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমাটি পেশ করেন।

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة (الاية)

(২) তাঁদের দ্বিতীয় দলীল আলী রাযি.-এর বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস ঃ

عن على قال نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية

(৩) জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসঃ

عن جابر قال نهى ﷺ ان نأكل لحوم الحمر وامرنا ان نأكل الخيل (سنن ابى داؤد)

(৪) হেদায়াহ গ্রন্থকার নিম্নের দলীলটিও পেশ করেছেন–

عن خالد بن الوليد ان النبى ﷺ نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير

প্রতিপক্ষের দলীলের উত্তর

হালাল এর প্রবক্তাগণ কুরআনের যে আয়াত দ্বারা দলীল দিয়েছেন, তার সম্পর্কে কথা হল, জমহূরের মতে হারাম বিষয়সমূহের সীমাবদ্ধতা কেবল উক্ত আয়াতের উপরই নির্ভরশীল নয় বরং আরও বহু জিনিস রয়েছে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে হারাম ঘোষণা করেছেন।

গালিব রাযি. সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির ব্যাপারে আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. بذل المجهود এ লিখেছেন–

قال الشوكانى : والحديث لا تقوم به حجة، قال الحافظ: اسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة فلا اعتماد عليه، وقال المنذرى: اختلف اسناده كثيرا وقال البيهقى: اسناده مضطرب

হযরত সাহারানপুরী রহ. (বযল ঃ ৪/৩৬) আরও বলেছেন,

يحتمل ان رسول الله ﷺ رخص بهم فى مجاعتهم وبين علة تحريمها المطلق لكونها تاكل العذرات

বযলুল মাজহুদ এর টীকাকার (৪/৩৬০) বলেন–

ويحتمل عندى ان يجاب بأن يمكن ان تكون حمره وحشية ثم صارت اهلية ومثله مباح

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে থেকে এটি ভক্ষণ করার যে অনুমতি বর্ণিত আছে, তাতে দু'টি সম্ভাবনা আছে। (১) গাধাটি যবেহ কর এবং খাও। (২) তাকে বিক্রি কর এবং তার মূল্য দ্বারা খাবার খরিদ করে খাও।

দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উদ্দেশ্য নিলে হাদীসগুলোতে আর কোন বিরোধ থাকে না। সুতরাং এটাই হবে অধিক যুক্তিযুক্ত। আর তাঁরা যে কিয়াসী দলীল পেশ করেছেন, সেটি সঠিক নয়। কারণ, নিয়মানুসারে اصل থেকে فرع এর হুকুম তখন প্রকাশ পায়, যখন فرع এর ব্যাপারে স্পষ্ট কোন হুকুম না থাকে। আর এখানে فرع এর ব্যাপারে তথা গৃহপালিত পশুর ব্যাপারে বিধান হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বরের সময় গৃহপালিত পশুর গোশতকে হারাম আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং এখানে কিয়াসের কোন প্রয়োজন নেই।

গাধার শরঈ বিধান

গাধা এবং খচ্চরের গোশত, দুধ ও চর্বি ভক্ষণ করা হারাম। (হিন্দিয়াঃ ২৯০/৫, দুররে মুখতার ঃ ৪৪২/৯, হেদায়াহ ঃ ৪৪১/৪)

المجثمة ঃ শব্দটি মীমের উপর পেশ, জীমের উপর যবর ছা এর উপর তাশদীদ। এটি اسم এর সীগাহ। অর্থাৎ যাকে বেঁধে রাখা হয়। পশুকে বেঁধে রাখা। যেন সে পালাতে না পারে কিংবা উড়ে যেতে না পারে। কাজটি নিষেধ। কেননা এতে পশুর প্রতি অবিচার হয়। তবে এর অধিক ব্যবহার হল, পাখি ও খরগোশের ক্ষেত্রে। এটির প্রতিশব্দ হল مصبورة । الجثم এর অর্থ হল, কোনও স্থানকে আঁকড়ে ধরা, বুকের উপর পড়া কিংবা মাটির সাথে লেগে থাকা।

মিসবাহুল লুগাতে রয়েছে المجثمة বেঁধে রেখে হত্যা করা পর্যন্ত যে পাখি কিংবা খরগোশ ইত্যাদিকে তীর বা অন্য কিছু নিক্ষেপ করা হয়।

শাইখুল আদব হযরত মাওলানা ই'জায আলী রহ. বলেন, مجثمة ঐ ছোট জন্তুকে বলা হয়, যাকে তীর ইত্যাদির নিশানা অনুশীলনের জন্য বেঁধে রাখা হয়। যেমন, কবুতর ইত্যাদি।

حرفا واحدا ঃ অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনু আ'মরের প্রথম শাগরিদ রায়েদাহ তিনটি জিনিসের বর্ণনা দিয়েছেন।

(১) كل ذى ناب من السباع (২) والمجثمة (৩) والحمر الاهلية কিন্তু অন্যান্য শাগরিদ আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ প্রমুখ শুধু একটি জিনিসের বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থাৎ كل ذى ناب من السباع

ذى ناب ঃ ناب বলে ধারালো তীক্ষ্ণ দাঁতকে। যদ্বারা চিড়ে ফেঁড়ে ফেলা হয়। এটি রুবাঈ দাঁতের সাথে মিলত থাকে। ذى ناب বলে সেসব হিংস্রপ্রাণীকে, যেগুলো দাঁতে শিকার করে। যেমন– সিংহ, বাঘ ইত্যাদি। এমনিভাবে বিড়াল, কুকুর ইত্যাদির ধারালো দাঁত থাকে। এ দাঁত দিয়েই এসব প্রাণী আঘাত করে। এমনিভাবে ذى مخلب من الطيور সেসব পাখী যেগুলো শিকার করে। যেমন– চিল, বাজ, ঈগল। এগুলো আঘাত করে পাঞ্জা দ্বারা। পাঞ্জা দিয়ে ঝাপটা মেরে শিকারকে কাবু করে ফেলে।

হাদীসের সারকথা হল, হিংস্র সব ধরনের চতুষ্পদ জন্তু, যেগুলোর মুখে ধারালো দাঁত থাকে এবং শিকার করে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে নিষেধ করেছে সেসব শিকারী পাখি খেতে, যেগুলো ঝাপটা মেরে পাঞ্জা দিয়ে শিকার করে। কেননা এগুলো সব হিংস্র প্রাণী।

سباع সেসব চতুষ্পদ জন্তু, যেগুলো চিড়ে ফেঁড়ে খায়। হাদীস শরীফে سباع এর শর্তায়নে অনুমিত হয়, যেসব চতুষ্পদ ধারালো দাঁতবিশিষ্ট জন্তু চিড়ে ফেড়ে খায়, সেগুলো হারাম। শুধু ধারালো দাঁতবিশিষ্ট হলেই হারাম হবে না।

হিদায়া গ্রন্থে আছে, শুধু পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি হারাম নয়। তিনি আরও বলেন, سبع দ্বারা সেসব চতুষ্পদ জন্তু ও পাখি উদ্দেশ্য, যেগুলোতে পাঁচটি নিন্দনীয় গুণ থাকে। (১) আক্রমণ করা। (২) হত্যা করা। (৩) ছোঁ মেরে নেওয়া। (৪) লুট করা। (৫) জখম করা।

হিংস্র প্রাণীগুলোকে হারাম করার হিকমত হল, মানুষের মধ্যে যেন এসব খারাপ গুণ সৃষ্টি না হয়। কারণ, আখলাক-চরিত্র ও নীতি- নৈতিকতায় খাদ্যের প্রভাব অনস্বীকার্য।

আহনাফ-এর ফতওয়া

এভাবে জন্তুকে বেঁধে রেখে তীর ইত্যাদির লক্ষ্যবস্তু বানানো মাকরূহে তাহরীমী। কারণ, এতে বিনা কারণে পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়। আর এ জাতীয় জন্তু (موقوذة) তথা আঘাতের মাধ্যমে মৃত্যু হয়, বিধায় ভক্ষণ করা হারাম। হ্যাঁ, জন্তু যদি তীর ইত্যাদির আঘাতে না মরে জীবিত থাকে এবং তারপর শরী'আতসম্মতভাবে যবাহ করা হয়, তাহলে তার গোশত হালাল। (শামী ঃ ১০/৫৮)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاَكْلِ فِى اٰنِيَةِ الْكُفَّارِ ص ـــ ۲

অনুচ্ছেদ ঃ ৭. কাফিরদের পাত্রে আহার করা

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قُدُوْرِ الْمَجُوْسِ قَالَ اَنْقُوْهَا غَسْلًا وَاطْبُخُوْا فِيْهَا وَنَهٰى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِىْ نَابٍ هٰذَا حَدِيْثٌ مَشْهُوْرٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ وَرُوِىَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ وَاَبُوْ ثَعْلَبَةَ اِسْمُهٗ جُرْثُوْمٌ وَيُقَالُ جُرْهُمٌ وَيُقَالُ نَاشِبٌ وَقَدْ ذُكِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ

১০. যায়দ ইবনে আখযাম তাঈ রহ........ আবূ সা'লাবা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অগ্নিপুজকদের পাত্র ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, এগুলো ধুয়ে খুব পরিস্কার করে নিবে এবং তাতে পাক-সাফ করবে। তিনি প্রত্যেক দাঁতাল হিংস্র প্রাণী (এর গোশত খেতে) নিষেধ করেছেন।

আবূ সা'লাবা রাযি. এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি মাশহুর। তাঁর বরাতে এটি অন্যভাবেও বর্ণিত আছে। আবূ সা'লাবা রাযি. এর নাম হল জুরছুম, বর্ণনান্তরে জুরহুম। নাশিব বলেও কথিত আছে। এ হাদীসটি আবূ কিলাবা– আবূ আসমা রাহবী – আবূ সা'লাবা রাযি. সূত্রেও বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسٰى بْنِ يَزِيْدَ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُرَشِىِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَقَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ اَنَّهٗ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ اَهْلِ كِتَابٍ فَنَطْبُخُ فِىْ قُدُوْرِهِمْ وَنَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَارْحَضُوْهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا

بِأَرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَذُكِّيَ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَقَتَلَ فَكُلْ.هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১১. আলী ইবনে ঈসা ইয়াযীদ বাগদাদী রহ......আবূ সা'লাবা খুশানী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কিতাবীদের ভূখণ্ডে বাস করি। (অনেক সময়) তাদের ডেকচীতে রান্না-বান্না করি এবং তাদের পাত্রে পানি পান করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাছাড়া যদি কিছু না পাও, তবে এগুলোকে পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে। এরপর আবূ সা'লাবা রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো শিকারাঞ্চলেও থাকি। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? তিনি বললেন, তুমি তোমার প্রশিক্ষিত কুকুর বিসমিল্লাহ বলে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠালে আর তা যদি শিকারকে মেরে ফেলে তবে তুমি তা আহার করতে পারবে। আর যদি সেটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হয়, এমতাবস্থায় শিকারটি যবেহ করা হয় তবে তুমি আহার করতে পারবে। বিসমিল্লাহ বলে তুমি তীর নিক্ষেপ করে থাকলেও তার আঘাতে নিহত হলে তুমি তা আহার করতে পারবে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

انية الكفار ঃ ধোয়া ব্যতীত কাফিরদের বাসন-পত্রে পানাহার করা মাকরূহ এবং অপছন্দনীয়। এ মাসআলাটি প্রযোজ্য হবে তখন, যখন তাদের বাসন-পত্রে নাপাকি আছে কিনা জানা না থাকে। যদি জানা থাকে কিংবা সন্দেহ থাকে, তাহলে ধৌত করা ব্যতীত পানাহার করা নাজায়িয। তবে মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে– فان.

وجدتم غير انيتهم فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها

এ হাদীস থেকে দৃশ্যত বুঝা যায়, অন্য পেয়ালা থাকা অবস্থায় কাফিরদের পেয়ালায় পানাহার করা ধৌত করার পরেও জায়িয নেই। অথচ ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, ধৌত করার পর অন্য পেয়ালা থাক বা না থাক কাফেরের পেয়ালায় পানাহার করা জায়িয। সুতরাং মুসলিম শরীফের আলোচ্য হাদীস এবং ফুকাহায়ে কিরামের ফতওয়া পরস্পর বিরোধী মনে হয়। ইমাম নববী রহ. উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য সাধন কল্পে বলেছেন, মুসলিম শরীফের হাদীসটি কাফিরদের ঐসব পেয়ালার কথা বলা হয়েছে, যেসব পেয়ালা সম্পর্কে জানা আছে যে, এতে নাপাকি বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ফুকাহায়ে কিরামের ফতওয়া হল, কাফিরদের সেসব পেয়ালার ব্যাপারে, যেগুলোর মধ্যে কোন ধরনের নাপাকি নেই।

হযরত মাওলানা তাকী উসমানী দা. বা. এ ব্যাপারে সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, হাফেয ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারীতে যা বলেছেন, সেটাই সঠিক। ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, হাদীসের মধ্যে যে বলা হয়েছে, অন্য পেয়ালা থাকাকালীন কাফেরদের পেয়ালায় খাওয়া যাবে না– এ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য মাকরূহে তানযীহী। অন্যথায় মূল কথা হল, যদি জানা থাকে কাফিরের পেয়ালায় নাপাক আছে, তাহলে ধৌত করে নিলে তা পবিত্র হয়ে যায়। আর যদি জানা না থাকে এবং প্রবল সন্দেহও না থাকে, তাহলে ধৌত করা ছাড়াই তাদের পেয়ালায় খাওয়া যাবে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে। তিনি বলেন–

قال كنا نغزوا مع رسول الله ﷺ فيصيب من انية المشركين واسقيتهم بها فلا يعيب ذالك عليهم (رواه ابو داؤد فى الاطعمة)

إنا بارض صيد ঃ অর্থাৎ আমরা যেখানে থাকি, সেখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। صيد শব্দটি মাছদার, الاصطياد এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থ শিকার করা, ধরা। صيد শব্দটি কখনও مصيد ইসমে মাফউল -এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থ, শিকারলব্ধ প্রাণী।

কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমানিত হয় যে গাইরে মুহরিমের জন্য হেরাম শরীফের বাইরে শিকার করা জায়িয।

অমুসলমানের দোকানে এবং ঘর-বাড়িতে আহার করার শরঈ বিধান

যদি তাদের দোকানের কিংবা ঘর-বাড়ির খাবারের পাত্র নাপাক –এই তথ্য থাকে, তাহলে তাদের দোকান ও ঘর-বাড়িতে পানাহার করা হারাম। আর যদি নিশ্চিতরূপে জানা না থাকে তাহলে মাকরূহ। আর যদি নিশ্চিত জানা থাকে যে, পাত্রগুলো পবিত্র তাহলে পানাহার করা জায়িয। (হিন্দিয়া ঃ ৫/ ৩৪৭, মাহমুদিয়া ঃ ৮/২৬২)

إذا أرسلت كلبك المعلم اى المعلم. ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের নিদর্শন হল, যদি সে তিনবার জন্তু শিকার করে তিনবারই নিজে না খেয়ে মালিকের জন্য নিয়ে আসে তাহলে বুঝা যাবে, কুকুরটি প্রশিক্ষিত।

আল্লামা তীবী প্রমুখ বলেন ঃ কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তিনটি অপরিহার্য গুণ রয়েছে।

(১) ছেড়ে দিলে দৌড় শুরু করবে।

(২) থামিয়ে রাখলে থেমে থাকবে। তীব্র দৌড়ের মুহূর্তেও থামাকে চাইলে থেমে যাবে।

(৩) শিকার ধরে নিজে মোটেও খাবে না বরং মালিকের কাছে নিয়ে আসবে। এ তিনটি গুণ বার বার পাওয়া গেলে (কমপক্ষে তিনবার) ধরে নেয়া হবে কুকুরটি প্রশিক্ষিত শিকারী। (হেদায়াহ - ৪/ ৫০২, শামী -. ১০/ ৪৬)

শিকারী কুকুর এরকম প্রশিক্ষিত হলে প্রমাণিত হবে যে, সে নিজের জন্য শিকার করে না; বরং মালিকের জন্য করে। যদি কোন সময় সে উক্ত তিনটি শর্তের বিপরীতে করে যেমন যদি শিকার করে নিজে খেয়ে দৌড় দেয় না তাহলে বুঝতে কুকুরটি প্রশিক্ষিত শিকারী নয়।

সারকথা, শিকারী কুকুরের শিকার হালাল হওয়ার চারটি শত রয়েছে।

(১) প্রশিক্ষিত হতে হবে।

(২) মালিক শিকারী কুকুরকে কোনও শিকারের পেছনে লেলিয়ে দিতে হবে। তথা কুকুর নিজ ইচ্ছায় শিকার করবে না; বরং মালিকের আদেশে সে শিকার করবে।

(৩) শিকারী কুকুর শিকার করবে। কিন্তু নিজের খাওয়ার জন্য নয়; বরং মালিকের জন্য শিকার করবে।

(৪) মালিক যখন তার শিকারী কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিবে তখন 'বিসমিল্লাহ' বলে ছাড়বে।

শিকারী কুকুরের শিকার হালাল হওয়ার উক্ত চারটি শর্ত আবশ্যক। এ চারটি শর্ত পাওয়া গেলে তখন সে যে জন্তু শিকার করে আনবে মালিকের জন্য তা ভক্ষণ করা হালাল হবে। এমনকি শিকারকৃত জন্তু শিকারী কুকুরের আঘাতে যদি মারাও যায় তাহলেও মালিক তা ভক্ষণ করতে পারবে। আর যদি শিকারকৃত জন্তু শিকারীর আঘাতে মৃত্যু বরণ না করে জীবিত থাকে তাহলে সেটি অবশ্যই জবাই করে নিতে হবে। অন্যথায় হালাল হবে না।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত বিধান বন্য পশু শিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে নিজের মালিকানাধীন কোন পশু কুকুর দ্বারা শিকার করানো যাবে না; বরং তাকে শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে জবাই করে ভক্ষণ করতে হবে।

وإذا رميت بسهمك الخ ঃ তীরের ক্ষেত্রেও বিধান এটাই যে, যদি তীর নিক্ষেপ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়ে নিক্ষেপ করে তাহলে সেই শিকার হালাল। তবে শর্ত হল, ধারালো দিক দ্বারা আহত হতে হবে।

যদি ধারালো দিক ছাড়া অন্য কোন দিক দ্বারা আহত হয়, যেমন প্রচণ্ড চোট লাগার কারণে আহত হল এবং মারা গেলো তাহলে এই সূরতে হালাল হবে না।

হানাফীদের ফতওয়া

বন্দুকের গুলি দ্বারা শিকার করা হলে ওই জন্তু হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হল, জবাই করতে হবে। জবাই করার পূর্বে যদি শিকার মারা যায় তাহলে শিকার হালাল হবে না। কেননা বুলেটের মধ্যে মূলত ধার থাকে না; বরং শিকার মারা যায় তীব্র আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে। (হেদায়াহ খ. ৪/ ৫১১; রহীমিয়াহ - ৬/ ২৭৪, মাহমূদিয়া-. ১২/ ৩৫৩;

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْفَارَةِ تَمُوتُ فِى السَّمْنِ صــــ٢

অনুচ্ছেদ ঃ ৮. ঘি-তে ইঁদুর পড়ে মারা গেলে

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَاَبُوْ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ رضـ اَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ مَيْمُوْنَةَ وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَصَحُّ وَرَوٰى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ حَدِيْثُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ

১২. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ও আবূ আম্মার রহ........ মায়মূনা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার একটি ইঁদুর (জমাট) ঘিতে পড়ে মারা যায়। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ইঁদুরটি এবং এর চতুষ্পার্শ্বের ঘি ফেলে দিবে। তারপর তা (বাকী ঘি) খাবে। এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

যুহরী - উবায়দুল্লাহ - ইবনে আব্বাস রাযি. সনদেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল........। এ সনদে মায়মূনা রাযি. -এর উল্লেখ নেই। কিন্তু ইবনে আব্বাস রাযি. মায়মূনা রাযি. সনদে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। মামার- যহরী- সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ. কে বলতে শুনেছি যে, মা'মার- যুহরী- সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব- আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণনাটি ভুল। সহীহ হল যুহরী- উবায়দুল্লাহ- ইবনে আব্বাস রাযি.- মায়মূনা রাযি. সূত্রের রিওয়ায়াতটি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মূলতঃ এখানে জমাট ঘি সম্পর্কে উক্ত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, নাসাঈ শরীফে এসেছে في سمن جامد হযরত গাঙ্গুহী রহ. ও এ প্রসঙ্গে বলেন–

"هذا تنصيص على أن السمن كان جامدا، وعلى أنه إذا كان جامدا فإن الحولية إنما تتحق فيه دون الذوائب. (الكوكب ج٦ ص ٤)

কিন্তু ঘি যদি তরল হয় আর সেখানে ইঁদুর পড়ে মারা যায়, তাহলে সে ঘি খাওয়া সবসম্মতিক্রমে নাজায়েয। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম বিক্রি করার ব্যাপারেও নিষেধ করেছেন। তবে ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেনঃ বিক্রি করা জায়িয। এ ঘি অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা যাবে কিনা ? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের একাধিক মত রয়েছে।

(১) কেউ কেউ বলেনঃ অন্য কোনও কাজে লাগানো জায়িয হবে না।

(২) ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেনঃ বাতি জ্বালানো, নৌকায় লাগানো এবং এ জাতীয় কাজে লাগানো জায়িয হবে।

(৩) ইমাম শাফিঈ রহ.এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ মত এটাই।

(৪) ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ. থেকেও দুটি মত পাওয়া যায়। এটি একটি। আর অপরটি হল খাওয়ার মত অন্য কাজেও ব্যবহার করা জায়েয নেই।

জমাট এবং তরল অপবিত্র জিনিসের শরঈ বিধান

জমাট বস্তু যেমন, জমাট ঘি ইত্যাদিতে যদি এমন নাপাকি পড়ে যা পৃথক করা যায়, তাহলে ঐ স্থান এবং তার আশপাশের কিছু স্থান থেকে কিছু ফেলে দিলে অবশিষ্ট অংশ পবিত্র থাকবে। কিন্তু নাপাক বস্তুটি যদি তরল হয় তাহলে তাকে পবিত্র করার পদ্ধতি হল, নাপাক বস্তুর সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত জ্বাল দিতে হবে, যাতে ঐ সমপরিমাণ বস্তু শুকিয়ে যায়। এভাবে তিন বার করা হবে। (শামী খ. ১, পৃঃ ৫৪৩; মাহমূদিয়া খ. ১৬, পৃঃ ১৯৮)

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ ص٢

অনুচ্ছেদ ঃ ৯. বাঁ হাতে পানাহার নিষিদ্ধ

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعُمَرَ بْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَفْصَةَ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهٰكَذَا رَوَى مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعُقَيْلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرِوَايَةُ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ

১৩. ইসহাক ইবনে মানসুর রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ বাম হাতে আহার করবে না এবং বাম হাতে পান করবে না। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে। এ বিষয়ে জাবির, উমার ইবনে আবূ সালামা, সালামা ইবনে আকওয়া, আনাস ইবনে মালিক ও হাফসা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ.বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

মালিক এবং ইবনে উয়ায়না রহ.ও এটিকে যুহরী- আবূ বাকর ইবনে উবায়দিল্লাহ- ইবনে উমার রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মা'মার এবং উকায়ল রহ. এটিকে যুহরী- সালিম- ইবনে উমার রাযি.সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মালিক ও ইবনে উয়ায়না রহ. এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهٖ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهٖ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهٖ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهٖ

১৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রহ.... সালিম রহ. -এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আহার করে, তখন সে যেন ডান হাতে আহার করে এবং ডান হাতে পান করে। কেননা শয়তান বাম হাতে আহার করে এবং বাম হাতে পান করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يمين ঃ (ডান) এর মধ্যে يمن (বরকত) আছে। أصحاب اليمين এবং أصحاب الشمال কেমন যেন দুটি দলের নাম। প্রথম দলকে حزب الله আর দ্বিতীয় দলকে حزب الشيطان বলা হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ডানকে পছন্দ করেন, তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ডানকে পছন্দ করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনও বস্তু লেনদেনের সময় ডান হাত আদা-প্রদান করতেন। এমনকি জুতা পরা এবং চিরুনী করার সময়ও ডান দ্বারা শুরু করতেন।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে দৃশ্যতঃ বুঝা যায়, এ বিধানটি পালন করা ওয়াজিব। কোনও কোনও আলেমের অভিমতও এটাই। দলীলস্বরূপ তারা মুসলিম শরীফের একটি হাদীসকে পেশ করে থাকেন। যা নিম্নরূপ-

"সালামা ইবনু আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বাম হাত দ্বারা আহার করতে দেখে তাকে বললেনঃ ডান হাত দ্বারা খাও। সে উত্তর দিল ঃ ডান হাত দ্বারা খাওয়ার শক্তি আমার নেই। বর্ণনাকারী বলেনঃ ঐ ব্যক্তির ডান হাত সুস্থ ছিল। অহঙ্কারের কারণে সে কথাটি বলেছিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্ করুন, তোমার যেন ডান হাত দ্বারা আহার গ্রহণ করার নসীব না হয়। তারপর থেকে ঐ ব্যক্তি নিজের ডান হাতকে কখনও মুখ পর্যন্ত নিতে পারত না।"

অনুরূপ আরেকটি হাদীস তাবরানী শরীফেও রয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাবী'আ আসলামিয়াকে বাম হাত দ্বারা খানা খেতে দেখলেন। তাই তিনি তার জন্য বদ দু'আ করলেন। ফলে সে তাউন রোগে মারা যায়।"

পক্ষান্তরে জমহূর উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, ডান হাতে আহার করা মুস্তাহাব। তাঁর উল্লেখিত হাদীসদ্বয়কে সতর্কতার উপর চালিয়ে দেন। তাছাড়া মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যক্তির জন্য বদ দু'আ করেছেন তার মিথ্যাচার ও অহঙ্কারের কারণে।

فان الشيطان يأكل شماله ঃ অর্থাৎ শয়তার তার অনুসারীদেরকে বাম হাত দ্বারা খাওয়ার ব্যাপারে কুমন্ত্রণা দেয়। হাফিয ইবনু হাজার রহ. বলেনঃ শয়তান বাস্তবেই বাম হাত দ্বারা আহার করে। তিনি বলেনঃ বৌদ্ধিক যুক্তির বিচারে এটা অসম্ভব নয়। বিধায় রূপক অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। মুহাদ্দিস তীবী রহ.ও অনুরূপ বলেছেন। (তাকমিলাহ)

بَابُ مَاجَاءَ فِى لَعْقِ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ صـ٢

অনুচ্ছেদ ঃ ১০. খাওয়ার পর আঙ্গুল চাটা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِى اَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَاَنَسٍ هٰذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ سُهَيْلٍ

১৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে আবূ শাওয়ারির রহ........ আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আহার করে, তখন সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে নেয়। কারণ, সে জানে না এগুলোর কোনটিতে বরকত নিহিত আছে।

এ বিষয়ে জাবির, কা'ব ইবনে মালিক ও আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

সুহায়ল রহ. এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বরকতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে

(১) বরকত অর্থ বৃদ্ধি লাভ করা। অর্থাৎ পরিমানে বেশী হওয়া।

(২) বরকত অর্থস্বল্প জিনিস অনেকের জন্য যথেষ্ট হওয়া। যেমন, পাঁচজনের খাবার পঞ্চাশ জনের জন্য যথেষ্ঠ হওয়া।

(৩) বরকত অর্থযে জিনিস মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত, সে জিনিস মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে মঙ্গলজনক ক্রিয়া সৃষ্টি করা।

সুন্নত হল, এক দস্তখানে একাধিক লোক খেতে বসলে এমনভাবে আহার করা, যেন অন্যের দৃষ্টিতে খারাপ না লাগে। একাকী খেতে বসলেও এমনভাবে খাওয়া উচিত, যেন লোভ প্রকাশ না পায়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ صـ٢

অনুচ্ছেদ ঃ ১১. লোকমা পড়ে গেলে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَسَقَطَتْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ

১৬. কুতায়বা রহ........ জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ আহার করা কালে যদি তার লোকমা পড়ে যায়, তবে এতে সন্দেহের কিছু (ধূলো-বালি জাতীয়) দেখলে সে যেন তা পরিস্কার করে নেয় এবং তারপর তা খেয়ে নেয়। আর শয়তানের জন্য সে যেন তা ছেড়ে না দেয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ অনুচ্ছেদে আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ اِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْاَذٰى وَلْيَاْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَاَمَرَنَا اَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ اِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِي اَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৭. হাসান ইবনে আলী খাল্লাল রহ. আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আহার করতেন তখন তিনি তার তিনটি আঙ্গুল চেটে নিতেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কারও লোকমা যদি পড়ে যায় তবে সে যেন এর ময়লা দূর করে নেয় এবং তা খেয়ে নেয়। শয়তানের জন্য সে যেন তা ছেড়ে না দেয়। তিনি আমাদেরকে আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন পেয়ালা চেটে নেই। তিনি বলেছেন, তোমরা তো জান না, তোমাদের খানায় কোন অংশে বরকত রয়েছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي اُمُّ عَاصِمٍ وَكَانَتْ اُمَّ وَلَدٍ لِسِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ وَ نَحْنُ نَاْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْمُعَلَّى بْنِ رَاشِدٍ وَقَدْ رَوٰى يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْاَئِمَّةِ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ رَاشِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ

১৮. নাসর ইবনে আলী জাহযামী রহ........ উম্মু আসিম রহ... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নুবায়শা আল-খায়র একদিন আমাদের কাছে এলেন। আমরা এ সময় একটি পেয়ালায় খাচ্ছিলাম। তিনি তখন আমাদের বর্ণনা করলেন, যে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি পেয়ালায় কিছু আহার করে, এরপর তা চেটে খায়, তবে এ পেয়ালা তার জন্য ইস্তিগফার করে।

এ হাদীসটি গরীব। মুআল্লা ইবনে রাশিদ রহ. এর বর্ণনা ছাড়া এ হাদীস সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। ইয়াযীদ ইবনে হারূনসহ হাদীস শাস্ত্রের একাধিক ইমাম এ হাদীসটিকে মুআল্লা ইবনে রাশিদ রহ. থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ماربه ঃ খাবার যদি পরিস্কার পবিত্র কোন কিছুর উপর পড়ে কিংবা পরিস্কার দস্তরখানের উপর পড়ে তাহলে উঠিয়ে নিবে। আর যদি ময়লা লেগে যায়, তাহলে তা ধুয়ে নিবে। খাবার কখনও নষ্ট করবে না। যদিও কোথা খাবার বেঁচে যায় এবং সেগুলো ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে এমন স্থানে ফেলবে, যেখানে ফেললে খাবারের অসম্মান হবে না বরং অন্য জীব-জন্তু খেয়ে ফেলতে পারে। মোটকথা, খানা যেন নষ্ট না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

لايدعها للشيطان ঃ যদি পাত্র চেটে পরিস্কার করে খাওয়া না হয়, তাহলে শয়তান তার থেকে ফায়দা লুফে নেয়। যার কারণে ভক্ষণকারীর জন্য বদদু'আ করে। লোকমা শয়তানের জন্য রাখার অর্থ হল, নেয়ামতের অবমূল্যায়ণ করা। এটা অহংকালীদের স্বভাব। বিনয়ীদের বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি কাজে বিনয় প্রকাশ পাওয়া।

لعق أصابعه الثلاث এর দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার খেতেন। এর রহস্য প্রসঙ্গে আল্লামা গাঙ্গুহী রহ. বলেন–

إلا فيها كفاية والزيادة عليها كما فى الأكل بخمس ـ دالة على شدة الحرص وباعثه على زيادة الأكل (الكوكب ج٢ ص ٥)

ان نسلت الصفحة ঃ একে তো পাত্র সাফ করা; দ্বিতীয়তঃ খাবার সাফ করা। পাত্র সাফ করার অর্থ সব খেয়ে ফেলা নয় বরং প্রয়োজন পরিমাণ খাবে। যতটুকু খাবে পরিস্কার করে খাবে। খাবার নষ্ট না করে অবশিষ্ট অংশ এমনভাবে রেখে দিবে, যেন অন্য কেউ খেতে পারে।

استغفرت القصعة ঃ এটা বাস্তবেও হতে পারে। যেমন, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেছেন–

يحتمل أن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها تمييزا أو نطقا تطلب به المغفرة ـ

এমনকি কোন কোন বর্ণনায় এসেছে–

إنما تقول أجزاك الله كما أجرتني من الشيطان

(পাত্র পরিস্কার করে খাওয়া) মাগফিরাতের কারণ। কিন্তু আল্লামা গঙ্গুহী রহ. বলেন, বিষয়টিকে রূপকার্থে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই বরং মূল অর্থে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وان من شى الا يسبح بحمده

শেখ সাদী বলেছিলেন–

بذكرش هرچه بينى در خروشت + ولے داند درىں معنى كه گوشت

পাত্র পরিস্কার করে খাওয়া এবং চেটে খাওয়া সুনত। শামী ঃ ৯/৪৯১; হিন্দিয়া ঃ ৫/৩৩৭)

পড়ে যাওয়া লোকমা উঠিয়ে খাওয়া সুন্নত। (হিন্দিয়া ঃ ৫/ ৩৩৭; শামী ঃ ৯/ ৪৯০)

খানার আদবসমূহ

(১) জুতা খুলে খাবে। কেননা এতে তৃপ্তি রয়েছে। অবশ্য জুতা পরে খাওয়াতে কোন গুণাহ নেই।

(২) খানার পূর্বে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া সুন্নাত।

(৩) প্রয়োজনে কুলি করা সুন্নাত।

(৪) খাবার সামনে আসলে পড়বে– اللهم باركلنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار

(৫) বিনয়ের সূরতে বসে খাওয়া।

(৬) সামনের দিকে ঝুঁকে বিনয়ের সাথে খাওয়া।

(৭) যমীনের উপর বসে খাওয়া। চেয়ার-টেবিলে খাওয়া উচিত নয়। কারণ, এতে খানার অনেক আদব রক্ষা হয় না।

(৮) খাওয়ার শুরুতে بسم الله اوله وآخره বলবে।

(৯) হেলান দিয়ে বসে খাওয়া উচিত নয়।

(১০) ডান হাত দ্বারা খাওয়া সুন্নাত। প্রয়োজন হলে বাম হাত দ্বারা সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

(১১) শরীরের সুস্থতা এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করার নিয়তে খাবে।

(১২) তিন আঙ্গুল দ্বারা খাওয়া সুন্নাত। প্রয়োজনে চার-পাঁচ আঙ্গুল ব্যবহার করা যেতে পারে।

(১৩) এক জাতীয় খাবার হলে অন্যের সম্মুখ থেকে না খেয়ে নিজের সম্মুখ থেকে খাবে। বিভিন্ন রকমের খাবার হলে অন্যের সামনে থেকেও খাওয়া যাবে।

(১৪) কেউ কেউ বলেছেন– লবন দ্বারা খাবার শুরু করা এবং শেষ করা সুন্নাত। তবে যে হাদীসের আলোকে কথাটি বলা হয়েছে, সে হাদীসটি জাল।

(১৫) প্লেটের এক দিক থেকে খাবে। পাত্রের মাঝ থেকে খাবে না। কারণ, মাঝখানে বরকত নাযিল হয়।

(১৬) খেজুর জাতীয় কোনও খাবার যেমন– বিস্কুট, মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়ার সময় একটি একটি করে নিবে।

(১৭) এক লোকমা গিলার পূর্বের আরেক লোকমা মুখে দিবে না। টগটগ করে খানা খেলে লোভ প্রকাশ পায়।

(১৮) পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খাবে। ময়লা লেগে গেলে পরিস্কার করে খাবে।

(১৯) গরম খাবার অথবা পানি ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করবে না। এটা শিষ্টাচার পরিপন্থী।

(২০) অধিক গরম খাবার খাবে না।

(২১) খাবারের দোষ-ক্রটি খুঁজবে না।

(২২) খাবারের সময় এমন কোনও কথা বলবে না, যার ফলে অন্যজন খাবার খেতে ভয় পায় কিংবা খাবারের প্রতি তার ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

(২৩) খাওয়ার মাঝে অন্য কাজে ব্যস্ত হবে না। এমন কোন কথাও বলবেনা, যা শুনতে হলে কান সজাগ করে ভালো মত শুনতে হয়।

(২৪) কিছু ক্ষুধা রেখে খানা বন্ধ করে দিবে। এটা হজমের জন্য উপকারী এবং এতে রুচিও বাড়ে।

(২৫) আঙ্গুল এবং খাবারের পাত্র পরিস্কার করে খাওয়া সুন্নাত। এতে নেয়ামতের মূল্যায়ণ হয় এবং আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষিতা পকাশ পায়।

(২৬) খানা খাওয়া শেষ হলে পড়বে ঃ الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين

(২৭) দস্তরখানা উঠানোর পূর্বে নিজে উঠাবে না।

(২৮) দস্তরখান উঠানোর সময় এ দু'আ পাঠ করা–

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا

(২৯) খানা খাওয়ার পর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত।

(৩০) খানার পর কুলি করা সুন্নাত।

(৩১) দাঁত খেলাল করা সুন্নাত।

(৩২) হাত ধোঁয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেজা হাত মাথা এবং কব্জিতে বুলিয়ে নিতেন।

(৩৩) খানা খাওয়ার পর কিছু যিকির আযকার করে নেওয়া।

(৩৪) খানা খাওয়া শেষ হলে সাথে সাথে শুয়ে না পড়া। (আহকামে যিন্দেগী, তাকমিলাহ, মা'আরিফুল হাদীস)

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ صـ٢

অনুচ্ছেদ ঃ ১২. পাত্রের মাঝখান থেকে খাদ্যগ্রহণ মাকরূহ

حَدَّثَنَا اَبُو رَجَاءِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض۔ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوْا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ اِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

১৯. আবূ রাজা রহ........ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বরকত নাযিল হয় খানার মাঝখানে। সুতরাং এর পাশ থেকে তোমরা খাবে, এর মাঝখান থেকে খাবে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

আতা ইবনে সাইব রহ. তার রিওয়ায়াত হিসাবেই এটি পরিচিত। শু'বা এবং সাওরী রহ.ও এটিকে আতা ইবনে সাইব রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে ইবনে উমার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

খাওয়ার সময় বরকত নাযিল হয় পাত্রের মধ্যখানে। যেমন, নামাযের মধ্যে সর্বপ্রথম বরকত নাযিল হয় ঈমামের ওপর, তারপর প্রথম কাতারে মুসল্লীদের ওপর। এজন্য খানার শেষ পর্যন্ত পাত্রের মধ্যখানের খাবার না খাওয়া উচিত। সবশেষে মধ্যখানের খাবার খাবে। যেন বরকত নাযিল হয়। (শামী ঃ ৯/ ২৯১, হিন্দিয়া ঃ ৫/ ৩৩৭)

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ صـ٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩. পেয়াজ-রসুন খাওয়া মাকরূহ

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ هٰذِهِ قَالَ اَوَّلَ مَرَّةٍ الثُّوْمِ ثُمَّ قَالَ اَلثُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِى مَسْجِدِنَا هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَاَبِىْ اَيُّوْبَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَقُرَّةَ وَبْنِ عُمَرَ

২০. ইসহাক ইবনে মানসূর রহ.......... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন, পিয়াজ ও কুর্রাছ আহার করেছে , সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে।

ইমাম তিরমিযী রহ.বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

এ বিষয়ে উমার আবূ আইয়ূব, আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ, জাবির ইবনে সামুরা, কুররআ ইবনে ইয়াস মুযানী ও ইবনে উমার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পেয়াজ-রসুনের তরকারী সর্বসম্মতিক্রমে হালাল। তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বভাবগত অরুচির কারণে অপছন্দ করতেন। এছাড়া এর গন্ধে ফেরেশতারা কষ্ট পায়। যেমন, আবু আইয়ূব আনসারী রাযি. বর্ণিত হাদীস–

فقال يا رسول الله! أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه من أجل ريحه

বুখারী শরীফের কিতাবুস সালাতে হযরত জাবের রাযি. এর একটি হাদীস রয়েছে

كل فإني أناجي من لاتناجي ,

সুতরাং বুঝা গেল, পেয়াজ-রসুনের তরকারি স্বকীয়ভাবে হালাল। কাঁচা পেয়াজ ও কাঁচা রসুনের ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার দ্বারা শুধু মাকরূহে তানযীহি উদ্দেশ্য।

فلا يقربنا في مساجدنا ঃ আল্লামা কাশ্মিরী রহ. বলেন, সকল ইমামগণ বলেছেন– পেয়াজ-রসুনের তরকারী হালাল। কিন্তু যেহেতু কাঁচা পেয়াজ ও কাঁচা রসুনে এক প্রকার দুর্গন্ধ আছে, আর তাই কাঁচা পেয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ।

হাদীসে مساجد শব্দটি বহুবচন আনা হল কেন ?

ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহ. এবং জমহূর উলামায়ে কিরামের মতে, এর দ্বারা মুসলমানদের জামাত উদ্দেশ্য। কেননা নিষেধের 'কারণ' হল, অন্যের কষ্ট পাওয়া। আর এ 'কারণ' তো মসজিদ, বাজার এবং লোকজন যেখানে জড়ো হয়, সেখানেই পাওয়া যায়। আর মসজিদে গেলে সামনে-পেছনে, ডানে-বামে সর্বত্রই মানুষ ও ফেরেশতা থাকে। والملائكة تتأذى بما تتأذى بها المسلمون, আর বাজারে গেলে মানুষ থাকে।

অতএব, নিষিদ্ধতা কেবল মসজিদের সাথে খাছ নয়। কিন্তু কোন কোন আলেম বলেন, এই নিষিদ্ধতা মসজিদে নববীর সাথে খাছ। কথাটি যদিও সঠিক নয়।

কোন ব্যক্তি যদি এগুলো খাওয়ার পর আধ ঘন্টা এক ঘন্টা ঘরে বসে থাকে। যেন দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়, তাহলে আর মাকরূহ থাকবে না। কেননা তখন অন্যকে কষ্ট দেওয়ার 'কারণ' অবিদ্যমান। তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো মোটেও খাননি। কারণ তাঁর নিকট সব সময় অহীর আগমন হত, কখন ফেরেশতা চলে আসেন, তা জানা নেই। তাই তিনি সতর্কতা অবলম্বন করে খেতেন না।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিষিদ্ধতার কারণ এ 'দুর্গন্ধ', যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়। অতএব যেসব জিনিসে এ 'কারণ' থাকবে যেমন, বিড়ি সিগারেট –সে সকল জিনিস মাকরূহ সাব্যস্ত হবে।

দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খেয়ে মসজিদ ওজন সমাজে যাওয়ার শরঈ বিধান

দুর্গন্ধযুক্তযুক্ত জিনিস পানাহার করার পর মসজিদে কিংবা জন সমাজে গমন করা মাকরূহে তাহরীমী। এমনকি কারও মুখ থেকে অসুস্থতার কারণে দুর্গন্ধ বের হলে, তাকেও সতর্ক থাকা উচিত। (ফতওয়ায়ে শামী ঃ ২/৪৩৫; মাহমূদিয়া ঃ/৩৬৭; রহিমিয়া ঃ ২/২৪১)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى أَكْلِ الثُّوْمِ مَطْبُوْخًا ص-٣
অনুচ্ছেদ ঃ ১৪. রান্না করা রসুন খাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ وَكَانَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ اِلَيْهِ بِفَضْلِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا اَتَى اَبُوْ اَيُّوْبَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ فِيْهِ ثُوْمٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لاَ وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُهُ مِنْ اَجْلِ رِيْحِهِ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২১. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ.......... জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ আইয়ূব রাযি. এর ঘরে মেহমান হয়েছিলেন। তিনি খানা খেয়ে এর অবিশিষ্ট আবূ আইয়ূবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি খানা পাঠালেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে কিছুই খাননি। এরপর আবূ আইয়ূব যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন, তখন সে বিষয়ের উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এতে তো রসুন ছিল। আবূ আইয়ূব রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এটা কি হারাম? তিনি বললেন– না, তবে এর দুর্গন্ধের কারণে আমি তা পছন্দ করি না। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيْحٍ وَالِدُ وَكِيْعٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ قَالَ نُهِىَ عَنْ اَكْلِ الثُّوْمِ اِلاَّ مَطْبُوْخًا ، وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى عَنْ اَكْلِ الثُّوْمِ اِلاَّ مَطْبُوْخًا قَوْلَهُ

২২. মুহাম্মদ ইবনে মাদ্দুওয়ায়হ রহ....... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রান্না করা ছাড়া রসূন খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। আলী রাযি. থেকে তাঁর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত আছে যে, রান্না করা ছাড়া রসূন খেতে নিষেধ করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় এটা আলী রাযি. এর নিজের কথা বলে উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ كَرِهَ اَكْلَ الثُّوْمِ اِلاَّ مَطْبُوْخًا

২৩. হান্নাদ রহ...... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রান্না করা ছাড়া রসূন খাওয়া অপছন্দ করতেন। এ হাদীসটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। শরীফ ইবনে হাম্বলের বরাতে এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اُمَّ اَيُّوْبَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِمْ فَتَكَلَّفُوْا لَهُ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ هٰذِهِ الْبُقُوْلِ فَكَرِهَ اَكْلَهُ فَقَالَ لِاَصْحَابِهِ كُلُوْهُ فَاِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدِكُمْ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ اُوْذِىَ صَاحِبِىْ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَاُمُّ اَيُّوْبَ هِىَ اِمْرَاَةُ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ

২৪. হাসান ইবনে সাব্বাহ বাযযার রহ...... উম্মু আইয়ূব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের ঘরে মেহমান হয়েছিলেন। তখন তারা তাঁর জন্য আড়ম্বরপূর্ণ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এতে এসব (রসুন ইত্যাদি) সবজী ছিল। কিন্তু তিনি না খেতে অপছন্দ করলেন। সঙ্গীদের বললেন, তোমরা খেয়ে নাও। আমি তোমাদের মত নই। আমার সঙ্গীকে (ফিরিশতা) কষ্ট দিতে আমি ভয় করি। **ইমাম তিরমিযী** রহ.বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। উম্মু আইয়ূব রাযি. হলেন, আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি. এর স্ত্রী।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ثنا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ عَنْ اَبِى خَلْدَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ الثُّوْمُ مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ وَاَبُوْ خَلْدَةَ اِسْمُهٗ خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَقَدْ اَدْرَكَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَسَمِعَ مِنْهُ وَاَبُوالْعَالِيَةِ اِسْمُهٗ رُفَيْعٌ وَهُوَ الرِّيَاحِيُّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كَانَ اَبُوْ خَلْدَةَ خِيَارًا مُسْلِمًا

২৫.মুহাম্মদ ইবনে হুমায়দ রহ..... আবুল আলিয়া রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূন পবিত্র খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। আবূ খালদা রহ. এর নাম হল, খালিদ ইবনে দীনার। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। আনাস ইবনে মালিক রাযি. কে তিনি পেয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীসও শুনেছেন। আবুল আলিয়া রহ. এর নাম হল, রুফায়্যি। তিনি হলেন রিয়াহী। আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. বলেন, আবূ খালদা ছিলেন একজন ভাল মুসলিম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি. ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহবায়ে রাসূলুল্লাহ। তাঁর একটি বিশেষত্ব হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় গিয়ে সর্বপ্রথম যে ঘরটিতে তাশরীফ রেখেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর ঘর। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেযবান ছিলেন। আবু আইয়ূব আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে আমলটির বর্ণনা দিয়েছেন, হতে পারে এ ঘরেরই কোনও ঘটনা।

ولكن اكرهه من اجل ريحه ঃ এ কথাটি খাবারের দোষ খোঁজ করার উদ্দেশ্যে নয় বরং উদ্দেশ্য হল, একথার বর্ণনা দেওয়া যে, তাঁর দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে যাওয়া ফেরেশতার আগমনের অন্তরায় হয়। ইমাম নববী রহ. বলেন, এ হাদীসের মধ্যে একথার প্রতি স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে যে, রসূন ভক্ষণ করা মোবাহ। কিন্তু ঐ ব্যক্তির জন্য মাকরূহ, যে এটি ভক্ষণ করে মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা করে।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটি হিন্দুস্তানী সংস্করণে باب ماجاء فى اكل الثوم مطبوخا শিরোনামে এসেছে। আর মিসরী সংস্করণে এসেছে باب ماجاء فى كراهية اكل الثوم والبصل শিরোনামে।

عن ام ايوب الانصارية এ হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রান্না করা রসূনও ভক্ষণ করেননি। অথচ আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণিত হয়েছে,

عن عائشة رض إن آخر طعام أكله رسول الله ﷺ طعام فيه بصل

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রান্না করা পেয়াজ খেয়েছেন।' উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধানের লক্ষ্যে বলা যায়, মাকরূহ হওয়ার 'কারণ' হল দুর্গন্ধ। সম্ভবতঃ ভালোভাবে না পাকানোর কারণে তার মধ্যে দুর্গন্ধ ছিল। বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ভক্ষণ করেননি।

انى اخاف ان اوذى صاحبى ঃ এখানে সাথী দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হযরত জিবরাঈল আ.। (কাউকাব) এর দ্বারা আরও বুঝা যায়, মানুষের জন্য তার সঙ্গী-সাথীর মন-মেযাজের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَخْمِيْرِ الْاِنَاءِ
وَاِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ الْمَنَامِ ص٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫. শয়নকালে পাত্রসমূহ ঢেকে রাখা, চেরাগ ও আগুন নিভিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَغْلِقُوا الْبَابَ وَاَوْكِئُوا السِّقَاءَ وَاَكْفِئُوا الْاِنَاءَ اَوْ خَمِّرُوا الْاِنَاءَ وَاطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ آنِيَةً فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ

وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ

২৬. কুতায়বা রহ.......... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা দরজা বন্ধ করবে, মশকের মুখ বাঁধবে, পাত্রগুলো উলটে রাখবে কিংবা বলেছেন, পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে, বাতি নিভিয়ে দিবে। কেননা শয়তান বন্ধ দুয়ার খুলতে পারে না, দুষ্ট, ইঁদুরগুলো লোকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবূ হুরাইরা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

জাবির রাযি. এর বরাতে হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِى بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৭. ইবনে আবূ উমর প্রমুখ রহ....... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিদ্রার সময় তোমরা তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اغلقو الباب ঃ দরজা বন্ধ করে দাও। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত আরও আছে–

واذكروا اسم الله এবং আল্লাহর নাম উল্লেখ কর।

اوكئو االسقاء ঃ শব্দটি إيكاء থেকে এসেছে। অর্থ, বন্ধ করা। السقاء অর্থ, মশক। অর্থাৎ রশি দ্বারা মশকের মুখ বেঁধে রাখ। اكفئوا لإناء ঃ শব্দটি إكفاء থেকে এসেছে। অর্থ, উপুড় করে রাখা, ঢালা, পর্দা টেনে দেওয়া। অর্থাৎ পাত্র উপুড় করে রাখ।

خمر والاناء ঃ باب تفعيل থেকে। অর্থ, ঢেকে রেখ। لايفتح غلقا ঃ غ এর উপর পেশ, ل এর উপরও পেশ। অর্থ বন্ধ।

ولا يحل ঃ ح এর উপর পেশ। অর্থ, ভাঙ্গতে পারে না, খুলতে পারে না, উন্মুক্ত করতে পারে না। যেমন, বলা হয়- (ن، حلا) حل العقدة গিঠ খুললো। حل البرلمان او المجلس সংসদ বা মজলিস ভেঙ্গে দিল।

فان الفويسقة ঃ মোল্লা আলী কারী রহ.-এর মতে এটি চেরাগ নেভানোর কারণ। الفويسقة শব্দটি فاسقة এর তাছগীর। অর্থ, ছোট ইঁদুর। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে ইঁদুর গর্ত থেকে বের হয়ে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে।

تضرم ঃ ت এর উপর পেশ, ض এর উপর জযম। অর্থাৎ দ্রুত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

উপরিউক্ত হাদীসে চারটি বিষয়ের নির্দেশ এসেছে। সাথে সাথে প্রতিটির কারণও বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হাদীসের মধ্যে উক্ত চারটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হল কেন ? এর কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, শয়তান বন্ধ দরজা এবং বন্ধ পাত্র খুলে প্রবেশ করতে পারে না। অথচ হাদীস শরীফে এসেছে–

الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم

'শয়তান মানুষের রক্তকণিকায় চলে।'

তাহলে কি শুধু পাত্রে ঢাকনা দিলে কিংবা দরজা বন্ধ করলেই শয়তানের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে ? তার উত্তর হচ্ছে, মূলকথা হল, আল্লাহর যিক্‌র। আল্লাহর যিক্‌রের সাথে কাজটি করলে শয়তান আসতে পারবে না। যেমন, অন্য হাদীসে واذكروا اسم الله عليه শব্দ এসেছে। কেউ কেউ বলেন, শয়তান কয়েকটি জিনিসে আসতে পারে না। তন্মধ্যে এ চারটি জিনিসও রয়েছে।

لاتتركوا النار الخ ঃ আগুন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যদ্বারা কোনও জিনিস জ্বলে পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। চাই চেরাগের আগুন হোক অথবা চুলা ইত্যাদির। অতএব বাল্ব ইত্যাদির আগুন যেগুলো থেকে আগুন লাগার কোনও আশঙ্কা নেই। সেগুলো জ্বালিয়ে রাখলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন, পূর্বোক্ত হাদীসে আগুন নেভানোর কারণ এটাই বর্ণণা করা হয়েছে, وان الفويسقه تضرم على الناس بيتهم

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, আগুন যদি ঘরে এরূপভাবে রেখে দেয়, যাতে কোন জিনিস জ্বলে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। যেমন, শীতকালে রাত্রি জাগরণের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে রেখে দেওয়া হল। তবে উপরিউক্ত বিবরণের আলোকে যৌক্তিকভাবে এটাও নিষিদ্ধ হবে না। (তুহফা, মাজাহিরে হক)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَيْنِ ص۳

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬. দু'টো খেজুর একত্রে খাওয়া মাকরূহ

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهٗ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৮. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ.... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওয়ার সাথীর অনুমতি না নিয়ে দু'টো খেজুর একসাথে মিলিয়ে খেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে আবূ বাকর রাযি. এর আযাদকৃত দাস সা'দ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বর্তমানে একত্রে দুটি খেজুর খাওয়া যাবে কিনা ?

আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন, উক্ত নিষেধাজ্ঞা ঐ যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যখন মুসলমানরা অত্যন্ত নিঃস্ব অবস্থায় জীবন কাটাত। কিন্তু তারা যখন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছল হল, তখন এ নির্দেশটি নিম্নের হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে– كنت نهيتكم عن القران فى التمر وإن الله وسع عليكم فاقرنوا .

ইমাম নববী রহ. বলেন, উক্ত নিষেধাজ্ঞা সর্বসম্মত। সুতরাং নিজের সাথীর অনুমতি ছাড়া এক সাথে দুই খেজুর খাওয়া যাবে না।

কাযী আয়ায রহ. বর্ণনা করেছেন, আহলে যাহেরের মতে এ নিষেধাজ্ঞাটি হারামস্বরূপ। অন্যান্যদের মতে এ নিষেধাজ্ঞাটি মাকরূহ হিসেবে।

সঠিক কথা হল, বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যদি একাধিক লোক সমধিকারের সাথে শরীক থাকে, তাহলে قران। অর্থাৎ একসাথে দুটি দুটি করে খাওয়া হারাম। অবশ্য সকল সাথীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট অনুমতি থাকলে কোনও অসুবিধা নেই।

হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন, খাবার যদি অন্যের হয়, আর সে মনে করুন দুই ব্যক্তিকে দান করে দিল। তাহলে দেখতে হবে, সে খাবার বেশি না কম। যদি পরিমাণে এতই কম হয় যে, উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে না, তাহলে সাথীর অনুমতি ছাড়া একসাথে দুটি দুটি করে খেতে পারবে না। আর যদি খাবার বেশি হয় তাহলে অপর সাথীর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। (আল-কাওকাব)

بَابُ مَاجَاءَ فِى اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ ص٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭. খেজুর একটি পছন্দনীয় খাদ্য

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ سَلْمَى اِمْرَأَةُ أَبِى رَافِعٍ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

২৯. মুহাম্মদ ইবনে সাহল রহ....... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ঘরে খেজুর না থাকা সে ঘরের অধিবাসীদের জন্য অনাহার স্বরূপ।

এ বিষয়ে আবূ রাফি রাযি. এর স্ত্রী সালমা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

হিশাম ইবনে উরওয়া রাযি. এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া আমরা অবহিত নই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

جياع ঃ শব্দটি جائع এর বহুবচন। অর্থাৎ ক্ষুধার্ত।

খেজুর সত্তাগতভাবে অতি বরকতময় একটি খাবার। যে ঘরে খেজুর না থাকে, সে ঘরে যত নেয়ামতই থাক না কেন, মনে করা হবে, সে ঘরে একটু খেজুর সমপরিমাণও নেয়ামত নেই। অথবা এখানে উদ্দেশ্য, ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মদীনা। সেখানের বিশেষ খাদ্য উপাদান হল খেজুর। আর হাজার ধরনের খেজুর সেখানেই উৎপন্ন হয়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান অতিকষ্টে কালাতিপাত করত। এমনকি ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথরও বেঁধেছিল। সাহাবায়ে কিরাম অনেক সময় কষ্টের যাতনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে অভিযোগ করত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরে বলেছিলেন, যার ঘরে খেজুর আছে তার জন্য ক্ষুধার অভিযোগ করা জায়িয নেই। হ্যা, যদি খেজুরও না থাকে, তাহলে সে অভিযোগ করতে পারে।

আল্লামা ত্বীবী রহ. বলেছেন, এ হাদীসটিকে স্বল্পে তুষ্টির প্রতি উৎসাহিত করার ব্যাপারে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে। আর হযরত গাঙ্গুহী রহ বলেন, হাদীসটির উদ্দেশ্য হল, যার ঘরে খেজুর আছে, সে নিজেকে ক্ষুধার্ত মনে করবে না। ক্ষুধার্ত সে যার ঘরে কিছুই নেই। এমনকি খেজুরও নেই। কাজেই এ হাদীসে যুহ্দ, কান'আত ও শোকর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ اِذَا فُرِغَ مِنْهُ ص٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮. আহার শেষে খানার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَاْكُلَ الْاَكْلَةَ اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا

وَفِى الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَعَائِشَةَ وَاَبِى اَيُّوْبَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَكَرِيَّابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ نَحْوَهُ وَلاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ

৩০. হান্নাদ ও মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ........ আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা কোনও খানা খেয়ে বা পানীয় পান করে, তজ্জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে।এ প্রসঙ্গে উকবা ইবনে আমির, আবূ সাঈদ, আয়েশা, আবূ আইয়ূব ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান।

যাকারিয়া ইবনে আবূ যাইদা রহ. থেকে একাধিক রাবী হাদীসটি তদনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যাকারিয়া ইবনে যাইদা রহ. এর সূত্রের হাদীস ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

الأكلة ঃ এর হামযায় যবর-পেশ উভয়ই হতে পারে। اكلة শব্দটি فعلة এর ওযনে। অর্থ, একবার পেট ভরে খাওয়া। সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে, বান্দা তৃপ্তিসহ পুরা খাবার শেষ করে যদি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তাহলে এটা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যদি اكلة আলিফে পেশ সহকারে হয়, যার অর্থ লোকমা, তাহলে অর্থ হবে, বান্দা যদি খাবারের সময় প্রতি লোকমাতে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তাহলে তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়।

কিন্তু প্রথম অর্থ قوله: او يشرب الشربة এর অধিক অনুকূল। কারণ, এখানে الشربة শব্দটির ش এর উপর যবর নির্ধারিত। এর অর্থ হল, একবার পান করা। অতএব অর্থ হল, একবার পানাহারের পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে, আল্লাহ তা'আলা তার সে আমলে খুব খুশী হন। তখন তার যে খাবার ছিল তার মানবীয় প্রয়োজন, তা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (মা'আরিফ)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُوْمِ صـ٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯. কুষ্ঠরোগীর সাথে আহার করা

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشْقَرِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَا حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوْمٍ فَاَدْخَلَهُ مَعَهُ فِى الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ كُلْ بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ ، هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ هٰذَا شَيْخٌ بَصْرِىٌّ وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ شَيْخٌ آخَرُمِصْرِىٌّ اَوْثَقُ مِنْ هٰذَا وَاَشْهَرُ وَرَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ عُمَرَاَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوْمٍ وَحَدِيْثُ شُعْبَةَ اَشْبَهُ عِنْدِىْ وَاَصَحُّ

৩১. আহমাদ ইবনে সাঈদ আশকার এবং ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব রহ..... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জনৈক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরলেন। এরপর তার নিজের সঙ্গে তার হাত (খাদ্যের) পেয়ালায় ঢুকিয়ে দিলেন। অনন্তর বললেন, আল্লাহর নামে, আল্লাহরই উপর আস্থা রেখে, তাঁরই উপর ভরসা করে আহার কর। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি গরীব।

ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ....... মুফায্যাল ইবনে ফাযালা -এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। মুফায্যল ইবনে ফাযালা হলেন বসরার জনৈক শাইখ। অপর একজন মুফায্যাল ইবনে ফাযালা আছেন। তিনি হলেন মিসরী শাইখ এবং যিনি বসরী শাইখের তুলনায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ। শু'বা রহ. এ হাদীসটি হাবীব ইবনে শাহীদ ইবনে বুরায়দা রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর রাযি. জনৈক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরলেন। শু'বা রহ.-এর রিওয়ায়াতটিই আমার মতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

المحذوم ঐ ব্যক্তিকে বলে, যাকে جذام তথা কুষ্ঠরোগ আক্রমণ করেছে।

قال فى القاموس : الجذام علة تحدث من انتشار السوداء فى البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتها وربما إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح .

اخذ بيد محذوم ঃ এ কুষ্টরোগী হলেন, হযরত মুআইকিব ইবনে আবু ফাতেমা দাওসী রাযি.।

فادخله معه ঃ ইবনে হাজার রহ. -এর বর্ণনায় আছে فادخله معه আর আবু দাউদের রেওয়ায়াতে আছে– فوضعها معه এখানে ادخله শব্দে مذكر এর যমীর নেওয়া হয়েছে। যেমন, তিরমিযীতে আছে, العضو এর তাবীল করে।

القصعة ঃ ق এর উপর যবর। প্লেট, পাত্র।

كل بسم الله ثقة بالله ঃ ث এর নিচে যের। এটি মাসদার। অর্থ, নির্ভর করা। (كالوعد والعدة)

এখানে এটি মাফউলে মুতলাক। অর্থাৎ كل معى اثق ثقة بالله اى اعتمادا به وتفويضا للامر اليه

(তুহফা ঃ ৫/৪৩৮)

وتوكلا ঃ অর্থাৎ اتوكل توكلا عليه والجملتان حالان ثانيتهما مؤكدة للاولى

مجذوم এর ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণনা এসেছে। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুষ্ঠরোগীর সাথে খানা খেয়েছেন। অথচ বুখারী শরীফের এক হাদীসে এসেছে– فر من المجذوم كما تفر من الاسد

হাদীস বিশারদগণ এ দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্যতা এনেছেন কয়েকভাবে। যথা–

(১) উক্ত হুকুমটি কোনও কোনও মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে আরোপিত। কারও কারও ঈমান ও তাওয়াক্কুল শক্তিশালী। তাদের জন্য কুষ্ঠরোগীর সাথে খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের ঈমান দুর্বল, তারা যেন কুষ্ঠরোগী থেকে বেঁচে থাকে। কেননা 'তাওয়াক্কুল' কম হলে বেঁচে থাকার মধ্যেই রয়েছে নিরাপত্ত।

(২) উক্ত নির্দেশটি 'মুসতাহাব হুকুম।' তার সাথে খানা খাওয়ারও অনুমতি রয়েছে।

(৩) জাহিলীযুগের মানুষের বিশ্বাস ছিল, ব্যাধি নিজে নিজে সংক্রমিত হয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ عقيده عدوى বা কুসংস্কার বিলুপ্ত করে কুষ্ঠরোগীর সাথে খাবার খেলেন। যেন উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীভূত হয়ে যায় এবং সবার মনে একথাটি বদ্ধমূল করা যায় যে, مؤثر حقيقى তথা প্রকৃত প্রতিক্রিয়াকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। অপরদিকে তিনি কুষ্ঠরোগী থেকে বেঁচে থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন। যেন এটা বোধগম্য হয় যে, সংক্রামক ব্যাধি মূলতঃ আল্লাহর নির্দেশের আওতাধীন। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু قادر مطلق তথা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, তাই তিনি ইচ্ছা করলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে নাও পারেন। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِى مِعًى وَاحِدٍ ص٤

অনুচ্ছেদ ঃ ২০. মুমিন খায় এক আঁতে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِى مِعًى وَاحِدٍ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَاَبِى سَعِيْدٍ وَاَبِى نَضْرَةَ وَاَبِى مُوْسٰى وَجَهْجَاهٍ الْغِفَارِىِّ وَمَيْمُوْنَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو

৩২. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ....... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কাফির খায় সাত আঁতে আর মু'মিন খায় এক আঁতে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ, আবূ বাসরা, আবূ মূসা, জাহজাহ আল গিফারী, মায়মূন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حثنا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَاَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ ثُمَّ اُخْرٰى فَشَرِبَهُ ثُمَّ اُخْرٰى فَشَرِبَهُ حَتّٰى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ اَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ فَاَسْلَمَ فَاَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِاُخْرٰى فَلَمْ

يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِى مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِى سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

৩৩. ইসহাক ইবনে মূসা আনসারী রহ......... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক কাফির ব্যক্তি মেহমান হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য একটি বকরী দোহন করতে নির্দেশ দিলেন। দুধ দোহন করা হলে সে তা পান করে ফেলল। পরে আরেকটি দোহন করা হল। তা-ও সে পান করে ফেলল। পরে আরও একটি দোহান করা হল। তা-ও সে পান করে ফেলল। এমনকি সাতটি বকরীর দুধ সে একাই পান করে ফেলল। পরদিন সকালে সে ইসলাম গ্রহণ করে নিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য একটি বকরী দোহন করতে বললেন। দুধ দোহন করানো হল। সে এটির দুধ পান করল। পরে তার জন্য আরেকটি দুধ দোহন করতে বলা হল। কিন্তু আজ সে এটির দুধ শেষ করতে পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুমিন পান করে এক আঁতে আর কাফির পান করে সাত আঁতে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

معى : م এর নিচে যের, ع এর উপর তানবীন। কিন্তু ى সহকারে লেখা হয়।

الكافر يأكل فى سبعة أمعاء : এর অর্থ ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে উলামায়ে কিরাম একাধিক মন্তব্য করেছেন। কারণ, এ ইবারতের উপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যথা–

প্রথম প্রশ্ন : অন্ত্র বা আঁতুড়ি তো সকলেরই সমান। এমনকি দেখা যায়, কোনও কোনও মুমিন কোনও কোনও কাফির থেকেও বেশি খায়। অতএব কাফির সাত আঁতুড়িতে খায় –একথার অর্থ কি ? উলামায়ে কিরাম এর বিভিন্ন জবাব পেশ করেছেন। যথা–

জবাব :

(১) কোনও কোনও আলেম বলেছেন, مومن এবং كافر শব্দদ্বয়ের শুরুতে যে الف لام আছে, সেটি جنس এর জন্য নয় বরং عهد خارجى এর জন্য। অতএব অর্থ হবে– নির্দিষ্ট জনৈক কাফির, যার উল্লেখ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে এসেছে। তার নাম ছিল আবু গাযওয়ান।

(২) কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুমিন খানার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে খায়। যার কারণে শয়তান তার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে অল্প খাবার তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কাফির খানার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করে না। বিধায় শয়তান তার খানাতে অংশগ্রহণ করে। ফলে কাফিরের খাবারের চাহিদা অধিক হয়।

(৩) কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসে উল্লেখিত امعاء শব্দটির দ্বারা সাতটি স্বভাবের প্রতি ইংগিত দেওয়া হয়েছে। যেন ঐ সাতটি স্বভাব সাতটি আঁতুড়ি। সে সাতটি স্বভাব হল, (১) লোভ। (২) লালসা। (৩) উচ্চবিলাস দীর্ঘ কামনা। (৪) উচ্চাকাংখা (৫) বদ স্বভাব (৬) হিংসা। (৭) স্থূলপ্রিয়তা। এ সাতটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাফির খাবার গ্রহণ করে। অন্যদিকে মুমিন কেবল ক্ষুধা মেটানোর প্রয়োজনে খাবার খায়।

(৪) ইমাম নববী রহ. বলেছেন, হাদীসটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কোনও মুমিন এক আঁতুড়িতে খায়। আর কোনও কোনও কাফির সাত আঁতুড়িতে খায়। তিনি বলেন,

فالمعنى إن بعض المؤمن يأكل في معى واحد وأكثر الكافر يأكلون في سبعة أمعاء

(৫) হাদীসের ভাষ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অধিক এবং কম। অর্থাৎ মুমিনের বৈশিষ্ট্য হল, ইবাদতের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ থাকার কারণে খাবার কম খাওয়া। অন্যদিকে কাফির পার্থিব মোহে পড়ে অধিক খায় অথবা অধিক খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করে।

(৬) ইমাম কুরতুবী রহ.বলেন, شهوات الطعام তথা খাবারের প্রতি লোভ সৃষ্টি করা। এমন জিনিস মোট সাতটি। যথা, (১) شهوة الطبع –স্বভাবগত লোভ। (২) شهوة النفس – প্রবৃত্তির তাড়না। (৩) شهوة العين –চোখের ক্ষুধা। (৪) شهوة الفم – মুখের লালসা। (৫) شهوةالأذن – কানের লোভ। (৬) شهوة الأنف – নাকের লোভ। (৭) شهوة الجوع –ক্ষুধার তাড়না। سبعة امعاء দ্বারা এ সাতটি জিনিস উদ্দেশ্য। আর معى واحد দ্বারা শুধু শেষোক্ত কামনা উদ্দেশ্য।

(৭) المؤمن। দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার। কারণ, সে আল্লাহর যিকরের বরকতময় নূর এবং ঈমানের মা'রেফতের কারণে সর্বদা তৃপ্ত থাকে। তার অধিক পানাহারের সুযোগ হয়ে উঠে না। কিন্তু যদি আলিম মুমিন না হয় তবে সে কাফিরের মত বেশী খাবে।

(৮) মুমিন শুধু হালাল রিযিক খায়; কাফির হালাল-হারাম সবকিছুই খায়। হালালের অস্তিত্ব যেহেতু হারামের তুলনায় কম, এজন্য বলা হয়েছে– المؤمن ياكل في معى واحد ... الخ

(৯) এ হাদীস দ্বারা মুমিনের কম খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান উদ্দেশ্য। কারণ, সে যখন জানবে বেশী খাওয়া কাফিরের স্বভাব, তখন সে অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকবে। (তাকমিলাহ ও তুহফাতুল আহওয়াযী)

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ সমস্ত চিকিৎসকগণ এ ব্যাপারে এক মত যে, মানুষের আঁতুড়ি মোট ছয়টি। কিন্তু হাদীসে সাতটি বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর ঃ প্রথমোক্ত প্রশ্নের উত্তরে যেসব উত্তর পেশ করা হয়েছে, তাতে এ প্রশ্নেরও অনেকটা জবাব হয়ে গেছে। এছাড়াও এর জবাবে আল্লামা কাশ্মিরী রহ. العرف الشدى গ্রন্থে বলেন,

لم أجد جوابه إلا ما قال الطحاوى رح ان المعنى السابع المعدة وادرجها الحديث فى المعاء

আল্লামা গঙ্গুহী রহ. এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন–

إن هذا تمثيل وتصوير لكثرة أكله والمعدة عدت سابعة الأمعاء تغليبا (الكوكب ج ٦ ص ٢)

মাসআলা ঃ পেট ভর্তি করে খাওয়া জায়েয। (শামী ঃ ৯/৪৮৯)

بَابُ مَاجَاءَ فِى طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ ص ٤

অনুচ্ছেদ ঃ ২১. একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট

حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِى الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِى الْاَرْبَعَةِ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوٰى جَابِرٌ وَابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الْاَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ

৩৪. আল-আনসারী রহ....... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট। তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

এ প্রসঙ্গে জাবির ও ইবনে উমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا

৩৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ..... জাবির রাযি. সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

খাওয়ার দুটি পদ্ধতি আছে। যথা, (১) পেট ভরে খাওয়া। (২) পেট ভরে নয় বরং যথেষ্ট পরিমাণ খানা খাওয়া। এ হাদীসে উল্লেখিত طعام الواحد দ্বারা প্রথম পদ্ধতির খানা উদ্দেশ্য। যা দু'জনের জন্য যথেষ্ট হয়। অনুরূপ দু'জনের খানা তিনজনের জন্য। নিয়ত খালেস হলে দ্বিতীয় পদ্ধতির খানাও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা তখন 'বিসমিল্লাহ' -এর বরকত আসতে পারে। (আল-কাওকাবুদ্দুররী)

بَابُ مَاجَاءَ فِى أَكْلِ الْجَرَادِ ص ٤

অনুচ্ছেদ ঃ ২২. পতঙ্গ খাওয়া

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفٰى اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ

هٰكَذَا رَوٰى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ ـ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَقَالَ سِتَّ غَزَوَاتٍ وَرَوٰى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَقَالَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاَبُوْ يَعْفُوْرٍ اِسْمُهُ وَاقِدٌ وَيُقَالُ وَقْدَانُ اَيْضًا وَاَبُوْ يَعْفُوْرٍ الْاٰخَرُ اِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسَ

৩৬. আহমাদ ইবনে মানী' রহ........ আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তাকে পতঙ্গ (বড় ফড়িং) খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছয়টি গাযওয়ায় শরীক হয়েছি। আমরা পতঙ্গ আহার করতাম।

সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. এ হাদীসটিকে আবূ ইয়া'কুব রহ.-এর বরাতে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি ছয়টি গাযওয়ার উল্লেখ করেছেন। সুফইয়ান ছাওরী রহ.ও এ হাদীসটি আবূ ইয়া'ফূর রহ.–এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় সাতটি গাযওয়ার উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْاَحْمَدَ وَالْمُؤَمَّلُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ عَنْ ابْنِ اَبِى اَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَاْكُلُ الْجَرَادَ

وَرَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ عَنْ ابْنِ اَبِى اَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزَوَاتٍ نَاْكُلُ الْجَرَادَ

৩৭. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ........ ইবনে আবূ আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি গাযওয়ায় শরীক হয়েছি। আমরা পতঙ্গ আহার করতাম।

শু'বা রহ. এ হাদীসটিকে আবূ ইয়া'ফূর – ইবনে আবূ আওফা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে থেকে বহু যুদ্ধ করেছি। আমরা পতঙ্গ খেতাম।

এ প্রসঙ্গে ইবনে উমর ও জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

আবূ ইয়া'ফূর রহ... এর নাম হল ওয়াকিদ। ওয়াকদান বলেও কথিত আছে। অপর একজন আবূ ইয়া'ফূর আছেন। তাঁর নাম হল, আবদুর রহমান ইবনে উবায়দ ইবনে বাসতাস।

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا

৩৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ.... শু'বা রহ....... সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

الجراد এর পরিচয়

الجراد : بفتح الجيم وتخفيف الراء والواحد جرادة والذكر والانثى سواء ، وبه قال انه مشتق من الجرد لانه لا ينزل على شئ الا جرده

جراد ঃ এর আভিধানিক অর্থ পঙ্গপাল, ফড়িং। এর পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ সমান। جراد শব্দটি جرد (মুক্ত বা শূন্য) শব্দ থেকে চয়িত। কেননা এটি যে জিনিসের উপর পড়ে, তাকে শূন্য ও নগ্ন করে ছাড়ে।

আল্লামা দারীমী বলেন, এটি একটি আশ্চর্যজনক জীব। তার মধ্যে দশ প্রকার জন্তুর দশটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। (১) ঘোড়ার মত চেহারা (২) হাতির মত চোখ (৩) ষাড়ের মত গরদান (৪) শিংওয়ালা হরিণের শিং (৫) বাঘের মত বক্ষ (৬) বিচ্ছুর মত পেট (৭) গাধার মত পালক ০(৮) উটের মত রান (৯) উট পাখির নলার মত নলা (১০) সাপের মত নিঃশ্বাস। তার মুখের লালা উদ্ভিদকে বিষের মত ধ্বংস করে দেয়।

ফড়িং সম্পর্কে ক্ষুদ্র দুইটি মাসআলা ঃ

(১) এটি হালাল-হারাম হওয়ার ব্যাপারে তার বিধান কি ?

(২) হালাল হওয়ার জন্য যবাহ করা শর্ত কি না?

এক. ফড়িং খাওয়া হালাল না হারাম ?

এ প্রসঙ্গে আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. ইমাম নববী রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, اجمع المسلمون على اباحة الجراد অর্থাৎ সকল মুসলান ফড়িং হালাল হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।
(বযলুল মজহুদ ৪/৩৬০)

الكوكب الدرى এর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ইবনে আ'রাবী তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে হিযাযের ফড়িং এবং স্পেনের ফড়িং এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, স্পেনের ফড়িং খাওয়া জায়েয নেই। কারণ, তাতে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। (আল-কাওকাব ঃ ২/৭)

দুই. ফড়িং হালাল হওয়ার জন্য যবাহ করার প্রয়োজন আছে কি না? এ প্রসঙ্গে বলা হয়, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ রহ.-এর এক মতানুযায়ী বুঝা যায়, ফড়িং হালাল হওয়ার জন্য যবাহ করা জরুরী। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম শাফিঈ রহ. এবং অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে যবাহ করা জরুরী নয় বরং যেভাবেই মারা যাক, ফড়িং খাওয়া হালাল।

যবাহ জরুরী হওয়ার দলীল

ইমাম মালেক রহ. দলীল হিসেবে বলেন, ফড়িং স্থলজ প্রাণী। আর স্থলজ প্রাণী হলে যবাহ করা জরুরী। সুতরাং ফড়িংকেও যবাহ করা জরুরী। অন্যথায় হালাল হবে না।

যবাহ জরুরী না হওয়ার দলীল

হানাফী আলেমগণ ও জমহূর দলীল হিসেবে নিম্নের 'মশহুর' ও 'মরফু' হাদীসকে উপস্থাপন করেন–

عن عبد الله بن عمر رض ان النبى ﷺ قال احلت لنا ميتتان ودمان فاماالميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال (رواه ابو داؤد ابن ماجه ودار قطنى وغيرهم)

ইমাম মালেক রহ এর আকলী দলীলের জবাবে বলা হয়, 'মশহূর' ও 'মরফূ' হাদীসের মোকাবেলায় যুক্তির কোন মূল্য নেই। (হিন্দিয়া ঃ ৫/২৮৯, শামীঃ ৯/৪৯২)

بَابُ مَاجَاءَ فِى أَكْلِ لُحُوْمِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا صـ٤

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩. জাল্লালা-এর গোশত খাওয়া ও এর দুধ পান করা

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ ابْنِ أَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَرض قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ هٰذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَرَوَى الثَّوْرِىُّ عَنْ ابْنِ أَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً

৩৯. হান্নাদ রহ....... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাল্লালা -এর গোশত খেতে এবং এর দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ছাওরী রহ. এটিকে ইবনে আবূ নাজীহ – মুজাহিদ – রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو

৪০. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাছছামা (অর্থাৎ বেঁধে রেখে তীর নিক্ষেপে যে পশু বধ করা হয়), জাল্লালা-এর দুধ এবং মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ....... বলেন, ইবনে আবূ আদী রহ. ও সাঈদ ইবনে আবূ আরূবা – কাতাদা – ইকরিমা – ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

جلالة ঃ শব্দটির বহুবচন جلل যা جلة শব্দ থেকে নির্গত। جلة শব্দের অর্থ– মল, পায়খানা ইত্যাদি। তুহফাতুল আহওয়াযীতে আছে–

الجلالة بفتح الجيم وتشديد اللام من ابنية المبالغة ،هى الحيوان الذى يأكل الغدرة من الجلة بفتح الجيم وهى البعرة (تحفة الاحوذى)

جلالة বলা হয় ময়লা-আবর্জনা ও নাপাক ভক্ষণকারী জন্তুকে, যে জন্তু অধিকাংশ সময় নাপাক ভক্ষণ করে। এমনকি তার দুধ, ঘাম ও গোশত থেকেও নাপাকির উৎকট গন্ধ বের হয়। যদি এমন হয় তাহলে তার গোশত খাওয়া হারাম। আর যদি গোশত ইত্যাদি থেকে অপবিত্র গন্ধ বের না হয় এবং ময়লা-আবর্জনা তার অধিকাংশ সময়ের খাবারও না হয়, তবে মাঝে মাঝে হয়ত খায়, তাহলে এ জন্তুকে جلالة বলা হবে না। এ জন্তু খাওয়া জায়িয হবে। সুতরাং প্রতীয়মান হল, মূলতঃ জন্তুটি হালাল। কিন্তু হারাম হয়েছে অন্য কারণে। অর্থাৎ অপবিত্রতার নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার কারণে। সুতরাং উক্ত 'কারণ' দূরীভূত হয়ে গেলে জন্তুটি খাওয়া জায়িয হবে।

جلالة কে কতদিন আকটিয়ে রাখতে হবে? এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, মুরগি হলে তিনদিন বেঁধে রাখার পর যবাহ করবে।

কেউ কেউ বলেছেন, মোরগ জাতীয় জন্তু হলে তিনদিন, বকরি সাতদিন, গাভী বিশদিন এবং উটকে একমাস কিংবা চল্লিশ দিন আটকিয়ে রাখবে। কেউ কেউ বলেন, মোরগ তিনদিন, বকরি চারদিন এবং উট কিংবা ষাড় হলে দশদিন বেঁধে রাখতে হবে।

সঠিক কথা হল, এক্ষেত্রে দিন নির্দিষ্ট না করাই ভাল বরং দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতার প্রতিক্রিয়া যতদিন থাকবে ততদিন আটকে রাখবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى أَكْلِ الدَّجَاجِ صـ٤

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪. মুরগ খাওয়া

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ اَبِى الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِى مُوْسٰى وَهُوَ يَاْكُلُ دَجَاجَةً فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُهُ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ زَهْدَمٍ وَلَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ زَهْدَمٍ وَاَبُوْ الْعَوَّامِ هُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ

৪১. যায়দ ইবনে আখযাম রহ..... যাহদাম আল-যারমী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা রাযি. -এর কাছে গেলাম। তিনি তখন মোরগের গোশত আহার করছিলেন। তিনি বললেন, কাছে এসো, খাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা আহার করতে দেখেছি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

একাধিকভাবে এ হাদীসটি যাহদাম থেকে বর্ণিত আছে। যাহদামের রিওয়ায়াত ছাড়া অন্য সূত্রে এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। আর আবুল আওওয়াম রহ. এর নাম হল, ইমরান আল কাত্তান।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمٍ رض عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ ، وَفِى الْحَدِيْثِ كَلَامٌ اَكْثَرُ مِنْ هٰذَا هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَى اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ

৪২. হান্নাদ রহ.......... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোরগের গোশত আহার করতে দেখেছি।

এ হাদীসে এর চেয়েও বেশী বক্তব্য রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

আইয়ূব সুখতিয়ানী রহ. এ হাদীসটিকে কাসিম তামীমী – আবূ কিলাবা – যাহদাম জারমী রহ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اكل الدجاج ঃ শব্দটি اسم جنس এর উপর তিন প্রকার হরকত দিয়েই পড়া যাবে। অবশ্য ইমাম নববী রহ. পেশ বর্ণনা করেন নি। এর একবচন হল, دجاجة এ শব্দটির মধ্যেও তিন প্রকার হরকত হতে পারে। কারও কারও মতে পেশ দুর্বল। (তুহফা ঃ ৫/৪৪৯)

মোরগ যদি جلالة না হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার গোশত ভক্ষণ করা জায়িয। চাই তা গৃহপালিত হোক কিংবা বন্য হোক। (হিন্দিয়া ঃ ৫/২৮৯, শামী ঃ ৯/৪৯২)

بَابُ مَاجَاءَ فِى أَكْلِ الْحُبَارَى صـ٤

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫. হুবারা খাওয়া

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُفَيْنَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُفَيْنَةَ رُوِىَ عَنْهُ ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ وَيَقُوْلُ بُرَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُفَيْنَةَ

৪৩. ফায্‌ল ইবনে সাহল আ'রাজ বাগদাদী রহ........ সুফায়না রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হুবারা -এর গোশত খেয়েছি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

এ সূত্র ছাড়া এ হাদীস সম্পর্কে আমরা অবগত নই। ইবরাহীম ইবনে উমর ইবনে সফীনা রহ. থেকে ইবনে আবূ ফুদায়ক রহ. হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (ইবরাহীমের পরিবর্তে) বুরায়দ ইবনে উমর ইবনে সুফায়না উল্লেখ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

حبارى ঃ ধূসর রংয়ের এক প্রকার বন্যপাখি। লম্বা পা, বড় ঘাড় এবং কিছুটা লম্বাটে ঠোঁট বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি। এটি খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ. বলেন, ফার্সীতে একে تغدورى বলা হয়। হিন্দীতে كرمناك বলা হয়। উর্দূতে سرخابه বলা হয়। পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং পাকিস্তানের কিছু কিছু অঞ্চলে এটি পাওয়া যায়। এটি বিরল প্রজাতির পাখি বিশেষ। 'আল-কামূসুল ওয়াযীয' অভিধানে এর বাংলা তরজমা লেখা হয়েছে, حبارى -এর বহুবচন حباريات অর্থ, দ্রুত দৌড়াতে পারে এমন বৃহদাকার পাখি বিশেষ। এ পাখিটি খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয।

সুরাহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, এটি ح এর উপর পেশ। এটিকে বলে شوات এটি এক প্রকার পাখি। مذكر ও مؤنث - واحد ও جمع সবই এক রকম। অবশ্য جمع এর ক্ষেত্রে حباريات বলা যেতে পারে। কথায় আছে, كل شئ يحسب ولده حتى الحبارى অবশ্য এখানে হুবারা পাখির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, এটিকে বোকামীর ক্ষেত্রে উদাহরণরূপে পেশ করা হয়।

برهيه بن عمر بن سفينة ঃ ب এর উপর পেশ, ر এর উপর যবর, ه সাকিন। ইট ابراهيم এর তাসগীর। সাফিনা রাযি. হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত দাস। তিনি প্রথমে হযরত উম্মে সালমা রাযি. এর গোলাম ছিলেন। পরে তিনি তাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। শর্ত করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করতে হবে।

عن ابيه ঃ উমর ইবনে সাফীনা।

عن جده ঃ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা এর আযাদকৃত দাস সফীনা রাযি.। তাঁকে সফীনা উপাধি দেওয়ার কারণ, তিনি নৌকা বা জাহাজের মত সফরে অনেক সামান নিজের কাঁধে বহণ করতে পারতেন। (তুহফাহ ঃ ৫/৪৫১)

بَابُ مَاجَاءَ فِى أَكْلِ الشِّوَاءِ ص٥

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬. ভূনা গোশত আহার করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ وَالْمُغِيْرَةِ وَأَبِى رَافِعٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

৪৪. হাসান ইবনে মুহাম্মদ যা'ফরানী রহ........ উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বকরীর পার্শ্বদেশের ভূনা গোশত পেশ করেন। তিনি তা থেকে কিছু আহার করেন। এরপর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু (নতুন) উযু করলেন না।

এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ, মুগীরা, রাফি রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ সূত্রে গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

الشواء ঃ অর্থ, اللحم المشوى অর্থ ভূনা গোশত, কাবাব, রোষ্ট ইত্যাদি। (ش) বর্ণে যের যোগে বেশি প্রসিদ্ধ। তবে পেশ দিয়েও পড়া যায়।

قام الى الصلوة ولم يتوضأ ঃ আগুনে রান্না করা খাবার ভক্ষণ করার পর অযু ওয়াজিব কিনা– এ ব্যাপারে প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কিরামের কিছুটা মতবিরোধ ছিল। কিন্তু ইমাম নববী রহ. বলেন, বর্তমানে এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আগুনে রান্না করা খাবার ভক্ষণ করার পর অযু করা ওয়াজিব নয়। যারা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে ছিলেন, তাঁরা কিছু قولى এবং فعلى হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করতেন। কিন্তু এর বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরাম দলীল হিসাবে অনেক হাদীস উপস্থাপন করেছেন। যে সব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রান্না করা বস্তু আহার করার দ্বারা অযু ওয়াজিব হয় না। জমহূর এর পক্ষ থেকে ওয়াজিব এর প্রবক্তাদের বিপক্ষে তিনটি উত্তর পেশ করা হয়। যথা–

(১) আগুনে রান্না করা বস্তু খাওয়ার পর অযূর যে বিধান ছিল, তা রহিত হয়ে গেছে। তার প্রমাণ, আবু দাউদ শরীফে হযরত জাবির রাযি. সূত্রে বর্ণিত– قال كان رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار

(২) এ প্রসঙ্গে অযূর বিধানটি মুসতাহাব এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তার প্রমাণ হল, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযূ করেছেন বলে যেমনিভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি অযূ করেননি বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। যা মুসতাহাব হওয়ার হওয়ার প্রতি স্পষ্ট ইংগিতবহ।

(৩) যেসব হাদীসে এ প্রসঙ্গে অযূর আলোচনা এসেছে, সেসব হাদীসে 'অযূ' দ্বারা আভিধানিক অযূ তথা হাত-মুখ ধোয়া উদ্দেশ্য। পারিভাষিক অযূ উদ্দেশ্য নয়। যার প্রমাণ হল, সামনের পরিচ্ছেদ باب ماجاء فى التسمية على الطعام এর মধ্যে বর্ণিত হাদীস। হযরত আকরামা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতের একটি ঘটনার বিবরনে বলেন,

ثم أتينا بماء فغسل رسول الله ﷺ يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا ص٥

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭. হেলান দিয়ে আহার করা মাকরূহ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ وَرَوٰى زَكَرِيَّا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَرَوٰى شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْأَقْمَرِ

৪৫. কুতায়বা রহ...... আবূ জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আর আমি তো হেলান দিয়ে খাই না। এ প্রসঙ্গে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

আলী ইবনে আকমার রহ.-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। যাকারিয়া ইবনে অরাসূলুল্লাহ যাইদা, সুফইয়ান ছাওরী ও ইবনে সাঈদ প্রমুখ রহ. এ হাদীসটি আলী ইবনে আকমার রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। শু'বা রহ. সুফইয়ান ছাওরী সূত্রে এ হাদীসটি আলী ইবনে আকমার রহ. থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসটি বর্ণনা করার কারণ

বস্তুতঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসরা রাযি. এর হাদীসে বর্ণিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ হাদীসখানা বর্নিত। যে হাদীসটি ইবনে মাজাহ ও তাবরানীতে সনদে হাসান-সহ বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি বকরী হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেটি বসে খেতে আরম্ভ করেন। তখন এক বেদুঈন বলল, এটা কেমন বসা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, আল্লাহ আমাকে সম্মানিত বান্দা বানিয়েছেন, আমাকে অবাধ্য জালিম বানাননি।

হযরত ইবনে বাত্তাল রহ. এর মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করেছিলেন আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশার্থে। অতঃপর তিনি আইয়ূব যুহরী সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন ফেরেশতা এসেছেন। এ ফেরেশতা ইতোপূর্বে আর আসেননি। তখন তিনি বললেন, আপনার প্রভু আপনাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, আপনি গোলাম রাসূলুল্লাহ কিংবা সম্রাট রাসূলুল্লাহ যে কোনও একটি হতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আ. এর দিকে পরামর্শ প্রার্থনার ভঙ্গিতে তাকালেন। জিব্রাঈল তাঁর দিকে ইংগিত করলেন বিনয় ও গোলামী গ্রহণ করার জন্য। তখন তিনি বললেন, আমি গোলাম রাসূলুল্লাহ হতে চাই। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে তিনি কখনও হেলান দিয়ে খানা খাননি।

পানাহার আল্লাহ তা'আলার একটি নেয়ামত। অতএব তার কদর করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহঙ্কারসূলভ ভোজন থেকে অত্যধিক সতর্ক থাকতেন। তিনি কখনও হেলান দিয়ে খাবার খেতেন না। কারণ, এটা অহঙ্কারীদের অভ্যাস। হেলান দেওয়া কেবল চেয়ারের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বলেন, হাতের উপর ভর করে যমীনে উপবিষ্ট হয়ে খাবার খাওয়াও মাকরূহ। কেউ কেউ আসন পেতে বসাকে হেলান দিয়ে

বসার মধ্যে শামিল করেছেন। আল্লামা কাশ্মিরী রহ. বলেন, اما التربيع فجلوس قبيح – আসন পেতে বসাও দোষনীয়।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, হেলান দেওয়ার চারটি পদ্ধতি আছে।

(১) ডান অথবা বাম দিকে হেলান দেওয়া অথবা বালিশের আশ্রয় নেওয়া।

(২) হাতে জমিনের উপর ভর করা।

(৩) চারজানু হয়ে বসা।

(৪) কোমর দেয়াল অথবা বালিশ ইত্যাদিতে লাগানো।

এ চারটি পদ্ধতিই কিছুটা মানগত পার্থক্যের সঙ্গে হেলান দেওয়ার অন্তর্ভূক্ত। বস্তুতঃ হেলান দিয়ে খানা খাওয়া অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ হল, এ পদ্ধতি বিনয়-নম্রতার পরিপন্থী। তাছাড়া এর কারণে খানাও বেশী খাওয়া হয়।

কেউ কেউ বলেন, এতে পেট স্ফীত হয়ে যায় বিধায় খাবার দ্রুত হজম হয়। ফলে অনেক সময় এ পদ্ধতির উপবেসন পেটের পীড়ার কারণও হতে পারে। (মা'আরিফুল হাদীস)

بَابُ مَاجَاءَ فِى حُبِّ النَّبِيِّ ﷺ اَلْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ ص٥

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হালুয়া ও মধু পছন্দ করা

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَاَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَفِي الْحَدِيْثِ كَلَامٌ اَكْثَرُ مِنْ هٰذَا

৪৬. সালামা ইবনে শাবীব, মাহমূদ ইবনে গায়লান এবং আহমাদ ইবনে ইবরাহীম দাওরাকী রহ....... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালুয়া এবং মধু খেতে পছন্দ করতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আলী ইবনে মুসহির এটিকে হিশাম ইবনে উরওয়া রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে আরও অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

الحلواء ঃ দীর্ঘসরে এবং ক্ষীণ সরে উভয়ভাবে পড়া যায়। ইমাম আসমাঈর মতে ক্ষীণ সরে ى এর সাথে লেখা হয়। আর ফাররার মতে দীর্ঘ সরে আলিফের সাথে লেখা হয়। লাইস রহ. এর উক্তি মতে অধিকাংশ সময় দীর্ঘ সরে লেখা হয়। আরবী ভাষায় সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্যকে হালুয়া বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিষ্টিদ্রব্য ভালবাসতেন। বিশেষ করে মধু তাঁর অত্যধিক প্রিয় ছিল।

ইমাম নববী রহ. বলেন, এখানে সব ধরনের মিষ্টিজাত দ্রব্য উদ্দেশ্য। এর পরে মধুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে عام এর পরে خاص হিসাবে।

وفى الحديث كلام اكثر من هذا ঃ অর্থাৎ এ হাদীসটি দীর্ঘ। ইমাম তিরমিযী রহ. এখানে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। (তুহফা ঃ ৫/৪৫৫)

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ إِكْثَارِ الْمَرَقَةِ ـــ ٥

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯. তরকারীতে ঝোল বেশী দেওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ ثنا أَبِيْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْمَرَقَتَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقَةً وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ هُوَ الْمُعَبِّرُ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلْقَمَةُ هُوَ أَخُوْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ

৪৭. মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে আলী মুকাদ্দামী রহ......... আবদুল্লাহ মুযানী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যদি গোশত ক্রয় কর, তবে এতে ঝোল বাড়িয়ে দিও। যাতে কেউ গোশত না পেলে যেন তার ঝোল পায়। আর এ–ও গোশতের শামিল।

এ বিষয়ে আবূ যার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

মুহাম্মদ ইবনে ফাযা -এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। মুহাম্মদ ইবনে ফাযা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন। সুলায়মান ইবনে হারব রহ. তাঁর সমালোচনা করেছেন। আলকামা রহ. হলেন বাকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযানীর ভাই।

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ أَبِيْ عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

৪৮. হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আসওয়াদ বাগদাদী রহ...... আবূ যার্র রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা নেক কাজের কোন বিষয়কেই ছোট বলে মনে কর না। ভাল করার মত যদি কিছু না পাও তবে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবে। যদি গোশত খরীদ কর বা কিছু রান্না কর, তবে এতে ঝোল বেশী করে দিবে এবং তা থেকে অন্তত এক চামচ তোমার প্রতিবেশীকে দিবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

শু'বা রহ. এটিকে আবূ ইমরান জাওনী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিও হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামী শরী'আহ অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। সামনে যথাস্থানে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। এখানে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আমাদের অনেক প্রতিবেশী এমনও রয়েছে যে, গোশতের প্রতি তাদের বিশেষ আকর্ষণ থাকে। অথচ গরীব হওয়ার কারণে গোশ্ত ক্রয় করে খাওয়া সম্ভব হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারও গোশত জুটে গেলে, ঝোল বেশি করে দিয়ে পাকাবে। যেন অন্তত ঝোল বেশি করে দিয়ে দু' এক টুকরা গোশত প্রতিবেশীর ঘরে পাঠানো যায়। এমন যেন না হয় যে, প্রতিবেশী ক্ষুধায় ছটফট করছে; অপরদিকে অন্য প্রতিবেশি তৃপ্তিসহ গোশ্ত-পোলাও ইত্যাদি খাচ্ছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ الثَّرِيْدِ صـ ٥

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০. সারীদ-এর মর্যাদা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِىْ مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৪৯. মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না রহ.... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুরুষের মাঝে তো অনেকেই কামেল হয়েছেন। আর মহিলাদের মাঝে মারইয়াম বিনত ইমরান ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ কামিল হননি। সকল খাদ্যের উপর যেমন ছারীদের মর্যাদা, তেমনি সকল নারীদের উপর আয়েশার মর্যাদা।

এ বিষয়ে আয়েশা ও আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كمل من الرجال كثير ঃ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম গ্রন্থে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে–

بفتح الميم وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات والكسر ضغيف ولفظ الكمال تطلق على تمام الشئ وتناهية فى بابه، والمراد هنا الشاهى فى جميع الفضائل وخصائل البر والتقوى

মারইয়াম ও আছিয়া রাযি. এর উত্তমতা

لم يكمل من النساء ঃ এ সীমাবদ্ধতার কারণে কেউ কেউ দু'জনকে (মরিয়ম আ.ও আছিয়া আ.) আল্লাহর রাসূল মনে করেন। কেননা কামেল বা পরিপূর্ণ মানব তো রাসূলরাই হন।

কিরমানী রহ. এর জবাবে বলেন, كمال (পরিপূর্ণতা) শব্দটি তারা নবুওয়াত পেয়েছেন বলে বুঝায় না বরং এখানে كمال শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য, নারী তার বিশেষত্ব ও গুণে পূর্ণতা লাভ করা।

হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যায়, হযরত মরিয়ম ও আছিয়া সকল নারী থেকে এমনকি হযরত আয়েশা, খাদীজা এবং ফাতেমা থেকেও উত্তম। এর একাধিক উত্তর রয়েছে। যথা–

(১) لم يكمل النساء দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের সমকালীন নারীদের থেকে তারা উত্তম ছিলেন।

(২) উক্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খাদীজা ও আয়েশা রাযি. সম্পর্কে ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে বলেছেন।

(৩) অন্যান্য হাদীস দ্বারা এ হাদীস থেকে হযরত আয়েশা রাযি. প্রমুখকে পৃথক করা হয়েছে।

সারীদের উত্তমতা

হযরত আয়েশা রাযি.এর ফযীলত সমস্ত নারীদের ওপর। হাদীসের ভাষ্য দ্বারা এখানে তাই প্রমাণিত। তেমনিভাবে সারীদ অন্যান্য খাবারের চেয়ে উত্তম। একথাও প্রমাণিত। 'সারীদ' বলা হয়, ঝোলে ভিজানো টুকরা টুকরা রুটি অথবা রুটি ও গোশতের মণ্ডবিশেষ খাদ্য। আরবরা এ খাবারকে বিশেষ গুরুত্ব দিত। 'সারীদ' কেন উত্তম খাবার ? হাদীসে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে, 'সারীদ' খুবই সুস্বাদু, শক্তিবর্ধক খাদ্য এবং দ্রুত পরিপাক হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য খাবার সারীদের তুলনায় বিলম্বে হজম হয়। তাই 'সারীদকে' অন্যান্য খাবারের চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে।

হযরত আয়েশা রাযি. এর মর্যাদা

হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান রহ. বলেন, কেউ কেউ হযরত মরিয়ম আ. কে নারীজগতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া নারী জাতির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত আয়েশা রাযি. সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। কারও কারও বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, হযরত খাদীজা সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। আবার কারও কারও মতে হযরত ফাতিমা রাযি. সর্বশ্রেষ্ঠ নারী।

এ সকল বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্যতা এনে বলা হয়, তাঁরা সকলেই পুণ্যবতী নারী; নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন। একজন আরেকজনের তুলনায় স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণে নারী জাতির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার কোনও কোনও হাদীস বিশারদ এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। (শামী ঃ ২১৯/৪)

✪ হযরত আয়েশা রাযি. এর শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা 'সারীদ' এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে কেন? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম বলেন, যেহেতু 'সারীদ' অন্যান্য খাবারের তুলনায় অধিক উপকারী। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা রাযি.ও উম্মতের জন্য অন্যান্য নারীদের তুলনায় অধিক কল্যাণময়। কেননা হযরত আয়েশা রাযি. ইলমে নববীতে নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। ফলে উম্মত তার থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার লাভ করেছে। এ মর্মে হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাযি. বলেন, আমরা যখন কোন মাসআলা নিয়ে সমস্যায় পড়তাম, তখন হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে সমাধানের জন্য যেতাম। তিনি অনায়েসে তার সমাধান পেশ করতে পারতেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. এর অবদান

আয়েশা রাযি. এর উপাধি ছিল সিদ্দীকা। তিনি আবু বকর রাযি. এর কন্যা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন। নবুওয়াতপ্রাপ্তীর চার বছর পর তাঁর জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ছয় বছর। মতান্তরে সাত বছর। হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের শাওয়াল মাসে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন। নয় বছর বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ঘর সংসার শুরু করেন। উম্মুল মুমিনীনগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তিনি ছিলেন সর্বাধিক প্রিয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনসঙ্গীনী হিসাবে তিনি একাধারে প্রায় নয়টি বছর অতিবাহিত করেন। আর রাসূলের জীবনের এ বছর কয়টিই ছিল সর্বাধিক কর্মবহুল ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সময়। আয়েশা রাযি. এর আঠারো বছর বয়সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন। এরপর প্রায় ৩৯টি বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এ কারণে এক দিকে তিনি যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, অপরদিকে ঠিক তেমনি পেরেছিলেন তার

সুষ্ঠু প্রচার করতে। অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর ভাগ্নে উরওয়া ইবনুয্ যুবাইর রহ. এবং ভাতিজা কাসিম ইবনে মুহাম্মদ-ই তাঁর থেকে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়াও তিনি তাঁর পিতা আবু বকর রাযি. উমর রাযি., ফাতিমা রাযি., সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি., উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি., জাযামা বিনতে ওয়াহাব রাযি., ও হামযাহ ইবনে আমর রাযি., প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রাযি. থেকে যেসব সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন, উমর রাযি., ইবনে উমর রাযি., আবু হুরাইরা রাযি., আবূ মূসা রাযি., যায়দ ইবনে খালিদ রাযি., ইব্নে আব্বাস রাযি., রবী'আ ইবনে আমর রাযি., ও সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. প্রমুখ।

আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী প্রবীন তাবেঈগণের কয়েকজন হলেন, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, উরওয়া ইবনুয্যুবাইর, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, ও আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ প্রমুখ। তাঁর বর্ণিত মোট হাদীসের সংখ্যা ২২১০।

আল্লামা আইনী রহ. লিখেছেন, আয়েশা রাযি. একজন বড় ফিক্হবিদ সাহাবিয়্যা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যে ছয়জন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁদের একজন। তাঁর থেকে ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ১৭৪টি হাদীস। এ ছাড়া পৃথকভাবে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে ৫৪টি এবং মুসলিমে ৫৮টি। ডক্টর মুহাম্মদ আবুযাহ্র মতে তাঁর থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬৮টি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, সতি-সাধ্বী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারিণী। তাঁর মহান চরিত্রের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন। পরিশেষে তিনি ৫৭ হিঃ ৬৭৬ খ্রিঃ মতান্তরে ৫৮/৬৭৭ ইন্তিকাল করেন।

মহিলাগণ নবীরাসূল হতে পারেন কিনা ?

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, শায়খ আবুল হাসান আশ'আরী, কুরতুবী, ইবনে হাযম রহ. প্রমুখের ঝোঁক হল, মহিলা নবী-রাসূল হতে পারেন বরং ইবনে হাযম এর দাবী ছিল, হযরত হাওয়া, সারা, হাজেরা, মূসা আ. এর আম্মা, মরিয়ম আ. এরা সবাই রাসূলুল্লাহ ছিলেন।

হযরত হাসান বসরী ইমামুল হারামাইন, শায়খ আব্দুল আযীয দেহলভী, কাযী ইয়ায এর মতে মহিলাগণ নবী-রাসূল হতে পারেন না। কাযী ইয়ায ও ইবনে কাছীর বলেন, জমহূরের মত এটাই। ইমামুল হারামাইন রহ. বলেন, এর উপরই উম্মতের ইজমা হয়েছে।

যাঁরা বলেন, মহিলাগণ নবী-রাসূল হতে পারেন না, তাদের প্রমাণ

কুরআনে কারীমে পুরুষ নবীর কথায় এসেছে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وما ارسلنا من قبلك الارجالا نوحى اليهم (النحل)

(২) বিশেষতঃ হযরত মরিয়ম আ. এর নবুওয়াত অস্বীকার করার ব্যাপারে কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কুরআনে কারীমে তাঁকে সিদ্দীকা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

ما المسيح ابن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة

কুরআন মজীদ সূরা নিসাতে নেয়ামত প্রাপ্তদের যে তালিকা দিয়েছে তাদের জন্য বলা বাহুল্য যে, সিদ্দীকিয়াতের মর্যাদা নবুওয়াতের মর্যাদার চেয়ে নিচু পর্যায়ের।

যাঁরা বলেন, মহিলাগণ নবী-রাসূল হতে পারেন, তাদের প্রমাণ

কুরআন মজীদ হযরত সারা ও হযরত ঈসা এর আম্মা মরিয়ম সম্পর্কে যেসব ঘটনা উল্লেখ করেছে, সেগুলোতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তাঁদের নিকট ফেরেশতা অহী নিয়ে আসতেন। তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের নিকট নিজের মারিফত ও ইবাদতের হুকুম পৌঁছেছে। হযরত সারা আ. এর জন্য সূরা হুদ ও জারিয়াতে, মূসা আ. এর মায়ের জন্য সূরা কাসাসে আর মরিয়ম আ. এর জন্য আলে-ইমরানে ও সূরা মরিয়মে ফিরিশতার মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সম্বোধন রয়েছে।

বলা বাহুল্য, এসব স্থানে অহীর আভিধানিক অর্থ তথা দিক-নির্দেশনা প্রাপ্তি বা সূক্ষ্ম ইংগিত হতে পারে না। যেমন, واوحى ربك الى النحل আয়াতে মধুপোকার জন্য অহী শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

বিশেষভাবে হযরত মরিয়ম আ. নবুওয়াতের স্পষ্ট প্রমাণ হল, তাঁর আলোচনা সূরা মরিয়মে সেভাবেই করা হয়েছে, যেমনিভাবে অন্যান্য নবী-রাসূলের আলোচনা এসেছে। যেমন–

واذ كر فى الكتاب موسى، واذكر فى الكتاب ادريس، واذكر فى الكتاب اسمعيل، واذكر فى الكتاب ابراهيم، واذكرفى الكتاب مريم ، وارسلنا اليها روحنا ، قال انما انا رسول ربك اصطفك وطهرك على نساء العلمين، يبشرك بكلمة منه .

প্রতিপক্ষের জবাব

হযরত মরিয়ম আ. যে সিদ্দীকা এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর হল, যদি কুরআন হযরত মরিয়ম আ. কে সিদ্দীক বলে তবে এ উপাধি নবুওয়াতের মর্যাদা পরিপন্থী নয়। যেমন, হযরত ইউসুফ আ. রাসূল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে 'সিদ্দীক' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, يوسف ايها الصديق যিনি রাসূল হন তিনি অবশ্যই সিদ্দীক হন। অবশ্য যিনি সিদ্দীক হবেন, তাঁর জন্য রাসূল হওয়া জরুরী নয়।

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم আয়াতের সম্পর্ক রিসালাতসহ নবুওয়াতের সঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা মহিলাকে মাখলূকের হিদায়াতের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন বা রাসূল বানিয়েছেন– এ ধরনের দাবী তো কেউ করেনি। আলোচনা হল, নবুওয়াত সংক্রান্ত, রিসালাত সংক্রান্ত নয়।

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন, অহীর দুটি পর্যায় আছে। (১) অহী দ্বারা উদ্দেশ্য মাখলুকের হেদায়াত ও আদেশ-নিষেধ শিক্ষাদান। (২) আল্লাহ কর্তৃক কাউকে সরাসরি কিংবা ফেরেশতার মাধ্যমে এ ধরনের সম্বোধন করা যদ্বারা সুসংবাদ প্রদান অথবা কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অবহিতকরণ কিংবা বিশেষভাবে তার নিজের ব্যাপারে কোন আদেশ-নিষেধ করা উদ্দেশ্য হয়। প্রথম পর্যায় হল, রিসালাতসহ নবুওয়াত।। সকলের ঐকমত্যে এটি পুরুষদের সঙ্গে বিশেষিত। আর যদি অহীর দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থ হয়, তবে ইবনে হাযাম ও তাঁর অনুসারী উলামায়ে কেরামের মতে এটাও নবুওয়াতের একটা প্রকার। কেননা কুরআন মজীদ সূরায়ে শূরার মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর ওহী নাযিল হওয়ার যে পন্থাসমূহ বর্ণনা করেছেন, তা এই অহীর উপরই প্রযোজ্য হয়। সূরায়ে শূরায় আছে–

وما كان لبشر ان يكلمه الله الاوحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء ، انه عليم حكيم .

আর যখন কুরআন মজীদ অহীর এ দ্বিতীয় প্রকারের ব্যবহার সরাসরি কুরআনের শাব্দিক প্রমাণে হযরত মরিয়ম, হযরত সারা, হযরত মূসা আ. এর মা এবং হযরত আছিয়ার ব্যাপারে করেছে, যেমন সূরায়ে হূদ, সূরায়ে কাসাস এবং সূরায় মরিয়মের আয়াত দ্বারা প্রকাশ পায়, তাই এ পবিত্র মহিলাদের উপর রাসূল উপাধি প্রদান করা নিতান্তই সঠিক।

ইবনে হাযাম রহ. এর সমর্থক উলামায়ে কিরাম এ প্রসঙ্গে উদ্ভূত এ প্রশ্নটির জবাবে বলেন, কুরআন মজীদ যেভাবে পুরুষ রাসূলগণকে পরিষ্কার শব্দে নবী ও রাসূল বলেছে, তদ্রুপ মহিলাগণের মধ্য হতে কাউকেও বলেনি। সারমর্ম হল, 'রেসালাতসহ নবুওয়ত' পুরুষ জাতির জন্য নির্দিষ্ট, যা মাখলূকের হেদায়াত, নসীহত এবং তা'লীম, তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এর অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যাকে এ সম্মানে সম্মানিত করেছেন, তার সম্বন্ধে তিনি পরিষ্কাররূপে ঘোষণা করেছেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী ও রাসূল। যাতে তাঁর দাওয়াত-তাবলীগ কবুল করে নেওয়া মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রমাণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর যেহেতু নবুওয়াতের সেই প্রকারটি, যার ব্যবহার নারীজাতির উপরও হয়ে থাকে, যিনি এ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেহেতু তার সম্বন্ধে শুধু-এতটুকু প্রকাশ করে দেওয়াই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে যে অহী আম্বিয়া ও রাসূলদের জন্য নির্দিষ্ট, সেই সম্মানে একজন মহিলাকেও সম্মনিত করা হয়েছে।

মহিলাদের নবুওয়াত স্বীকার ও অস্বীকার করা সম্পর্কে তৃতীয় আরেকটি অভিমত সে সকল উলামায়ে কেরামের পাওয়া যায়, যাঁরা এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বনকে প্রাধান্য দেন। তাঁদের মধ্যে শায়খ তাকী উদ্দীন সবকী রহ. নাম উল্লেখযোগ্য। 'ফতহুল বারী গ্রন্থে রয়েছে–

قال السبكى اختلف فى هذه المسئلة ولم يصح عندى فى ذالك شئ

'সবকী বলেন, এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। আর আমার মতে এ বিষয়ের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি কোনটিই সঠিক নয়। (কাজেই এ বিষয়ে কোনও মত প্রকাশ না করে নীরবতা অবলম্বন করাই উত্তম।)

ইবনে কাছীর বলেন, জমহূর উলামায়ে কেরাম মহিলাদের রাসূল হওয়াকে অস্বীকার করেছেন, এ ব্যাপারে আমরা একমত নই। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম হয়ত নীরবতা অবলম্বন করাকে পছন্দ করেছেন।

(কাসাসুল কুরআন ঃ ৪/১৮৫-১৮)

بَابُ مَاجَاءَ إِنْهَشُوا اللَّحْمَ نَهْشًا ص٥

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১. গোশত দাঁত দিয়ে ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِى أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ زَوَّجَنِى أَبِى فَدَعَا أُنَاسًا فِيهِمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنْهَشُوا اللَّحْمَ نَهْشًا (انهشوا اللحم نهشا) فَإِنَّهُ اَهْنَأُ وَاَمْرَأُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ فِى عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُعَلِّمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ مِنْهُمْ اَيُّوبُ السَّخْتِيَانِىُّ

৫০. আহমাদ ইবনে মানী রহ....... আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বিবাহ করান, তিনি লোকদের এতে দাওয়াত করেন। তাঁদের মাঝে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া রাযি.ও ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা দাঁত দিয়ে কেটে কেটে গোশত খাও। কেননা তা অধিক সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক।

এ প্রসঙ্গে আয়েশা ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল করীম রহ.-এর সূত্র ছাড়া উক্ত হাদীসটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। আইয়ূব সাখতিয়ানী রহ. সহ কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ আবদুল করীম রহ.-এর স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁত দ্বারা চিবিয়ে বা কেটে খাবার খাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা এতে খাবার দ্রুত হজম হয় এবং শরীরের জন্যও সুষম হয়।

بَابُ مَاجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّيْنِ ص٥

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ছুরি দিয়ে গোশত কাটার অনুমতি

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

৫১. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ....... আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ছুরি দিয়ে বকরীর হাতার গোশত কাটতে দেখেছেন। তিনি তা থেকে আহার করেন। এরপর নামাযের জন্য গেলেন কিন্তু (নতুন) অযূ করেন নি।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ প্রসঙ্গে মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عن ابيه ঃ অর্থাৎ আমর ইবনে উমাইয়্যা যামরী রাযি.। একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি মুশরিকদের পক্ষ হয়ে বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশ নেন। এরপর যখন মুসলমানরা উহুদ হতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আরবের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি সর্বপ্রথম বীরে মা'উনার যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে শরীক হন। তখন আমের ইবনে তোফায়েল তাকে বন্দী করে। অতঃপর তাঁর মাথার সম্মুখভাগের চুল কেটে ছেড়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬ষ্ঠ হিজরীতে তাঁকে দূত হিসাবে সম্রাট নাজ্জাসীর নিকট প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র পাঠ করে নাজ্জাসী ইসলাম কবুল করেন। তাঁকে হেজাযবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁর নিকট থেকে তাঁর দুই পুত্র জা'ফর ও আবদুল্লাহ এবং ভাতিজা যিবরিকান রেওয়ায়াত করেন। তিনি মু'আবিয়া রাযি. এর খেলাফতকালে ইনতিকাল করেন। কারও কারও মতে ৬০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। (আসমাউর রিজাল)

السكين ঃ শব্দটি আরেকভাবে পড়া যায় অর্থাৎ السكينة। তবে প্রথমটি প্রসিদ্ধ। জাওহারীর মতে السكين শব্দটি مذكر ও مؤنث উভয়টিই হয়। তবে অধিকাংশ সময় مذكر হিসেবে ব্যবহৃত হয়। –(তুহফা)

احتز ঃ ছুরি দ্বারা কেটেছে।

كتف شاة ঃ শব্দটি فرح ، مثل ও جبل এর মত। বহুবচন اكتاف، كتفة অর্থঃ কাঁধ, স্কন্ধ। (তুহফা ঃ ৪৬২)

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, لاتقطعو اللحم بالسكين فانه من صنيع الاعاجم অর্থাৎ ছুরি দ্বারা গোশত কেটো না, এটা আনারবীদের অভ্যাস। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ হাদীস এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের মাঝে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তার নিরসন কল্পে বলা হয়ঃ

(১) আবু দাউদ শরীফের হাদীসটি 'অপ্রয়োজন'এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস প্রযোজ্য হবে 'প্রয়োজন'এর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কাটা যাবে না; প্রয়োজনে কাটা যাবে। সুতরাং কোন বিরোধ নেই।

(২) নিষেধ সম্বলিত হাদীসে ছুরি দ্বারা কেটে খাওয়ার অভ্যাস না করা বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে অনুমতি সংক্রান্ত হাদীসে প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে এরূপ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ اَىُّ اللَّحْمِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ص ـ ه

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩. কোন্ গোশত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অধিক প্রিয় ছিল?

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَدُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ (و كان يعجبه) فَنَهَسَ مِنْهَا ، وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَاَبِىْ عُبَيْدَةَ هٰذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاَبُوْ حَيَّانَ اِسْمُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِىُّ وَاَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ اِسْمُهُ هَرِمٌ

৫২. ওয়াসিল ইবনে আবদুল আ'লা রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গোশত আনা হল এবং তাঁকে একটি রান দেওয়া হল। তিনি রান পছন্দ করতেন। তারপর তিনি তা দাঁত দিয়ে কেটে আহার করলেন।

এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর ও আবূ উবায়দা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। রাবী আবূ হায়্যান রহ.-এর নাম হল, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ইবনে হায়্যান তায়মী। আবূ যুরআ ইবনে আমর ইবনে জারীর রহ.-এর নাম হল হারিম।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ اَبُوْ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى مِنْ وَلَدِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ الذِّرَاعُ اَحَبَّ اللَّحْمِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ اِلَّا غِبًّا فَكَانَ يَعْجَلُ اِلَيْهِ لِاَنَّهُ اَعْجَلُهَا نُضْجًا

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

৫৩. হাসান ইবনে মুহাম্মদ যা'ফারানী রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনে বলেন, রানের গোশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অধিক প্রিয় ছিল, এমনটি নয়। বস্তুতঃ ব্যাপার ছিল, অনেক দিন পর পর তিনি গোশত খেতে পেতেন। তা-ই তাঁর জন্য তাড়াতাড়ি করা হত। আর রানের গোশত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ولكن لايجد اللحم الا غبا ঃ এর অর্থ হল, সর্বদা তা পেতেন না, কখনও কখনও পেতেন।

ماكانَ الذراع احب اللحم ঃ ইমাম তিরমিযী রহ. মূলতঃ উক্ত হাদীস এনেছেন একটি প্রশ্নের সমাধান কল্পে। প্রশ্নটি হল, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, كان يعجبه اى يحبه । এতে বুঝা যায়, দুনিয়ার মজাদার বস্তুর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও আকর্ষণ ছিল! অথচ এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান পরিপন্থী। এ জন্য হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এনে উক্ত

প্রশ্নের সমাধানে বলা হয়েছে, এ 'আকর্ষণ' মজাদার হওয়ার কারণে নয় বরং যেহেতু এ গোশত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হত এবং খাওয়ার সময় সময়ও বেঁচে যেত, তাই তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া হয়ে ইবাদতে মশগুল হতে পারতেন। এজন্যই তিনি এ গোশতকে পছন্দ করতেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْخَلِّ ص۵

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ সিরকার বর্ণনা

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخُو سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ

৫৪. হাসান ইবনে আরাফা রহ.......... জাবির রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সিরকা হল, উত্তম তরকারী।

حشنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ العَجْرِیُّ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّهَانِيٍّ وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُبَارَكِ بْنِ سَعِيْدٍ

৫৫. আবদা ইবনে আবদুল্লাহ খুযাঈ বাসরী রহ...... জাবির রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সিরকা কতইনা উত্তম তরকারী!

এ বিষয়ে আয়েশা এবং উম্মে হানী রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এটি মুবারক ইবনে সাঈদ রহ.-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ

৫৬. মুহাম্মদ ইবনে সাহল ইবনে আসকর বাগদাদী রহ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সিরকা কতইনা ভাল তরকারী।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثنا يَحْيَى ابْنُ حَسَّانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ اَوِالْاُدْمُ الْخَلُّ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لَا يُعْرَفُ حَدِيْثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ

৫৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রহ.......... সুলায়মান ইবনে বিলাল রহ. এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেছেন, نعم الادام او الادم الخل উত্তম ইদাম কিংবা উদুম (তরকারী) হল সিরকা।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ সূত্রে গরীব।

হিশাম ইবনে উরওয়া রহ.-এর রিওয়ায়াত হিসাবে সুলায়মান ইবনে বিলাল রহ.-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَئٌ فَقُلْتُ لَا اِلَّا كِسَرٌ يَابِسَةٌ (يابس) وَخَلٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَرِّبِيْهِ فَمَا اَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ اُدْمٍ فِيْهِ خَلٌّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ اُمِّ هَانِئٍ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَاُمُّ هَانِئٍ مَاتَتْ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ بِزَمَانٍ

৫৮. আবূ কারায়ব রহ......... উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমার কাছে এলেন। বললেন, তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমি বললাম, সুকনো রুটির কয়েকটি টুকরা ও সিরকা ছাড়া কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা-ই নিয়ে এসো! যে বাড়িতে সিরকা আছে, সে বাড়িতে তরকারীর কোন অভাব আছে, বলা যায় না।এ হাদীসটি হাসান। এ সূত্রে গরীব। উম্মে হানী রাযি.-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। উম্মু হানী রাযি. আলী রাযি.-এর অনেক দিন পর ইন্তেকাল করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

نعم الادام الخل ঃ الادام - তরকারিরূপে ব্যবহৃত দ্রব্য। এ শব্দটির বহুবচন আসে الادم। তবে الادم শব্দটি ইমাম নববী এর মতে একবচন। হাফিয রহ. এর উক্তি অনুযায়ী এটি বহুবচন। আ কারও কারও মতে জযম সহকারে একবচন, পেশ সহকারে বহুবচন। সিরকাকে উত্তম তরকারি বলা হয়েছে। কারণ, সিরকা খেতে সময় কম ব্যয় হয়। রুটির সাথে অনায়েসে খাওয়া যায় এবং সহজলভ্য। এছাড়া সিরকাতে ঔষধী গুণও রয়েছে প্রচুর। যেমন, সিরকা অম্লস্বাদ পানীয়, কফ নিরাময়ক, হজমিবর্ধক, কৃমিনাশক, রুচিবর্ধক। তবে ঠাণ্ডা জাতীয় পানীয় বিধায় কারও কারও জন্য ক্ষতিকরও বটে। কিন্তু সহজলভ্য ও সাদামাঠা বিধায় উত্তম বলা হয়েছে। (খাসায়েলে নববী)

প্রশ্ন ঃ শামায়েলে তিরমিযীর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের দোষ-গুণ বর্ণনা করতেন না। কারণ, প্রশংসা দ্বারা লোভ সৃষ্টি হয়। আর দোষ বর্ণনা করা দ্বারা নেয়ামতের অবমূল্যায়ণ হয়। অথচ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরকার প্রশংসা করলেন। উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে করা হবে?

উত্তর ঃ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের প্রশংসা করেন নি বরং উম্মে হানী রাযি. নবীজীর প্রশ্নে 'না' উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, ঘরের মধ্যে সিরকা ছাড়া অন্য কিছু নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মন খুশি করার জন্য বলেছেন, نعم الادام الخل এতে উম্মে হানী পুলকিত হন।

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, খাদ্যা -পানীয়ের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত। সুস্বাদু জিনিসের পেছনে না পড়া উচিত বরং যুহদ ও অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করবে। আল্লামা খাত্তাবী ও কাযী ইয়ায বলেন, হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই। অবশ্য ইমাম নববী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসের প্রতিপাদ্য হল, সিরকার প্রশংসা। এজন্য হযরত জাবির রাযি. বলেছেন, مازلت احب الخل منذ سمعتها من نبى الله যেমন আনাস রাযি. কদু সম্পর্কে বলেছেন, ما زلت احب الدباء সুতরাং হাদীসের রাবীর ব্যাখ্যা অন্যদের তুলনায় অবশ্যই অগ্রাধিকারযোগ্য। (তাকমিলাহ)

মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরকাকে তরকারী বলেছেন অভিধান ও প্রচলনের দিক থেকে নয় বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল, উম্মতকে যুহ্দ তথা দুনিয়া বিমুখতা শিক্ষা দেওয়া। কাজেই হানাফীদের বিরুদ্ধে এ প্রশ্ন তোলা যাবে না যে, তারা কসমের জওয়াবে সিরকাকে তরকারির অন্তর্ভুক্ত করেনি। কেননা কসমের ভিত্তি তো প্রচলন ও আভিধানিক ব্যবহারের ওপর। আর প্রচলনের দিক থেকে সিরকা তরকারী নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى أَكْلِ الْبِطِّيْخِ بِالرُّطَبِ ص ٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫. তাজা খেজুরের সাথে বাঙ্গি খাওয়া

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ هٰذَا الْحَدِيثَ

৫৯. আবদা ইবনে আবদুল্লাহ খুযাঈ রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে বাঙ্গি খেতেন। এ প্রসঙ্গে আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কেউ কেউ এটিকে হিশাম ইবনে উরওয়া – তার পিতা উরওয়ার সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আয়েশা রাযি. -এর উল্লেখ নেই। ইয়াযীদ ইবনে রূমান রহ. উরওয়া সূত্রের আয়েশা রাযি. থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بطيخ ঃ শাইখুল আদব হযরত মাওলানা ইযায আলী রহ. বলেন, بطيخ শব্দটি ব্যাপক। এটি তরমুজ-বাঙ্গি দুটিই বুঝায়। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য হাদীসে তরমুজ উদ্দেশ্য। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বাঙ্গি উদ্দেশ্য। তবে কাঁচা। আবার কারও কারও মতে বাঙ্গিও ঠাণ্ডা হয় বলে তা-ই উদ্দেশ্য। তবে এ সকল মতামতের মীমাংসা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপরই ছেড়ে দেওয়া হল।

এটি খেজুরের সাথে মিলিয়ে খাওয়ার কারণ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরমুজ বা বাঙ্গিকে খেজুরের সাথে মিলিয়ে খেয়েছেন। কেননা এ দুটি ঠাণ্ডা জাতীয় ফল। আর খেজুর গরম জাতীয় ফল। কাজেই উভয়টি একসঙ্গে খেলে ঠাণ্ডা গরমের মধ্যে ভারসাম্যতা ফিরে আসবে এবং খাবার সুষম হবে। একসাথে মিলিয়ে খাওয়ার সূরত হল, উভয়টি একসাথে মুখে দিতেন এবং খেয়ে নিতেন। অথবা প্রথমে একটি খেজুর মুখে নিতেন এরপর এক টুকরা তরমুজ বা বাঙ্গি নিতেন। উভয়টি মিলিয়ে খেতেন।এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, পানাহারে উদারনীতি অবলম্বন করা জায়েয আছে। এ সময় একাধিক খাওয়ার জিনিস তৈরী করা ও খাওয়া জায়েয আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ ص٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬. তাজা খজুরের সাথে কাঁকুড় খাওয়া

حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ ، هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيثِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ

৬০. ইসমাঈল ইবনে মূসা ফাযারী রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে কাঁকুড় খেতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ইবরাহীম ইবনে সা'দ রহ.-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শসা যেহেতু ঠাণ্ডা আর খেজুর হল গরম, তাই উভয়টি মিলিয়ে খেলে সুষম খাদ্য হবে। তাছাড়া খেজুর মিষ্টি আর শসা পানসে, তাই এদুটি মিলিয়ে খেলে ভিন্ন একটা স্বাদও পাওয়া যায়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়টি মিলিয়ে খেতেন। এসব হাদীস দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীলতার উদ্দেশ্যে খাদ্যের ধরনের প্রতি লক্ষ্য রাখাও উচিত।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ شُرْبِ اَبْوَالِ الْإِبِلِ ص٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭. উটের পেশাব পান করা

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّاعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا حُمَيْدُ وثَابِتٌ وَقَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ثَابِتٍ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَنَسٍ رَوَاهُ اَبُوْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ وَرَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ

৬১. হাসান ইবনে মুহাম্মদ যা'ফরানী রহ......... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনায় আসে। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া তাদের উপযোগী না হওয়ায় তিনি তাদেরকে সদকার উট যেখানে রক্ষিত ছিল। সেখানে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, এর দুধ ও পেশাব পান করবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ।

ছাবিতের বর্ণনা হিসেবে গরীব। হাদীসটি আনাস রাযি. থেকে একাধিকসূত্রে বর্ণিত আছে। আবূ কিলাবা এটিকে আনাস রাযি. থেকে এবং সাঈদ ইবনে আবূ আরূবা রহ. এটিকে কাতাদা - আনাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فاجتووها ঃ এর শাব্দিক অর্থ, جوء রোগে আক্রান্ত হওয়া। جوء এক প্রকার পেটের রোগ। এর ফলে পেট ফুলে যায়। শরীরের রং হলুদ হয়ে যায়। অত্যধিক পিপাসা অনুভূত হয়।

কারও কারও মতে اجتووها। অর্থ, আবহাওয়া ও পরিবেশ বৈরী হওয়া। অর্থাৎ মদীনার আবহাওয়া ও পরিবেশ তাদের জন্য বান্ধব হয়নি। তারা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছে। এ দ্বিতীয় অর্থটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

وقال اشربوا من البانها وابوالها ঃ বাক্যটি ফিকহের দুটি মাসআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যথা-

এক. হালাল জন্তুর পেশাব পবিত্র নাকি অপবিত্র?

দুই. কোনও হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়িয আছে কি না?

প্রথম মাসআলাঃ এ ক্ষেত্রে ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মদ এবং এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ প্রমুখের অভিমত হল, হালাল জন্তুর পেশাব পবিত্র। আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং সুফিয়ান সাওরী রহ. প্রমুখের মতে হালাল জন্তুর পেশাব অপবিত্র।

ইমাম মালেক প্রমুখের দলীল

ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. তাঁরা আলোচ্য হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, যদি উটের পেশাব অপবিত্র হত, তাহলে রাসূলুল্লাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পান করার নির্দেশ দিতেন না।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রহ. প্রমুখের দলীল

(১) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসঃ

قال قال رسول الله ﷺ استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه

হাদীসটিতে بول (পেশাব) শব্দটি ব্যাপক। যা সকল প্রাণীর পেশাবকে গণ্য করে।

(২) মুসনাদে আহমদে এসেছে, এক সাহাবীর মৃত্যুর পর কবরে তাকে শক্তভাবে চাপ দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছিলেন, প্রস্রাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে তার এ শাস্তি হয়েছে।

(৩) পূর্বে باب ماجاء فى أكل لحوم الجلالة এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে, نهى ﷺ عن أكل لحوم الجلالة والبانها এ নিষেধাজ্ঞার 'কারণ' হিসাবে সেখানে বলা হয়েছিল, যেহেতু এসব জন্তু অপবিত্র বস্তু খায় বিধায় এসব জন্তু খাওয়া নিষেধ। এ হাদীস থেকে دلالة النص হিসাবে প্রমাণিত হয় যে, হালাল পশুর মলমূত্র অপবিত্র বলেই গণ্য।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

আহনাফ এবং শাওয়াফে' এর পক্ষ থেকে এর কয়েকটি জবাব পেশ করা হয়। যথা–

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন, উটের পেশাবের মধ্যে এদের প্রতিষেধক রয়েছে। তাই এদের জীবন রক্ষার তাগিদে এদেরকে উটের পেশাব পান করাতেই হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সুতরাং বুঝা গেল, এরা مضطر তথা নিরুপায়। আর مضطر তথা নিরুপায় হলে অপবিত্র জিনিস পানাহার করা জায়িয আছে। এ মর্মে উসূলে ফিকহের নীতি হল–

الضرورات تبيح المحظورات (قواعد الفقه: ٨٩)

(২) কেউ কেউ এর উত্তরে বলেছেন, উক্ত হাদীস "হাদীসে উরাইয়া" রহিত হয়ে গেছে। আর রহিতকারী হাদীসটি হল, আবু হুরাইরা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। কারণ, হাদীসে উরাইনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উলা অথবা শাওয়াল কিংবা জিলকদ মাসে। পক্ষান্তরে আবু হুরাইরা রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেছেন সপ্তম হিজরীতে।

(৩) হালাল-হারামের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে উসূল মতে হারামের স্বপক্ষে হাদীস অগ্রাধিকার লাভ করে।

দ্বিতীয় মাসআলা

تداوى بالمحرمات বা হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা নেওয়া জায়িয আছে কি নেই? এ মাসআলাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যদি নিরুপায় অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন, হারাম বস্তু ব্যবহার করা ছাড়া জীবন রক্ষা পাবে না, তাহলে প্রয়োজন অনুপাতে হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা নেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। কিন্তু যদি জীবনের হুমকি না থাকে বরং শুধু ব্যাধি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে হারাম বস্তু ব্যবহার করা হয়, তাহলে এর বৈধতা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

- ইমাম মালেক রহ. এর মতে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা নেওয়া বিনাশর্তে জায়িয।
- ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে হারাম বস্তু চিকিৎসায় ব্যবহার করা বিনাশর্তে না জায়েয। ইমাম তাহাবী রহ. বলেছেন, মদ ছাড়া অন্য সকল হারাম বস্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে।
- ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে যদি কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক পরামর্শ দিয়ে বলেন– হারাম বস্তু ছাড়া এ রোগীর রোগ নিরাময় হবে না, তাহলে সে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে হারাম বস্তু ব্যবহার করতে পারবে। অন্যথায় জায়িয হবে না। (দরসে তিরমিযী)

ফতওয়া ঃ যদি কোন দ্বীনদার, দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক এ মর্মে ব্যবস্থাপত্র দেন যে অমুক ব্যাধির চিকিৎসা শুধু অমুক হারাম বস্তুতে রয়েছে, তাহলে মযবূর বা অপারগ হিসাবে প্রয়োজন মত ঐ হারাম বস্তু ব্যবহার করা যাবে। অন্যথায় এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যবহার করা যাবে না। (ফতওয়ায়ে শামী ঃ ৩৬৪/১, ফতহুল কাদীর ঃ ৫/১০, মাহমুদিয়া ঃ ৫/৮৭, আলমগীরী ঃ ৫/৩৫৫)

بَابُ الْوُضُوْءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ ص٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮. আহারের পূর্বে ও পরে অযু করা

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ الْجُرْجَانِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِى التَّوْرَاةِ اِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِى التَّوْرَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوْءُ بَعْدَهُ – وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَقَيْسٌ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ وَاَبُوْ هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ اِسْمُهُ يَحْيٰى بْنُ دِيْنَارٍ

৬২. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ........ সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, খাদ্যের বরকত হল এর পরে অযূ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমি এ কথা আলোচনা করলাম এবং তাওরাতে যা পড়েছি এর উল্লেখ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খাবারের বরকত হল, এর পূর্বে এবং পরে অযূ করা।

এ প্রসঙ্গে আনাস, আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কায়স ইবনে রাবী এর সূত্র ছাড়া এ হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কিছুই অবগত নই। কায়স হাদীসের ক্ষেত্রে যঈফ বলে বিবেচিত। আবূ হাশিম রুম্মানী রহ.-এর নাম হল, ইয়াহইয়া ইবনে দীনার।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে অযূ দ্বারা আভিধানিক 'অযূ' উদ্দেশ্য অর্থাৎ কেবল হাত-মুখ ধোয়া। খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করার পদ্ধতি হল, কব্জি পর্যন্ত ভালভাবে ধৌত করা। যেন হাত উত্তমরূপে পরিস্কার হয়ে যায় এবং পরিচ্ছন্নতার সাথে তৃপ্তিসহ খাওয়া যায়। এটাই সুন্নাত তরীকা। কেবল এক হাত ধোয়ার দ্বারা কিংবা দু'একটি আঙ্গুল ধৌত করার দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে না। (আলমগীরী ঃ ৫/৩৩৭, রহীমিয়া ঃ ৬/২৮৯, শামী ঃ ৯/৪৯০)

বরকত কাকে বলে ?

বরকত একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ "হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগা" কিতাবে চমৎকার উক্তি করেছেন। যার সারমর্ম হল, কোন খাদ্যে বরকতের অর্থ এটাও হয় যে, খাদ্যের যে আসল উদ্দেশ্য তা ভালোরূপে অর্জিত হয়, খাবার আকর্ষণ নিয়ে খাওয়া হয়। স্বভাবে সহনশীলতা আসে, মন আলোকিত হয়, প্রশান্তি আসে। সামান্য পরিমাণ খাবারই যথেষ্ট হয়ে যায়। এর দ্বার যথ্যার্থ রক্ত সৃষ্টি হয়ে শরীরের অংশ হয়। তার উপকারীতা দীর্ঘমেয়াদী হয়। এর ফলে নফসের অবাধ্যতা ও গাফলতি সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তা'আলার শোকর ও ইবাদতের তাওফীক হয়। হাদীসে যে কথা বলা হয়েছে , তার প্রতীক হল উক্ত সবগুলোই। (মা'আরিফ)

بَابٌ فِى تَرْكِ الْوُضُوْءِ قَبْلَ الطَّعَامِ صـ٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯. খাওয়ার পূর্বে অযু না করা

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوْا اَلاَ نَأْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ قَالَ اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلاَةِ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ قَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ كَانَ سُفْيٰنُ الثَّوْرِيُّ يَكْرَهُ غَسْلَ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَكَانَ يَكْرَهُ اَنْ يُوْضَعَ الرَّغِيْفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ

৬৩. আহমাদ ইবনে মানী রহ......... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৌচাগার থেকে বের হয়ে এলেন। তাঁর সামনে খানা পেশ করা হল। লোকেরা বলল, অযূর পানি নিয়ে আসব কি? তিনি বললেন, আমি অযূ করতে নির্দেশিত হয়েছি, যখন আমি সালাতে দাঁড়াব।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

আমর ইবনে দীনার এটিকে সাঈদ ইবনে হুওয়ারিছ – ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনে মাদীনী রহ. বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. বলেছেন, সুফইয়ান ছাওরী রহ. আহারের পূর্বে হাত ধৌত করা। অপছন্দ করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময়ের দৃষ্টিকোণে বলেছেন অর্থাৎ অযূ কেবল নামাযের জন্য ফরয। সিজদায়ে তিলাওয়াত, কুরআন মজীদ স্পর্শ করা এবং তাওয়াফ করার জন্য অযূ করা ওয়াজিব। এখানে সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করেছিলেন, সাহাবায়ে কিরামের ই'তিকাদ হল, খানার পূর্বে অযূ করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ ই'তিকাদকে দূর করার জন্য উক্ত পন্থা অবলম্বন করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اَكْلِ الدُّبَّاءِ صـ٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০. কদু (লাউ) তরকারী খাওয়া

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِى طَالُوْتَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ الْقَرْعَ وَهُوَ يَقُوْلُ يَا لَكِ شَجَرَةٌ مَا اَحَبَّكِ اِلَىَّ لِحُبِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكِ

وَفِى الْبَابِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْهِ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

৬৪. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ....... আবূ তালূত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসান ইবনে মালিক রাযি.-এর কাছে আমি গেলাম। তিনি লাউ খাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, হে গাছ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে ভালবাসতেন বলেই তুমি আমার কাছে এত প্রিয়।

এ প্রসঙ্গে হাকীম ইবনে জাবির তার পিতা জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি এ সূত্রে গরীব।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنِ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ فِى الصَّحْفَةِ يَعْنِى الدُّبَّاءَ فَلَا اَزَالُ اُحِبُّهُ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

৬৫. মুহাম্মদ ইবনে মায়মূন মক্কী রহ....... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়ালায় লাউ তালাশ করে খেতে দেখেছি। তাই আমি সর্বদা লাউ ভালবাসি। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে একাধিকভাবে বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عن انس بن مالك ঃ এটি একটি দাওয়াতের ঘটনা। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক দর্জি দাওয়াত দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ বাড়ীতে গেলেন, তখন সম্ভবতঃ খাদেম হিসেবে হযরত আনাস রাযি.ও সঙ্গে ছিলেন। দাওয়াত প্রদানকারী দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে কিছু জবের রুটি এবং এক পেয়ালা গোশতসহ কদুর ঝোল পেশ করলে। ঐ দিনের ব্যাপারে হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি সেদিন দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কদুর টুকরা বেছে বেছে খাচ্ছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভবতঃ কদু এজন্য পছন্দ করতেন যে, আরব দেশ গরমের দেশ। আর কদু হল, ঠাণ্ডা প্রকৃতির। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কদু পছন্দ করতেন। কদুর ঔষধী গুণ উপকার আছে। তন্মধ্যে একটি হল, মেধা তীক্ষ্ণ করে। এটি লঘুপাক খাদ্য। এ হাদীস দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পছন্দনীয় বস্তুকে পছন্দ করা উত্তম।

بَابُ مَاجَاءَ فِى أَكْلِ الزَّيْتِ صـ٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১. যয়তুন খাওয়া

حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهٖ فَاِنَّهٗ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

هٰذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَضْطَرِبُ فِى رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَرُبَّمَا ذَكَرَ فِيْهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَلَى الشَّكِّ فَقَالَ اَحْسَبُهٗ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا

৬৬. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ........ উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যয়তুন খাবে এবং এদিয়ে মালিশ করবে। কেননা এ হল বরকতময় বৃক্ষ।

আবদুর রাযযাক ইবনে মা'মার -এর সূত্র ছাড়া এ হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই। হাদীসটি বর্ণনা

করতে আবদুর রায্যাক ইযতিরাব করেছেন। তিনি কোন কোন সময় উমর - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করতেন। আবার কখনও সন্দেহের সাথে বর্ণনা করতেন যে, আমার মনে হয় এটি উমর - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। কোন কোন সময় যায়দ ইবনে আসলাম - তার পিতা আসলাম - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করতেন।

حدثنا ابو داؤد سليمان بن معبد ثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبى ﷺ نحوه ولم يذكر فيه عن عمر،

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو احمد الزبيرى وابو نعيم قالا حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من اهل الشام عن ابى اسيد رض قال قال النبى ﷺ كلوا من الزيت وادهنو به فانه شجرة مباركة

هذا حديث غريب من هذا الوجه انما نعرفه من حديث عبد الله بن عيسى

৬৮. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ....... আবূ আসীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যয়তূন খাবে এবং তা মালিশ করবে। কারণ, এ হল এক বরকতময় বৃক্ষ। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি এ সূত্রে গরীব। আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা রহ.-এর সূত্রেই কেবল আমরা অবগত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كلوا الزيت ঃ অর্থাৎ রুটির সাথে যাইতুন ভক্ষণ কর। যাইতুনকে তরকারীরূপে ব্যবহার কর। সুতরাং এ প্রশ্ন হবে না যে, যাইতুন তো তরল প্রদার্থ, তাই এটি গলধকরণ করা ভক্ষণ গণ্য হবে না।

যয়তুন গাছকে কুরআন মজীদেও মুবারক বলা হয়েছে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে- من شجرة مباركة زيتونة তবে কথা হল, যয়তুন গাছ মুবারক বা বরকতময় কেন? এ প্রসঙ্গে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন।

- কেউ কেউ বলেছেন, যয়তুন গাছ যেহেতু শাম দেশে হয়, তাই তাকে মুবারক বলা হয়েছে। কেননা শামের যমীন বরকতময়। সেখানে সত্তরজন রাসূলুল্লাহ প্রেরণ করা হয়েছিল।
- কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, বরকতময় বলা হয়েছে এ জন্য যে, যয়তুন গাছে অনেক উপকারিতা রয়েছে। আবু নাঈম বর্ণনা করেন, এর মধ্যে সত্তরটি ব্যাধির চিকিৎসা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল কুষ্ঠরোগ।
- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এর প্রতিটি অংশই উপকারী। তার তেল জ্বালানির কাজে আসে। খাওয়ার কাজে আসে। দাবাগতের কাজে আসে এবং ইন্ধন জ্বালানোর কাজে আসে। এমনকি তার পুড়ে যাওয়া ছাইও উপকারী। কেননা রেশম ধোয়ার কাজে তা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে, যয়তুন গাছ অনেক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। চল্লিশ বছর পর তার ফল আসে। এক হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচে। (খাসায়েলে নববী)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوْكِ ص۔٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২. গোলামের সাথে আহার করা

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَفَى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهُ اِيَّاهَا

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاَبُوْ خَالِدٍ وَالِدُ اِسْمٰعِيْلَ اِسْمُهُ سَعْدٌ

৬৯. নাসর ইবনে আলী রহ......... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারও খাদিম যখন তার খাদ্য প্রস্তুতের বেলায় গরম ও ধূয়াঁর ব্যাপারে তার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে তখন সে যেন ঐ খাদিমের হাত ধরে নিজের সঙ্গে খেতে বসায়। খাদিম যদি বসতে না চায়, তবে সে যেন এক লোকমা নিয়ে তাকে তা খাইয়ে দেয়। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ইসমাঈল রহ.-এর পিতা আবূ খালিদ রহ.-এর নাম হল সা'দ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يخبرهم ذالك ঃ কোন কোন কপিতে আছে, بذالك এ শব্দটি এখানে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।

خادمه ঃ পেশ সহকারে। خادم শব্দটি নারী-পুরুষ, গোলাম-বাঁদি উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

طعامه ঃ অর্থাৎ যখন তোমাদের কোন খাদেম তার খাদ্য তৈরী করে এবং কষ্ট বরদাশত করে।

حره ودخانه ঃ যবর সহকারে। এটি طعامه থেকে بدل হয়েছে। السيد হতে পারে অথবা الخادم ও হতে পারে। দ্বিতীয়টি অধিক যুক্তিযুক্ত। (তুহফাহ)

গোলাম-বাঁদি, চাকর-বাকর যারা খানা পাকায় অথবা বিভিন্ন সেবা-যত্ন করে, তাদেরকেও নিজেদের সাথে খানাতে শরীক করা উচিত।এ নির্দেশই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত হাদীসে দিয়েছেন। তবে নির্দেশটি ওয়াজিবের জন্য নয় বরং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া হয়েছে। তাই এর উপর আমল করা মুসতাহাব। আল্লামা নববী রহ. বলেন, এ হাদীসে উত্তম চরিত্র ও সহমর্মিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা করা হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ اِطْعَامِ الطَّعَامِ ص۔٧

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩. খাদ্য খাওয়ানোর ফযীলত

حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاضْرِبُوا الْهَامَ تُوْرَثُوا الْجِنَانَ

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَاَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشَةَ وَشُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ اَبِيْهِ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِى هُرَيْرَةَ

৭০. ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সালামের প্রসার ঘটাও, অন্যকে খানা খাওয়াও, কাফিরদের মাথায় আঘাত কর, আর তোমরা জান্নাতের ওয়ারিছ হও।এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে উমর, আনাস, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আবদুর রহমান ইবনে আয়েশা, শুরাইহ ইবনে হানী তার পিতা হানী রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা রাযি. -এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাসান, সহীহ ও গরীব।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৭১. হান্নাদ রহ......... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রহমানের ইবাদত কর। অন্যদের খানা খাওয়াও। সালামের প্রসার ঘটাও। ফলে শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

افشوا السلام ঃ অর্থাৎ সালামের প্রচার-প্রসার ঘটাও। সবাইকে সালাম দাও। চেনা-জানা ও পরিচিত জনের সাথে বিশেষিত রেখ না।

اطعموا الطعام ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যাকাতের ওয়াজিবের পর্যায় থেকে আরও অতিরিক্ত পানাহার করানো।

اضربوا الهام ঃ শব্দটি هامة (তাশদীদবিহীন) এর বহুবচন। এর অর্থ হল, মস্তকের উপরিভাগ।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি নেককাজের হেদায়াত দিয়েছেন। তৎসঙ্গে যে ব্যক্তি এগুলো পালন করবে, তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

এক. আল্লাহর তা'আলার ইবাদত। এটা বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার। মূলতঃ মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্যও এটি।

দুই. অপরকে আহার করানো। অর্থাৎ মিসকীন বান্দাকে সদকা এবং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দিবে। ইখলাস ও মহত্বের সাথে দান করবে। মূলতঃ এর মাধ্যমে প্রেম-ভালবাসা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে কৃপণতা এমন এক বদস্বভাব, যা মানুষকে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে। সুতরাং এ নেককাজটি কৃপণতার চিকিৎসাও বটে।

তিন. সালামের প্রচার ও প্রসার ঘটাবে। সালাম দ্বারা বিনয় সৃষ্টি হয়। এটি অহঙ্কারের প্রতিষেধক। তাছাড়া এটি ইসলামের নিদর্শন এবং আল্লাহ তা'আলার শেখানো দু'আও বটে। এ তিনটি নেককাজ করলে জান্নাত পাবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ الْعَشَاءِ ص٧

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪. রাতের খাবারের গুরুত্ব

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلَّاقٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ فَاِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ ، هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَعَنْبَسَةُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَلَّاقٍ مَجْهُوْلٌ

৭২. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ......... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক মুঠো রদী খেজুর হলেও রাতে কিছু খাবে। রাতে আহার না করা বার্ধক্যের কারণ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি মুনকার।

এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই। আম্বাসা হাদীসের ক্ষেত্রে যঈফ বলে বিবেচিত। আর আবদুল মালিক ইবনে আল্লাক অজ্ঞাত ব্যক্তি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

العشاء ঃ শব্দটি سماء এর ওযনে। বহুবচন أعشية অর্থ– নৈশভোজন, সন্ধ্যা বা রাতের খাবার।

حشف (بفتحتين) ঃ অর্থ, নিকৃষ্ট খেজুর বা শুষ্ক বাজে খেজুর। অর্থাৎ রাতের খাবারের অভ্যাস বজায় রাখবে, যদিও সামান্য জিনিস দ্বারা হয়।

مهرمة ঃ মানাবী বলেন– مهرمة بفتح الميم والراء أي مظنة للضعف والهرم অর্থাৎ مهرمة মীম এবং রা যবর সহ। অর্থ, দুর্বলতা ও বার্ধক্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ ص٧

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫. খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ قَالَ اُدْنُ يَابُنَيَّ فَسَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ ،

وَقَدْ رَوٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْ وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِيْ رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَأَبُوْ وَجْزَةَ السَّعْدِيُّ إِسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ

৭৩. আবদুল্লাহ ইবেন সাব্বাহ হাশিমী রহ....... উমর ইবনে আবূ সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যান। তাঁর সামনে তখন খানা ছিল। তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস! কাছে এস, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও। আর তোমার কাছ থেকে খাবে।

এ হাদীসটি হিশাম ইবেন উরওয়া.... আবূ ওয়াজযা সা'দী...... মুযায়না কবীলার জনৈক ব্যক্তি..... উমর ইবনে আবূ সালামা রাযি. সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। হিশাম ইবনে উরওয়া রহ.-এর শিষ্যরা এ হাদীসটির বর্ণনায় মতবিরোধ করেছেন। আবূ ওয়াজযা সা'দী রহ.-এর নাম হল ইয়াযীদ ইবনে উবায়দ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سَوِيَّةَ أَبُوْ الْهُذَيْلِ قَالَ ثنى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِكْرَاشٍ عَنْ أَبِيْهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ بَعَثَنِيْ بَنُوْ مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَدِمْتُ (عَلَيْهِ) الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ إِلٰى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ فَأُتِيْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيْرَةِ الثَّرِيْدِ وَالْوَذْرِ فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ بِيَدِيْ فِيْ نَوَاحِيْهَا وَأَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى يَدِيْ الْيُمْنٰى ثُمَّ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أُتِيْنَا بِطَبَقٍ فِيْهِ أَلْوَانُ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ شَكَّ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَجَالَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أُتِيْنَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ

كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ هَذَا الْوُضُوْءُ مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفَضْلِ وَقَدْ تَفَرَّدَ الْعَلَاءُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ

وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ

৭৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার ....ইকরাশ ইবনে যুয়াইব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুররা ইবনে উবাইদ গোত্রের লোকেরা তাদের ধন-সম্পদের যাকাতসহ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পাঠায়। আমি মদীনায় গিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি তাঁকে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি আমার হাত ধরে উম্মু সালামা রাযি. এর ঘরে নিয়ে যান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোন খাবার আছে কি ? আমাদের সামনে একটি বড় পেয়ালা আনা হল। এর মধ্যে গোশতের টুকরা ও সারীদ (ঝোলে ভিজানো রুটি) ভর্তি ছিল। আমরা তা থেকে খেতে লাগলাম। আমি পাত্রের এদিক-সেদিক থেকে নিয়ে খাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সামনে থেকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি তার বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরে বলেন, হে ইকরাশ! এক জায়গা থেকে খাও। কেননা সম্পূর্ণটাই একই খাদ্য। অতঃপর আমাদের সামনে আরেকটি পেয়ালা আনা হল। এর মধ্যে বিভিন্ন রকম কাঁচা-পাকা খেজুর ছিল। আমি আমার সামনে থেকে খেতে থাকলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রের এদিক সেদিক থেকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, হে ইকরাশ! তুমি পাত্রের যে কোন স্থান থেকে খেতে পার। কেননা সব খেজুর এক রকম নয়। অতঃপর আমাদের জন্য পানি দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উভয় হাত ধুইলেন এবং ভিজা হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল, দুই হাত ও মাথা মুছলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আকরাশ! আগুন যে জিনিস পরিবর্তন করে দিয়েছে (তা খাওয়ার পর) এটাই হল উযু । **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি গরীব।

আমরা কেবল আলা ইবনুল ফাদলের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তিনি এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি ছাড়া ইকরাশ রাযি. থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি না তা আমাদের জানা নেই। এ হাদীসে আরও বিবরণ আছে।

حدثنا ابو بكر محمد بن ابان حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائى عن بديل بن ميسرة العقيلى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ اذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله فان نسى فى اوله فليقل باسم الله فى اوله اخره وبهذا الاسناد عن عائشة قالت كان النبى ﷺ يأكل طعاما فى ستة من اصحابه فجاء اعرابى فاكله بلقمتين فقال رسول الله ﷺ اما انه لوسمى كفاكم هذا حديث حسن صحيح

৭৫. আবু বকর ....আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খাওয়া শুরু করে তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। যদি সে আহারের প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে যেন বলে, "বিসমিল্লাহ ফী আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি" (এর শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে)। একই সনদে আয়েশা রাযি. থেকে আরও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহাবাকে নিয়ে আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে উপস্থিত হল। সে দুই গ্রাসেই সব খাবার সাবাড় করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি সে 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করত, তবে এ খাবারই তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হত। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। উম্মু কুলসুম রহ. হলেন আবু বক্‌র সিদ্দীক রাযি. এর পুত্র মুহাম্মদের কন্যা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ابو سلمة ঃ হযরত আবু সালমা রাযি.। এটি কুনিয়ত। নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আসাদ কুরাইশী, মাখযুমী। একদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ ভাই, অপরদিকে তাঁর ফুফু বাররাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামার পূর্ব স্বামী। হাদীস বর্ণনাকারী উমর ইবনে সালামা তাঁরই ছেলে। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে দশজনের পরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধাভিযানে শরীক ছিলেন। হিজরী ৪র্থ সালে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তিনি নাম অপেক্ষা কুনিয়াতে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিধবা স্ত্রীর মন জয়ের উদ্দেশ্যে তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলে উমর ইবনে সালামা তখন কম বয়স্ক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছেন। তিনি বলেন, শৈশবে যখন রাসূলুল্লাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিজের সাথে একই পাত্রে খানা খাওয়াতেন, তখন আমার হাত পাত্রের সব দিকে ঘুরতো। তখন রাসূলুল্লাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিলেন যে, বিসমিল্লাহ পড়ে খানা খাবে এবং ডান হাতে খাবে। নিজের সামনে থেকে খানা খাবে। আবার অন্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, বিভিন্ন প্রকারের খাবার বা ফল-ফ্রুট হলে নিজের দিক ছাড়া অন্য দিক থেকে খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হল, সাথী যেন অপছন্দ না করেন। (তুহফা)

عكراش بن ذويب ঃ ইকরাশ ইবনে যুয়াইব তামীমী রাযি.। সল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী একজন সাহাবী। একশ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁকে বসরাবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁর নিকট হতে তাঁর পুত্র উবায়দুল্লাহ রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি তাঁর গোত্রের সদকা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন। عكراش শব্দে ع এ যের, ك সাকিন, এরপর ر, শেষ হরফ ش । (আসমাউর -রিজাল)

খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব না সুন্নাত ?

খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া আহলে হাদীসের নিকট ওয়াজিব। তারা দলীলস্বরূপ বলেন, হাদীসের মধ্যে 'বিসমিল্লাহ'র বিধানটি صيغه امر এর সাথে এসেছে। والامر للوجوب হিসাবে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব।সকিন্তু জমহূর ফুকাহায়ে কিরামের মতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্‌তাহাব। আর হাদীসে উল্লেখিত صيغه امر এখানে ওয়াজিবের জন্য নয় বরং মুস্‌তাহাবের জন্য। অনুরূপভাবে খানার শেষে الحمد لله পড়াও মুসতাহাব।

উলামায়ে কিরাম বলেন, বিসমিল্লাহ একটু উচ্চস্বরে বলবে। যাতে অন্যান্য লোকজনও সতর্ক হতে পারে এবং 'বিসমিল্লাহ' পড়তে পারে। এ বিসমিল্লাহ জুনূবী (যাদের গোসল করা ফরয) এবং ঋতুবর্তী মহিলাও বলতে পারবে।

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, যদি একাধিক লোক একসঙ্গে খাবার খায় তখন তাদের মধ্যে একজন 'বিসমিল্লাহ' বললে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে অধিকাংশ উলামার নিকট ঐ একজনের জন্য বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। তাই একজন বললে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে খাবার জিনিসের মাত্য পানীয় দ্রব্য পান করার পূর্বেও বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। যেসব জিনিস পানাহার করা শরী'আতের দৃষ্টিকোণে হারাম কিংবা মাকরূহ, সেসব জিনিস পানাহার করার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া যাবে না বরং উদাহরণতঃ কেউ যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে মদপান করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। (মাযাহেরে হক)

খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার রহস্য

আল্লাহর নাম নেওয়া হয় বরকতের জন্য। এ পবিত্র নামের একটা বিশেষ প্রভাব আছে। সুতরাং এ নামের বদৌলতে শয়তানের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উপরন্তু 'বিসমিল্লাহ' বলার মধ্যে এ শিক্ষাও রয়েছে যে, খানার প্রতিটি দানা যা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন– সেই প্রকৃত দানকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

এভাবে আহার করলে –যা মূলতঃ নিছক একটি মানবিক প্রয়োজন তা আল্লাহর বরকতময় নামের ছোঁয়ায় আলোকিত ইবাদতে পরিণত হয়। (মা'আরিফুল হাদীস)

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوْتَةِ وَفِى يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ ص٧

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬. আহারের পর হাতের চর্বি পরিষ্কার না করে রাত কাটানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوْهُ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِىْ يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَاَصَابَهُ شَيْئٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ حَدِيْثِ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৬. আহমদ ইবনে মানী' রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শয়তান অত্যন্ত অনুভূতি সম্পন্ন এবং খুবই লোলুপ। নিজেদের ব্যাপারে তোমরা একে ভয় করবে। হাতে চর্বীর গন্ধ নিয়ে কেউ যদি রাত যাপন করে আর হাতের যদি কোন ক্ষতি হয়, তবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ সূত্রে হাদীসটি গরীব।

সুহায়ল ইবনে আবূ সালিহ – তার পিতা আবূ সালিহ – আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ اَبُوْ بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَاتَ وَفِى يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَاَصَابَهُ شَيْئٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

৭৭. আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বাগদাদী রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হাতে চর্বি নিয়ে যদি কেউ রাত যাপন করে আর তার কোন ক্ষতি হয়, তবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

আ'মাশের রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আলোচ্য হাদীছে কোন্ শয়তান উদ্দেশ্য ?

إن الشيطان الخ ঃ হাদীসের মধ্যে 'শয়তান' দ্বারা প্রকৃত শয়তানই উদ্দেশ্য অথবা নফসে শয়তান বা প্রবৃত্তিও উদ্দেশ্য হতে পারে। কিংবা ইঁদুর, পোকা-মাকড় ইত্যাদিকে 'শয়তান' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা ঘুমন্ত অবস্থায় হাতে চর্বি লেগে থাকলে ইঁদুর, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি আক্রমণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে মুমিন বান্দা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে। আর শয়তান মুমিন বান্দার কষ্ট দেখে খুশি হয়। এজন্য কাজটিকে শয়তানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

اَبْوَابُ الْاَشْرِبَةِ

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায় ঃ পানপাত্র ও পানীয়

بَابُ مَاجَاءَ فِى شَارِبِ الْخَمْرِ صـ٧

অনুচ্ছেদ ঃ ১. মদখোরের সম্পর্কে

حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ دُرُسْتَ اَبُوْ زَكَرِيَّا ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْ مِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعُبَادَةَ وَاَبِى مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوٰى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ

১. ইয়াহইয়া ইবনে দুরুস্ত আবূ যাকারিয়্যা রহ........ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তুই মদ। নেশা উদ্রেককারী সব বস্তুই হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করে এবং এ অভ্যাস নিয়ে সে মারা যায়, আখিরাতে সে তা পান করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবূ মালিক আশ'আরী ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, ইবনে উমর রাযি. বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

নাফি' – ইবনে উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে একাধিকভাবে এটি বর্ণিত আছে। মালিক ইবনে আনাস রহ. এটিকে নাফি' – ইবনে উমর রাযি. সূত্রে মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে মারফূরূপে বর্ণনা করেননি।

اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ثنا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةٌ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلٰوةَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلٰوةَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ صَلٰوةَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ قِيْلَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ قَالَ نَهْرٌ مِنْ صَدِيْدِ اَهْلِ النَّارِ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوٰى نَحْوَ هٰذَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২. কুতায়বা রহ.......... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ পান করে, চল্লিশ দিন ভোর (দিন) পর্যন্ত তার নামায কবূল হয় না। সে তওবা

করলে আল্লাহ তার তওবা কবূল করবেন। সে যদি পুনরায় তা পান করে তবে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ ভোর পর্যন্ত তার নামায কবূল হরবেন না। যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবূল করবেন। আবার যদি সে তা পান করে, তবে চল্লিশ ভোর পর্যন্ত তার নামায কবূল করবেন না। কিন্তু যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবূল করবেন। চতুর্থবার যদি আবার সে তা পান করে তবে চল্লিশ ভোর পর্যন্ত তার নামায কবূল করবেন না এবং তওবা করলেও আল্লাহ আর তা কবূল করবেন না। পরন্তু তাকে "নাহরে খাবাল" থেকে পান করাবেন। ইবনে উমর রাযি. কে বলা হল, হে আবু আবদুর রহমান! নাহরে খাবাল কি? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের পুঁজের নহর।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মদ্যপান হারাম কেন ?

'মদ' হারাম। এটি হারাম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কেননা মদ পানকারীর জ্ঞান-বুদ্ধি বর্তমান থাকে না। যা আল্লাহর এক বিশেষ দান। যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তা'আলার মা'রিফাত লাভ করে। মদ পানের কারণে মানুষ সেই জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে পশুর কাতারে নেমে আসে। কারণ, মানুষ এবং পশুর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী জিনিস হল জ্ঞান-বুদ্ধি। জ্ঞান-বুদ্ধিহীন মানুষ পশুর মত। নিজের উপর যুলুম এবং আত্মঘাতি বস্তু হল এ মদ। এটা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক নিকৃষ্টতম পন্থাও বটে। নেশাখোর মাতাল অবস্থায় অনেক সময় এমন বেহায়াপূর্ণ কাজ করে বসে, যাতে শয়তান অত্যন্ত খুশি হয়। মাতাল মানে শয়তানের এক প্রকার খেলনা। মদের মধ্যে রয়েছে আত্মিক, চারিত্রিক, সামাজিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক অসংখ্য ক্ষতি ও অনিষ্টতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে এক শব্দে বলেছেন, أم الخبائث أو أم الفواحش। অর্থাৎ মদ হল সকল পাপ ও অশ্লীলতার মূল। এজন্য সকল আসমানী শরী'আতে মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। ইসলামী শরী'আতও মদের বিরুদ্ধে কঠোর বিধান প্রণয়ন করেছে।

মদ ও নেশাজাতদ্রব্য; একটি পর্যালোচনা

মদ ও নেশাজাত দ্রব্যের উপকারিতা সম্পর্কে বলা যায়, শরাব পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাবণ্যও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ নগণ্য উপকারীতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য কোন বস্তুতে সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে শারীরিক ক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন- যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত, তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধের মত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। তাদের শরীরের গঠন এত হাল্কা হয়ে যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক শক্তি ও সামর্থের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শরাব লিভার এবং কিডনীকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে। যক্ষা রোগ মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি। ইউরোপের শহরাঞ্চলে যক্ষার আধিক্যের কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান। সেখানকার কোন কোন ডাক্তার বলেছেন, ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যক্ষা। যখন থেকে ইউরোপে মদপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে যক্ষার প্রাদুর্ভাবও দেখা দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে মদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত। সকলেই জানেন, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্থ থাকে, ততক্ষণ তার জ্ঞান-বুদ্ধি কোন কাজই করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানিগণের অভিমত হচ্ছে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে দেয়। যার প্রভাব চৈতন্য ফিরে পাওয়ার পরেও ক্রিয়াশীল থাকে। অনেক সময় এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়।

চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, মদ কখনও শরীরের অংশে পরিণত হয় না। এতে শরীরে রক্তও সৃষ্টি হয় না; রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। কিন্তু হঠাৎ রক্তের এ উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যেসব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দ্রুতগতিতে বার্ধ্যক্য এগিয়ে আসতে থাকে। শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরও প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর মোটা হয়ে যায় এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে। তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে। মধ্যপায়ীদের সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে।

বলা বাহুল্য যে, মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের মধ্যে চঞ্চলতা, স্ফুর্তি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে। ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদের মতামতকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জানা উচিত, মদ এমন একটি বিষাক্ত দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পায়।

মদের আরেকটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং এ শত্রুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে এ অনিষ্টকারিতাই সবচেয়ে গুরুতর। সুতরাং কুরআনুল কারীমের সূরা মায়েদার এক আয়াতে আছে ঃ

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء

"শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।"

শরাবের আরও একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়। যার পরিণাম অনেক সময় অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, তবে তার দ্বারা বেফাঁসভাবে কোন গোপন তথ্য প্রকাশিত হতে পারে। ফলে সারা দেশেই পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

শরাবের আরেকটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়; যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত উপহাস করতে থাকে। কেননা তার কাজ ও চাল-চলন সবই তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরাবের আরও একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, এটি খেয়ানতের মতো। শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দতর কাজে চালিত করে। ব্যভিচার ও নরহত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম। আর এজন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, যেনা ও হত্যাকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি আর রূহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত। যেমন, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া চলে না। অন্য কোন ইবাদত-বন্দেগী বা আল্লাহর যিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্যই কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে– শরাব তোমাদিগকে আল্লাহ স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে।

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটি। যদি কোন এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়, একথা সর্বজনবিদিত। এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের। একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদে জরিপ অনুযায়ী শুধু একটি শহরে শরাবের মোট ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান।

এ হল শরাবের ধর্মীয়, পার্থিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন– ام الفواحش او ام الخبائث। অর্থাৎ 'শরাব সকল মন্দ ও অশ্লীলতার জননী।' এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চিয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। (তাফসীরে আল মানার ঃ মুফতী আবদুহু– ২/ ২২৬)

আল্লামা তানতাবী আল-জাওহারে রহ. এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে–

'ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তাঁর গ্রন্থ 'খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম' –এ লিখেছেন, 'প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য নির্মিত দু'ধারী তলোয়ার ছিল এ 'শরাব'। আমরা আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরী'আত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আজ যাদের ঘরে আমাদের সরবারাহকৃত শরাবের বন্যা বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারবে না।'

✪ জনৈক বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্টাম লেখেন, 'ইসলামী শরী'আতের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হল, ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদের বংশে 'উন্মাদনা' সংক্রমিত হত শুরু করেছে। আর ইউরোপের যেসব লোক এই পানীয়তে চুমুক দিতে শুরু করেছে, তখন থেকে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রিকার লোকদের জন্য যেমন এর নিষেধ করা প্রয়োজন, তেমনি ইউরোপের লোকদের জন্যও এ কারণে কঠিন শাস্তি বিধান করা দরকার।

সারকথা, যে কোন সৎলোক যখনই ঠাণ্ডা মাথায় এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে বলে উঠেছেন, 'এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানী কাজ, এ যে হলাহলে ভরা ধ্বংসের উপকরণ! এ 'উম্মুল খাবায়েস' বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে কাছেও যেও না; ফিরে এসো। فهل انتم تنتهون

প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্যই হারাম

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. বলেন, এটি আভিধানিক কথা নয় বরং বিধানগত কথা। অর্থাৎ নেশার উদ্রেক করে এমন প্রতিটি বস্তুই হারাম। চাই তা কম হোক অথবা বেশি হোক। এটা ইমাম মুহাম্মদ রহ. সহ অন্যান্য সকল ইমামের অভিমত। আর ফতওয়াও এর ওপর। অভিধানে 'মদ' বলা হয়, আঙ্গুর থেকে তৈরি নির্যাস পানীয়কে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমামগণের এ মতবিরোধ ভিটামিন হিসাবে মদ পান করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন মনে করা হবে, মদপানে শক্তি বাড়ে এবং ইবাদতে অধিক শ্রম দেওয়া যায়। আর যদি মদ নিছক নেশা ও রং-তামাশার উদ্দেশ্যে পান করা হয়, তাহলে পরিমাণে তা কম হোক বা বেশি– সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

হযরত ইবনুল মানযূর রহ.বলেন, আঙ্গুরের মদ সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ একমত যে, خمر العنب اذا اشتد و رمت بالزبد অর্থাৎ আঙ্গুরের মদ যদি জ্বালাতে জ্বালাতে গাঢ় হয়ে ফেনার সৃষ্টি করে, তাহলে তা হারাম। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, এ ধরনের মদ কম হোক বা বেশি হোক সবই হারাম, বিধায় পানকারীর উপর 'হদ' ওয়াজিব হবে। কিন্তু আঙ্গুর থেকে প্রস্তুতকৃত মদ ব্যতীত অন্য কিছু থেকে প্রস্তুতকৃত মদ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। আইম্মায়ে ছালাছাহ বরং জমহূরের অভিমত হল, আঙ্গুরের মদের মত যে কোনও মদ কম-বেশি যে কোন পরিমাণই পান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস كل مسكر حرام এ কথাই প্রমাণ করে। শুধু ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে আঙ্গুর ব্যতীত অন্য কোনও ফলমূলের জুস, পানীয় ইত্যাদি যদি নেশা সৃষ্টিকারী পরিমাণ হয়, তাহলে হারাম। আর নেশার উদ্রেককারী পরিমাণ না হলে তা হারাম নয়। কারণ, ভাষাবিদগণ 'মদ' বলতে শুধু আঙ্গুরের মদকেই বুঝেন। ফতওয়া জমহূরের মতের ওপর। অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাদ্রব্য হারাম। চাই তা নেশার উদ্রেক করুক বা না করুক। (মদ ও হারাম পানীয় সম্পর্কে স্ববিস্তার আলোচনা অত্যাসন্ন)

لم يشربها فى الاخرة : কেউ কেউ এর মর্মার্থ সম্পর্কে বলেছেন, মদ্যপ ব্যক্তি শুরুতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারও কারও মতে মদ্যপ ব্যক্তি জান্নাতে মোটেই প্রবেশ করবে না। এ অভিমতটি মূলতঃ এ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি মদকে হালাল মনে করে।

ইমাম নববী রহ. বলেন, বাক্যটির অর্থ হল, এ ব্যক্তি যদি জান্নাতে প্রবেশও করে, তথাপি জান্নাতের পবিত্র পানীয় থেকে সে বঞ্চিত থাকবে। এ অভিমত নিম্নোক্ত হাদীসটির সমর্থন থাকায় শক্তিশালী মনে হয়। যথা–

عن أبي سعيد الخدرى رض مرفوعا: من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الاخرة الخ (رواه الطيالسي وصححه ابن حبان)

উক্ত অভিমতের সমর্থনে (আহমদ– হাসান সনদে বর্ণিত) নিম্নের হাদীসও পেশ করা যায়ঃ

عن ابن عمر رض مرفوعا: من مات من أمتى وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها فى الجنة.

কুরতুবী রহ. বলেন, মদ্যপ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করলেও জান্নাতের পবিত্র পানীয়ের প্রতি তার কোন আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। আর যারা জান্নাতের পবিত্র পানীয় পান করবে, তাদেরকে দেখে হিংসারও উদ্রেক হবে না। এর জন্য তার কোন দুঃখবোধও হবে না। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম)

মদ্যপের নামায কবূল না হওয়ার মর্মার্থ

ولم تقبل له صلوة اربعين صباحا এখানে কবুল হবে না দ্বারা উদ্দেশ্য সাওয়ারের অধিকারী হবে না। অন্যথায় নামাযের ফরযিয়্যাত তো তার থেকে আদায় হয়ে যাবে। কেননা তার ঈমান তো নষ্ট হয়নি। أربعين صباحا চল্লিশ সকালের নামায দ্বারা চল্লিশ ওয়াক্ত নামায উদ্দেশ্য অথবা চল্লিশ দিনের নামায উদ্দেশ্য।

এখানে প্রশ্ন হয়, সকল ইবাদতের মধ্যে কেবল "নামায কবূল হবে না" বলা হল কেন?

এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর রয়েছে। যথা–

(১) নামায أم العبادات তথা সকল ইবাদতের মূল। বিধায় جامع العبادات তথা সকল ইবাদতকে সমন্বয়কারীও। পক্ষান্তরে মদ হল أم الخبائث অর্থাৎ সকল পাপাচারও বদ আমলের গোড়া, তাই جامع الخبائث অর্থাৎ সকল বদ আমলের উদ্রেককারীও। এ বিপরীতমুখী সম্পর্কের কারণেই বলা হয়েছে, নামায কবূল হবে না।

(২) নামায হল, ঈমানের পর افضل العبادات তথা সর্বোত্তম ইবাদত। সর্বত্তোম ইবাদত নষ্ট হয়ে গেলে অন্যান্য ইবাদতও নষ্ট হয়ে যাবে বৈ কি! তাই নামাযের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

তদুপরি প্রশ্ন থেকে যায়, চল্লিশ দিনের কথা কেন বলা হল? এ প্রশ্নেরও একাধিক উত্তর রয়েছে। যথা,

(ক) মদের প্রতিক্রিয়া অন্তরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। যেমন, ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন– নেক-আমল এবং বদ-আমলের প্রভাব চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। কারণ, চল্লিশ দিনের একটা গুরুত্ব আছে।

(খ) واذ واعدنا موسى اربعين ليلة অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ইসলামী শরী'আতে চিল্লা বা চল্লিশ দিনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন, মায়ের পেটে বাচ্চা প্রতি চল্লিশ দিন পর পর পরিবর্তন হয়। অনুরূপভাবে আত্মিক মানোয়ন্নের জন্য সূফীগণের চল্লিশ দিনের চিল্লা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তওবা কবুল না হওয়ার অর্থ

চতুর্থবার তওবা কবূল না হওয়ার অর্থ হল, বারবার মদ পান করার কারণে তওবারই তাওফীক হয় না। অথবা বাক্যটি সতর্কতা স্বরূপ বলা হয়েছে। কেননা বান্দা যত গুনাহই করুক আল্লাহর দরবারে খালেছভাবে তওবা করলে তিনি কবূল করেন।

بَابُ مَاجَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍحَرَامٌ ص٨

অনুচ্ছেদ ঃ ২. নেশা সৃষ্টিকারী সব কিছুই হারাম

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى الْاَنْصَارِيُّ ثنا مَعْنٌ ثنا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

৩. ইসহাক ইবনে মূসা আনসারী রহ....... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মধু দ্বারা প্রস্তুতকৃত মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী সকল পানীয়ই হারাম।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَا ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَرض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ مُوْسٰى وَالْاَشَجِّ الْعُصَرِيِّ وَدَيْلَمَ وَمَيْمُوْنَةَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ الْبَشِيْرِ وَمُعَاوِيَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَاُمِّ سَلَمَةَ وَبُرَيْدَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقُرَّةَ الْمُزَنِيِّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَكِلَاهُمَا صَحِيْحٌ وَرَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

৪. উবায়দ ইবনে আসবাত ইবনে মুহাম্মদ কুরাশী ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ রহ....... ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।

এ বিষয়ে উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, আবূ সাঈদ, আসূ মূসা, আশাজ্জ উসারী, দায়লাম, মায়মূনা, আয়েশা, ইবনে আব্বাস, কায়স ইবনে সা'দ, নু'মান ইবন বাশীর, মু'আবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল, উম্মে সালামা, বুরায়দা, আবূ হুরাইরা, ওয়াইল ইবনে হুজর ও কুররা মুযানী রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

আবূ সালামা – আবূ হুরাইরা রাযি.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। উভয় রিওয়ায়াতই সহীহ। একাধিক রাবী এটিকে মুহাম্মদ ইবনে আমর– আবূ সালাম – আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ সালামা -ইবনে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তা বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

البتع ঃ (বা বর্ণে যের, তা সাকিন) মধুর নাবীয। মধুর সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি মিলিয়ে ফেনা আসা পর্যন্ত জ্বাল দিলে এ নাবীয তৈরী হয়। আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা গেল, যে জিনিস পানাহার করলে নেশার উদ্রেক হয়, সে জিনিস হারাম। জমহূরের মত এটাই এবং এর উপরই ফতওয়া।

كل مسكرحرام ঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে جوامع الكلم এবং خواتم الكلم। তথা অল্প কথায় সর্বাঙ্গীন সুন্দর সিদ্ধান্তমূলক কথা বলার যোগ্যতা-সম্পন্ন করে পাঠিয়েছিলেন। এ হাদীসটিও তারই অংশ বিশেষ।

بَابُ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ صـ٨

অনুচ্ছেদ ঃ ৩. নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যের সল্প পরিমাণও হারাম

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثنا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَسْكَرَكَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَخَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ

৫ . কুতায়বা রহ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে বস্তুর বেশী পরিমাণ নেশা উদ্রেক করে, তার কম পরিমাণও হারাম। এ বিষয়ে সা'দ, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে উমর এবং খাওওয়াত ইবনে জুবায়র রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন**, জাবির রাযি. এর হাদীসটি রিওয়ায়াত হিসাবে হাসান ও গরীব।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ ح وثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا اَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْأُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ قَالَ اَحَدُهُمَا فِى حَدِيْثِهِ اَلْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ اَبِى سُلَيْمٍ وَالرَّبِيْعُ ابْنُ صَبِيْحٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ الْاَنْصَارِيِّ نَحْوَرِوَايَةِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ وَاَبُوْ عُثْمَانَ الْاَنْصَارِىُّ اِسْمُهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ وَيُقَالُ عُمَرُ بْنُ سَالِمٍ

৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার ও আবদুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া রহ....... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম। যে বস্তুর মটকা পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে এর হাতের তালু পরিমাণ বস্তুও হারাম। মুহাম্মদ ইবনে বাশশার ও আবদুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া রহ.বলেছেন, এর এক ঢোক পরিমাণও হারাম। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন**, এ হাদীসটি হাসান।

লাইস ইবনে আবূ সুলাইম এবং রাবী ইবনে সাবীহ রহ.ও এটিকে আবূ উসমান আনসারী রহ. থেকে মাহদী ইবনে মায়মূন রহ.-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ উসমান আনসারী রহ. এর নাম হল আমর ইবনে সালিম। উমর ইবনে সালিম বলেও কথিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মাদকদ্রব্য কি পরিমাণ হারাম ?

নেশাদ্রব্য এবং মাদকদ্রব্য সামান্য পরিমাণও কি হারাম ? জমহূর এর মতে অল্প পরিমাণও হারাম। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে চারটি হারাম পানীয় (আঙ্গুরের মদ, তিলা, খেজুরের নাবীয, কিসমিসের নাবীয) ব্যতীত অবশিষ্ট সকল এ্যালকোহলযুক্ত পানীয় নেশা সৃষ্টি করে পরিমাণ হারাম। স্বল্পমাত্রা হারাম নয়। কিন্তু জমহূরের কথাই অগ্রাধিকারযোগ্য। আহনাফ -এর ফতওয়াও এটাই। (তাকমিলা ঃ ৩, শামী ঃ ১০/৩৬)

ماسكر الفرق : ر এর উপর যবর ও জযম উভয়টি হতে পারে। তবে যবর হল প্রসিদ্ধতম। এটি একটি নির্ধারিত পরিমাপক। যাতে ষোল রতল ধরে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা হচ্ছে যখন ر এর উপর যবর হবে। পক্ষান্তরে ر এর উপর জযম হলে এর অর্থ হবে ১২০ রতল।

فملأ الكف : আল্লামা ত্বীবী রহ. বলেন, এখানে 'ফারাক ও অঞ্জলীপূর্ণ দ্বারা উদ্দেশ্য হল কম-বেশী বুঝানো। নির্ধারিত পরিমাণ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। পূববর্তী হাদীস দ্বারা একথার সমর্থন মিলে।

احدهما : মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার ও আব্দুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া রাযি.।

الحسوة : এক ঢোকে যে পানি পান করা হয়। পক্ষান্তরে ح এর উপর যবর হলে অর্থ হবে, একবার পান করা।

بَابُ مَاجَاءَ فِى نَبِيْذِ الْجَرِّ صـ٨

অনুচ্ছেদ ঃ ৪. মাটির কলসের নাবীয

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثنا ابْنُ عَلِيَّةَ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالاَ ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاؤُسٍ اَنَّ رَجُلًا اَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ طَاؤُسٌ وَاللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ اَبِىْ اَوْفَى وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَسُوَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৭. আমহদ ইবনে মানী' রহ........ তাউস রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনে উমর রাযি. এর কাছে এসে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সবুজ কলসের নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাউস রহ. বলেন, আল্লাহর কসম, আমি ইবনে উমর রাযি. থেকে এ কথা শুনেছি।

এ বিষয়ে ইবনে আবী আওফা, আবূ সাঈদ, সুওয়াইদ, আয়েশা, ইবনে যুবাইর ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

جر শব্দটি جرة এর বহুবচন। নিহায়াহ গ্রন্থে এসেছে– الجر والجرار جمع جرة وهو الإناء المعروف من الفخار، কামূসুল মানার গ্রন্থে جرة এর অর্থ লেখা হয়েছে, মদের সোরাহি, কলম, মটকা ইত্যাদি। খেজুর, মোনাক্কা অথবা আঙ্গুর যদি পানিতে এ পরিমাণ সময় ভিজিয়ে রাখা হয় যে, পানির মধ্যে ভেজানো ফলের কিছুটা স্বাদ ও মিষ্টতা চলে আসে কিন্তু তার মধ্যে মাদকতা না আসে, তাহলে এ পানীয়কে 'নাবীয' বলা হয়। আরবদেশে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও এটি পান করতেন। এ 'নাবীয' সকলের মতে হালাল। অবশ্য তাতে মাদকতা চলে এলে পান করা নিষেধ।

আলোচ্য হাদীসে মদের পাত্রে 'নাবীয' তৈরী করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এর দুটি কারণ।

(১) মদের পাত্রে নাবীয ভেজালে মাদকতা চলে আসে।

(২) এসব পাত্র শুধু মদের জন্য নির্দিষ্ট বলে এগুলোতে 'নাবীয' তৈরী করা নিষেধ। যেন মদের সাথে নাবীযের কোনও সাদৃশ্যতা না থাকে এবং মদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। যেহেতু মদ তৎকালীন মানবসমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই মদের পাত্রগুলো যেন বেকার পড়ে না থাকে, এজন্য উক্ত হুকুম রহিত করা হয়েছে। যেমন, মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে মদের পাত্রে নাবীয তৈরী না করার জন্য বলেছিলাম। এখন তোমরা এসব পাত্রে নাবীয বানাতে পার। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, নাবীযে যেন মাদকতা সৃষ্টি না হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَّةِ اَنْ يُنْبَذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِوَالْحَنْتَمِ ص۸

অনুচ্ছেদ ঃ ৫. লাউয়ের খোলে ও খেজুর কাণ্ডে তৈরী পাত্রে নবীয নানানো প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثنا اَبُوْ دَاؤُدُ الطَّيَالِسِيُّ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُوْلُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَوْعِيَةِ وَاَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ وَهِيَ الْجَرَّةُ وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَنَهَى عَنِ النَّقِيْرِ وَهِيَ اَصْلُ النَّخْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا ، يُنْسَجُ نَسْجًا وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَاَمَرَ اَنْ يُنْتَبَذَ فِى الْاَسْقِيَةِ

وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ وَسَمُرَةَ وَاَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَمَيْمُوْنَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৮. আবূ মূসা মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না রহ........ যাযান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্ পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আপনি মাতৃভাষায় তা ব্যক্ত করুন এবং আমাদের ভাষায় তা ব্যাখ্যা করে দিন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হানতাম অর্থাৎ সবুজ কলস, দুব্বা অর্থাৎ লাউয়ের খোল, নাকীর অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে গর্ত করে নির্মিত পাত্র। মুযাফফাত অর্থাৎ আলকাতরা লাগানো পাত্র (নবীযের জন্য) ব্যবহার নিষেধ করেছেন। তিনি মশ্‌কে নবীয বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ বিষয়ে উমর, আলী, ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদ, আবূ হুরাইরা, আবদুর রহমান ইবনে ইয়া'মুর, সামুরা, আনাস, আয়েশা, ইমরান ইবনে হুসাইন, আইয ইবনে আমর, হাকাম গিফারী এবং মায়মূনা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

الدباء ঃ (দালে পেশ, বা-তে তাশদীদ) অর্থ, শুষ্ক কদু, লাউ। এটা মদ তৈরীর পাত্র হিসাবে বিশেষভাবে ব্যবহৃত করা হত।

النقير ঃ শব্দটি فعيل এর ওযনে نقر ينقر ن نقرا এর ইসমে মাফউল। অর্থ, গর্তকৃত, খোদাইকৃত, গর্ত গহবর, বৃক্ষকাণ্ড ইত্যাদি। পরিভাষায় نقير ঐ পাত্রকে বলা হয়, যা বৃক্ষকাণ্ড বা বৃক্ষমূল ইত্যাদি খোদাই করে তৈরি করা হয়। আরবরা সাধারণতঃ খেজুর গাছের গোড়া দিয়ে এক ধরণের মদ তৈরীর পাত্র বানাত।

الحنتم ঃ হা-তে যবর, নূন সাকিন, তা-এ যবর মদের সবুজ সোরাহি বা সবুজ কলসি। কেউ কেউ বলেছেন, মদ বানানোর সব ধরনের পাত্রকে حنتم বলা হয়।

المرفت ঃ আলকাতরা ইত্যাদি দ্বারা প্রলেপ যুক্ত মদের পাত্র। একে মুকীরও বলা হয়।

একটি ঐতিহাসিক বিধান ও তার প্রেক্ষাপট

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমণের পূর্বে আরবের মধ্যে মদের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তারা মদ দ্বারা ক্ষণিক আনন্দ ও উল্লাস অনুভব করত। উপরন্তু তাদের সমাজে মদ ছিল সভ্যতা ও ভদ্রতার নিদর্শন। ধনী লোকেরা মদ পান করে মাতাল ও উন্মাদ হয়ে সম্পদ বিলাত। এ মদ ছিল তাদের বদান্যতা ও উদারতার নিদর্শন। মদ

পান না করা ছিল তাদের কাছে বুখল ও কৃপনতার নিদর্শন। মোটকথা, মদ ছিল তাদের আভিজাত্যের প্রতীক। তাই ঘরে ঘরে মদের হরেক রকম পাত্র লুটোপুটি খেত।

অপরদিকে ইসলামী শরী'আতের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে বুঝা যায়, ইসলামী শরী'আত বিধান প্রনয়নের সময় মানুষের মন-মেযাজের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। যাতে মানুষ সহজেই সেই বিধান গ্রহণ করতে পারে। ইসলামী বিধানের এ হেকমত ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দাবী মতে মদ হারাম হওয়ার বিধানটি ধীরে ধীরে এবং পর্যায়ক্রমে আসে। এক পর্যায়ে যখন মানুষের অন্তরে মদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং মদ থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা তাদের মধ্যে চলে আসে, তখন ইসলামী শরী'আত মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ঘোষণা করে, মদ হারাম। পাশাপাশি ইসলামী শরী'আতের এ বিধান মনে-প্রাণে গ্রহণ করার সুবিধার্থে 'মদের পাত্র' ব্যবহারও নিষেধ করে দেওয়া হয়। যেন ঈমানদারের হৃদয়ে সমস্ত পাপের মূল এ মদের প্রতি এমন ঘৃণা তৈরী হয়, যা আর কোন দিন দূর হওয়ার নয়। আলোচ্য হাদীসটিও উক্ত প্রেক্ষাপটের আলোকেই বলা হয়েছে।

এখানে চার ধরনের মদের পাত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যেগুলোতে নাবীয বানানো নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নিষেধাজ্ঞা ছিল, একটি সাময়িক কৌশল। কারণ, এ ধরনের পাত্রে নাবীয বানালে এ নাবীযে মাদকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পাত্র দেখে মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষের অতীত স্মৃতি স্মরণ হওয়া এবং মদের প্রতি পুনরায় আকর্ষণ সৃষ্টিরও সম্ভাবনা ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদের পাত্র ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন। অবশেষে একটা পর্যায় এমন আসল যে, মদের প্রতি মানুষের চরম ঘৃণা সৃষ্টি হল। যা আর দূর হওয়ার নয়। তখন সেই সাময়িক নিষেধাজ্ঞা তিনি প্রত্যাহার রহিত করে মদের পাত্রগুলো সাধারণ পাত্র হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিলেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ اَنْ يَنْتَبِذَ فِى الظُّرُوْفِ ص-٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৬. সব ধরনের পাত্রে নবীয তৈরীর অনুমতি দান

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالُوْا ثنا اَبُوْ عَاصِمٍ ثنا سُفْيٰنُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوْفِ وَاِنَّ ظَرْفًا لَايُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার, হাসান ইবনে আলী ও মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ....... সুলায়মান ইবনে বুরায়দা তার পিতা বুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। বস্তুতঃ পাত্র কোন জিনিসকে হারামও করে না; হালালও বানায় না। নেশাকর সবকিছুই হারাম।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا اَبُوْ دَاؤُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيٰنَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوْفِ فَشَكَتْ اِلَيْهِ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالُوْا لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ قَالَ فَلَا اِذًا ، وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَهٰذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১০. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছিলেন। তখন আনসাররা এ বিষয়ে তাঁর কাছে কিছু অসুবিধা তুলে ধরেন। তারা বললেন, আমাদের তো আর কোন পাত্র নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে এগুলো নিষিদ্ধ নয়।

এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংক্রান্ত আরও কিছু সিদ্ধান্ত সাময়িক কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই মদের পাত্র অন্য কাজে ব্যবহার করা বর্তমানে নাজায়িয হবে না। তবে ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক রহ. বলেন, বর্তমানেও মদের পাত্রে নাবীয ইত্যাদি তৈরি করা মাকরূহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاَنْتِبَاذِ فِى السِّقَاءِ ص۹

অনুচ্ছেদ ঃ ৭. মশকে নবীয তৈরী

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سِقَاءٍ يُوْكَا اَعْلَاهُ لَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً وَيَشْرِبُهُ غُدْوَةً

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِهٰذَا الْوَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَيْضًا

১১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না রহ......... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মশকে নাবীয তৈরী করতাম। এর উপরের দিকটি ফিতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। এর একটি ছিদ্র ছিল। সকালে নাবীয করলে তিনি বিকালে তা পান করতেন। আর বিকালে নবীয করলে তিনি ভোরে তা পান করতেন। এ বিষয়ে জাবির, আবূ সাঈদ ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব।

এ সূত্র ছাড়া ইউনুস ইবনে উবায়দ রহ.-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এ হাদীসটি আয়েশা রাযি. থেকে অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كنا ننبذ ঃ ب এর নীচে শুধু যের আর প্রথম ن এর উপর শুধু পেশই হবে। ب এর উপর তাশদীদ নেই। النبذ। অর্থ, ছুঁড়ে মারা। নিক্ষেপ করা।

عزلاء ঃ এখানে عزلاء দ্বারা উদ্দেশ্য, মশকের মুখ। যে মুখ নিচের দিক থেকে থাকত। ঐ মশকের দুটি মুখ ছিল। (১) যেটি উপরের দিকে বেঁধে রাখা হত। (২) যেটি নিচের দিকে থাকত এবং খুলে পান করা হত।

ننبذغدوة ঃ সকালের নাবীয সন্ধ্যায় এবং সন্ধ্যার নাবীয সকালে পান করা হত গ্রীষ্মের মৌসুমে। যে হাদীসে তিন দিন পর্যন্ত নাবীয ভেজানোর কথা এসেছে, তা হত শীত মৌসূমে।

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল, নাবীয হালাল ও পবিত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তা পান করতেন। আবু দাউদ ইত্যাদির হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুর, খেজুর ইত্যাদির মিশ্র জিনিসের নাবীযও পান করতেন। এতে প্রমাণিত হল, মিশ্রিত ও অমিশ্রিত সব ধরণের নাবীয জায়েয। তবে এতটুকু সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে যে, তাতে যেন নেশার ভাব সৃষ্টি হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحُبُوْبِ الَّتِى يَتَّخَذُ مِنْهَا الْخَمْرُ ص٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৮. যেসব শস্য দানা দ্বারা মদ তৈরী করা হয়

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثنا اسْرَائِيلُ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১২. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ...... নুমান ইবনে বাশীর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গম থেকে মদ হয়, যব থেকে মদ হয়, খেজুর থেকে মদ হয়, কিসমিস থেকে মদ হয়, মধু থেকেও মদ হয়। এ বিষয়ে আবু হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ نَحْوَهُ وَرَوَى اَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ اِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيثَ

১৩. হাসান ইবনে আলী আল খাল্লাল রহ...... ইসরাঈল রহ. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ হায়্যান আত-তায়মী এ হাদীসটিকে শা'বী – ইবনে উমর – উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, গম থেকে মদ হয়। অনন্তর পুরো রিওয়ায়াতটির তিনি উল্লেখ করেন।

اَخْبَرَنَا بِذٰلِكَ اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ اَبِى حَيَّانِ التَّيْمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا ،وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِبْرٰهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَمْ يَكُنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بِالْقَوِيِّ

১৪. আহমাদ ইবনে মানী' রহ..... উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, গম থেকে মদ হয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এটি ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির রহ.-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ। আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. বলেছেন, ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির শক্তিশালী রাবী নন।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا الْاَوْزَاعِيُّ وَعِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثنا اَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ ، هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ هُوَ الْغُبَرِيُّ اِسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُفَيْلَةَ

১৫. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ........ আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মদ হয় এ দুটি বৃক্ষ থেকে। খেজুর ও আঙ্গুর।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

বর্ণনাকারী আবূ কাসীর সুহায়মী হলেন, উবারী। তাঁর নাম ইয়াযীদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে গুফাইল। শুবা রহ. ইকরিমা ইবনে আম্মার রহ. সূত্রে উক্ত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মদের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ

ইসলামে মদ হারাম। এ ব্যাপারে কারও কোনও মতানৈক্য নেই। তবে তার বিস্তারিত বিবরণে ইমামগণের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ইমামগণের তিনটি উক্তি পাওয়া যায়।

এক. ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ এবং হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মদ রহ. প্রমুখের অভিমত হল, নেশা সৃষ্টিকারী সকল পানীয়কেই মদ বলা হয়। তার কম-বেশী সবই হারাম। পানকারী স্বল্পমাত্রায় পান করলেও তার উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ হবে। যদিও ঐ স্বল্পমাত্রা নেশা সৃষ্টিকারী না হয়। এ মদ সম্পূর্ণ অপবিত্র। এর বেচা-কেনাও হারাম। যে একে হালাল মনে করবে, সে কাফির।

দুই. রাবী'আ এবং দাউদে যাহেরী রহ. এর অভিমত হল, নেশা জাতীয় সকল পানীয়কেই মদ বলা হয়। মদ হারম, তবে অপবিত্র নয়।

তিন. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইবরাহীম নাখঈ রহ. এবং কোন কোন বসরাবাসী আলেমের অভিমত হল, হারাম পানীয় তিন প্রকার। যথা–

(ক) প্রথম প্রকার হারাম পানীয় হল, মদ। যার কম-বেশী সবই হারাম। পানকারী এক ফোটা পান করলেও হদ্দের উপযোগী হবে। এ মদ অপবিত্র। তার বেচা-কেনাও হারাম। যে একে হালাল মনে করবে, সে কাফির। তবে সকল নেশাজাত পানীয় মদ নয় বরং মদ হল, আঙ্গুরের ঐ রস, যাকে জ্বাল দেওয়ার ফলে ঘন হয়ে গেছে এবং ফেনাও সৃষ্টি হয়েছে। (ইমাম আবু ইউসুফের নিকট ফেনা সৃষ্টি হওয়া শর্ত নয়।)

(খ) দ্বিতীয় প্রকার হারাম পানীয় আবার তিন প্রকার। যথা–

(১) طلاء তথা আঙ্গুরের জ্বাল দেওয়া ঘন রস। জ্বাল দেওয়া কারণে যার দুই তৃতীয়াংশ উড়ে গেছে।

(২) نقيع التمر অর্থাৎ খেজুর ভেজানো মিষ্টি পানি, যা এ পরিমাণ সময় পর্যন্ত ভেজানো হয়েছে যে, গরমের কারণে ফেনা বের হয়েছে। আর নেশাও চলে এসেছে।

(৩) نقيع الزبيب অর্থাৎ কিসমিস বা মুনাক্কা ভেজানো পানি, যার মিষ্টতা নির্গত হওয়ার কারণে ঘন রসে পরিণত হয়ে নেশা সৃষ্টি হয়েছে।

উক্ত তিন ধরনের পানীয়ও মদের মত হারাম। কম-বেশি সব হারাম এবং অপবিত্রও। তবে এ দ্বিতীয় প্রকারের পানীয়গুলো যেহেতু প্রথম প্রকারের মত মদের অন্তর্ভুক্ত কি-না-এ ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে, তাই এগুলো স্বল্পমাত্রায় পান করলে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কেননা সন্দেহের কারণে 'হদ্দ' রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে নেশা সৃষ্টি করে পরিমাণ (বেশিমাত্রায়) পান করলে অবশ্যই হদ্দ ওয়াজিব হবে।

সারকথা, দ্বিতীয় প্রকার পানীয়গুলো প্রথম প্রকারের সাথে অনেকটা সাদৃশ্যতা রাখে বিধায় তার কম-বেশি সবই হারাম এবং অপবিত্র। আবার তৃতীয় প্রকারের পানীয়ের সাথেও সাদৃশ্যতা রাখে। বিধায় নেশা সৃষ্টি করে পরিমাণ পান করলে 'হদ্দ' ওয়াজিব হবে এবং স্বল্পমাত্রায় পান করলে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে দ্বিতীয় প্রকারের পানীয়সমূহের বেচাকেনা জায়িয। আর সাহেবাইনের মতে জায়িয নয়।

(গ) তৃতীয় প্রকার পানীয় হল, ঐ সমস্ত নেশাজাত পানীয়, যেগুলো উল্লেখিত প্রকারসমূহের মধ্যে পড়ে না। যেমন, খেজুরের নাবীয, হালকা জ্বাল দেওয়া কিশমিশের রস, আঙ্গুরের জ্বাল দেওয়া রস, মধুর নাবীয, গম-যব জাতীয়

শস্যদানা ইত্যাদির নাবীয। এগুলোর ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর অভিমত হল, এ জাতীয় নেশাজাত পানীয় নেশা সৃষ্টি করে পরিমাণ হারাম। আর নেশা সৃষ্টি করে পারিমাণ না হলে হারাম নয়।

ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রমুখের দলীল

১. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং বসরার আলেমগণ দলীল পেশ করেন ভাষাবিদদের কথা দ্বারা। কারণ, কোন কোন বস্তুর প্রকৃত অর্থ ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আর সকল ভাষাবিদগণ বলেন যে, মদ বলা হয় বিশেষ ধরনের পানীয়কে। যে পানীয় তৈরি করা হয় আঙ্গুরের পাকানো ঘন রস থেকে। যেমন, ইবনে মনযূর বলেন,

حكى ابن منظور فى اللسان عن ابن سيدة انها نكر على من قال ان الخمر قد تكون من الحبوب ورد عليه بقوله واظنه تسمها منه لان حقيقة الخمر انما هى العنب دون سائر الاشياء وعرفه ابن سيد نفسه فى المخصص بقوله الخمر ما اسكر من عصير العنب والجمع خمور

এ কারণেই তো মদ বলতে সাধারণতঃ আঙ্গুর থেকে পান্তুরিত মদকেই বুঝায়। নেশাজাত অন্যান্য পানীয়কে সাধারণতঃ মদ বলা হয় না বরং সেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন– নাবীয, নকী' এবং সাকার।

২. এক হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে, মদ হল আঙ্গুরের নির্যাস। যেমন–

اخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن المسيب مرسلا قال قال النبى ﷺ الخمر من العنب والسكر من التمر والمزر من الذرة والغبيراء من الحنطة والبتع من العسل كل مسكر حرام

৩. এক হাদীসে হযরত ইবনে উমার রাযি. মদকে অন্যান্য নেশাজাত পানীয় থেকে পৃথক করে উল্লেখ করেছেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, সকল নেশাজাত পানীয় মদ নয়। যেমন–

اخرج عبد الرزاق ايضا فى مصنفه عن ابن عمر فى قصة قال اما الخمر فحرام لا سبيل اليها واما سواها من الاشربة فكل مسكر حرام

৪. মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি قطعى তথা সুনিশ্চিত দলীল দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে অন্যান্য নেশাজাত পানীয় হারাম হওয়ার বিষয়টি ظنى তথা ধারণাপ্রসূত দলীল দ্বারা সাব্যস্থ। তাই خمر তথা মদের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। যদ্বারা সেটি অন্যান্য নেশাজাতদ্রব্য থেকে পৃথক হয়ে যায়। সেটা হল, আঙ্গুলের নিংড়ানো রস।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, মদ বলতে শুধু আঙ্গুরের তৈরি মদকেই বুঝায়। আর অন্যান্য নেশাজাত পানীয়কেও মদ বলা হয় রূপক অর্থে; প্রকৃত অর্থে নয়। অবশ্য মুসিলম শরীফের এক হাদীসে এসেছে –

عن انس بن مالك قال كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت طلحة وما شرابهم الا الفضيخ البسر والتمر فاذا مناد ينادى فقال اخرج فانظر فخرجت فاذا مناد ينادى الا ان الخمر قد حرمت قال فجرت فى سكك المدينه فقال لى ابو طلحة اخرج فاهرقها فهرقتها الخ

আর আবু হুরাইরা রাযি. এর হাদীসে এসেছে– الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আঙ্গুরের রস, খেজুরের নাকী, কিসমিসের নাকীও (সংজ্ঞা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) মদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব হারাম ও অপবিত্র হওয়ার দিক থেকে এ তিনটির বিধান মদের বিধানের অনুরূপ। অর্থাৎ এগুলোর কম-বেশি সবই হারাম ও অপবিত্র। তবে এগুলো যেহেতু মদ হওয়া دليل ظنى দ্বারা প্রমাণিত, তাই পানকারীর উপর স্বল্পমাত্রায় পান করার কারণে 'হদ্দ' প্রয়োগ হবে না। কেননা সন্দেহের কারণে 'হদ' রহিত হয়ে যায়।

জমহূরের দলীলসমূহ

এক. عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام

দুই. বুখারী শরীফে এসেছে–

عن ابن عمر انه خطب على منبر رسول الله ﷺ فقال انه قد نزل تحريم الخمر وهى من خمسة اشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خمر العقل (رواه البخارى)

তিন. আবু দাউদ শরীফে এসেছে–

عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله ﷺ ان من العنب خمرا وان من التمر خمرا و ان من العسل خمرا وان من البر خمرا وان من الشعير خمرا

চার. আভিধানিক দিক থেকে خمر (মদ) ব্যাপক অর্থবোধক হওয়া উচিত। কেননা এটি مخامرة العقل তথা জ্ঞান-বুদ্ধি গোপন করা বা ঢেকে দেওয়া থেকে নির্গত। আর তা তো প্রত্যেক নেশাজাত দ্রব্যের মধ্যেই আছে।
-তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম

খমর বা মদ শব্দটি সমস্ত নেশাদ্রব্যকে শামিল করে বলে জমহুর অভিধান দ্বারা যে প্রমাণ পেশ করেছেন তা ঠিক নয়। যেমন, ভাষাবিদগণের উক্তি পেছনে এসেছে। সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে– عن ابن عمر لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شئ

এ উক্তিটিতে প্রমাণিত হয়, অভিধানিকভাবে খমর শব্দের প্রয়োগ কেবল আঙ্গুরের ওপর।

উপসংহার

উপরিউক্ত দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ প্রমুখের নিকট خمر তথা মদ বলতে শুধু আঙ্গুরের রস বুঝায়। যার উপাদান সেটাই। আর অন্যান্য নেশাজাত পানীয়কেও মদ বলা হয়। তবে প্রকৃত অর্থে নয়; রূপক অর্থে। প্রত্যেক নেশাজাত পানীয় কম-বেশি পান করা হারাম। অবশ্য অন্যান্য নেশাজাত পানীয় হারাম হওয়ার বিষয়টি دليل ظنى দ্বারা প্রমাণিত বলে তা পানকারীর উপর 'হদ্দ' ওয়াজিব হবে না।

এ্যালকোহল এবং স্পিরিটের বিধান

এ্যালকোহল এবং স্পিরিট যদি আঙ্গুর, কিসমিস অথবা খেজুর দ্বারা বানানো হয়, তাহলে সকলের মতে অপবিত্র এবং হারাম। অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে এ্যালকোহল এবং স্পিরিট আঙ্গুর ও কিসমিসের রস দ্বারা তৈরী করা হয় না। সুতরাং শায়খাইনের ভাষ্য মতে এগুলো পবিত্র এবং নেশা সৃষ্টি করে পরিমাণ হারাম। তবে ফুকাহায়ে কিরাম যুগের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর কথার উপর ফতওয়া দিয়েছেন।

(আহসানুল ফতওয়া ঃ ২)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ خَلِيْطِ الْبُسْرِوَالتَّمَرِ ص ١٠

অনুচ্ছেদ ঃ ৯. পাকা খেজুর ও কাঁচা খেজুর মিশ্রিত পানীয়

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى اَنْ يَنْتَبِذَ الْبُسْرَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

১৬. কুতায়বা রহ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁচা খেজুর ও পাকা খেজুর এক সাথে দিয়ে নবীয বানাতে নিষেধ করেছেন। **ইমাম তিরমিযী রহ.** বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثنا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمَرِ اَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمَرِ اَنْ يُخْلَطَ

بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الْجِرَارِ اَنْ يَنْتَبِذَ فِيهَا ، وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ وَجَابِرٍ وَاَبِىْ قَتَادَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اُمِّهِ هٰذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৭. সুফইয়ান ইবনে ওয়াকী রহ....... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নবীযের ক্ষেত্রে) কাঁচা খেজুর ও পাকা খেজুর এক সঙ্গে মিলাতে, কিশমিশ ও পাকা খেজুর এক সঙ্গে মিলাতে এবং মাটির মটকায় নবীয বানাতে নিষেধ করেছেন।এ বিষয়ে আনাস, জারির, আবূ কাতাদা, ইবনে আব্বাস, উম্মে সালামা, মা'বাদ ইবনে কা'ব তার মা রাযি. -এর সূত্রেও উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে দুটি বস্তু একসাথে মিলিয়ে নাবীয বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্ন নাবীয বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, দুটি জিনিসকে এক সাথে ভিজিয়ে নাবীয বানালে তাড়াতাড়ি নেশা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা অনেক ক্ষেত্রে মানুষ টেরই পায় না। ফলে অজান্তে হারাম পানীয় পান করার সম্ভাবনা আছে।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ. এর নিকট একাধিক বস্তু একত্রে মিশিয়ে যে নাবীয তৈরি করা হয়, তা নেশাকর না হলেও হারাম। ইমাম শাফিঈ রহ. এর একটি অভিমত এটাই। তাঁরা আলোচ্য হাদীস - عن ابى سعيد نهى رسول الله ﷺ عن البسر এর প্রকাশ্য ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করে এ অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ. এর অভিমত হল, মিশ্রিত নাবীয যদি নেশার উদ্রেককারী হয় তাহলে হারাম। অন্যথায় হারাম নয়। ইমাম শাফিঈ রহ. এরও প্রসিদ্ধ মত এটাই। কারণ, হাদীসেএসেছে– كل مسكر حرام

ইমাম মালেক ও আহমদ রহ. যে দলীল পেশ করেন, তার জবাবে আহনাফ বলেন, মিশ্রিত নিষিদ্ধ নাবীয মূলতঃ তখনই হারাম হবে, যখন তা নেশা সৃষ্টিকারী হবে।

ফতওয়া ঃ মিশ্রিত নাবীয যথা খেজুর ও কিসমিস মিশ্রিত নাবীয, যদি নেশার উদ্রেককারী না হয় তাহলে হালাল। (হেদায়াহ ঃ ৪/৪৯৬, শামী ঃ ১০/৩৪)

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ فِى الشَّرَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলা নিষেধ

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْإِنَاءِ : قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

সহজ তরজমা

ইসহাক ইবনে মনসুর ...... আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রহ. হতে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত, ﷺ ইরশাদ করেন– তোমাদের কেউ যখন পান করে তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীকও তাশরীহ

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, ان النبى ﷺ كان يتنفس فى الاناء ثلاثا এটির সাথে উপরোক্ত হাদীসের বিরোধ রয়েছে। এর উত্তর হল, হযরত আনাস রাযি. এর হাদীসের অর্থ হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনশ্বাসে পানি পান করতেন। প্রত্যেকবার পাত্র মুখ থেকে পৃথক করে নিতেন। বস্তুত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে পাত্রে শ্বাস নিতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এটি তাহযীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতার পরিপন্থী।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِى اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ص ١٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১০. সোনা-রূপার পাত্রে পান করা হারাম

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ اَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَاَتَاهُ اِنْسَانٌ بِاِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ اِنِّى كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَاَبَى اَنْ يَنْتَهِىَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِى اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَقَالَ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَفِى الْبَابِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ وَالْبَرَاءِ وَعَائِشَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ

১৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ......... মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফা রাযি. পানি পান করতে চাইলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি একটি রূপার পাত্রে তাঁর কাছে পানি নিয়ে এল। তিনি তা ছুড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি তাকে এ থেকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু সে এ থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে এবং রেশম ও দীবাজ (একপ্রকার রেশম)-এর কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এ তো তাদের (কাফিরদের) জন্য দুনিয়াতে আর তোমাদের জন্য আখিরাতে। এ বিষয়ে উম্মু সালামা, বারা ও আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ان حذيفة استسقى ঃ অর্থাৎ হুযাইফা রাযি. পানি পান করতে চাইলেন। বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন মাদায়েনে ছিলেন। হযরত উমর রাযি. এর খেলাফতকালে সেখানে তিনি গভর্নর ছিলেন। হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফতকালেও তিনি সেখানের গভর্নর ও যাকাত উসূলকারী ছিলেন। হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাতের পর তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে।

لبس الحرير والديباج ঃ الديباج রেশমের তৈরী পোশাক। কারও কারও মতে الديباج হল, একপ্রকার রেশম। এটি এ নামে বিশেষিত।

فاتاه انسان ঃ বুখারীর বর্ণনাতে আছে, অতঃপর তার নিকট একজন গ্রাম্য লোক আসল। বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর তাকে একজন অগ্নিপুজাক পানি পান করাল। ইবনু হাজার রহ. বলেন, চেষ্টা করেও আমি তার নাম জানতে পারলাম না।

فرماه به ঃ আহমদের রিওয়ায়েতে আছে, যদি আমি তার কাছে দু-একবার না আসতাম, তবে তার সঙ্গে আমি অনুরূপ আচরণ করতাম না। (তাকমিলাহ, তুহফাহ)

ইমামগণের মতে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার

সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা মূলতঃ ধনাঢ্য শ্রেণীর লোকদের অহঙ্কারের নিদর্শন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন। সকল আলেম ও ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা হারাম। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন– ولا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها

অনুরূপভাবে 'মুসনাদে আহমদ' এর একটি হাদীসে আছে–

نهى ان يشرب فى انية الذهب والفضة وان يؤكل فيها

সোনা-রূপার পাত্রে যেমনিভাবে পানাহার করা হারাম, তেমনিভাবে সোনা-রূপার পাত্রে অযূ করা, আতর রাখা এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করাও হারাম।

উল্লেখিত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন পাত্রটি সম্পূর্ণভাবে সোনা-রূপার হবে। যদি অন্য কোন ধাতু দ্বারা তৈরি পাত্রে সোনা-রূপার প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহলে সে পাত্র ব্যবহার করা জায়িয আছে। কিন্তু যদি পাত্রটি স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত হয়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে ঐ পাত্রে পানাহার করা মাকরূহ। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে পানাহারসহ যে কোন কাজে ব্যবহার করা জায়িয। তবে শর্ত হল, মুখ লাগানোর স্থানে সোনা-রূপা থাকতে পারবে না। কেননা কারুকার্যটা মূল পাত্র নয় বরং পাত্রের অনুগামী একটা জিনিস। যা পাত্রকে মজবুত করার লক্ষ্যেও অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। অতএব এ পাত্র পানাহারসহ যে কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে।

(মাযাহেরে হক, হেদায়া ঃ ৪, শামী ঃ ৪/৪৯৫)

نهى عن لبس الحرير والديباج ঃ নারীরা বিনাশর্তে রেশমি কাপড় ব্যবহার করতে পারবে। আর পুরুষরা পারবে চার আঙ্গুল পরিমাণ। যেমন– ফুল, বাটিক প্রভৃতিতে ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে ঐ পোশাকও পরিধান করা জায়িয আছে, যে পোশাকের যমীন, সূতোর এবং লম্বালম্বি রেখা বা নকশা হয় রেশমের। পক্ষান্তরে বস্ত্রের যমীন যদি রেশমি হয় আর লম্বালম্বি রেখা সূতোর হয়, তাহলে তা পরিধান করা জায়িয নেই। (আলমগীরি ঃ ৫/৩৩১, রহিমিয়া ঃ ১/১৮৩, রদ্দে মুখতার ঃ ৫০৬)

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا ص۱۰

অনুচ্ছেদ ঃ ১১. দাঁড়িয়ে কিছু পান করা নিষেধ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا فَقِيْلَ الْاَكْلُ قَالَ ذَاكَ اَشَدُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২০. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ....... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আহার করা? তিনি বললেন, এতো আরও খারাপ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সাহীহ।

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى مُسْلِمٍ الْجَذْمِيِّ عَنِ الْجَارُوْدِ بْنِ الْعَلَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَنَسٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَهٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنْ جَارُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَرُوِىَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنِ الْجَارُوْدِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ وَالْجَارُوْدُ هُوَ ابْنُ الْمُعَلّٰى يُقَالُ ابْنُ الْعَلَاءِ وَالصَّحِيْحُ اِبْنُ الْمُعَلّٰى

২১. হুমায়দ ইবনে মাসআদা রহ......... জারূদ ইবনুল মুআল্লা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে আবূ সাঈদ, আবূ হুরাইরা ও আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

একাধিক রাবী এ হাদীসটিকে সাঈদ – কাতাদা – আবূ মুসলিম – জারূদ – নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কাতাদা – ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর – আবূ মুসলিম – জারূদ রাযি. সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিমের হারানো বস্তু জাহান্নামের দহনের কারণ বলে বিবেচ্য। জারূদ ইবনুল মু'আল্লা রাযি. ইবনুল আলা বলে কথিত। কিন্তু সহীহ হল, ইবনুল মু'আল্লা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমামগণের মতে দাঁড়িয়ে পানাহার করা

দাঁড়িয়ে পানাহার করার ব্যাপারে কোন কোন হাদীসে নিষেধ এসেছে। অপরদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এবং আবদুল্লাহ ইবনে আ'মর ইবনুল আসসহ কোন কোন সাহাবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাঁড়িয়ে পানাহার করতে দেখেছেন। এই উভয় ধরনের হাদীসের মধ্যে উলামায়ে কিরাম কয়েকভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন। যথা,

(১) হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহ. বলেন, এতদুভয় হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান কল্পে কেউ কেউ বলেছেন, উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে ممانعت তথা নিষেধ সংক্রান্ত হাদীস হল, নাসিখ। আর اباحت তথা অনুমোদনের হাদীস হল মানসূখ (রহিত)। আবার কেউ কেউ এর উল্টোও বলেছেন। তবে অগ্রাধিকারযোগ্য কথা হল, দাঁড়িয়ে পানাহার করা জায়িয এবং বসে পানাহার করা মুসতাহাব।

(২) ইমাম নববী রহ. বলেন, নিষেধের বিধান মাকরূহে তানযীহি হিসাবে প্রয়োগ হবে। আর দাঁড়িয়ে পান করার বিষয়টি জায়িয হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

(৩) স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে দাঁড়িয়ে পানাহার করা নিষেধ। তবে শরঈ বিধান মতে দাঁড়িয়ে পানাহার করা জায়িয। সুতরাং নিষেধের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়ার বহিঃপ্রকাশ।

(৪) স্থানটি নোংরা থাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন। অন্যথায় পানাহার মূলতঃ বসে করাই নিয়ম।

(৫) নিষেধের বিধান যমযমের পানি এবং অযূর বেঁচে যাওয়া পানি ছাড়া অন্যান্য পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর অনুমোদনের বিষয়টি অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা এ দুই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পান করা মুসতাহাব।

(৬) হযরত মাওলানা তাকী উসমানী তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম গ্রন্থে লিখেছেন– দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ সেসব স্থানে যেখানে বসে পান করার কোন সুযোগ নেই। নতুবা সে সুযোগ থাকলে বসেই পান করতে হবে।

قوله الأكل؟ قال: ذالك اشد ঃ এটাও মাকরূহে তানযীহির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর হাদীস জায়িযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথবা বলা হবে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাযি. এর হাদীস দু'এক লোকমা খানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিংবা যেসব খানা খাওয়ার জন্য দস্তরখান বিছানোর প্রয়োজন হয় না, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাযি. এর হাদীস সেসব খানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যে জাতীয় খানার জন্য দস্তরখান বিছানো হয়, সেখানে বসেই খেতে হবে। আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, শেষোক্ত কথাটি আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

মাসআলা ঃ সাধারণতঃ রাস্তায় চলাফেরা অবস্থায়, শোয়া অবস্থায় এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পানাহার করা মাকরূহ।

(শামী ঃ ৯/২৫৫, আলমগীরি ঃ ৫/৩৪১)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى الشُّرْبِ قَائِمًا ص١٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১২. দাঁড়িয়ে পান করার অনুমতি প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا اَبُوْ السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ الْكُوْفِيُّ ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَاكُلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِيْ وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَوٰى عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِى الْبَزَرِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاَبُوْ الْبَزَرِيِّ اِسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عُطَارِدٍ

২২. আবুস সাইব সালম ইবনে জুনাদা কূফী রহ...... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তি[illegible]লেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা চলতে চলতে খেয়েছি এবং দাঁড়িয়েও পান করেছি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর – নাফি – ইবনে উমর রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। ইমরান ইবনে জারীর এ হাদীসটিকে আবুল ইউযারী – ইবন উমর রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবুল ইউযারী রহ. -এর নাম হল, ইয়াযীদ ইবনে উতারিদ।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثنا هُشَيْمٌ ثنا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ وَمُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৩. আহমাদ ইবনে মানী' রহ......... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আলী সা'দ, আবদুল্লাহ ইবন আমর ও আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৪. কুতায়বা রহ......... আমর ইবনে শু'আইব আপন পিতা তৎপিতামহ আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয় অবস্থায়ই পান করতে দেখিছি। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অনেকে আলোচ্য হাদীসটির ব্যাপারে বলেছেন, এ হাদীসটি যমযমের পানি এবং অযূর বেঁচে যাওয়া পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আল্লামা শামী রহ. রদ্দুল মুখতার গ্রন্থে লিখেছেন, যমযমের পানি এবং অযূর অতিরিক্ত পানি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা জায়িয; মুসতাহাব নয়। আর অযূর অতিরিক্ত পানি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলে অনেক রোগের নিরাময় হয় বলে অভিজ্ঞজনরা মন্তব্য করেছেন। অবশ্য আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেছেন, যমযমের পানি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা মুস্তাহাব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّنَفُّسِ فِى الْاِنَاءِ صـ١٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩. কিছু পানের সময় শ্বাস গ্রহণ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَا ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى عِصَامٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُوْلُ هُوَ اَمْرَأُ وَاَرْوَى

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ هِشَامُ الدَّسْتُوَائِىُّ عَنْ اَبِى عِصَامٍ عَنْ اَنَسٍ وَرَوَى عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلٰثًا

২৫. কুতায়বা ও ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ রহ...... আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রে কিছু পানের সময় তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন এ হল অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধক ও তৃপ্তিদায়ক।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব। হিশাম আদ – দাসতাওয়াঈ এটিকে আবূ আসিম – আনাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর আযরা ইবনে ছাবিত রহ. ছুমামা – আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রে কিছু পানের সময় তিনবার শ্বাস নিতেন।

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلٰثًا هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

২৬. বুন্দার রহ........ আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রে কিছু পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثنا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانِ الْجَزَرِىِّ عَنْ ابْنٍ لِعَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَشْرَبُوْا وَاحِدً اكَشُرْبِ الْبَعِيْرِ وَلٰكِنْ اشْرَبُوْا مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَسَمُّوْا اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوْا اِذَا اَنْتُمْ رَفَعْتُمْ

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَيَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ الْجَزَرِىُّ هُوَ اَبُو فَرْوَةَ الرَّهَاوِىُّ

২৭. আবূ কুরায়ব রহ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কেউ উটের মত (ঘটঘট করে) পান করবে না বরং দুইবার বা তিনবার পান করবে। যখন পান করবে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। আর যখন পান করে উঠবে তখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে হাদীসের মধ্যে ثلاثا শব্দ এসেছে। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ সময়ের অভ্যাস। পক্ষান্তরে শামায়েলে তিরমিযীর একটি হাদীসে এসেছে, كان يتنفس بمرتين এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝেমধ্যে করতেন। অতএব হাদীসদ্বয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। অনুরূপভাবে এখানে হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রের মধ্যে শ্বাস নিতেন।

অথচ অন্য হাদীসে এসেছে, انه نهى عن التنفس فى الاناء অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এনে বলা হয়, এখানে শ্বাস নেওয়ার অর্থ, পাত্রের ভিতরে শ্বাস ফেলা নয় বরং পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে তিনি শ্বাস গ্রহণ করতেন। আর نهى এর হাদীসে নিষেধাজ্ঞা হল, পাত্রের ভেতরে শ্বাস ফেলা যাবে না।

মাসআলা ঃ তিন শ্বাসে পানি পান করা সুন্নাত। এক শ্বাসে পান করা সুন্নত পরিপন্থী। (আলমগীরি ঃ ৫/৩৪১)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ ص١١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪. দুই শ্বাসে পান করা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ثنا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ـــــ ﷺ كَانَ اِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ مَرَّتَيْنِ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رِشْدِيْنَ بْنَ كُرَيْبٍ قُلْتُ هُوَ اَقْوَى اَمْ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ قَالَ مَا اَقْرَبَهُمَا وَرِشْدِيْنُ بْنُ كُرَيْبٍ اَرْجَحُهُمَا عِنْدِىْ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ هٰذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ اَرْجَحُ مِنْ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ وَالْقَوْلُ عِنْدِىْ مَا قَالَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رِشْدِيْنُ بْنُ كُرَيْبٍ اَرْجَحُ وَاَكْبَرُ وَقَدْ اَدْرَكَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَرَاٰهُ وَهُمَا اَخَوَانِ وَعِنْدَهُمَا مَنَاكِيْرُ

২৮. আলী ইবনে খাশরাম রহ....... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পান করতেন, তখন দুই বার শ্বাস নিতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

রিশদীন ইবনে কুরায়ব রহ. ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান দারিমী রহ.-কে রিশদীন ইবনে কুরায়ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলেছিলাম, রাবী হিসাবে রিশদীন বেশি শক্তিশালী না মুহাম্মদ ইবনে কুরায়ব বেশি শক্তিশালী? তিনি বললেন, এরা পরস্পর কতইনা কাছাকাছি। তবে আমাদের মতে উভয়ের মাঝে রিশদীন ইবনে কুরায়ব রহ.-ই অগ্রগণ্য। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ.-কেউ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন, রিশদীন ইবনে কুরায়ব রহ.-এর তুলনায় মুহাম্মদ ইবনে কুরায়ব অধিকতর প্রাধান্যযোগ্য। আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান দারিমী রহ. এর মত আমারও অভিমত হল, এতদুভয়ের মাঝে রিশদীন ইবনে কুরায়ব রহ.-ই অধিক অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠতর। তিনি ইবনে আব্বাস রাযি.-এর যুগ পেয়েছেন এবং তাঁকে দেখেছেন। এরা পরস্পর ভাই ভাই। তাঁদের নিকট অনেক মুনকার রিওয়ায়াত রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই শ্বাসে না তিন শ্বাসে পান করতেন ?

প্রশ্ন হয়, এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই শ্বাসে পানি পান করতেন। অথচ আনাস রাযি.-এর হাদীসে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, তিনি তিন শ্বাসে পান করতেন। এ বিরোধের সমাধান কি? উলামায়ে কিরাম বিভিন্নভাবে এর উত্তর দিয়েছেন। পূর্বেও এর প্রতি কিছুটা ইংগিত দেওয়া হয়েছিল। নিম্নে এর তিনটি উত্তর তুলে ধরা হল।

(১) তিন শ্বাসে পান করা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব সময়ের অভ্যাস। মাঝে মাঝে দুই শ্বাসেও পান করতেন।

(২) দুই শ্বাসে পান করতেন এর অর্থ হল, পান করার সময় দু' বার শ্বাস নিতেন। আর মাঝখানে দু'বার শ্বাস নিলে তো তিন শ্বাসই হল। সুতরাং কোন বিরোধ রইল না।

(৩) সংখ্যা গণনায় এদিক-সেদিক হয়ে যাওয়া বিবেচ্য বিষয় নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ صـ١١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫. পানীয় বস্তুতে ফুঁক দেওয়া মাকরূহ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ثنا عِيْسى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَيُّوْبَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا الْمُثَنّى الْجُهَنِيَّ يَذْكُرُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهى عَنِ النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلُ الْقَذَاةُ اَرَاهَا فِى الْاِنَاءِ فَقَالَ اَهْرِقْهَا فَقَالَ فَاِنِّىْ لَا اَرْوى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَاَبِنِ الْقَدَحَ اِذًا عَنْ فِيْكَ هذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৯. আলী ইবনে খাশরাম রহ......... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানীয় বস্তুতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, পাত্রে আবর্জনার মত পরিলক্ষিত হলে ? তিনি বললেন, তা ঢেলে ফেলে দাও। লোকটি বলল, আমি তো এক শ্বাসে পান করে তৃপ্তি পাই না। তিনি বললেন, তা হলে তোমার মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিবে (এবং শ্বাস ফেলবে)।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهى اَنْ يَتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ اَوْ يَنْفَخَ فِيْهِ هذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১০৫. ইবনে আবূ উমর রহ........ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রে শ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁকতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

গরম খাবারে ফুঁ দেওয়া নিষেধ কেন ?

গরম খাবারও ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে খাওয়া উচিত নয়। কেননা হতে পারে মুখের থু থু পানাহারের পাত্রে পড়বে। ফলে নিজের কিংবা অন্যের ঘৃণার উদ্রেক হবে। তাছাড়া মুখের লালা ও ফুঁ বিষাক্ত। ফুঁ দিলে নানা জীবাণু পাত্রের মাঝে পড়তে পারে। যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এজন্য পানির বা খাবার পাত্রে খড়কুটা পড়লে ফুঁ দিয়ে না সরিয়ে চামচ ইত্যাদির সাহায্যে ফেলবে।

মাসআলা ঃ অত্যধিক গরম খাবার না খাওয়া, পানহারের জিনিসের ঘ্রাণ না নেওয়া এবং পানাহারের জিনিসে ফুঁ না দেওয়া উচিত। এসব লক্ষ্য রাখা পানাহারের আদব। (শামী ঃ ৯/৪৯১, আলমগীরি ঃ ৫/৩৩৭)

পান করার আদবসমূহ

(১) বসে পান করা মুসতাহাব।
(২) ডান হাতে পান করা সুন্নাত।
(৩) পাত্রের ভাঙা দিকে মুখ না লাগানো উচিত।
(৪) তিন শ্বাসে পানা করা উত্তম। প্রতি শ্বাসের সময় পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে রাখবে।
(৫) পানপাত্রে শ্বাস ফেলবে না। ফুঁ দিবে না।
(৬) পান করার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলবে।
(৭) পানি পান করার সময় পড়বে– الحمد لله الذى جعله عذبا فراتا ولم يجعله ملحا اجاجا
(৮) দুধ, চা, কপি ইত্যাদি পান করার সময়ে পড়বে– اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه
(৯) যমযমের পানি কিবলামুখী হয়ে পান করা মুসতাহাব এবং দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম।
(১০) যমযমের পানি পান করার সময় এ দু'আ পড়বে–

اللهم انى اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء

(১১) নিজে পান করার পর অন্য কাউকে দেওয়ার ইচ্ছা হলে সর্বপ্রথম ডান দিকের লোককে দিবে। যদিও ডান দিকের লোক বাম দিকের লোকের তুলনায় মর্যাদার দিক থেকে ছোট হয়।
(১২) কলসি ইত্যাদি যে পাত্র থেকে পানি ঢালতে গেলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, এরকম পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করা মুসতাহাব পরিপন্থী।
(১৩) যিনি পান করাবেন তিনি সর্বশেষ পান করবেন।
(১৪) মুসলমান ভাই বিশেষ করে আল্লাহ ওয়ালা লোকের উচ্ছিষ্ট পানি বরকত মনে করে পান করবে।

(আহকামে যিন্দেগী, মা'আরিফুল হাদীস)

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ صـ١١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬. মশকের মুখ উলটে ধরে তা থেকে পানি পান করা নিষিদ্ধ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا سُفْيٰنُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رِوَايَةً اَنَّهُ نَهٰى عَنْ اِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩০. কুতায়বা রহ......... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মশকের মুখ উলটে ধরে তা থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে জাবির, ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عن اختنات الاسقية ঃ এ প্রসঙ্গে তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম গ্রন্থে রয়েছে–

الاختناث افتعال من الخنث وهو التكسر والانثناء والانطواء، ومنه سمى الرجل المشبه بالنساء مخنثا لانه ينثنى كلامه وحركاته والاسقية جمع السقاء وهو القربة اختناث الاسقية ان يطوى فمها وفسره فى حديث مسلم بان يشرب من افواهها

অর্থাৎ اختناث শব্দটি خنث থেকে باب افتعال এর মাসদার। অর্থ– ভেঙ্গে যাওয়া, বক্র হওয়া, ভাঁজ হওয়া। এ থেকেই হিজড়াকে مخنث বলা হয়। কেননা তার কথা ও ক্রিয়াকলাপ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আর اسقية শব্দটি سقاء এর বহুবচন। অর্থ, পানি বহনের মশক। اختناث الاسقية অর্থ, পান করার লক্ষ্যে মশকের মাথা বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মশক, কলস ইত্যাদির মুখে পানি পান করা।

মশক, কলস, পানির কল, পাইপ লাইন, বোতল ইত্যাদির মুখে পান করা নিষেধ। এর কারণ কয়েকটি। যথা–

(১) এভাবে পানি পান করলে পানির অপচয় হয়।

(২) পানি কাপড়-চোপড় ইত্যাদিতে পড়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

(৩) একসাথে অনেক পানি পেটে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে নাড়ির সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

(৪) পান করার সুন্নাত পদ্ধতির পরিপন্থী হয়।

(৫) পাত্রের ভেতর গাপটি মেরে বসে থাকা সাপ, বিষাক্ত পোকামাকড় ইত্যাদি পানকারীর ক্ষতি সাধন করতে পারে।

(৬) এভাবে পান করলে পাত্রের মুখ দুর্গন্ধ হয়ে যেতে পারে। যাঁ অন্যের জন্য ঘৃণার কারণ হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِىْ ذَالِكَ صـ١١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭. উক্ত বিষয়ে অবকাশ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِيْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ اِلٰى قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَخَنَثَهَا ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيْهَا وَفِى الْبَابِ عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِصَحِيْحٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهٖ وَلَا اَدْرِىْ سَمِعَ مِنْ عِيْسٰى اَمْ لَا

৩১. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ...... ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি। তিনি একটি ঝুলন্ত মশকের দিকে উঠে গেলেন। অতঃপর সেটির মুখ উলটে ধরে এর মুখ থেকে পান করলেন।

এ বিষয়ে উম্মে সুলায়ম রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. স্মরণশক্তির দিক থেকে যঈফ বলে বিবেচিত। তিনি ঈসা রহ. থেকে শুনেছেন কিনা আমি জানি না।

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيٰنُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِهٖ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِىِّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ اِلٰى فِيْهَا فَقَطَعْتُهٗ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَيَزِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ هُوَ اَخُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ وَهُوَ اَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتًا

৩২. ইবনে আবী উমর .... কাবশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে আসেন। তিনি দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত মশকের মুখে পানি পান করেন। আমি পরে উঠে গিয়ে মশকের মুখের সেই অংশ (বরকতের আশায় কেটে রেখে দেই।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইয়াযীদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবির হলেন আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের সহোদর ভাই এবং তিনি তার আগে মারা যান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عن جدته كبشة ঃ তাহযীবুত তাহযীবে রয়েছে, كبشة তিনি হলেন, ছাবিত আল-মুনযির আল –আনসারীর মেয়ে। তিনি হযরত হাসসান রাযি. এর বোন। তাকে বলা হত বারছা। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে দাঁড়িয়ে মশকের মুখ থেকে পানি পান সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তুহফা ../১৩)

বরকত লাভের উদ্দেশ্যেই মশকের মুখ কেটে নেওয়া হয়েছে ।

পূর্বোল্লেখিত হাদীস, যাতে মশকের মুখে পানি পান করা নিষেধ করা হয়েছে এবং এ হাদীসের মধ্যে বাহ্যতঃ বিরোধ দেখা যায়। এতদুভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধানের লক্ষ্যে উলামায়ে কিরাম এর একাধিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা–

(১) নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক বড় মশক-কলসি ইত্যাদির সাথে, যেগুলোর মুখও সাধারণতঃ বড় হয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মশক থেকে পান করেছেন, সেটি ছিল ছোট মশক এবং মুখও ছিল সঙ্কীর্ণ।

(২) নিষেধ করা হয়েছে যেন মানুষ এরকম অভ্যাস করতে না পারে। আর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যেন প্রয়োজনের সময় কাজে লাগাতে পারে।

(৩) মশকের মুখে পানি পান করা পূর্বে মুবাহ ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে।

(৪) নিষেধ করা হয়েছে মাকরূহে তানযীহি হিসাবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পান করেছেন জায়িয বুঝানোর উদ্দেশ্যে। (তুহফাতুল আহওয়াযী, তাকমিলাহ)

ফায়দা ঃ হযরত হাফসা রাযি. এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, নেককারদের নিদর্শনাদি দ্বারা বরকত অর্জন করা জায়েয।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْاَيْمَنِيْنَ اَحَقُّ بِالشُّرْبِ ص١١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮. ডান দিকের লোক পান করার অধিক হকদার

حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ ثنا مَعْنٌ ثنا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وثنا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ اَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ اَعْطَى الْاَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْاَيْمَنَ فَالْاَيْمَنُ وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৩. আনসারী রহ....... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু পানি মিশ্রিত দুধ আনা হল। তাঁর ডান পাশে ছিল একজন বেদুঈন আর বাম পাশে ছিল আবূ বকর রাযি.। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পান করে ঐ বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, ডান পাশের লোকেরাই ক্রমান্বয়ে অধিকারী।

এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস, সাহল ইবনে সা'দ, ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসটি এখানে সংক্ষিপ্ত। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে, হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ আনলেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গৃহপালিত একটি বকরির দুধ দোহন করা হল। সে দুধে পানি মেশানো হয়, যা হযরত আনাস রাযি. এর ঘরে ছিল। তারপর দুধের পেয়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পেশ করা হল। তিনি তা থেকে কিছু দুধ পান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাঁ দিকে হযরত আবু বকর রাযি. বসা ছিলেন। ডান দিকে এক গ্রাম্য সাহাবী বসা ছিলেন। হযরত উমর রাযি. আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ অতিরিক্ত দুধ হযরত আবু বকরকে দিন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুঈনকে দিলেন। কারণ, বেদুঈন সাহাবী তাঁর ডান দিকে বসা ছিল। এরপর তিনি বললেন, বাম দিকের উপর ডান দিক প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, কোন জিনিস বণ্টন করার সময় সর্বপ্রথম ডান দিক থেকে শুরু করা মুসতাহাব। তবে ডান দিকের লোক যদি বাম দিক থেকে শুরু করার অনুমতি দেয়, তাহলে বাম দিক থেকেও শুরু করা যাবে।

قد شيب بالماء ঃ দুধকে পানির সাথে মেশানো দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দুধকে ঠাণ্ডা করা। আরব দেশ যেহেতু গরম দেশ, তাই ঠাণ্ডা করার জন্য এরূপ করেছেন। কিন্তু বিক্রি করার সময় এরূপ করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

الايمن فالايمن ঃ অর্থাৎ সর্বপ্রথম দেওয়া হবে ডানদিকে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে। এরপর তার ডান পাশের নিকটতম ব্যক্তিকে। এ নিয়মে দিতে থাকবে। সর্বশেষ আসবে বাম দিকের ব্যক্তির পালা।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ سَاقِىَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا ص١١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯. পরিবেশনকারী ব্যক্তি সবার শেষে পান করবে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَاقِىُ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৪. কুতায়বা রহ..... আবূ কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন দলের পানীয় পরিবেশনকারী নিজে সবার শেষে পান করবে। এ বিষয়ে ইবনে আবূ আওফা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

খাবার পরিবেশনকারীর জন্য আদব হল, তিনি সবার শেষে খাবেন। এর দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয়, যিনি ব্যক্তি জনগণের জিম্মাদার বা জন প্রতিনিধি, তিনি জনগণের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের চেয়েও অগ্রাধিকার দিবেন। (তুহফাহ)

بَابُ مَاجَاءَ اَىُّ الشَّرَابِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صـ١١

অনুচ্ছেদ ঃ ২০. কোন্ পানীয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অধিক প্রিয় ছিল ?

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْحُلْوَ الْبَارِدَ هٰكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مِثْلَ هٰذَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالصَّحِيْحُ مَارَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً

৩৫. ইবনে আবূ উমর রহ....... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অধিক প্রিয় পানীয় ছিল ঠাণ্ডা মিষ্টি শরবত।

একাধিক রাবী ইবন উয়ায়না রহ. থেকে মা'মার – যুহরী – উরওয়া – আয়েশা রাযি. সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ হল, যে রিওয়ায়াতটি ইমাম যুহরী রহ. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الشَّرَابِ اَطْيَبُ قَالَ اَلْحُلْوُ الْبَارِدُ وَهٰكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

৩৬. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ.......... আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক – মা'মার ও ইউনুস – যুহরী রহ. সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সবচেয়ে ভাল পানীয় কোনটি? তিনি বললেন, ঠাণ্ডা মিষ্টি শরবত। আবদুর রায্যাক রহ. ও মা'মার – যুহরী – নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এটি ইবনে উয়ায়না রহ.-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধীক সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উপরিউক্ত হাদীসে বাহ্যতঃ ঠাণ্ডা এবং মিষ্টি পানি উদ্দেশ্য। আবার মিষ্টি জিনিস দ্বারা সকল মিষ্টি দ্রব্যই উদ্দেশ্য হতে পারে। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মিষ্টি পানীয়কে খুব পছন্দ করতেন। এ মিষ্টি পানী সাধারণ পানিও হতে পারে কিংবা মিষ্টি দুধ, মধু, শরবত, খেজুরের নাবীয ইত্যাদিও হতে পারে। এ ব্যাখ্যা দ্বারা উক্ত হাদীস এবং ঐ দুই হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন হয়ে যায়, যে হাদীস দুটিতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পানীয়ের মধ্যে মিষ্টি দুধ অধিক প্রিয় ছিল এবং মধু সর্বাধিক প্রিয় ছিল। অথবা বলা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত সব ধরনের পানীয়কেই খুব বেশি পছন্দ করতেন। একেকটি একেক কারণে অধিক পছন্দ করতেন।

الحلو البارد ঃ এটির অর্থ বর্তমান যুগে Cool Drink শব্দে করা যেতে পারে। কারণ, এটাও ঠাণ্ডা ও মিষ্টি হয়।

আজকের যুগে যেমনিভাবে এর ব্যবহার ব্যাপক, অনুরূপভাবে আরবে গরম বেশি হওয়ার কারণে তৎকালীন যুগেও ঠাণ্ডা পানি বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারেও ঠাণ্ডা ও মিঠা পানির

বিশেষ ব্যবস্থা থাকত। অথচ খানার প্রতি তেমন বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। উপস্থিত যা ভাগ্যে জুটত, তাই খেতেন। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল সাকইয়া। সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মিঠা পানি সংগ্রহ করা হত।

ফায়দা ঃ উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, পানীয় জিনিসের মধ্যে ঠাণ্ডা-মিঠার প্রতি আকর্ষণ যা সুস্থ ও রুচিসম্পন্ন মানুষের দাবী– এটা যুহ্‌দের পরিপন্থী নয়। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও মহব্বতের ভেতরে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা সৌভাগ্যের বিষয়। ('মা'আরিফুল হাদীস)

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী হযরত থানভী রহ. কে বলতেন, আশরাফ আলী! পানি পান করার সময় ঠাণ্ডা পানি পান করবে। যেন তোমার শিরা-উপশিরা থেকে আল্লাহ তা'আলার শোকর বের হয়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনও পানাহার দ্রব্য কোথাও হতে চেয়ে এনেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু শুধু শীতল পানি তিন মাইল দূর থেকেও সংগ্রহ করতেন। 'বীরে গরম' নামক কূপ, যা এখনও মদীনাতে আছে। সেখান থেকে গুরুত্বসহ ঠাণ্ডা পানি আনতেন। এর পেছনে মূল হেকমত ছিল, পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি পান করলে যেন প্রত্যেব ঢোকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহ তা'আলার শোকরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। (ইসলাহী খুতুবাত ঃ ১)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

بسم الله الرحمن الرحيم

اَبْوَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صـ ١١

সৎব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা অধ্যায়

শুরুর কথা ঃ

হক্‌কুল ইবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা দু'ভাবে বিভক্ত।

(১) পার্থিব কাজ-কারবার ও লেনদেন সম্পর্কিত। যেমন, বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋণ, আমানত, হিবাহ, ওসিয়্যত, শ্রম, পরস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, প্রতিনিধি নিয়োগ, সাক্ষ্য এবং বিচার-আচার ইত্যাদি। হুকুকুল ইবাদ এর এ অংশকে বলা হয় 'মু'আমালাত'।

(২) সামাজিক শিষ্টাচার ও বিধানাবলী সম্পর্কিত। যেমন, মাতা-পিতা নিজ সন্তানদের সাথে, সন্তান তার পিতা-মাতার সাথে, স্ত্রী তার স্বামীর সাথে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে, নিকটাত্মীয় অপর আত্মীয়ের সাথে, প্রতিবেশী নিজ প্রতিবেশীর সাথে, বড় ছোটর সাথে, ছোট বড়র সাথে, মনিব তার চাকরের সাথে, চাকর নিজ মনিবের সাথে এবং শাসক জনগণের সাথে কেমন আচার-ব্যবহার করবে, এসব বিষয় সম্পর্কিত হুকুকূল ইবাদ এর অংশকে বলা হয় 'মু'আশারাত'।

ইমাম তিরমিযী রহ. মানুষের মু'আমালাত যিন্দেগী সম্পর্কে প্রায় একশ ছিচাল্লিশটি হাদীস সংকলন করেছেন। এসবের উপর আমল করতে পারলে মানুষের পরিবার ও সমাজে শান্তির অমীয় ফল্গুধারা বইতে শুরু করবে এবং হেদায়েতের সোনালী পথে মানুষ চলতে সক্ষম হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ صـ ١١

অনুচ্ছেদ ঃ ১. পিতা-মাতার সাথে সৎব্যবহার

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ثنا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ ثنى اَبِىْ عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَبَرُّ قَالَ اُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ الْاَقْرَبَ فَالْاَقْرَبَ

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ وَبَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِىُّ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِى بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَرَوٰى عَنْهُ مَعْمَرٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ

১. বুনদার রহ........ বাহয ইবনে হাকীম তার পিতা পিতামহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার সঙ্গে আমি সৎ ব্যবহার করব? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে। আমি বললাম, এরপর কার সঙ্গে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে। আমি বললাম, পরে কার সঙ্গে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে।

আমি বললাম, পরে কার সঙ্গে? তিনি বললেন, তারপর তোমার পিতার সঙ্গে, এরপর নিকটতম আত্মীয় ক্রমান্বয়ে।

এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আয়েশা ও আবুদ দারদা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বাহয ইবনে হাকীম রহ.. হলেন বাহয ইবনে হাকীম ইবনে মু'আবিয়া ইবনে হায়দা কুশায়রী রাযি.।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

শু'বা রহ. বাহয ইবনে হাকীমের সমালোচনা করেছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি ছিকা বা নির্ভরযোগ্য। তাঁর নিকট থেকে মা'মার সুফইয়ান সাওরী, হাম্মাদ ইবনে সালামা প্রমুখ হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমামগণ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابٌ مِّنْهُ صـ١١

অনুচ্ছেদ ঃ ২. এরই অংশ বিশেষ

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ اَبِىْ عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلصَّلاَةُ لِمِيْقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ سَكَتَ عَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِىْ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَقَدْ رَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍعَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَبِىْ عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبُوْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ اِسْمُهُ سَعْدُ بْنُ اَيَاسٍ

২. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ........ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবচেয়ে ফযীলতের আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন, যথাসময়ে নামায আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোনটি ইয়া রাসূলাল্লাহ ? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা। আমি বললাম, তারপর কি ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন। আমি যদি আরও জানতে চাইতাম তবে তিনি অবশ্যই আমাকে আরও জানাতেন।

আবূ আমর শায়বানী রহ.-এর নাম হল, সা'দ ইবনে ইয়াস।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

শায়বানী, শু'বা রহ. এবং আরও একাধিক রাবী এটিকে ওয়ালীদ ইবনে আইযার রহ. থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এটি একাধিকভাবে আবূ আমর শায়বানী ইবনে মাসউদ রাযি. সূত্রে বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بن حكيم ঃ বাহ্‌য ইবনে হাকীম ইবনে মু'আবিয়া ইবনে হায়দাতুল কুশাইরী, বসরী। কুনিয়াত আবদুল মালেক। তিনি তাঁর পিতা এবং দাদার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু লোকই তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করলেও ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. নিজ নিজ গ্রন্থে তাঁর কোনও হাদীস চয়ন করেননি। ইবনে আ'দী বলেন, আমি তাঁর বর্ণিত কোনও হাদীস মুনকার দেখি না।

ثنى ابى ঃ অর্থাৎ হাকীম ইবনে মু'আবিয়া আল-কুশাঈরী। বাহ্‌যের পিতা। পল্লীর বাসিন্দা। হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তিনি আপন পিতা মু'আবিয়া থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

عـن جـدى ঃ মু'আবিয়া ইবনে হায়দা। (ح এর উপর যবর, ى জযম) তিনি সাহাবী। বসরায় বসবাস করতেন। খুরাসানে ইন্তিকাল করেন। বাহ্য ইবনে হাকীমের দাদা।

البـر ও صـلـه শব্দের অর্থ ঃ

البـر ঃ (বা-তে যের) দান ও সদাচার, সৎকাজ, আনুগত্য, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার। بـر الـوالـديـن অর্থ, পিতা-মাতার সাথে সদাচার। بر শব্দটি عـقـوق শব্দর বিপরীত। عـقـوق الـوالـديـن অর্থ– পিতা-মাতার সাথে অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

صـلـة ঃ এর শাব্দিক অর্থ– সংযুক্ত করা, একত্র করা। صـلـة الـرحـم অর্থ, নিকটাত্মীয়দের সাথে সদাচারী ও কোমল হওয়া। এর বিপরীত শব্দ قـطـع الـرحـم অর্থ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, সদাচারণের সবচেয়ে বেশি হকদার হল, আপন মাতা। কেননা গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসব বেদনা, দুগ্ধপানের কষ্ট এবং সন্তান প্রতিপালনের শ্রম ইত্যাদিতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়েছে মাকেই।

শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া রহ. বলেন, এ হাদীসের দাবি মতে বুঝা যায়, পিতার অধিকার একটি আর মায়ের অধিকার তিনটি। কারণ, সন্তান প্রতিপালনের সময় মাতা এমন তিনটি কষ্ট স্বীকার করেন, যেগুলো পিতা করতে পারে না। অর্থাৎ গর্ভধারণ, প্রসব এবং দুগ্ধপান। এ তিনটি কষ্ট কেবল মা করেন। তাই হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের কথা তিনবার বলেছেন। আর চতুর্থবার বলেছেন পিতার কথা। এ জন্যই উলামায়ে কিরাম বলেন, মায়ের তিন হক, পিতার এক হক।

হযরত শাইখুল হাদীস রহ. আরও বলেন, বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, তা'যীম ও খেদমত দুটি স্বতন্ত্র বিষয়।

প্রথমতঃ তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শনের বেলায় পিতা মাতার উপর প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ অন্তরে তার প্রতি বড়ত্ব বেশি থাকবে। তার দিকে পা বিছিয়ে বসবে না। তাঁর মাথার কাছে বসবে অথবা সম্মান প্রকাশার্থে যা যা করতে হয়, তাই করবে। মোটকথা, এ ক্ষেত্রে পিতার হক প্রাধান্য পাবে।

দ্বিতীয়তঃ খেদমত। এ ক্ষেত্রে মায়ের হক প্রাধান্য পাবে। পিতার তুলনায় মা সেবা-যত্ন পাওয়ার বেশি হকদার। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফতহুল বারীতেও বুযুর্গানে দীনের উক্ত উসূল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সন্তান পিতার সম্মান বেশি করবে আর মায়ের খেদমত বেশি করবে।

উত্তম আমল কি ?

বিভিন্ন হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেক সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন– اى الاعـمـال افـضـل ؟ (সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি?) এতে সাহাবায়ে কিরামের মনের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের আকাঙ্খা ছিল, যে আ'মলটি আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়, সে আ'মলটি কিভাবে যথাযথ বাস্তবায়ন করা যায় এবং সেটিকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নেওয়া যায়।

সর্বোত্তম আ'মল কোনটি? হাদীসের একাধিক বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রশ্নটির জবাব বিভিন্ন সাহাবীকে বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। যেমন, উল্লেখিত হাদীসে তিনি জবাব দিয়েছেন, সবচেয়ে উত্তম আ'মল হল, সময় মত নামায পড়া। অন্য এক হাদীসে আরেক সাহাবীর এ প্রশ্নের জবাবেই বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম আ'মল হল, তোমার জিহবাকে আল্লাহ তা'আলার যিকর দ্বারা সতেজ রাখা।

আরেক হাদীসে এসেছে, অপর এক সাহাবী এ ধরনের প্রশ্ন করলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সর্বোত্তম আ'মল হল, পিতা-মাতার আনুগত্য করা এবং তাদের সাথে সদাচারণ করা। অন্য সাহাবীকে তিনি

জবাব দিয়েছেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা সর্বোত্তম আ'মল। বাহ্যতঃ এ সব জবাবে বৈপরিত্ব দেখা গেলেও মৌলিক কোনও বৈপরিত্ব নেই। বস্তুতঃ মানুষের চারিত্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তম আ'মল পরিবর্তন হয়। কোনও ব্যক্তির জন্য নামায পড়া সবচেয়ে উত্তম আ'মল। আবার কারও জন্য উত্তম আ'মল হল, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এভাবে কোনও ব্যক্তির জন্য যিকরুল্লাহ সবচেয়ে উত্তম আ'মল। প্রেক্ষাপট ও মানুষের চারিত্রিক অবস্থার ভিন্নতার কারণে এ পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন, কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম থেকেই জানা ছিল, তিনি নামায পড়েন, নামাযের ব্যাপারে যথেষ্ট পাবন্দিও তাঁর আছে, তাঁর সামনে নামাযের ফযীলত বর্ণনা করার বেশি প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার মধ্যে মাতা-পিতার হক আদায়ের ব্যাপারে অলসতা রয়েছে। তাই তিনি তাকে বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম আমল হল, মাতা-পিতার আনুগত্য করা। এরূপ কোনও সাহাবীর ইবাদতের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু জিহাদের প্রতি ততটুকু আগ্রহ ছিল না। তাই তার ব্যাপারে বলেছেন, তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম আ'মল হল, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। কোনও সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছেন, তিনি ইবাদত-বন্দেগী, জিহাদ সবই করছেন। কিন্তু আল্লাহর যিকরের প্রতি তেমন কোনও মনোযোগ নেই। তখন তাকে বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম আমল হল, আল্লাহর যিকির করা।

بَابُ مَاجَاءَ مِنَ الْفَضْلِ فِىْ رِضَاالْوَالِدَيْنِ ص١١

অনুচ্ছেদ ঃ ৩. পিতা-মাতার সন্তুষ্টির ফযীলত

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ لِىْ اِمْرَأَةً وَاِنَّ اُمِّىْ تَأْمُرُنِىْ بِطَلَاقِهَا فَقَالَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاِنْ شِئْتَ فَاَضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ اَوِ احْفَظْهُ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ اِنَّ اُمِّىْ وَرُبَّمَا قَالَ اَبِىْ ، هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَاَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىُّ اِسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَبِيْبٍ

৩. ইবনে আবূ উমার রহ........ আবুদ-দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমার এক স্ত্রী আছে। কিন্তু আমার মা তাকে তালাক দিয়ে দিতে বলছেন। আবুদ দারদা রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, জন্মদাতা হলেন জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা। এখন তুমি ইচ্ছা করলে এ দরজা নষ্টও করতে পার কিংবা সংরক্ষণও করতে পার। সুফিয়ান তাঁর বর্ণনায় কখনও আমার মা.... কখনও আমার পিতা..... উল্লেখ করেছেন। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি সহীহ। আবূ আবদুর রহমান সুলামী রহ.-এর নাম হল আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব।

حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رِضَا الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ

৪. আবূ হাফস আমর ইবনে আলী রহ..... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জন্মদাতার সন্তুষ্টিতে পালনকর্তার সন্তুষ্টি আর জন্মদাতার অসন্তুষ্টিতে পালনকর্তার

অসন্তুষ্টি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهٰذَا اَصَحُّ ،

وَهٰكَذَا رَوَى اَصْحَابُ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوْفًا وَلاَ نَعْلَمُ اَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ وَخَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ثِقَةٌ مَامُوْنٍ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنّٰى يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ بِالْبَصْرَةِ مِثْلَ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ وَلاَ بِالْكُوْفَةِ مِثْلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ

৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এটি মারফূ‘ নয়। এটিই অধিকতর সহীহ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, শু‘বা রহ. -এর শাগরিদগণও শু‘বা – ইয়ালা ইবনে আততার পিতা আতা – আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. সূত্রে এটিকে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শু‘বা রহ. থেকে খালিদ ইবনে হারিছ ব্যতীত আর কেউ এটিকে মারফূ‘রূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। খালিদ ইবনে হারিছ অবশ্য রাবী হিসাবে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত। মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না রহ. কে বলতে শুনেছি, বসরায় খালিদ ইবনে হারিছের মত কাউকে আমি দেখিনি এবং কূফায় আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসের মতও কাউকে আমি দেখিনি। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসে উল্লেখিত কয়েকটি বাক্যের ব্যাখ্যা

الوالد اوسط ابواب الجنة ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে যদিও পিতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু হযরত আবু দারদা রাযি. এর থেকে মাসআলা চয়ন করে বলেছেন, পিতার ব্যাপারে যদি এ রকম বলা হয়, তাহলে মাতার হক তো আরও অগ্রাধিকার পায়। অতএব মাও উক্ত হাদীসের শামিল হবে। অথবা الوالد। শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য জন্মদাতা, যেখানে মাতা-পিতা উভয়ই শামিল।

আর وسط ابواب الجنة এর অর্থ হচ্ছে, خير ابواب الجنة واعلاها অর্থাৎ জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা। কেননা কোনও কোনও উলামায়ে কিরামের মতে জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা হল, মধ্যখানের দরজা।

رضا الرب فى رضا الوالد ঃ তাবারানীর এক হাদীসে এসেছে–

رضا الرب فى رضا الوالدين وسخطه فى سخطهما

অতএব ইমাম তিরমিযী রহ. কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসেও মাতা-পিতা দ্বারা উভয়ই উদ্দেশ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে মাতা-পিতার বিধান অভিন্ন।

سخط الرب فى سخط الوالد ঃ বলা বাহুল যে, এ কথাটা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন মাতা-পিতা শরী‘আত সমর্থিত কোন কাজের নির্দেশ দিবেন। শরী‘আত বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ করলে মাতা-পিতার আনুগত্য

জরুরি নয়। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে– لا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق

পিতা-মাতা স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলে কি করবে?

যদি কারও পিতা-মাতা তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের নির্দেশ দেয়, তখন ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হল, স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, মাতা-পিতা বাস্তবেই শরী'আতসম্মত কোন কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন কিনা। যদি নিছক খোড়া অজুহাতে মাতা-পিতা স্ত্রী তালাক দেওয়ার কথা বলেন, তাহলে মাতা-পিতার কথা মানা জরুরি নয় বরং তখন স্ত্রীকে তালাক দেওয়া মানে স্ত্রীর উপর জুলুম করা। কেননা তালাক ইসলামী শরী'আতে এক ঘৃণ্য বস্তু। নিরুপায় অবস্থায়ই এর প্রয়োগ করা যায়। অন্যথায় নয়। (দরসে তিরমিযী ঃ ৩)

মাতা-পিতার হকসমূহ

(১) যদি মাতা-পিতার প্রয়োজন হয় এবং সন্তান তাদের খোরপোশ দিতে সক্ষম হয়, তাহলে মাতা-পিতার খোরপোশ দেওয়া সন্তানের উপর ওয়াজিব। এমনকি পিতা-মাতা কাফির হলেও।

(২) প্রয়োজনে মাতা-পিতার খেদমত করা। খেদমত নিজে করবে কিংবা কোন লোক রেখে দিবে। তবে খেদমতের ক্ষেত্রে পিতার তুলনায় মাতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৩) পিতা-মাতা কোন কাজে আহবান করলে সন্তানের জন্য সাড়া দেওয়া ওয়াজিব। এমনকি তাঁরা যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় কিংবা সমস্যায় পড়ার ভয়ে সহযোগিতার জন্য আহবান করেন আর অন্য কেউ তাদের সহযোগিতা করার মত না তাকে, তাহলে ফরয নামাযে থাকলেও তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। তবে প্রয়োজন ছাড়া যদি ডাকে তাহলে ফরয নামায ছাড়া জায়িয নেই। আর নফল বা সুন্নাত নামাযে থাকা অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে পিতা-মাতা ডাকলে মাসআলা হল, যদি সে নামাযে আছে একথা না জেনে ডাকেন, তাহলে নামায ছেড়ে তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি নামাযে আছে এ কথা জেনেও বিনা প্রয়োজনে ডাকেন, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে নামায ছাড়বে না। দাদা-দাদী, নানা-নানীর ক্ষেত্রেও মাসআলা এটাই।

(৪) মাতা-পিতা নির্দেশ মানা ওয়াজিব। যদি শরী'আত পরিপন্থী কোন নির্দেশ না হয়। মুসতাহাব পর্যায়ের ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে সফর করতে হলে তাদের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। তবে ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়াহ পর্যায়ের ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে সফর করাটা তাদের অনুমতির উপর নির্ভরশীল নয়।

(৫) পিতা-মাতা সঙ্গে আন্তরিকতা, ভক্তি ও আদব বজায় রেখে কথা বলতে হবে। রুঢ়ভাবে ও ধমকের স্বরে কথা বলা জায়িয হবে না।

(৬) আচার-আচরণে তাদের আদব রক্ষা করে চলতে হবে। তাদের নাম ধরে ডাকা যাবে না। তাদের দিকে রুঢ় দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না। এ ক্ষেত্রে মাতার তুলনায় পিতা অগ্রাধিকার পাবে।

(৭) কোনভাবে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম। তাঁরা অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলেও তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এমনকি মৃত্যুর পরও তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ। এজন্যই তাঁদের মৃত্যুর পর চিৎকার করে কাঁদা নিষেধ। কারণ, এতে তাঁদের আত্মা কষ্ট পায়।

(৮) নিজের জন্য যখনই দু'আ করবে, তখনই পিতা-মাতার মাগফিরাতের জন্য এবং তাঁদের কষ্ট দূর হওয়ার জন্য দু'আ করা কর্তব্য। তাঁদের মৃত্যুর পরও আজীবন তাঁদের জন্য দু'আ করা কর্তব্য। পিতা-মাতা কাফির হলে তাঁদের জন্য হেদায়াতের দু'আ করা কর্তব্য।

(৯) পিতা-মাতার খাতিরে তাঁদের বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং সাধানুযায়ী উপকার ও সাহায্য করবে।

(১০) পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা এবং তাঁদের জায়িয অছিয়ত পালন করাও তাঁদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

(তা'লীমুদ্দীন, মা'আরিফুল কুরআন)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ صـ١٢

অনুচ্ছেদ ঃ ৪. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاَبُوْ بَكْرَةَ اِسْمُهُ نُفَيْعٌ

৬. হুমায়দ ইবনে মাসআদা রহ.... আবদুর রহমান ইবনে আবূ বাকরা তার পিতা আবূ বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে আমি কি তোমাদের বলব না? সাহাবীগণ বললেন– হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম টেক লাগানা অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু তিনি সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং বললেন, আর হল মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান কিংবা তিনি বলেছেন, মিথ্যা উক্তি। তিনি এটিকে বারবার এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, আমরা ভাবছিলাম, আহ! তিনি যদি চুপ করতেন! এ বিষয়ে আবূ সাঈদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবূ বাকরা রাযি.-এর নাম হল নুফায় ইবনুল হারিছ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْكَبَائِرِ اَنْ يَشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَشْتِمُ اُمَّهُ فَيَشْتِمُ اُمَّهُ، هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

৭ কুতায়বা রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পিতা-মাতাকে গালাগালি করা কবীরা গুনাহ। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি কি তার পিতা-মাতাকে গালাগালি করতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! একজন অন্যের পিতাকে গালি দেয়, ফলে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। কেউ কারও মাকে গালি দেয়, তখন সেও তার মাকে গালি দেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اكبر الكبائر ঃ এখানে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে من تبعيضية উহ্য আছে। অর্থাৎ মূলতঃ من اكبر الكبائر ছিল। কেননা কবীরা গুনাহর তালিকা দীর্ঘ। যেমন, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, গীবত করা, ব্যভিচার করা ইত্যাদি। সহীহাইনের একটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম আ'মল হল, সময় মত নামায পড়া, তারপর মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করা। যেমনিভাবে বড় বড় নেক আ'মলের তালিকায় মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের বিষয়টি এসেছে, অনুরূপভাবে বড় বড় গুনাহর তালিকায়ও মাতা-পিতাকে অবজ্ঞা

করার বিষয়টি এসেছে।

جلس وكان متكئا ঃ এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোজা হয়ে বসার কারণ হল, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হারাম হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বসহ বর্ণনা দেওয়া। অবশ্য শিরক তার চেয়েও বড় গুনাহ। কিন্তু শিরকের গুনাহ বর্ণনা করার সময় এ পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। কেননা শিরকের গুনাহ থেকে মানুষ সাধারণতঃ বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্যদান থেকে মানুষ ততটা সতর্ক থাকে না। তাই এটিকে গুরুত্ব দেওয়াই ছিল অধিক যুক্তিযুক্ত।

قلنا ليته سكت ঃ সাহাবায়ে কিরাম ليته سكت বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অধিক ভালবাসার কারণে। যেহেতু বারবার একটা কথা উচ্চারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামান্য হলেও কষ্ট হচ্ছিল। অথচ সাহাবায়ে কিরাম প্রথম কথাতেই বিষয়টি বুঝে গেছেন।

কবীরা এবং সগীরা গুনাহর মাঝে কোন প্রকারভেদ আছে কিনা?

গুনাহর কোন প্রকারভেদ আছে কিনা? এ ব্যাপারে উলামাযে কিরামের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে গুনাহর কোন প্রকারভেদ নেই বরং সকল গুনাহই মূলতঃ কবীরা। এটা আবূ ইসহাক ইসফারাইনীরও অভিমত। তাঁরা দলীল হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. এর উক্তিকে পেশ করেন। তিনি বলেছেন- كل ما نهى الله عنه فهو كبير কিন্তু পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জমহূর উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, গুনাহ দুই প্রকার। (১) কবীরাহ। (২) সগীরা।

জমহুরের দলীলসমূহ

ان تجتنبون كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سياتكم

(১) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন, কিছু কিছু গুনাহ তাওবা ছাড়াও নেক আমলের মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, প্রথম প্রকারের গুনাহকেই বলা হয়, কবীরা গুনাহ। আর দ্বিতীয় প্রকার গুনাহকে বলা হয়, সগীরা গুনাহ। (এ ছাড়াও কুরআনে কারীমের একাধিক আয়াত রয়েছে।)

(২) আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস ঃ

عن ابى بكرة قال قال رسول الله ﷺ الا أحدثكم باكبر الكبائر (الخ)

(৩) অনুরূপ বুখারী শরীফের একটি হাদীসেও এসেছে-

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ الكبائر الاشراك بالله... الخ

এ ছাড়াও এর সমর্থনে আরও বহু হাদীস বিদ্যমান।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

প্রতিপক্ষ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর উক্তি দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, তার জবাবে বলা হবে, স্বয়ং ইবনে আব্বাস রাযি. এর থেকেও গুনাহর প্রকারভেদ বর্ণিত রয়েছে।

সগীরা গুনাহ ও কবীরা গুনাহর সংজ্ঞা

এ ব্যাপারে একাধিক মতামত রয়েছে। যথা-

(১) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ও হাসান বসরী রহ. এর মতে যে গুনাহের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন কিংবা লা'নত ও গযবের সাথে সতর্ক করেছেন, সে গুনাহ কবীরা গুনাহ। আর এরূপ না হলে

সেটি সগীরা গুনাহ।

(২) যে গুনাহ ফাযায়েলে আ'মলের মাধ্যমে মাফ হয় না, সেটি কবীরা গুনাহ। আর মাফ হলে সগীরাহ গুনাহ।

(৩) যে গুনাহর জন্য শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিদণ্ড রয়েছে, সেটি কবীরা গুনাহ

(৪) যে গুনাহ করার সময় গুনাহগার বেপরোয়া হয়ে করে, সেটি কবীরা গুনাহ। আর যে গুনাহ করার সময় অন্তরে ভয় ও লজ্জা থাকে, সেটি সগীরাহ গুনাহ।

(৫) যে গুনাহ সম্পর্কে فاحشة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি কবীরা গুনাহ।

(৬) যে গুনাহ করলে অপরের হক নষ্ট হয় অথবা দীনের অবমানা হয়, সেটি কবীরা গুনাহ।

(৭) ইমাম গাযালী রহ. বলেন, কবীরা ও সগীরা একটি আপেক্ষিক বিষয়। প্রত্যেক গুনাহ তার উপরের স্তরের গুনাহর তুলনায় সগীরা আর নিম্নস্তরের গুনাহর তুলনায় কবীরা।

(৮) আল্লামা আবুল হাসান ওয়াহিদী বলেন, মূলতঃ কবীরা ও সগীরাহর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। ইসলামী শরী'আত কিছু গুনাহকে কবীরা হিসাবে বর্ণনা দিয়েছে আর কিছু গুনাহকে সগীরা হিসাবে বর্ণনা করেছে। আর কিছু গুনাহর কোন বর্ণনা দেয়নি। যেগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়নি সেগুলোও মূলতঃ এ দুপ্রকারের কোন এক প্রকারে শামিল হবে।

ইনযারুল আশায়ের মিনাস্ সাগায়েরে ওয়াল কাবায়ের

কবীরা ও সগীরা গোনাহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মূল ঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.

বর্তমান যুগে অপরাধ ও গুনাহের সংখ্যাধিক্য মহামারি আকার ধারণ করেছে। গুনাহের সয়লাব আজ জল-স্থল, পূর্ব-পশ্চিম সকল দিক আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে। ফলে আল্লাহর কোন বান্দা গোনাহ থেকে বাঁচার ইচ্ছা করলেও পৃথিবীর পরিবেশ তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে। অনেকেই সাহস হারিয়ে গুনাহ থেকে বাচাঁর ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত ত্যাগ করে ফেলেন। কিন্তু রোগ যত ব্যাপক আকারই ধারণ করুক এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা যতই ব্যর্থ হোক তবুও বিবেক-বুদ্ধি, স্বভাব ও শরী'আত একথাই বলে যে, এমতাবস্থায়ও রোগ মুক্তির চেষ্টা পরিত্যাগ করলে চলবে না বরং বক্তৃতা, লিখনী ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগে জর্জরিত এ পরিবেশকে রোগমুক্তি ও পরিশুদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা কবীরা ও সগীরা গুনাহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করলাম। যেন তা পড়ে মানুষ প্রথমতঃ রোগকে রোগ ও গুনাহকে গুনাহ মনে করে। ফলশ্রুতিতে, গুনাহের কারণে অনুতাপ ও অনুশোচনা সৃষ্টি হবে। আর এটিই তওবার প্রথম রুকন। এর দ্বারা গুনাহসমূহ মিটে যায়। দ্বিতীয়তঃ যখন গুনাহকে গুনাহ মনে করবে এবং এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, তখন ইনশাআল্লাহ একদিন না একদিন তাওবা করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক নসীব হবে।

কবীরা ও সগীরা গুনাহের সংজ্ঞা

একদল আলেমের মতে প্রত্যেকটি গুনাহই কবীরা। সগীরা বলতে কোন গুনাহ নেই। কেননা গুনাহ মানেই আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করা। আর আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় লিপ্ত হওয়া, তা যত ক্ষুদ্র ও সামান্যই হোক না কেন, মস্তবড় গুনাহের কাজ। এজন্য কোন গুনাহকেই সগীরা বলা যায় না। তবে গুনাহকে সগীরা ও কবীরা এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করার যে নিয়ম প্রসিদ্ধ রয়েছে, তা শুধু তুলনামূলক। অর্থাৎ একটি গুনাহ অপর গুনাহের তুলনায় ছোট-বড় হয়। অপেক্ষাকৃত ছোট গুনাহটিকে সগীরা ও বড় গুনাহটিকে কবীরা বলা হয়। শাইখ আবু ইসহাক ইস্ফারানী, কাযী আবু বকর বাকীল্লানী, ইমামুল হারামাইন তাকাউদ্দীন বাকী এবং

আশ'আরী উলামায়ে কিরামের অভিমতও তা-ই।

অপরদিকে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, সকল গুনাহই কবীরা নয় বরং কিছু গুনাহ কবীরা ও কিছু গুনাহ সগীরা। কেননা এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কিরাম একমত যে, কতিপয় গুনাহ এমন রয়েছে, যেগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ফাসিক ও তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত হয়। অপরদিকে কিছু গুনাহ এরূপ রয়েছে, যেগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ফাসিক বলা যায় না এবং তার সাক্ষ্যও বাতিল বলে গণ্য হয় না।

পরিভাষায় প্রথম প্রকারকে কবীরা ও দ্বিতীয় প্রকারকে সগীরা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে উলামায়ে কেরামের এ মতানৈক্য শুধু নাম নিয়ে। তাঁদের মাঝে মৌলিক কোন মতপার্থক্য নেই। কেননা কতিপয় গুনাহকে যারা সগীরা বলে মত প্রকাশ করেন, তাদের এ মতের অর্থ এই নয় যে, সগীরা গুনাহে কোন ক্ষতি নেই কিংবা তা একেবারেই তুচ্ছ বরং গুনাহ মানেই আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি গুনাহই বড় এবং মহাবিপদের কারণ। আগুনের বিরাট স্ফুলিঙ্গ যেমন ধ্বংসাত্মক, এর ছোট ফুলকিও তেমনি ধ্বংসাত্মক। কিন্তু ছোট হোক কিংবা বড় উভয়ই মানুষের জন্য বিপদজনক।

কবীরা ও সগীরার পারিভাষিক অর্থ নিয়ে পূর্বোল্লেখিত মতপার্থক্য ছাড়াও আরও বহু মত রয়েছে। আল্লামা ইবনে নুজাইম তাঁর পুস্তিকায় প্রায় ৪০ টি অভিমত উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে আল্লামা ইবনে হাজার হিশামীও এ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে যে অভিমতটি সবচেয়ে বেশী অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন থেকে বর্ণিত, তা হল, যে সকল গুনাহের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে অথবা হাদীস শরীফে সুস্পষ্টরূপে আগুন ও জাহান্নামের বিভিন্ন শাস্তির কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে কবীরা। আর সে সকল গুনাহের বেলায় স্পষ্টরূপে এরূপ শাস্তির কথা না বলে শুধু নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেগুলো হচ্ছে সগীরা। হযরত হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুজাহেদ, যাহহাক প্রমূখ মনীষীগণের অভিমতও এটিই। (যাওয়াজের)

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, মানুষ বেপরোয়াভাবে যে গুনাহে লিপ্ত হয়, সেটি কবীরা গুনাহ– তা যতই সামান্য ও ক্ষুদ্র হোক না কেন। আর যে গুনাহে মানুষ ঘটনাক্রমে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সাথে সাথে অন্তরে খোদার ভয় জাগে এবং এর জন্য সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়, তা যত বড়ই হোক –সেটি সগীরা গুনাহ।

সগীরা গুনাহে বারবার লিপ্ত হলে তা কবীরা হয়ে যায়

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, যে গুনাহকে সগীরা বলা হয়, তা ততক্ষণ পর্যন্ত সগীরা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা বারবার করা না হয় বরং মাঝেমধ্যে সংঘটিত হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি কোন সগীরা গোনাহে বারবার লিপ্ত হয় এবং তাতে অভ্যাস গড়ে তোলে, সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির মতই সমান অপরাধী। তাছাড়া কেউ যদি এত অধিক পরিমাণে সগীরা গোনাহে লিপ্ত হয় যে, এর সংখ্যা তার ইবাদতের চেয়েও বেশী হয়ে যায়, তাহলে সেও ফাসেক বলে গণ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। (যাওয়াজের)

নিম্নে কবীরা ও সগীরা গুনাহের তালিকা আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. -এর রচিত গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হল।

কবীরা গুনাহসমূহ

(১) যিনা অর্থাৎ নারীর সতীত্ব হরণ করা।

(২) লাওয়াতাত অর্থাৎ ছেলেদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়া।

(৩) মদ পান করা। যদিও তা এক ফোটাই হোক না কেন। এমনিভাবে তাড়ি, গাঁজা, ভাঙ্গ প্রভৃতি নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি পান করাও কবীরা গুনাহ।

(৪) চুরি করা।

(৫) সতী-সাধ্বী নারীর উপর যিনার অপবাদ দেওয়া।

(৬) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

(৭) সাক্ষ্য গোপন করা –যখন তাকে ছাড়া অন্য কোন সাক্ষ্য দাতা না থাকে।

(৮) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

(৯) মিথ্যা কসম খাওয়া।

(১০) কারও ধন-সম্পদ লুট করা।

(১১) জিহাদের ময়দান হতে (প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও) পলায়ণ করা।

(১২) সুদ খাওয়া।

(১৩) অন্যায়ভাবে এতিমের মাল খাওয়া।

(১৪) ঘুষ লওয়া।

(১৫) পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া।

(১৬) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (নিকটাত্মীয়দের হক আদায় না করা)

(১৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি স্বেচ্ছায় কোন মিথ্যারোপ করা।

(১৮) কোন ওযর-অসুবিধা ছাড়াই রমাযানের রোযা ভঙ্গ করা।

(১৯) ওজনে কম দেওয়া।

(২০) কোন ফরয নামাযকে তার নির্ধারিত ওয়াক্তের আগে বা পরে আদায় করা।

(২১) যাকাত কিংবা রোযাকে নির্ধারিত সময়ে আদায় না করা। (ওযর থাকলে ভিন্ন কথা)

(২২) ফরয হজ্জ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করা। (যদি মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করে যায় এবং হজ্জ আদায়ের খরচাদিসহ যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে যায়, তাহলে গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে।)

(২৩) অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করা।

(২৪) কোন সাহাবীকে মন্দ বলা।

(২৫) উলামায়ে কিরাম ও হাফেযগণকে মন্দ বলা এবং তাদের বদনাম করার পেছনে লাগা।

(২৬) জালেমের কাছে কারও চুগলখোরী (কুটনামী) করা।

(২৭) আপন স্ত্রী, কন্যা, বোন ও অধীনস্থ মেয়েদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম কাজে লিপ্ত করা বা তাতে রাজী থাকা।

(২৮) কোন বেগানা মহিলাকে হারাম কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং এর জন্য দালালী করা।

(২৯) ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা।

(৩০) যাদু নিজে শিখা, অপরকে শিখানো বা এর উপর আমল করা।

(৩১) কুরআন শরীফ মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া। (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় অলসতা ও অবহেলার দরুন ভুলে যাওয়া) অবশ্য অসুস্থতা বা দুর্বলতার কারণে ভুলে গেলে গুনাহ হবে না) কোন কোন আলেম বলেছেন, ভুলে যাওয়ার অর্থ হল, দেখেও পড়তে না পারা।

(৩২) কোন জীবন্ত প্রাণীকে আগুনে পোড়ানো। (অবশ্য সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদির অনিষ্টতা ও উৎপাত হতে বাঁচার জন্য পোড়ানো ব্যতিত অন্য কোন উপায় না থাকলে পোড়াতে কোন দোষ নেই।

(৩৩) কোন স্ত্রী লোককে তার স্বামীর নিকট যেতে এবং স্বামীর অধিকার আদায় করতে বাঁধা দেওয়া।

(৩৪) আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া।

(৩৫) আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে নির্ভয় হওয়া অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে ভয় না করা।

(৩৬) মৃত জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া। (অবশ্য নিরুপায় হয়ে খেলে কোন দোষ নেই।)

(৩৭) শূকরের গোশত খাওয়া। (নিরুপায় হয়ে খেলে কোন গুনাহ হবে না)

(৩৮) চোগলখুরী (কুটনামী) করা।

(৩৯) কোন মুসলমান বা অমুসলমানের অগোচরে তার দোষ বর্ণনা বা গীবত করা।

(৪০) জুয়া খেলা (৪১) সম্পদের অপচয় অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা।

(৪২) সমাজে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করা।

(৪৩) শাসক বা বিচারক হয়ে ন্যায়ভাবে বিচার না করা।

(৪৪) স্ত্রীকে মা বা মেয়ের মত বলা। আরবীতে একে 'যিহার' বলে।

(৪৫) ডাকাতি করা। (৪৬) কোন সগীরা গুনাহ বারবার করা।

(৪৭) অপরকে গোনাহের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা বা গোনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

(৪৮) গান শোনা বা শোনানো।

(৪৯) মানুষের সামনে সতর খোলা।

(৫০) হযরত আলী রাযি. কে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও উমর ফারুক রাযি. অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা।

(৫১) কোন ওয়াজিব (অত্যাবশ্যকীয়) হক আদায় করতে কৃপণতা করা।

(৫২) আত্মহত্যা করা কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ দেহের কোন অঙ্গ নষ্ট বা অকেজো করে ফেলা। এটি অপরকে হত্যা করার চেয়েও মারাত্মক ও অধিক গুনাহের কাজ।

(৫৩) প্রস্রাবের ফোটা-ছিটা হতে বেঁচে না থাকা।

(৫৪) সদকা বা হাদিয়া দিয়ে খোটা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়া।

(৫৫) তাকদীরকে অস্বীকার করা।

(৫৬) আপন আমীরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

(৫৭) গণক বা যোতিষির কথা বিশ্বাস করা।

(৫৮) অন্যের বংশকে খারাপ বলা বা দোষারোপ করা।

(৫৯) নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাখলূক (পীর, ফকীর, গাউস, কুতুব প্রমুখ) এর নামে মান্নত ও পশু কুরবানী করা।

(৬০) লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি স্বেচ্ছায় ও অহংকার ভরে টাখনুর নিচে পরিধান করা।

(৬১) কোন ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করা বা কোন কুপ্রথা চালু করা।

(৬২) মুসলমান ভাইকে তলোয়ার, চাকু, বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি দেখিয়ে মেরে ফেলার ইশারা করা।

(৬৩) ঝগড়া-ফাসাদ বা মারপিটের অভ্যাস থাকা।

(৬৪) আপন গোলামকে খাসী বানানো অথবা তার কোন, অঙ্গ কেটে ফেলা অথবা তাকে ভীষণ কষ্ট দেওয়া।

(৬৫) অনুগ্রহ বা উপকারকারীর প্রতি না-শোকরী করা বা অকৃতজ্ঞ হওয়া।

(৬৬) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে দিতে কৃপনতা করা।

(৬৭) হেরেম শরীফে ধর্মদ্রোহীতা বা কোন গুমরাহীর কাজ করা।

(৬৮) মানুষের গোপন দোষ তালাশ করা এবং এর পিছনে লেগে থাকা।

(৬৯) গুটি দ্বারা জুয়া খেলা। তবলা, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাজানো। (যে সকল খেলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত, সেগুলোতে লিপ্ত হওয়াও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।)

(৭০) ভাঙ্গ খাওয়া বা পান করা।

(৭১) এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফির বলা।

(৭২) একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের অধিকার আদায়ে সমতা রক্ষা না করা।

(৭৩) হস্ত মৈথুন করা (অর্থাৎ স্বীয় হাত ইত্যাদি দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে বীর্যপাত ঘটানো।)

(৭৪) হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া।

(৭৫) মুসলমানদের দুরবস্থা ও অভাব-অনটনে আনন্দ বোধ করা।

(৭৬) কোন জানোয়ার যেমন, গাভী, বকরী, ভেড়া ইত্যাদির সাথে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া। (নাউযুবিল্লাহ)

(৭৭) আলেম তাঁর ইলেম অনুযায়ী আমল না করা।

(৭৮) কোন খাদ্যদ্রব্যকে মন্দ বলা। (তৈরী বা রান্নার ত্রুটি বর্ণনা করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।)

(৭৯) গান-বাদ্য সহ নাচা।

(৮০) দুনিয়াকে মহব্বত করা অর্থাৎ দ্বীনের মোকাবেলায় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া।

(৮১) দাড়িবিহীন ছেলেদের প্রতি কামভাবসহ দৃষ্টিপাত করা।

(৮২) অপরের ঘরে উঁকি মারা।

(৮৩) বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করা। (এ ব্যাপারে মুসলমানগণ চরম উদাসীন। অনেকেই অজ্ঞতাবশতঃ বা জেনেও এ মহাপাপে লিপ্ত। এ থেকে আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন! –অনুবাদক)

সগীরাহ গুনাহসমূহ ঃ

(১) গাইরে মাহরাম অর্থাৎ যে সকল মহিলাদের সাথে বিবাহ জায়েয, স্বেচ্ছায় তাদের দিকে তাকানো অথবা স্পর্শ করা অথবা এরূপ মহিলার সাথে নির্জন ঘরে বসা।

(২) কোন মানুষ বা পশুকে অভিশাপ দেওয়া।

(৩) এরূপ মিথ্যা বলা, যদ্দারা অপরের ক্ষতি না হয়।

(৪) কোন মুসলমানের দুর্নাম রটানো, যদিও তা সত্য হয় এবং ইশারা-ইংগিতেই করা হয়।

(৫) বিনা প্রয়োজনে এমন বিল্ডিং বা উচুঁ স্থানে উঠা, যেখান থেকে অন্য লোকদের ঘর-বাড়ী দেখা যায়।

(৬) বিনা ওযরে বা অকারণেই কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা।

(৭) না জেনে-শুনে এবং যাচাই-বাছাই না করেই কারও পক্ষপাতিত্ব করা বা জেনে-বুঝে সত্যের বিপরীতে ঝগড়া করা।

(৮) নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে হাসা বা কোন মুসীবতের কারণে ক্রন্দন করা।

(৯) পুরুষদের রেশমী কাপড় ব্যবহার করা।

(১০) কথাবার্তা ও চাল-চলনে অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করা

(১১) কোন ফাসিক-পাপাচারীর নিকট বসা।

(১২) মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বি-প্রহরের সময় নামায পড়া।

(১৩) নিষিদ্ধ দিনগুলিতে (দুই ঈদ ও তাশরীকের দিনগুলিতে) রোযা রাখা।

(১৪) মসজিদে নাপাক বা অপবিত্র জিনিশ প্রবেশ করানো।

(১৫) মসজিদে কোন পাগল বা এমন ছোট শিশু নিয়ে যাওয়া, যাদের দ্বারা মসজিদ নাপাক হওয়ার আশংকা আছে।

(১৬) প্রস্রাব-পায়খানার সময় কেবলামুখী হয়ে অথবা কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসা।

(১৭) গোসল খানায় কাপড়-চোপড় খুলে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া, যদিও সেখানে কোন লোক না থাকে।

(১৮) 'সওমে বেসাল' অর্থাৎ মাঝখানে একদিনও বাদ না দিয়ে একাধারে রোযা রাখা।

(১৯) যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে যিহারের কাফ্‌ফারা আদায়ের পূর্বে সহবাসে লিপ্ত হওয়া।

(২০) মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাদের সফর করা। (অবশ্য নিরুপায় হয়ে তাদের একাকী বা গাইরে মাহরামের সাথে সফর করাতে কোন অসুবিধা নেই।)

(২১) কোন বস্তু নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে দাম-দর চলছে অথবা কোন মহিলার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুই পক্ষ আলাপ-আলোচনা করছে, এমতাবস্থায় তাদের চূড়ান্ত জবাবের পূর্বে তাদের বেচাকেনা বা বিবাহের পয়গামে কোনরূপ বাঁধার সৃষ্টি করা।

(২৩) গ্রামবাসীরা যে সকল মালা-মাল শহরে নিয়ে আসে, সেগুলোকে দালালী করে ক্রয় করা।

(২৪) শহরের উদ্দেশ্যে আগত মালামাল শহরে পৌঁছার পূর্বেই শহরের বাইরে গিয়ে খরিদ করে ফেলা।

(২৫) জুম'আর আযানের পর বেচাকেনা করা।

(২৬) বিক্রয়ের সময় মালের দোষ ত্রুটি গোপন করা।

(২৭) সখ করে কুকুর পালা। (শিকার বা ফসলের হিফাযতের উদ্দেশ্যে পাললে তা জায়েয আছে।)

(২৮) মদ ঘরে রাখা।

(২৯) দাবা খেলা।

(৩০) মদ বেচাকেনা করা।

(৩১) তুচ্ছ-মামুলী বা সাধারণ জিনিস এক দুই মুষ্ঠি চুরি করা।

(৩২) হাদীস শুনানো বা বলে দেওয়ার বিনিময়ে চুক্তি করে পারিশ্রমিক লওয়া।

(৩৩) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা।

(৩৪) পানির ঘাট বা গোসল খানায় প্রস্রাব করা।

(৩৫) নামাযে নিয়মের বিপরীত কাপড় পরিধান করা।

(৩৬) জানাবাত অর্থাৎ গোছল ফরয হওয়া অবস্থায় আযান দেওয়া।

(৩৭) জানাবাতের অবস্থায় বিনা ওযরে মসজিদে প্রবেশ করা।

(৩৮) নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো।

(৩৯) নামাযে লম্বা চাদর এভাবে পরিধান করা যে, এর ভেতর থেকে হাত বের করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

(৪০) নামাযে কাপড় অথবা শরীর নিয়ে খেলা করা অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কোন অঙ্গ নাড়াচাড়া করা অথবা কাপড় উলট-পালট করা।

(৪১) নামাযরত ব্যক্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা বা দাঁড়ানো।

(৪২) নামাযের মধ্যে ডানে বামে বা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

(৪৩) মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা।

(৪৪) মসজিদে ইবাদত ছাড়া অন্য কোন কাজ করা।

(৪৫) রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে 'মোবাশারাত' করা অর্থাৎ বস্ত্রহীন অবস্থায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরা।

(৪৬) রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমো দেওয়া, যদি এতে সীমালংঘন অর্থাৎ সহবাস পর্যন্ত গড়ানোর আশংকা না থাকে।

(৪৭) জানোয়ারকে পিছন অর্থাৎ ঘাড়ের দিক দিয়ে যবাই করা।

(৪৮) নিকৃষ্ট মাল দ্বারা যাকাত আদায় করা।

(৪৯) পচা-গলা অথবা পানির উপর ভেসে উঠা মৃত মাছ খাওয়া।

(৫০) মাছ ছাড়া অন্য কোন মৃত জানোয়ার খাওয়া।

(৫১) হালাল ও যবাইকৃত প্রাণীর বিশেষ অঙ্গ, মূত্রথলী ও মাংস গ্রন্থি (জন্তুর দেহে উত্থিত গোলাকার জমাট মাংস) খাওয়া।

(৫২) সরকারের পক্ষ হতে বিনা-প্রয়োজনে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা।

(৫৩) ওলি বা অভিবাবকের অনুমতি ব্যতিত বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্কা (সাবালিকা, বিবেকবান) মেয়ের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। (তবে বিনা কারণে ওলী যদি বিবাহে বাঁধা সৃষ্টি করে, সে ক্ষেত্রে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে বসাতে কোন দোষ নেই।)

(৫৪) 'নিকাহে শেগার' করা অর্থাৎ কোন মেয়েকে বিয়ে করে তাকে মহর দেওয়ার পরিবর্তে নিজ কন্যাকে পাত্রী পক্ষের কারও নিকট বিয়ে দেওয়া।

(৫৫) স্ত্রীকে এক সাথে একাধিক তালাক দেওয়া।

(৫৬) বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেওয়া (প্রয়োজনে স্ত্রীকে রজয়ী তালাক দেওয়া উচিত।)

(৫৭) হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া (তবে এসময় খোলা' করাতে কোন অসুবিধা নেই।)

(৫৮) যে তুহরে স্ত্রীসহবাস করা হয়েছে ঐ তুহরে তালাক দেওয়া। (হায়েয হতে পবিত্র দিনগুলোকে তুহর বলা হয়।)

(৫৯) স্ত্রীকে তালাকে রজঈ প্রদান করে সহবাসের মাধ্যমে (রজয়াত করা বা) ফিরিয়ে আনা। (কারণ, এ অবস্থায় স্ত্রীকে মুখের কথার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা উত্তম।)

(৬০) স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া অথবা ইদ্দত দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছায় (রজ'আত করা) ফিরিয়ে আনা।

(৬১) স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঈ'লা করা ও অর্থাৎ স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার কসম খাওয়া।

(৬২) সন্তান-সন্ততিকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রদানের বেলায় সমতা রক্ষা না করা। (অবশ্য কোন ছেলে বা মেয়েকে তার যোগ্যতা ও ইলমের কারণে কিছু বেশী প্রদান করলে কোন অসুবিধা নেই।)

(৬৩) বিচারক ও প্রশাসকের জন্য বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের সাথে বৈঠকে অথবা লক্ষ্য ও মনোযোগের ক্ষেত্রে সমান দৃষ্টি না রাখা।

(৬৪) বাদশাহের দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করা।

(৬৫) যে ব্যক্তির নিকট হারাম মাল বেশী আর হালাল মাল কম, এমন ব্যক্তির হাদিয়া বা দাওয়াত বিনা ওযরে যাচাই-বাছাই না করে গ্রহণ করা।

(৬৬) লুণ্ঠিত জমি হতে উৎপন্ন ফসল ভক্ষণ করা।

(৬৭) লুণ্ঠিত জমিতে প্রবেশ করা, যদিও নামাযের জন্য হয়।
(৬৮) অন্যের জমিতে মালিকের অনুমতি ব্যতিত চলা।
(৬৯) কোন জানোয়ারের নাক-কান ইত্যাদি কাটা।
(৭০) কোন হারবী (অর্থাৎ অমুসলিম দেশের কাফির) মুরতাদ (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীকে) তিনদিন পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে হত্যা করা।
(৭১) ধর্মত্যাগী মহিলাকে হত্যা করা।
(৭২) নামাযের মধ্যে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হলে তা আদায়ে দেরী করা অথবা ছেড়ে দেওয়া।
(৭৩) নামাযের মধ্যে কোন বিশেষ সূরা পড়াকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া।
(৭৪) জানাযার খাটলকে পাল্কীর মত বাঁশ বেঁধে উঠানো।
(৭৫) বিনা প্রয়োজনে দু'জনকে একই কবরে দাফন করা।
(৭৬) জানাযার নামায মসজিদে পড়া। (যে হাদীসে মসজিদে জানাযার নামায পড়া হারাম বলা হয়েছে, সেই হাদীস অনুযায়ী)
(৭৭) ডানে-বামে বা সামনে কোন ছবি রেখে নামায পড়া অথবা তার উপর সিজদা করা।
(৭৮) স্বর্ণের তার দিয়ে দাঁত বাঁধা।
(৭৯) স্বর্ণের বা রৌপ্যের বাসন ব্যবহার করা।
(৮০) মৃত ব্যক্তির চেহারা চুম্বন করা।
(৮১) কোন কাফিরকে বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা। (অবশ্য সে আগে সালাম দিলে তার জবাবে "ওয়া আলাইকা" বা 'হাদাকাল্লাহু' বলা উচিত।)
(৮২) ইসলাম বিরোধী সম্প্রদায়ের নিকট হাতিয়ার বা যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয় করা।
(৮৩) খাসীকৃত গোলাম থেকে কোনরূপ খেদমত লওয়া অথবা তার উপার্জিত সম্পদ থেকে খাওয়া।
(৮৪) বালেগ পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ এমন কোন পোশাক বাচ্চাদেরকে পরিধান করানো।
(৮৫) আপন মনে খুশি ও শান্তি আনার উদ্দেশ্যে গান গাওয়া।
(৮৬) কোন ইবাদত আরম্ভ করে ছেড়ে দেওয়া।
(৮৭) এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতে আপন স্ত্রী বা দাসীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া, যে যৌন বিষয়ে জ্ঞান রাখে। যদিও সে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। (অবশ্য ছোট ছোট শিশু যারা এ ব্যাপারে কিছুই বুঝে না, তাদের থাকাতে কোন দোষ নেই।)
(৮৮) দাড়িবিহীন কোন বালক শাসকের অভ্যর্থনার জন্য বের হওয়া।
(৮৯) রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা। যাতে লোক চলাচলে কষ্ট হয়।
(৯০) আযান শোনার পর ইকামতের অপেক্ষায় ঘরে বসে থাকা।
(৯১) পেট ভরে যাওয়ার পরও খাওয়া। (তবে রোযা বা মেহমানের খাতিরে কিছু বেশী খেলে কোন দোষ নেই।)
(৯২) ক্ষুধা ব্যতিত খাওয়া। (অবশ্য যদি কোন রোগের কারণে ক্ষুধাই না লাগে অথবা শক্তি বৃদ্ধির জন্য খানার প্রয়োজন হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।)
(৯৩) আলেম, বুযুর্গ ও পিতা ছাড়া অন্য কারও হাত চুম্বন করা।
(৯৪) শুধু হাত দিয়ে সালাম করা। (তবে যাকে সালাম দেওয়া হচ্ছে, সে যদি বধির হয় কিংবা দূরে থাকে, তাহলে মুখে সালাম দেওয়ার সাথে সাথে হাত দিয়ে ইশারা করাতেও কোন দোষ নেই।)
(৯৫) কুরআন পড়ায় মগ্ন ব্যক্তির জন্য আপন পিতা অথবা উস্তাদ ব্যতিত অন্য কারও সম্মানার্থে দাঁড়ানো।
ফকীহ আবুল লাইস রহ. এর মতে আরও কিছু সগীরা গুনাহ।
(৯৬) কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা।
(৯৭) হিংসা করা।
(৯৮) অহংকার ও আত্মম্ভরিতা করা। (নিজেকে বড় মনে করা) (৯৯) গান শুনা

(১০০) গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তির বিনা ওযরে মসজিদে বসা।
(১০১) কোন মুসলমানের গীবত শুনে চুপ থাকা।
(১০২) মুসীবতের সময় আওয়াজ করে চিৎকার করে কাঁদা। বুকে হাত মারা ইত্যাদি।
(১০৩) যদি লোকজন কোন ইমামের উপর অসন্তুষ্ট থাকে, উক্ত ইমাম ঐসব লোকের ইমামতি করা, যদিও তাদের অসন্তুষ্টি বিনা কারণেই হয় এবং তার মধ্যে কোন দোষ না থাকে।
(১০৪) খুতবার সময় কথা বলা।
(১০৫) মসজিদে গিয়ে লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া।
(১০৬) মসজিদের ছাদে নাপাকী ফেলা।
(১০৭) লোক চলাচলের পথে নাপাকী ফেলা।
(১০৮) সাত বছরের বেশী বয়সের ছেলের সাথে মায়ের এক বিছানায় শয়ণ করা।
(১০৯) হায়েয-নেফাস বা জানাবাত (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা।
(১১০) বাজে কথায় বা কাজে সময় নষ্ট করা। যেমন- আগেকার রাজা-বাদশাহদের ভোগবিলাস ও আরাম আয়েশের আলোচনা করা।
(১১১) উপকারবিহীন-অনর্থক কথা-বার্তা বলা।
(১১২) অতিমাত্রায় কারও প্রশংসা করা।
(১১৩) কষ্ট ও কৃত্রিমতা করে ছন্দের ন্যায় মিলিয়ে মিলিয়ে কথা বলা অথবা কথাকে শক্তিশালী করার জন্য কৃত্রিমতা অবলম্বন করা।
(১১৪) গালি ও অশ্লীল কথা বলা।
(১১৫) সীমাতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা করা।
(১১৬) কারও গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া।
(১১৭) বন্ধুবর্গ ও সাথীদের অধিকার আদায়ে অবহেলা করা।
(১১৮) ওয়াদা করার সময়েই মনে মনে ওয়াদা পূর্ণ করার ইচ্ছা না করা।
(১১৯) ধর্মীয় বিষয়ে বে-আদবী ছাড়া অন্য কোন কারণে অধিক রাগান্বিত হওয়া।
(১২০) ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধবকে জুলুম থেকে না বাঁচানো।
(১২১) অবহেলা করে জামাত তরক করা।
(১২৩) সত্যের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করা।
(১২৪) কোন অমুসলিম জিম্মিকে (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে কর দিয়ে বসবাস করে এমন অমুসলিমকে) 'হে কাফির' বলে সম্বোধন করা– যদি সে এতে মনে কষ্ট পায়।
(১২৫) নিম্ন লিখিত বাক্য দ্বারা দু'আ করা ঃ

بمقعد العز من عرشك

(তোমার আরশের মর্যাদাপূর্ণ আসনের উসিলায়।)

আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. তাঁর 'সাগায়ের ও কাবায়ের' নামক গ্রন্থে উল্লেখিত সংখ্যা এ তরতীবেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে ইবনে হাজার আসকালানী রাযি.-এর চেয়েও অধিক সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইবনে নুজাইম রাযি. যে সকল গুনাহকে সগীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেছেন, তিনি এর অধিকাংশগুলোকে যাওয়াজের নামক গ্রন্থে কবীরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ কবীরা ও সগীরা গুনাহের সংজ্ঞা নিয়ে তাঁদের মাঝে যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা হতেই এরূপ তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে।

একটি কথা খুব ভাল করে স্মরণ রাখা দরকার! পূর্বেও বলা হয়েছে, কোন আলেমের মতেই কোন গুনাহ-সগীরা

হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এতে লিপ্ত হওয়া মামুলি বা সাধারণ ব্যাপার অথবা এ থেকে বাঁচার জন্য খুব বেশী চিন্তা-ফিকির করার প্রয়োজন নেই; বরং কবীরা ও সগীরা গুনাহের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে, তা কেবল একটি পরিভাষাগত বিষয়। অন্যথায় গুনাহ মানেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাফরমানী ও অবাধ্যাচরণ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক গুনাহই (সগীরা-কবীরা যাই হোক) শক্ত ও মহামুসীবতের কারণ। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের সকল মুসলমানকে যাবতীয় গুনাহ হতে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اِكْرَامِ صَدِيْقِ الْوَالِدِ ص۱۲

অনুচ্ছেদ ঃ ৫. পিতার বন্ধুকেও সম্মান প্রদর্শন করা

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ اَسِيْدٍ هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهٗ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ

৮. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, উত্তম সৎ ব্যবহার হল, পিতার বন্ধুদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা।

এ বিষয়ে আবূ আসীদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটির সনদ সহীহ। এ হাদীসটি ইবনে উমার রাযি.-এর বরাতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ফকীহুন নাফস আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদভাব বজায় রাখা, ভাল আচরণ করা এ কথার প্রমাণ যে, সে পিতাকে গভীর ভালবাসে, ভক্তি করে। কারণ, পিতার বন্ধু-বান্ধবকে মহব্বত তো এ জন্যই করা হয় যে, তিনি পিতার বন্ধু। পিতার প্রতি যতটুকু ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকবে, পিতার বন্ধু-বান্ধবকে শ্রদ্ধার চোখে দেখার মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটবে। জনৈক কবি চমৎকার এক কথা বলেছেন–

فمن مذهبى حب الديار لاهلها + وللناس فيما يعشقون مذاهب

পিতার বন্ধু-বান্ধবের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে বিষয়টি প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে মায়ের সখী-বান্ধীদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য। মায়ের বান্ধবীদেরকেও শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করতে হবে। এটা পর্দা রক্ষা করেও করা সম্ভব।
(আল-কাওকাব, মা'আরিফুল হাদীস)

আল্লামা তাক্বী উসমানী বলেন, অনেক সময় মাতা-পিতার মৃত্যুর পর সন্তানের এ অনুভূতি তৈরি হয়, আহ! আমি কত বড় নেয়ামত খুইয়ে ফেলেছি। আমি তো তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করতে পারি নি। আল্লাহ তা'আলা এমন সন্তানদের জন্যও সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন। এমন সন্তানদের জন্য প্রায়শ্চিত্বের পথ দু'টি।

প্রথমতঃ মাতা-পিতার জন্য বেশি বেশি দু'আ ও সাওয়াব রেসানি করা। এটা দান-সদকা, নফল নামায বা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ মাতা-পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের সাথে ঠিক তেমন ব্যবহার করা, যেমনটি উচিত ছিল পিতা-মাতার সাথে করার। এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও প্রায়শ্চিত্ব হয়ে যাবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ بِرِّ الْخَالَةِ ص۱۲

অনুচ্ছেদ ঃ ৬. খালার সঙ্গে সদ্ব্যবহার

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أبى عَنْ إسْرَائِيْلَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ وَهُوَ ابْنُ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ إسْرَائِيْلَ وَاللَّفْظُ لِحَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰه عَنْ أبِى إسْحٰقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ ، وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

৯. সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী ও উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা রহ....... বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খালা হল মায়ের স্থানে। হাদীসটিতে দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ।

حَدَّثَنَا أبُوْ كُرَيْبٍ ثنا أبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ أبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَجُلاً أتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إنِّى أصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِى مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ لاَ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِرَّهَا وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

১০. আবূ কুরায়ব রহ...... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক মহাপাপ করে ফেলেছি, আমার কি কোন তওবা আছে? তিনি বললেন, তোমার মা আছেন কি? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা আছেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। এ বিষয়ে আলী রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ أبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ أبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهٰذَا أصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أبِى مُعَاوِيَةَ وَأبُوْ بَكْرِبْنِ حَفْصٍ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أبِىْ وَقَّاصٍ

১১. ইবনে আবূ উমার রহ..... আবূ বাকর ইবনে হাফস রাযি. সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এতে ইবনে উমার রাযি.-এর উল্লেখ করা হয়নি। এটি আবূ মুআবিয়া রহ.-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ। আবূ বাকর ইবনে হাফস রহ. হলেন ইবনে উমার ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وفى الحديث قصة طويلة ঃ ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. এ লম্বা ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। যেমন,

اخرج الشيخان بقصة الطويلة عن البراء بن عازب قال صالح النبى ﷺ يوم الحديبية على ثلاثة اشياء ان من اتاه من المشركين ردوه اليهم ومن اتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى ان يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة ايام فلما دخلها ومضى الاجل فتبعته ابنة حمزة تنادى ياعم! ياعم! فتناولها على فأخذ بيدها فاختصم فيها على وزيد وجعفر قال على انا اخذتها وهى بنت عمى وقال جعفر بنت عمى وخالتها تحتى وقال زيد بنت اخى فقضى بها النبى ﷺ لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلى انت منى وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقى لخلقى وقال لزيد انت اخونا ومولانا (تحفة الاحوذى)

انى أصبت ذنبا عظيما : সম্ভবতঃ ذنب عظيم (বড় গুনাহ) দ্বারা উল্লেখিত নিজের দৃষ্টিতে বড় গুনাহ বুঝিয়েছেন। কারণ, গুনাহ ছোট হোক বড় হোক, তা তো আল্লাহরই নাফরমানি। কিংবা হতে পারে ঐ সাহাবীর পক্ষ থেকে বাস্তবেই কবীরা গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে। যে গুনাহ মাফ হতে পারে নেক আমল দ্বারাই। আর এটা ঐ সাহাবীর বিশেষত্ব ছিল। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। আল্লামা তীবী রহ. এর অভিমত এটাই।

هل لك من ام؟ : এখানে من হরফটি زائدة অথবা تبعيضيه। কোন কোন আলেম বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মায়ের খেদমত করলে কিংবা মা না থাকলে খালার খেদমত করলে আল্লাহ তা'আলা তাওবা নসীব করেন। (মা'আরিফুল হাদীস)

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ دُعَاءِ الْوَالِدَيْنِ صـ١٢

অনুচ্ছেদ : ৭. পিতা-মাতার দু'আ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثنا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ وَالِدٍ عَلٰى وَلَدِهٖ ،

وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ نَحْوَ حَدِيْثِ هِشَامٍ وَاَبُوْ جَعْفَرَ الَّذِيْ رَوٰى عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يُقَالُ لَهٗ اَبُوْ جَعْفَرِ الْمُؤَذِّنُ وَلَا نَعْرِفُ اِسْمَهٗ وَقَدْ رَوٰى عَنْهُ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ غَيْرَ حَدِيْثٍ

১২. আলী ইবনে হুজর রহ........ আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি দু'আ এমন, যেগুলো অবশ্যই কবূল করা হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই! মজলুমের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ, পিতার দু'আ তার সন্তানের ওপর।

হাজ্জাজ আল-সাওওয়াফ রহ. এ হাদীসটিকে ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাছীর রহ. থেকে হিশামের রিওয়ায়াতের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। যে আবূ জা'ফর রহ. আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন, তাঁকে আবূ জা'ফর আল-মুআযযিন বলা হয়। তাঁর নাম সম্পর্কে আমরা অবগত নই। তাঁর সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাছীর রহ.ও একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যে তিনটি দু'আ কবুল হয়

এসব দু'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ রহস্য হল, এ দু'আগুলোর মধ্যে ইখলাস বেশী থাকে এবং এ দু'আগুলো হৃদয়ের গভীর থেকে বের হয়। তাছাড়া অসুস্থ, মুসাফির এবং মজলুম ব্যক্তির অন্তর ভাঙা থাকে। আর ভাঙা দিলে আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণ করার মত শক্তি রাখে।

হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন, এখানে হাদীসের শব্দ হল, دعوة الوالد على ولده আর على শব্দটি প্রতিকূল অর্থে আসে। সুতরাং এখানে দু'আ নয় বরং বদদু'আ উদ্দেশ্য। যদিও পিতার নেক দু'আও খুব তাড়াতাড়ি কবূল হয়। কিন্তু বদদু'আ আরও তাড়াতাড়ি কবূল হয়। কারণ, কোন পিতা সন্তানের জন্য একেবারে নিরুপায় ও অসহায় মুহূর্ত ছাড়া বদদু'আ করতে পারেন না। এ হাদীসে মায়ের কথা বলা হয়নি। কেননা বলার প্রয়োজনও নেই। যেহেতু মায়ের হক পিতার চেয়েও বেশি। অতএব তার বদদু'আও খুব দ্রুত হওয়াই যুক্তিযুক্ত কথা।

دعوة المسافر ঃ এখানে মুসাফির দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি, যে নিজ আবাসস্থল, পরিবার ও পরিজন ছেড়ে দূরে কোথাও অবস্থান করছে। এখানে মুসাফির দ্বারা শরঈ মুসাফির উদ্দেশ্য নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى حَقِّ الْوَالِدَيْنِ صـ١٢

অনুচ্ছেদ ঃ ৮. পিতা-মাতার হক

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى ثنا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا اِلَّا اَنْ يَجِدَهٗ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهٗ فَيَعْتِقَهٗ

هٰذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لَانَعْرِفُهٗ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ وَقَدْ رَوٰى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ

১৩. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মূসা রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পিতাকে ক্রীতদাস হিসাবে পেলে তাকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়েই সন্তান পিতার হক আদায় করতে পারবে না। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। সুহায়ল ইবনে আবূ সালিহ -এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই। সুফইয়ান সাওরী প্রমুখ রহ. এ হাদীসটিকে সুহায়ল রহ. থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فيشتريه فيعتقه ঃ আল্লামা জাযারী রহ. নিহায়াতে বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, কেনার পর নতুন করে আযাদ করবে। কেননা এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ছেলে নিজ পিতাকে খরিদ করলে সাথে সাথে আযাদ হয়ে যায়। যেহেতু কেনাটা আযাদির কারণ হয় বিধায় আযাদিকে কেনার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। আহলে-যাহিরের মতে, শুধু ক্রয় করলে আযাদ হবে না বরং নতুনভাবে আযাদ করা প্রয়োজন। তারা বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের বাহ্যিক অর্থও আমাদের স্বপক্ষে দলীল। জমহূরের দলীল হল, হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. এর হাদীস– انه عليه السلام قال من ملك ذارحم محرم فهو حر (তুহফাতুল আহওয়াযি)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ صـ١٢

অনুচ্ছেদ ঃ ৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَا ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ اشْتَكٰى اَبُو الدَّرْدَاءِ فَعَادَهٗ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ خَيْرُهُمْ وَاَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ اَبَا مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَا اللّٰهُ وَاَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اِسْمِىْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهٗ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهٗ، وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى وَعَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ حَدِيْثُ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَرَوٰى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ هٰذَ الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ رَدَّادٍ اللَّيْثِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَمَعْمَرٍ كَذَا يَقُوْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيْثُ مَعْمَرٍ خَطَأٌ

১৪. ইবনে আবূ উমার ও সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী রহ....... আবূ সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবুদ দারদা রাযি. অসুস্থ হলে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. তাঁকে দেখতে আসেন। তখন আবুদ দারদা রাযি. বললেন, আমার জানা মতে আবূ মুহাম্মদ (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) হলেন সবার শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমিই আল্লাহ, আমিই রহমান। আমি আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম (রহমান) থেকে এর নাম (রেহ্ম) উদগত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখবে, আমিও তার সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক রাখব আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ, ইবনে আবূ আওফা, আমির ইবনে রাবী'আ, আবূ হুরাইরা, জুবায়র ইবনে মুত'ইম রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সুফইয়ান – যুহরী রহ. সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। মা'মার রহ. এ হাদীসটিকে যুহরী – আবূ সালামা – রাদ্দাদ লায়ছী – আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ বুখারী রহ. বলেন, মা'মার বর্ণিত রিওয়ায়াতটি ভুল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

شققت لها من اسمى ঃ অর্থাৎ আমি رحم কে رحمة ধাতু থেকে উৎসারিত করেছি এবং রহমতের একটা অংশ তার মধ্যে রেখে দিয়েছি। যেহেতু ان لكل من اسمه نصيب তথা প্রত্যেকের জন্য নিজের নামের একটা অংশ রয়েছে।

আল্লামা সুহাইলি রহ. বলেন, رحم এবং رحمن এর মূলধাতু এক। বিধায় উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এমন নয় যে, رحم আল্লাহ তা'আলার অংশ।

الرحم ঃ এখানে رحم দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক। রক্তের সম্পর্ক প্রত্যেককেই رحم বলা হবে। কেউ কেউ বলেছেন, رحم দ্বারা উদ্দেশ্য মাহরাম। তবে কথাটি দুর্বল।

من وصلها وصلته ঃ এখানে وصل الله দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার মহান করুণা ও দয়া। আর قطع الله দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর আযাব। যেমনিভাবে صلة الرحم তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফলে আল্লাহর দয়া ও করুনা আসে, অনুরূপভাবে قطع الرحم তথা আত্মীয়তা ছিন্ন করলে আল্লাহও তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। ফলে তার আযাব ও গযব আসে। যেমন, অন্য হাদীসে এসেছে –

لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم

"সে জাতির উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না, যাদের মাঝে আত্মীয়তা ছিন্নকারী আছে।"

তদ্রূপ বুখারী শরীফের এক হাদীসে এসেছে– لا يدخل الجنة قاطع رحم (আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِلَةِ الرَّحِمِ ص۱۳

অনুচ্ছেদ ঃ ১০. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيَانُ ثنا بَشِيْرُ اَبُوْ اِسْمٰعِيْلَ وَقِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِىْ اِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ

১৫. ইবনে আবূ উমার রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বদলার মনোভাব নিয়ে সম্পর্ক রক্ষাকারী প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকী নয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হল সে ব্যক্তি, যে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে নিজে তা রক্ষা করে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ বিষয়ে সালমান, আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حدثنا ابن ابى عمر ونصر بن على وسعيد بن عبد الرحمن المخزومى قالوا ثنا سفين عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ لا يدخل الجنة قاطع قال ابن ابى عمر قال سفين يعنى قاطع رحم هذا حديث حسن صحيح

১৬. ইবনে আবূ উমার, নাসর ইবনে আলী ও সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী রহ..... জুবাইর ইবনে মুত'ইম রাযি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (আত্মীয়তা) ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সুফইয়ান রহ. বলেছেন অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি সাহান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পরিপূর্ণ صلة الرحم বা আত্মীয়তার সম্পর্ক হল, যে আত্মীয় তোমার সাথে অসদাচরণ করবে তুমি তার সঙ্গে সদাচরণ করবে। সদ্ব্যবহারের প্রতিদানে শুধু সদ্ব্যবহার করা পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্পর্ক নয়। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে– صل من قطعك واعف عمن ظلمك আর صلة الرحم দ্বারা উদ্দেশ্য হল,

(১) আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা। (২) তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা।(৩) সাধ্যানুযায়ী তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা।(৪) মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা।(৫) হাদিয়া-তোহফা দেওয়া।(৬) সালাম-কালাম করা। (৭) তাদের পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পেলে সহ্য করা।

لايدخل الجنة ঃ অর্থাৎ প্রথমবার সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুণাহ। এ গুনাহসহ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা এ গুনাহর শাস্তি দিয়ে বা মাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা এর মর্মার্থ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দুজনের মধ্য থেকে কোন একজন কথা না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের দরজা তাদের জন্য বন্ধ থাকবে। কিংবা এ মর্মার্থও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে বৈধ মনে করে তবে সে জান্নাতে যাবে না। কেননা এর ফলে সে কাফির হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে শরঈ বিধান

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজিব এবং ছিন্ন করা হারাম। আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য স্তর অনুযায়ী সম্পর্কও বিন্যাস হবে। (শামী ঃ ৯/৫৮৯)

কাযী ইয়ায রহ. বলেন, কোন কোন সূরতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব আর কোন কোন সূরতে মুস্তাহাব। তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার এ হুকুম তখনকার জন্য যখন ঐ সব আত্মীয় দ্বীনদার হবে। পক্ষান্তরে যদি কাফির অথবা ফাসিক-কাজিব হয়, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয আছে। কিন্তু শর্ত হল, প্রথমে তাদের বুঝাতে হবে। এতে কাজ না হলে তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ হল, দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের পরওয়া না থাকা। আর তাদের অনুপুস্থিতিতে তাদের জন্য দু'আ

করার হক কখনও বাতিল হবে না। শশুর-শাশুড়ি, শালা, ভগ্নিপতি, জামাই, পুত্রবধূ, স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তান, স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তান প্রমুখ যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে আত্মীয়তা হয়, তাদের হকও সাধারণ মুসলমানের চেয়ে বেশি। সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান ও এতিম-মিসকীনের চেয়ে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কোন কোন আলেমের মতে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের ন্যায় বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথেও ছেলায়ে-রেহমী রক্ষা করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীরই বিধান এক পর্যায়ের। (হুকুকুল ইবাদ, তালীমুদ্দীন,)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ حُبِّ الْوَلَدِ ص١٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১১. সন্তানের ভালবাসা

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيَنُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ سُوَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ اَحَدَ ابْنَىْ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُوْنَ وَتُجَبِّنُوْنَ وَتُجَهِّلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللّٰهِ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ حَدِيْثُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِهِ وَلَا نَعْرِفُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ سَمَاعًا مِنْ خَوْلَةَ

১৭. ইবনে আবি উমার রহ........ খাওলা বিনতে হাকীম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দৌহিত্রের একজনকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি তখন বলছিলেন, তোমরাই কৃপণতা, ভীরুতা ও অজ্ঞতার কারণ হও। তোমরা তো হলে আল্লাহর সুগন্ধময় ফুল।

এ বিষয়ে ইবনে উমর ও আশ'আছ ইবনে কায়স রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবরাহীম ইবনে মায়সারা রহ. সূত্রে বর্ণিত ইবনে উয়ায়না রহ.-এর রিওয়ায়াতটি তাঁর সূত্র ছাড়া অন্য কোন ভাবে বর্ণিত আছে বলে আমরা অবগত নই। উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. সরাসরি খাওলা রাযি. থেকে হাদীস শুনেছেন বলে আমরা জানি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

انكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون ঃ এখানে তিনটি সীগাহই باب تفعيل থেকে। অর্থাৎ মানুষ নিজ ছেলে-মেয়ের মহব্বতে কৃপন, কাপুরুষ এবং মুর্খ হয়ে যায়। কেননা মানুষ সন্তানের মহব্বতে পড়ে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে চায় না; ছেলে-মেয়েদের কাজে আসবে ভেবে জমা করে রাখে। এভাবে সে এক পর্যায়ে কৃপন হয়ে যায়। তদ্রুপ মানুষ ছেলে-মেয়ের মহব্বতেই জিহাদে যেতে চায় না। ভাবে, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার ছেলে-মেয়ের কি উপায় হবে। অনুরূপভাবে ছেলে-মেয়ের অতি মহব্বতে উলামা ও বুযুর্গদের কাছে যাওয়ার অবকাশ পায় না, তাই দীনের বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও কিছু লোক পরিবার-পরিজনের পেছনে সময় দিতে গিয়ে ইল্‌ম থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। তখন আয়াত নাযিল হয়েছিল– انما اموالكم واولادكم فتنة (নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি বিরাট এক ফিৎনা।)

انكم لمن ريحان الله ঃ উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা সংশয় সৃষ্টি হতে পারে, এমন হলে তো ছেলে-মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকানোও উচিত নয়। এ সংশয় দূরীভূত করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে, যেমনিভাবে ফুল মানুষের কাছে স্বভাবগতভাবে প্রিয়, তেমনিভাবে ছেলে-মেয়ের প্রতি স্নেহ-ভালবাসাও মানুষের স্বাভাবজাত। তাই এটা নাজায়িয তো নয়ই বরং একটা পর্যায় পর্যন্ত প্রশংসনীয়ও বটে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, ছেলে-মেয়ের মহব্বতে পড়ে যেন আখেরাত বরবাদ না হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى رَحْمَةِ الْوَلَدِ صـ١٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১২. সন্তানের প্রতি দয়া

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَبْصَرَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ وَقَالَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ الْحَسَنَ اَوِالْحُسَيْنَ فَقَالَ اِنَّ لِى مِنْ وَلَدٍ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ اَحَدًا مِّنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ مَنْ لَايَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৮. ইবনে আবূ উমার ও সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান রহ........ আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আকরা' ইবনে হাবিস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলেন, তিনি হাসান রাযি. কে চুমু খাচ্ছেন। ইবনে আবূ উমর তার বর্ণনায় বলেন, হাসান কিংবা হুসাইনকে। তিনি বললেন, আমার তো দশটি সন্তান রয়েছে। অথচ এদের কাউকে কোন দিন চুমু খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করে না, তাকেও দয়া করা হয় না।

এ বিষয়ে আনাস, আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান রহ.-এর নাম হল, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

من لا يرحم لا يرحم ঃ প্রথম সীগাহ معروف এর এবং দ্বিতীয় সীগাহ مجهول এর। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, শিশু-সন্তানকে চুমু দেওয়া, কোলে নেওয়া, কাঁধে উঠানো সবই সুন্নাত। এগুলোও দীনের অংশ বরং আল্লাহ তা'আলা যে মুমিনের অন্তরে রহমত ঢেলে দিয়েছেন, তার নিদর্শন। অন্য এক হাদীসে এসেছে–

من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا

"যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّفَقَةِ عَلَى الْبَنَاتِ وَالْاَخَوَاتِ صـ١٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩. কন্যা ও বোনদের জন্য ব্যয় করা

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْاَعْشِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ اَوْ ثَلَاثُ اَخَوَاتٍ اَوْ اِبْنَتَانِ اَوْ اُخْتَانِ فَاَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللّٰهَ فِيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

১৯. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার তিনটি মেয়ে কিংবা তিনটি বোন থাকে অথবা দুইটি মেয়ে কিংবা দুইটি বোন থাকে, সে যদি তাদের সাথে সবসময় সদয় ব্যবহার করে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে, তবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَكُوْنُ لِاَحَدِكُمْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ اَوْ ثَلَاثُ اَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِنَّ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَاَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ اِسْمُهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَسَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ هُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وُهَيْبٍ وَقَدْ زَادُوْا فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ رَجُلًا

২০. কুতায়বা রহ...... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন থাকে, সে তাদের সাথে সবসময় সদয় ব্যবহার করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।এ বিষয়ে আয়েশা, উকবা ইবনে আমির, আনাস, জাবির ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযি.-এর নাম হল, সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান। আর সাদ ইবনে আবি ওয়াককাস রাযি. হলেন সাদ ইবনে মালিক ইবনে উহায়ব। কোন কোন বর্ণনাকারী এ সনদে একজন রাবী বৃদ্ধি করেছেন।

حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْلَمَةَ ثنا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتُلِىَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

২১. আল ইবনে মাসলামা রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মেয়ে দিয়ে যাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, সে যদি তাদের বিষয়ে ধৈর্যধারণ করে তবে তারাই তার জন্য জাহান্নামের পথে পর্দা (বাঁধা) হয়ে দাঁড়াবে। এ হাদীসটি হাসান।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ اِمْرَأَةٌ مَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ ابْتُلِىَ بِشَيْءٍ مِّنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২২. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা একবার আমার কাছে এল, তার সঙ্গে তার দু'টি মেয়ে ছিল। মহিলাটি আমার কাছে কিছু চাইল। কিন্তু একটা শুকনা খেজুর ছাড়া আর কিছুই আমার কাছে ছিল না। আমি সেটাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে তার দু'মেয়ের মাঝে সেটি ভাগ করে দিল। নিজে কিছুই খেল না। এরপর বেরিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলে আমি তাকে ঘটনা বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তিকে মেয়েদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয় তারা তার জন্য জাহান্নামের পথে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّاسِبِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ ، هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرَ حَدِيثٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَنَسٍ وَالصَّحِيحُ هُوَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ

২৩. মুহাম্মদ ইবনে ওয়াযীর আল-ওয়াসিতী রহ........ আবূ বাকর ইবনে উবায়দিল্লাহ ইবনে আনাস ইবনে মালিক রহ. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটো মেয়ে সন্তান লালন-পালন করবে সে ব্যক্তি আর আমি এভাবে পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করব। এরপর তিনি দুটো আঙ্গুল ইশারা করে দেখালেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয রহ. থেকে উক্ত সনদে মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ রহ. একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি আবূ বাকর ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আনাস রহ. বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সহীহ হল, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ বাকর ইবনে আনাস।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে সদ্ব্যবহারের অর্থ কি ?

فاحسن صحبتهن : এখানে حسن صحبت তথা সদ্ব্যবহার করা বা উত্তম সঙ্গ দেওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা–

(১) কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাদের ওয়াজিব হকসমূহ আদায় করা।

(২) কেউ কেউ বলেন, ওয়াজিব হকসমূহ আদায় করার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে আরও সদ্ব্যবহার করা।

(৩) হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী রহ. বলেন, উল্লেখিত ফযীলত তখন পাওয়া যাবে, যখন তাদের বিয়ে-শাদি হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা হবে। (হাশিয়ায়ে তিরমিযী, তাকমিলাহ)

এক মেয়ে প্রতিপালন করলেও উক্ত ফযীলত পাওয়া যাবে

কোন কোন আলেম উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, এ ফযীলত ঐ ব্যক্তির জন্য খাস, যে ব্যক্তি তিন মেয়ে অথবা দুই মেয়ে লালন-পালন করেছে। মূলতঃ স্পষ্ট কথা হল, এক মেয়ে প্রতিপালন করলেও উক্ত ফযীলত পাওয়া যাবে। তার দলীল দুটি। যথা–

এক. এ অনুচ্ছেদের একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– من ابتلى بشيء من البنات... الخ এখানে شيء শব্দটি ইংগিত করে যে, উক্ত জান্নাত লাভের ফযীলত ব্যাপক। যে ব্যক্তি এক মেয়ে প্রতিপালন করবে সেও জান্নাত লাভ করবে।

দুই. তাবরানী আওসাত এ বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে–

قلنا وثنتين ؟ قال وثنتين قلنا وواحدة؟ قال وواحدة

এ হাদীসের সমর্থনে তাবরানীর আরেকটি হাদীস দুর্বল সনদে পাওয়া যায়। যেমন,

عن ابن مسعود مرفوعا من كانت له ابنة فادبها وعلمها فاحسن تعليمها واوسع عليها من نعمة الله التى اوسع عليه

সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, একটি মেয়ে প্রতিপালন করলেও হাদীসে উল্লেখিত ফযীলত লাভ হবে।(তাকমিলাহ)

এই পরীক্ষার মর্ম কি ?

من ابتلى بشئ من البنات ঃ এখানে ابتلى শব্দটি صيغه مجهول এর সাথে। অর্থ, যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারীতে লিখেছেন, পরীক্ষার অর্থ নির্ণয়ে উলামায়ে কিরাম থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, কন্যা-সন্তানের অস্তিত্বটাই এটকা পরীক্ষা। কেউ কেউ বলেন, তার থেকে প্রকাশিত কার্যকলাপ একটা পরীক্ষা।

আল্লামা নববী রহ. বলেন, কন্যা সন্তানকে পরীক্ষা বলার কারণ হল, মানুষ কন্যা সন্তানের জন্মকে একটা লজ্জাজনক বিষয় মনে করত। এমনকি জাহিলি যুগে এ মিছে লজ্জার কারণে কন্যা সন্তানকে হত্যা পর্যন্ত করত। কখনও বা জীবন্ত কবর দিত। ইসলাম এ অমানবিক পৈশচিকতার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে কন্যা সন্তান প্রতিপালনে ফযীলত প্রাপ্তীর ঘোষণা দিয়েছে। এখন দেখার বিষয় হল, কে কন্যা সন্তানের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে আর কে করে না। সুতরাং এটা এটাক পরীক্ষা।

كن له حجابا من النار ঃ অর্থাৎ মানুষ যদি নিজের গুনাহর কারণে আল্লাহর আযাব ও গযবের যোগ্য হয়ে যায়, তাহলে কন্যা সন্তানের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করার বদৌলতে আশা করা যায়, আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিবেন এবং দোযখ থেকে নাজাত দিয়ে দিবেন।

বিরোধ মীমাংসা ঃ এখানে রয়েছে যে,

فسألت فلم تجد عندى شيئا غير ثمرة فاطعمتها ثلاث تمرات فاعطيت كل واحدة منها تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينها فأعجبنى شانها إلخ

বাহ্যত এ দুটি রেওয়ায়াতে বিরোধ রয়েছে। কেননা তিরমিযীর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আয়েশা রাযি. তাকে একটি খেজুর দিয়েছিলেন। মুসলিমের রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায়, তিনটি খেজুর দিয়েছেন।

এর সামঞ্জস্য বিধানে বলা হয়, হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট তখন শুধু একটি খেজুর ছিলো। তিনি সেটাই দিয়েছেন। অতঃপর পরবর্তীতে আরও দুটি পেয়ে সেগুলোও দিয়েছেন। কারও কারও মতে, এখানে মূলতঃ ঘটনা দুটি।

অথবা হতে পারে রাবীর কোনও হস্তক্ষেপের কারণে ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, মুসলিমের রেওয়ায়াতে আছে, যে খেজুরটি নিজের জন্য রেখেছিলেন। তাতে অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নিজে না খেয়ে দু' কন্যাকে ভাগ করে দিয়েছেন। ফলে রাবীগণ শুধু একটির কথা বর্ণনা করেছেন, অবশিষ্ট দুটির কথা ছেড়ে দিয়েছেন, এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, রাবীগণ সাধারণতঃ ঘটনার মৌলিক অংশ স্মরণ রাখার বেশী চেষ্টা করেন। শাখাগত বিষয়গুলোর প্রতি এতটা গুরুত্ব দেন না। (তাকমিলাহ ঃ ৫)

فاخبرته ঃ হযরত আয়েশা রাযি. আভিভূত হয়ে বিস্ময় প্রকাশার্থে এ সংবাদ দিয়েছিলেন। যেমন, মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট শব্দে এসেছে- فاعجبنى شانها বিস্ময়ের কারণ ছিল, হযরত আয়েশা রাযি. ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর জানা ছিল না, একজন মা তার সন্তানদের জন্য কতটা আন্তরিক হতে পারে। তাই হযরত আয়েশা রাযি. মহিলার অবস্থা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন যে, তিনি নিজে ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত থেকেও খেজুরের সামান্য অংশও মুখে দেন নি। সন্তানদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন।

নারীর মর্যাদা

নারীকে নিয়েই প্রকৃতির যত আনন্দ মেলা। দুনিয়ার বুকে যার সঙ্গে পরিচয়, সে নারী। নারীকে নিয়েই জীবন সংসার। চেষ্টা করলেও ভুলতে পারবে না জগৎ নারীর দান, শোধতে পারবে না নারীর ঋণ, অস্বীকার করতে পারবে না নারীর স্নেহ, নারীর সেবা, নারীর ভালবাসা। নারীর অভাবে শুধু সংসারই নয়, স্বর্গও ফাঁকা।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে নারীর ভূমিকা কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয় পুরুষের চেয়ে। নারীকে বাদ দিলে সৃষ্টির জৌলুসই শুধু কমে না, তার প্রাণও আহত হয় মারাত্মকভাবে। নারীর অনাদরে, নারীর অপমানে ও অপব্যবহারে তাই সৃষ্টির বুক কাঁপে, মুখ পোড়ে, চোখে আগুন জ্বলে। তবু নারীর প্রতি চলে অবিচার, বাড়াবাড়ির অন্ত নেই নারীকে নিয়ে। ইসলাম ধর্ম বন্ধ করতে চায় এ বাড়াবাড়ি; নারীকে দেখতে চায় তার আপন মহিমায়; প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাকে আপন মর্যাদায়। বলে নারী দেবীও নয়, দানবীও নয়, মানবী। সৃষ্টির সন্তান হিসাবে তার ভালবাসায় নর-নারী উভয়েরই সমান অধিকার। নারী-মা, নারী-বোন, নারী-প্রিয়া, নারী-জায়া, নারী-কন্যা। নারীর অপমানে নরের মুখ চুন পড়বে, নীচুঁ হবে তার মাথা। নারীর মান-মানুষের মান। নারীর অমর্যাদা-মানবতার অপমান। নারীর যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় স্বভাব-ধর্ম ইসলাম রেখেছে অনন্য সাধারণ মহান অবদান।

বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান

ইয়াহুদী ধর্মে নারী

বর্তমান বিকৃত তাওরাত, তাতে লেখা আছে, নারীরা পণ্য দ্রব্যের মত, তাদেরকে অবাধভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। ইয়াহুদী সমাজে তাই প্রাচীনকাল থেকে কন্যা শিশুদের বেচা-কেনার প্রচলন ছিল। বরের কাছ থেকে দাসত্বের মূল্যস্বরূপ এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেওয়া হত। ইয়াহুদী ধর্মে ভাইদের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃ জায়াকে বিবাহ করা এক অপরিবাহর্য নীতি, তাতে মেয়ের মতামত গ্রহণের কোন প্রশ্নই ছিল না। তাদের মাঝে একাধিক বিবাহের এত প্রচলন ছিল যে, যার যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারত। এতে তাদের মনগড়া কিতাবে কোনরূপ বিধি-নিষেধ ছিল না।

ইয়াহুদীদের নির্ভরযোগ্য কিতাব "আহাদ নামায়ে আতীক" গ্রন্থে আরও লেখা আছে, নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে শান্তি পরিবেশন করা। সে মূলতঃ পাপের প্রস্রবণ। পূর্ণ কর্মের যোগ্যতা নারীর মাঝে অনুপস্থিত তাই সে মান-মর্যাদার যোগ্য হতে পারে না। ইয়াহুদীদের সাধারণ বিশ্বাস হচ্ছে, একমাত্র হযরত হাওয়া আ. এর প্ররোচনায় হযরত আদম আ. এর এত দুর্দশা পোহাতে হয়। এ থেকে ইয়াহুদীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত উপনীত হয়েছে যে, নারীজাতি প্রথম থেকেই অন্যায় ও পংকিলতার উস্কানিদাত্রী হয়ে আছে। এতে সে সব ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য। শুধু এ একটি মাত্র কারণ থেকেই ইয়াহুদীরা নারী জাতির ন্যায্য অধিকারকে সম্পূর্ণ রূপে খর্ব করে দিয়েছে।

কাল্পনিক তাওরাতে এ বিধানও ছিল যে, "দু'জন পুরুষের মাঝে ঝগড়া বা লড়াই শুরু হলে কোন নারী যদি তার স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে আসে বা তার পক্ষাবলম্বন করে, তবে তা হবে সে স্ত্রীর জন্য অমার্জনীয় অপরাধ। সে অপরাধে তার উভয় হস্ত কেটে দেওয়া হবে। এতে তার প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করা যাবে না। স্বামীর প্রতি নারীর মমত্ববোধ হৃদ্যতা ও ভক্তি ভালবাসার পুরস্কার হিসেবে এর চেয়ে বেশী আর কী দেওয়া যেতে পারে? একটি কুকুরের প্রতি প্রভূ ভক্তির প্রশংসা পাওয়া অন্যায় নয়, কিন্তু একটি নারীর স্বামী ভক্তির বিনিময় নির্দয়ভাবে হাত কাটা। গভীরভাবে প্রনিধান করুন যে, নবী মূসা আ. মাদায়েন শহরে গমন করে পানির জন্য অপেক্ষমান দুটি বালিকাকে দেখে স্নেহের তাড়নায় তাদের সাহায্যে ছুটে গিয়েছিলেন, যা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ রয়েছে। তারই প্রিয় উম্মতের দাবীদার ইয়াহুদী জাতির ইতিহাস নারী কেলেংকারীতে পরিপূর্ণ তুচ্ছ ভুল-ক্রটি, অহেতুক কথা-বার্তা বা পার্থিব স্বার্থের মোহে তারা স্ত্রীর জীবন বিপন্ন করে তুলত। পাপহীন তালাকের প্রবণতা ছিল তাদের মাঝে বর্ণনাতীত। এতো শুধু তালাক নয়

বরং রমনীর পবিত্র জীবনকে ধ্বংসের অতল গহবরে নিক্ষেপ করা। অসহায় সে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর দিকে আর কেউ ফিরেও তাকাবে না। নারীর পবিত্র আত্মার প্রতি পুঞ্জিভূত ঘৃণার কারণেই ইয়াহুদী পুরুষেরা তাদের ইবাদতের সময় এ বলে প্রার্থনা জানায় যে, হে আল্লাহ! তুমি যে আমাকে নারী করে সৃষ্টি করনি এজন্য তোমার শুকরিয়া, তোমায় মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

পারসিক ধর্মে নারী

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, ইরানের অগ্নিপূজকদের ধর্মীয় নেতা ছিল যরোয়েষ্টি। তার ধর্ম নীতিতে নারীদের ব্যাপারে আপত্তিকর বিষয় পাওয়া যায়। হযরত ঈসা আ. এর জন্মের প্রায় পঁচিশ বছর আগের যুগটি ছিল যরোয়েষ্টির যুগ। আর মাজুসী ধর্মের মূল বৈশিষ্ট ছিল যৌন কেলেংকারী। সে কারণেই কায়খসরু গেষ্টাপ ও আলেকজাণ্ডারের মত প্রতাপশালী রাজারাও এ ধর্মের দীক্ষা নিয়েছিল, যার ফলে তাদের প্রভাব ও প্রচারণায় এ ধর্ম দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট পারভেজও মাজুসী ছিল। সে একই সাথে বার হাজার নারীর পতিও বটে। এই বার হাজার স্ত্রীর মধ্যে শতাধিক ছিল তার মা, খালা, ফুফু, বোন প্রমুখ। পারভেজ এ বার হাজার স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিল না, বরং যখন ইচ্ছা বিশ পঞ্চাশ জনকে তালাক দিত বা হত্যা করত আর পছন্দমত স্ত্রী সংগ্রহ করে নিত। এমন কি সে তার বিবিদেরকে বিক্রি করতে অথবা অন্য কারও শয্যাশায়িতা করতে কোন রূপ দ্বিধাবোধ করত না। সে সময় নারীজাতি পণ্য-দ্রব্য হিসেবে বেচা-কেনা হত। সতীন পুত্রের সাথে সৎ মায়ের সহবাস করার মত নির্লজ্জ কর্মকাণ্ডেও তারা জড়িত ছিল। এভাবে মা-বোন-মেয়ের পার্থক্য উঠিয়ে দেওয়ার ফলে মাজুসী ধর্ম দূর দেশেও পরিচিতি লাভ করে। এ ধর্মের সংস্কারক দার্শনিক মথুম এসে ঘোষণা দিলেন, ধন ও নারী সকল অন্যায়ের মূল উৎস। তাই সে ধন ও নারীকে ব্যক্তি অধীনে না রেখে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করে। এক ব্যক্তির ধন সমস্ত দেশবাসীর ধনে এবং এক এক ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত জনতার উপভোগের পাত্রে পরিণত হয়। মাজুসী বা পারসিক ধর্মে পালাক্রমে নারী নির্যাতনের রূপ নেয়। যুবতী নারী সম্পর্কে বলা আছে, কোন পুষ্পবতি যেন সূর্য না দেখে, কোন পুরুষের সাথে কথোপথন না করে, অগ্নির দিকে দৃষ্টি না দেয়, পানিতে না নামে, অন্য কোন পুষ্পিতা নারীর সাথে একত্রে শয়ন না করে, খাদ্য স্পর্শ না করে, কোন পাত্র ধরতে হলে হাত যেন কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নেয়। কোন ঋতুবর্তী নারী এর ব্যতিক্রম করলে তার জন্য বেহেশ্ত হারাম।

প্রসূতি ঘরের নিয়মও অনুরূপ কঠোর ছিল। প্রসবের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন প্রসূতি নারী মাটি বা কাঠের পাত্র স্পর্শ করার অনুমতি পেত না। সে সময়ের মধ্যে কোন প্রসূতি ঘরে বারান্দায় পা রাখতে পারত না। ঋতুকাল একটি পাপকাল বলে বিবেচিত হত। এমনকি সে সময়ের পাপ থেকে তওবা করার জন্য বছরের একটি মাত্র মাস নির্ধারণ করা ছিল। সেখানকার দুর্ভাগ্য নারী জাতি নিজেদের জীবনকে বোঝা বলে মনে করত। নারী ছিল স্বামীর দাসী স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাদেরকে স্বামীর দাসত্বে নিযুক্ত করে ছিলেন দার্শনিক মথুম।

খ্রিস্ট ধর্মে নারী

খ্রিস্টানরা যদিও আহলে কিতাব তথাপি তাদের কতিপয় ধর্মগুরু এ মতে বিশ্বাসী যে, নারী জাতি হচ্ছে শয়তানের প্রবেশ পথ। এ পথেই শয়তানের আগমন ঘটে। তাদের বিশ্বাস যে, বেহেশতের মধ্যে যে গাছের কাছে যেতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছিলেন, সে গাছের কাছে হযরত আদম আ. প্রথমে যেতে চাননি। পরে বিবি হাওয়ার হাত এড়াতে না পেরে হযরত আদম আ. সে গাছের কাছে যেতে এবং সে গাছের ফল খেতে বাধ্য হন। কিন্তু কুরআনুল কারীম এ মত সমর্থন করে না। কুরআনুল কারীম বলে আদম ও হাওয়া দু'জনই শয়তানের খপপরে পড়েন এবং গাছের নিকট যেতে দু'জনই সমান দায়ী, কিন্তু খ্রিস্টানরা তা মানে না। তারা মেয়ে জাতিকে শয়তানের প্রবেশদ্বার মনে করে বলেই তারা এ শয়তানরূপী নারীদের থেকে দূরে থাকার জন্য বিবাহ করে না। তারা একথাও বিশ্বাস করে যে, তাদের নবী হযরত ঈসা আ. যেহেতু বিবাহ করেননি, তাই ধর্মযাজক পাদ্রীরাও বিবাহ করেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

আল্লাহর দেওয়া যৌন প্রবৃত্তিস্থল হচ্ছে বেশ্যালয়। তাদের কারও কারও দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, বিবাহ করাটা দোষণীয় কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের অবাধ যৌন আচরণ কোন দোষণীয় কাজ নয়। অপর দিকে নারীদেরকে দারুণভাবে অবহেলা করা হত। যার কারণে তাদের দুঃখ-কষ্টের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা ছিল দারুন অসহায়। নিরুপায় হয়ে তারা দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হত। তাদের স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে যৌন আচরণের বেলায় ছিল দারুণ অবিশ্বাস। কেউ কাউকে বিশ্বাস করত না। এমনকি এ ধরনের একটি প্রথা সেখানে চালু হয়েছিল যে, কোন স্বামী যুদ্ধ করতে গেলে কিংবা বেশী দিনের জন্য বাড়ির বাইরে গেলে, তাদের স্ত্রীদেরকে ধাতব পদার্থ নির্মিত এক প্রকার কটিবন্ধ পরিয়ে তালা দিয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে তবে বাইরে যেত। এ কটিবন্ধের কারণে তারা যৌন কার্যে অসমর্থ হত। এ কটিবন্ধকে বলা হত সতীত্বের বর্ম।

অতঃপর স্বাভাবিক কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে উঠে। এ আন্দোলনের ফলে নারীজাতি সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

১. নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে।

২. অর্থ উপার্জনে নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করতে হবে।

৩. নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার সুযোগ থাকতে হবে।

শেষ পর্যন্ত এ অধিকার সেখানে স্বীকৃত হল। ফলে দাসত্ব জীবনের পারিবারিক নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে পাল্টা আর এক ধ্বংসের দিকে ধাবিত হল। মেয়েদের খেয়াল-খুশী মত বিয়ে হতো। আবার পরক্ষণেই সে বিয়ে ভেঙ্গে যেত। নারী তার পছন্দমত অন্য একটা স্বামী বেছে নিত।

অবাধ যৌন আচরণের ফলে গর্ভনিরোধের কলা-কৌশল আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে আবিষ্কার হওয়া শুরু হল গর্ভনিরোধ ট্যাবলেট এবং বিভিন্ন কলা-কৌশল। যার বাতাস শেষ পর্যন্ত ইউরোপ থেকে ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। সে বাতাস আমাদেরকেও চরমভাবে আলোড়িত করছে, যা বাংলার প্রায় ঘরে ঢুকে পড়েছে। এটাকে আমরা বলতে পারি ইউরোপীয় বর্বরতা।

বিভিন্ন দেশে নারীর অবস্থান

ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থা

ভারতে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যান্ত করুন। সেখানে মেয়েরা না পিতার সম্পত্তিতে অংশ পেত আর না স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ পেত। তারা যতদিন বাঁচত শুধু গোলামী করত, আর দুটো খেতে পেত। এ ছিল নারীদের সামাজিক মর্যাদা। এরপর আরও যা নৃশংস আচরণ হত মেয়েদের প্রতি, তা ভাবলেও মানুষের গা শিউরে উঠবে। তা হচ্ছে, কোন স্ত্রীর স্বামী যদি স্ত্রীর আগে মারা যেত তাহলে আর রক্ষা ছিল না। জ্যান্ত স্ত্রীকে তার স্বামীর সাথে পোড়ানো হত। এর নাম ছিল সতীদাহ প্রথা। তারা মনে করত স্ত্রী যার অলক্ষুণে তারই স্বামীর অকাল মৃত্যু ঘটে। কাজেই এ অলক্ষুণে নারীর আর বাঁচার কোন ধিকার নেই। তাকে তার স্বামীর মরদেহের সঙ্গে পুড়ে মরতে হবে। আর বেঁচে তার কোন লাভও ছিল না। কারণ, না ছিল স্বামীর সম্পত্তিতে তার কোন অংশ আর না ছিল পিতার সম্পত্তিতে। এরপর রাজা রাম মোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ইংরেজ শাসকদের হস্তক্ষেপে এ প্রথা দূর হল বটে। কিন্তু বিধবা অবস্থায় সে বাঁচবে কি করে, তার কোন ব্যবস্থা করা হল না। পরে যে কোন স্বামী গ্রহণ করবে, তাও সেই জাহেলী সমাজে স্বীকৃত ছিল না। তারা আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত না মানলেও স্বামীর ওয়াহদানিয়াত বা একত্ব মানত। তারা মনে করত, আল্লাহ একাধিক হতে পারে বটে, স্বামী একাধিক হতে পারে না। এখনও যদি তাদেরকে স্বামীর সঙ্গে পোড়ানো হয় না। কিন্তু তারা যে সমাজে সম্মানের সঙ্গে বাঁচবে এমন কোন ব্যবস্থা তাদের সমাজ এখনও করতে পারেনি। হ্যাঁ ভাগ্য ভাল-যারা ২/১টা সন্তানের মা হয়ে বিধবা হয় তাদের তো বাঁচার একটা ব্যবস্থা হয়, কিন্তু যারা সন্তান হওয়ার পূর্বেই

বিধবা হয়, তাদের অবস্থায় হয় বড় করুণ। তাদের নির্দিষ্ট কোন ঘর-বাড়ি থাকে না। জীবিকার জন্য ভিক্ষা করে আর থাকার জন্য বেঁচে নেয়, কোন শ্মশান বা কোন নির্জ্জন এলাকায় গিয়ে তৈরী করে কোন আস্তানা। বসবাসের সাথী হিসেবে বেঁচে নেয় কোন সন্ন্যাসী বা গৃহত্যাগী বৈরাগী ধরনের কাউকে। এক এলাকায় কিছু দিন থাকার পর আবার সেখান থেকে তারা চলে যায় অন্য এলাকায়। এভাবেই অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে করতে একদিন শেষ হয়ে যায় তার এ পার্থিব জীবনের সব কিছুই। এ হল ভারতীয় জাহিলিয়াতের সংক্ষিপ্ত চিত্র।

গ্রীক জাহিলিয়াতে নারীদের অবস্থা

গ্রীক সভ্যতার প্রথম যুগে নারীদেরকে সম্মানের চোখে দেখা হত। তাদেরকে মাতৃত্বের মর্যাদা দেওয়া হত। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করা হত। স্ত্রীদেরকে পুরুষের সম-মর্যাদা দেওয়া হতো। কিন্তু যেহেতু তাদের সভ্যতার ভিত্তি মূলে কোন ঈমানী চেতনা ছিল না, তাই তারা নারী জাতিকে খুব বেশী দিন মাতৃত্বের মর্যাদায় রাখতে পারেনি। মাতৃত্বের আসন থেকে নামিয়ে এনে তাদেরকে ভোগের বস্তুতে পরিণত করে ফেলে। তাদের যে সমাজে একদিন নারীর সতীত্বকে অমূল্য সম্পদ হিসেবে মনে করা হত, সেই সমাজে তাদেরকে পুরুষের কামনা-বাসনা পূরণের ভোগ্য বস্তুতে পরিণত করা হল। ফলে যারা একদিন বেশ্যাবৃত্তিকে ঘৃণার চোখে দেখতো তারাই বেশ্যাদেরকে দেবীর আসনে বসাল। বেশ্যারা হল মহাসম্মানিতা। এমনকি যে নারী যত বেশী সংখ্যক দেবতার সঙ্গে রতিক্রিয়ায় সক্ষম সে তত বেশী সম্মানী দেবী। আর দেবতার মধ্যেও যিনি যতবেশী সংখ্যক নারীদের সঙ্গে রতি ক্রিয়ায় ক্ষমতাবান তিনি তত বেশী দামী দেবতা। আর এটাই ছিল গ্রীক পুরানোর মতে অত্যাধিক নেক কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ। ফলে তাদের ধর্মের মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা অবাধ যৌন আচরণের উস্কানি পেত। এতে করে যৌন আসক্তি বৃদ্ধি করে দেওয়াই শেষ পর্যন্ত তাদের এক মহাপুণ্যের কাজ হিসেবে পরিগণিত হল।

জাহেলিয়াত যুগে নারী

জাহেলী সমাজে সাধারণভাবে মহিলাদের প্রতি নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা ছিল একটি সাধারণ ও বৈধ ব্যাপার। তাদের অধিকারকে পদদলিত করা হত। তাদের সম্পদকে পুরুষেরা নিজেদের সম্পদ মনে করত। ওয়ারিশ হিসেবে মৃতের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে তারা কোন অংশ পেত না। স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে পছন্দ মাফিক দ্বিতীয় বিয়ের ও অধিকার ছিল না। (সূরা বাকারার ২৩২ আয়াত।)

অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ও জীবজন্তুর মতই নারীও ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত ও হস্তান্তরিত হত। (সূরা নিসা ঃ ১৯)

পুরুষ তো তার অধিকার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিত, কিন্তু মহিলারা তাদের অধিকার নিতে পারত না। এমন অনেক খাদ্য দ্রব্য ছিল যেগুলো কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, মহিলারা তা খেতে পেত না।

(সূরা আল-আনআমঃ ১৪০)

পুরুষরা যত সংখ্যক ইচ্ছা নারীকে বিয়ে করতে পারত। কন্যা সন্তানের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাদের জীবন্ত প্রোথিত করারও রেওয়াজ ছিল। হায়ছাম ইবনে আদী উল্লেখ করেছেন, জীবন্ত প্রোথিত করার প্রথা আরবের সকল গোত্রেই প্রচলিত ছিল। একজন একে কার্যকর করত আর দশজন ছেড়ে দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এ প্রথা চালু ছিল। (ময়দানী)

কেউ লোকলজ্জা ও অপমানের কারণে, কেউ খরচ যোগাতে অসামর্থ ও দারিদ্র্যের ভয়ে আপন সন্তানকে হত্যা করত। আরবের কোন কোন শরীফ ও নেতৃস্থানীয় লোক এ সময় এ ধরনের শিশুদেরকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে কিনে নিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করত। (বুলূগুল আরব ফী আহওয়ালিল আরব– আল্লামা আলূসী)

সা'সা'আ ইবনে নাজিয়া বর্ণনা করেন, ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত আমি জীবন্ত প্রোথিত হতে যাচ্ছে, এ ধরনের তিন শ' কন্যা সন্তানের জীবন অর্থের বিনিময়ে বাঁচিয়ে ছিলাম। (কিতাবুল আগানী)

কোন কোন সময় কোন সফর কিংবা কাজে ঝড়িয়ে পড়ায় সময় অভাবে কন্যা বড় হয়ে গেলে এবং প্রোথিত করার অবকাশ না পেলে গোঁয়ার পিতা ধোঁকা দিয়ে কোন নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাকে জীবন্ত কবর দিত। ইসলাম গ্রহণের পর অনেকে তাদের বিগত জীবনের এ ধরনের বেদনাদায়ক ও মর্মস্পর্শী ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। (সুনান দারমী ঃ ১)

ইসলামে নারীর মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ـ

অর্থ ঃ মানবকুলকে মোহগ্রস্থ করেছে নারী, সন্তান-সন্তুতি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী। (সূরা আল-ইমরান– ১৪)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর জন্য ছয়টি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে নারী জাতিকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মোহনীয়-নি'আমত বলে অভিহিত করেছেন। পুরুষদের সহজাত স্বভাবের মধ্যে তাদের প্রতি সৃষ্টি করেছেন স্নেহ, মমতা, প্রেম-ভালবাসা। এটাও নারী জাতির প্রতি দয়াময় সৃষ্টিকর্তার এক বিরাট মেহেরবানী।

নারী জাতি যে পুরুষদের জন্য আকর্ষণীয় নি'আমত, তার বহু বর্ণনা হাদীস শরীফেও পাওয়া যায়। যেমন, হযরত আনাস রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "এ পৃথিবী থেকে আমার চোখের শীতলতা নারী।" (নাসাঈ শরীফঃ ৯৩)

দ্বীনদার নারীর ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ـ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ـ

অর্থ ঃ স্মরণীয় সেদিন, যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে তাদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছুটাছুটি করবে। (তাদের বলা হবে) আজ তোমাদের জন্য অনন্ত-অসীম আনন্দময় জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা হাদীদ ঃ ১২)

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মহাপ্রলয় তথা কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের ঘোরান্ধকারের মহাসঙ্কটের সময়ও শুধু পুরুষরাই নূরের অধিকারী হবে না বরং পুণ্যবতী নারীরাও সে নূরের অধিকারী হবে। এটা যে নারী জাতির ফযীলত ও মর্যাদার প্রমাণ বহন করে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ জাতীয় ফযীলত শুধু কুরআনেই নয় বরং বিভিন্ন হাদীসেও পাওয়া যায়।

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المراة الصالحة ـ

অর্থঃ হযরত ইবনে উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী বর্ণনা করেন যে, "এ বিশ্ব ভূমণ্ডল পুরোটাই ভোগ সম্ভার ও আনন্দ উল্লাসের সামগ্রী। তম্মধ্যে সর্বোত্তম সামগ্রী হল নেক ও সৎকর্মপরায়ণ নারী।"

মা হিসেবে নারীর ফযীলত

পৃথিবীর কোন ধর্ম ও মতবাদে নারীকে মা হিসেবে এত মর্যাদা ও ইজ্জত দেওয়া হয়নি, যা দেওয়া হয়েছে ইসলামে। এখানে কুরআন-হাদীস থেকে কিছু দলীল পেশ করা হচ্ছে।

১. আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ـ

"আমি মানুষকে মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকীদ দিয়েছি। (মায়ের জন্য বেশী করেছি) কারণ, মা তাকে খুব কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসব করেছে আরও কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে।" (সূরা আহকাফ ঃ ১৫)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ ـ

"আমি মানুষকে তাদের আব্বা-আম্মার অধিকার বুঝবার জন্য নিজ থেকেই তাকীদ করেছি। (মায়ের জন্য বেশী করেছি) কারণ, তার মা কষ্ট ও দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে বহন করেছে। অতঃপর তাকে দু'বছর দুধপান করিয়েছে। কাজেই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক, সাথে সাথে আব্বা-আম্মার প্রতিও। (লুকমানঃ ১৪)

কুরআনে কারীমে অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ .... وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ الخ

"তোমাদের জন্য (বিবাহ) হারাম করা হয়েছে তোমাদের (জননী ও সৎ) মাতাদেরকে.... এবং তোমাদের দুধমাতাগণকে, যারা তোমাদের স্তন্য পান করিয়েছে।" (সূরা নিসা ঃ ২৩)

উল্লিখিত আয়াতে জননী, সৎমা ও দুধ মাতাকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এতে মাতৃজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাদের ফযীলত ও মর্যাদাকে সমুন্নত করা হয়েছে। ইসলামে মাতৃজাতি যে অধিকার মর্যাদাশীল ও ফযীলতের অধিকারিনী, তার প্রমাণ আমরা হাদীস থেকেও পাই। নিম্নে তার কয়েকটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে।

عن ابن عباس رض قال قال رسول الله ﷺ : من قبل بين عينى امه كان له سترا من النار ـ

"হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, " যে ব্যক্তি স্বীয় মা জননীর কপালে (ভক্তি শ্রদ্ধাসহ) চুম্বন করবে, তার এ চুম্বন তার ও জাহান্নামের মাঝে অন্তরায় হয়ে যাবে।"

(শুআবুল ঈমান ঃ ৬/১৮৭)

عن انس رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت اقدام الامهات ـ

অর্থ ঃ হযরত আনাস রাযি. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন, "জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।" (আহমাদ, নাসাঈ, কানযুল উম্মাল ঃ ১৬/৪৬১)

বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা

ইসলাম যেমনিভাবে মা হিসেবে নারীর মর্যাদা দিয়েছে, তেমনি বোন হিসেবেও নারীর মর্যাদা দিয়েছে। এমন কি পিতা সম্পত্তিতেও তার অংশ নির্ধারণ করেছে। এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি দলীল পেশ করা হচ্ছে মাত্র।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ (سورة النساء)

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোনদের (কে বিবাহ করা)।"

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন, "যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে তিনটি মেয়ে বা বোন কিংবা দুটি মেয়ে বা দুটি বোন রয়েছে। অতঃপর সে তাদের সুন্দরভাবে লালন-পালন করেছে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করেছে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করবেন।" তিরমিযী ঃ ১/১৩

স্ত্রী হিসেবে নারীর ফযীলত

ইসলাম পূর্ব বর্বর যুগে স্ত্রী হিসেবে নারীর কোন সম্মান ছিল না সমাজে। দাস-দাসীদের মতই স্ত্রীদের অবমূল্যায়ণ করা হত। সমাজে পিশাচ প্রকৃতির ক্ষমতাধর পাষণ্ড সরদার ও মোড়লরা আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী নিজ নিজ আস্তানায় একাধীক স্ত্রী, উপস্ত্রী বন্দীদশায় আবদ্ধ করে রাখত। উপরন্তু স্বামীদের বিকৃত লালসা পূরণ করতে হত স্ত্রীদের। সামান্য অপরাধে অমানবিক জুলুম-নির্যাতন চালানো হত। একান্ত অসহায় ও আশ্রয়হীন ধর্ষীতা কিশোরীর মত চাপা কান্না ও নিভৃতে অশ্রু ঝরানো ছাড়া অভাগিনী স্ত্রীদের জন্য কোন উপায় ছিল না। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শান্তির আধার, সান্তনার উৎস, প্রেম ও ভালবাসার অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে বানিয়েছেন কল্যাণী, মহিয়সী ও ফযীলত-মর্যাদার অধিকারিনী।

এখানে স্ত্রীর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু দলীল কুরআন হাদীস থেকে নমুনা স্বরূপ পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের (স্বামীদের) পরিচ্ছদ, আর তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।" (বাকারা ঃ ১৮৭)

যদি স্ত্রী হিসেবে নারীর কোন মূল্য ও মর্যাদা না থাকত, তাহলে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে আশরাফুল মাখলুকাতের অন্যতম স্বামীদের পরিচ্ছদ বানাতেন না। তখন তারা অবজ্ঞার পাত্রীই গণ্য হত।

ইসলাম নারীকে পুরুষের ঈমানের পরিপূরক ঘোষণা দিয়ে নারীর যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। একজন স্ত্রী দ্বারা পুরুষ বৈধ পন্থায় তার যৌন ক্ষুধা মিটাতে পারে। তাই স্বামীর জন্যই স্ত্রী চারিত্রিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এটা হল স্বামীর জন্য দুনিয়াবী উপকার। শুধু তাই কি! অধিকন্তু দ্বীনদার নারীকে বিবাহ করার মাধ্যমে একজন পুরুষ আখেরাতের সাফল্যও অর্জন কতে পারে।

কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা

ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাতের যুগে কন্যা সন্তান জন্মকে পাপ বা অভিশাপ মনে করা হত; বিধায় কোন পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে লজ্জায়, ঘৃণায় সে কাউকে চেহারা দেখাতে পারত না। অনেকেই জন্মের পর পরই কন্যা সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করত। কেউ কেউ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে কবর দিত। এ ব্যাপারে শুরুতে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে ইসলাম কন্যা হিসেবে নারীকে কি মর্যাদা দিয়েছে, কুরআন হাদীস থেকে তার কিছু দলীল পেশ করা হচ্ছে।

১. আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়েছেন কন্যা নির্যাতনকারীদেরকে। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন,

وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ. بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল ? (সূরা তাকবীর ঃ ৮-৯)

অর্থাৎ যারা নিরাপরাধ ও নিষ্পাপ শিশু কন্যাদেরকে জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করত, রোজ হাশরে আল্লাহ পাক আহকামুল হাকেমীন তাদের বিচার করবেন। এ আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝা গেল, ইসলামে নারী ও শিশু নির্যাতন অত্যন্ত ঘৃণিত, নিন্দিত ও মহাপাপ।

ইসলামে নারীর বৈবাহিক অধিকার

ইসলাম নারীকে বৈবাহিক অধিকারও দিয়েছে। স্বাধীন সত্তা হিসেবে একজন মুসলিম সাবালিকা নারী নিজ পছন্দ মত যে কোন মুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। অভিভাবকগণ তাকে জোরপূর্বক বিবাহ দিলে তা কার্যকর হবে না। সাবালিকা মুসলিম পাত্রীর অনুমতি বা কথায় বিবাহ কার্যকর করা হয়। ইসলামের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ইমামে আযম আবু হানীফা রহ. ও এ মত পোষণ করেন। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

"তিন তালাক প্রাপ্তির পর নারী পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল নয়, যাবৎ না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে।" (সূরা বাকারা)

আলোচ্য আয়াতে অন্য স্বামী গ্রহণ করা নারীর কাজ তথা ক্রিয়ার সম্বন্ধ নারীর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অভিভাবকের কথা বা কাজ উল্লেখিত হয়নি। অবশ্য নারী যদি অসম নিম্ন শ্রেণীর বংশের সাথে বিবাহ করে থাকে, যার ফলে তার বংশের মান-মর্যাদা প্রশ্ন বিদ্ধ কিংবা তার বংশের অন্য মেয়েদের বিবাহের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে ভিন্ন কথা। সাবালিকা নারীর বিবাহে তার উপর অভিভাবকদের জোর-জবরদস্তি চলে না। এর প্রমাণ হাদীস শরীফেও আছে।

ইসলামে নারীর মহরানা অধিকার

সার্বজনীন ও শ্বাশ্বত দ্বীনে ইসলাম মুসলিম নারীকে যতগুলো অধিকার দিয়েছে, তন্মধ্যে দেনমহর একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অধিকার। বিবাহ বন্ধনের ফলে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর প্রতি অর্পন করার বিনিময়ে স্বামীর নিকট হতে শরী'আত সম্মতভাবে যে অর্থ লাভের অধিকারী হয়, সে অর্থকে "মহরানা" বলা হয়। বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা শাওকানীর মতে মহরানা বা দেন-মহর স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার মনকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই ধার্য করা হয়েছে। জনৈক আলেম বলেন, দেন-মোহর দ্বারা স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানও বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে এ অধিকার লাভ করে। এটা কেবল মাত্র আনুষ্ঠানিক কোন বিষয় নয়। আল্লাহর তরফ থেকে একজন স্ত্রীকে বিশেষ দান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। জাহিলী যুগে মুহরানা ব্যতীরেকেই নারীদের বিয়ে করা হত কিংবা মহরানা ধার্য হলেও যা কিছু আদায় হত, তা লুটপাট করে গ্রাস করে ফেলত মেয়ের বাপ-ভাই তথা অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনরা। ইসলাম নারী নির্যাতনের এ পদ্ধতি বিলুপ্ত করে মহরের একচ্ছত্র অধিকারী বানিয়েছে স্ত্রীকে। এ অধিকারে মাতা, পিতা, ভাই, বোন অলি-অভিভাবক কিংবা আপন স্বামীও তার অনুমতি ব্যতীরেকে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

শরী'আতের পরিভাষায় মহরের সংজ্ঞা কি –এ প্রসঙ্গে হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বিখ্যাত ফাত্ওয়ার কিতাব রদ্দুল মুহতারে "এনায়ার" উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ

انه اسم للمال الذى يجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابلة البضع اما بالتسمية او بالعقد .

অর্থাৎ মহর বলতে এরূপ অর্থ-সম্পদ বুঝায়, যা বিবাহ বন্ধনে স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার অর্জনের বিনিময়ে স্বামীর উপর আদায় করা আবশ্যক। এটি বিয়ের সময় ধার্য হবে, অন্যথায় বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর স্বামীকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। –ফতোয়ায়ে শামী ঃ ৩/১০০, ১০১

কুরআন মজীদের সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেনঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً .

"তোমরা স্ত্রীদের নিকট থেকে যে যৌনস্বাদ উপভোগ করে থাক, তার বিনিময়ে তোমরা তাদেরকে মহরানা আদায় করা ফরয কর্তব্য।"

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ رَحْمَةِ الْيَتِيْمِ وَكَفَالَتِهِ صـ١٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪. ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তার দায়িত্ব নেওয়া

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالِقَانِيُّ ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَبَضَ يَتِيْمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ اَلْبَتَّةَ اِلَّا اَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ مُرَّةَ الْفِهْرِىِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ اُمَامَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَنَشٌ هُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ اَبُوْ عَلِى الرَّحَبِىُّ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ يَقُوْلُ حَنَشٌ وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ

২৪. সাঈদ ইবনে ইয়াকূব তালিকানী রহ....... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিমদের মাঝে কোন ইয়াতীমকে এনে স্বীয় পানাহারে শরীক করে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যদি না সে এমন কোন গুনাহ করে– যা ক্ষমাযোগ্য নয়। এ বিষয়ে মুররা ফিহরী, আবূ হুরাইরা, আবূ উমামা ও সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হানাশ হলেন, হুসায়ন ইবনে কায়স, আর তিনিই হচ্ছেন আবূ আলী রাহবী। সুলায়মান তায়মী রহ. বলেন, হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে হানাশ যঈফ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِمْرَ انَ اَبُوْ الْقَاسِمِ الْمَكِّىُّ الْقُرَشِىُّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ بِاِصْبِعَيْهِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৫. আবদুল্লাহ ইবনে ইমরান আবুল কাসিম মাক্কী কুরাশী রহ....... সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি এবং ইয়াতীমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এরূপ পাশাপাশি থাকব –এ বলে তিনি তাঁর দুই অঙ্গুলী অর্থাৎ মধ্যমা এবং তর্জনী দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

الا ان يعمل ذنبا لا يغفر ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুফর, শিরক এবং বান্দার হক। মূল বাক্যটি الا ان يعمل ذنبا لا يغفر الا بالتوبة হবে।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ইয়াতিম লালন-পালনকারী ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে যাবে। কিন্তু শর্ত হল, ঐ ব্যক্তি যেন এমন কোন কবীরা গুনাহ না করে, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমার অযোগ্য। (মা'আরিফুল হাদীস)

ইবনু বাত্তাল রহ. বলেন, যে ব্যক্তির নিকট হাদীস পৌঁছেছে, সে যেন এর উপর আমল করে। তাহলে জান্নাতে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হতে পারবে।

ইয়াতিম, বিধবা এবং বিপদগ্রস্থ মানুষের হক

(১) তাদের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করা। (২) তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করা। (৩) তাদেরকে আশ্রয় দান করা, প্রতিপালন করা। (৪) তাদের মন খুশি করা। যথাসম্ভব তাদের চাহিদা পূরণ করা। (৫) তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার না করা। (৬) তাদের সাথে সুন্দরভাবে সান্ত্বনাদায়ক কথা-বার্তা বলা।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ رَحْمَةِ الصِّبْيَانِ صـ١٤

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫. শিশুদের প্রতি দয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ الْبَصْرِيُّ ثنا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ زَرْبِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيْدُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ اَنْ يُوَسِّعُوْا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا
وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِيْ اُمَامَةَ ـ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَزَرْبِيٌّ لَهُ اَحَادِيْثُ مَنَاكِيْرُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ

২৬. মুহাম্মদ ইবনে মারযূক বাসরী রহ........ যারবী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক রাযি. কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের আশায় এক বৃদ্ধ এল। কিন্তু উপস্থিত লোকজন তাকে পথ করে দিতে দেরী করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের দয়া না করে আর বড়দের শ্রদ্ধা করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবূ হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, আবূ উমামা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আনাস ইবনে মালিক রাযি. এবং অন্যান্যদের থেকেও যারবীর অনেক মুনকার হাদীস রয়েছে।

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا،

২৭. আবূ বাকর মুহাম্মদ ইবনে আবান রহ....... আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা তার পিতামহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের মর্যাদার জ্ঞান রাখে না।

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانَ ثنا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ
وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ اَيْضًا قَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مَعْنٰى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِنْ سُنَّتِنَا يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ اَدَبِنَا وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ قَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُنْكِرُ هٰذَا التَّفْسِيْرَ لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِنْ مِلَّتِنَا

২৮. আবূ বাকর মুহাম্মদ ইবনে আবান রহ....... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের থেকে নয়, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে

না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করে না এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে না। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক – আমর ইবনে শু'আইব রহ. সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

কতক আলিম বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য 'আমাদের নয়'-এর মর্ম হল, 'আমাদের তরীকা ও সুন্নাতের উপর নয়'। এ আমাদের শিষ্টাচার থেকে নয়। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. বলেন, আমাদের নয় অর্থ আমাদের মত নয় –এ ভাষ্য সুফইয়ান সাওরী রহ. প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ليس منا ঃ এর অর্থ হল, ليس من سنتنا অর্থ, সে আমাদের সুন্নত ও তরীকার উপর নেই। এমন নয় যে, সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল, গুনাহ করলে মানুষ কাফির হয়ে যায় না। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, সে আমাদের মধ্য থেকে নয়" এর অর্থ হল, সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে নয়। (হাশিয়াতুল কাওকাব ঃ ২/১৯)

كان سفيان الثورى تيكره الخ ঃ তিরমিযী ও আ'ইনীর বিবরণ মতে এ তাফসীর অস্বীকারকারী সুফিয়ান সাওরী রহ.। অথবা ইমাম নববী বলেছেন, অস্বীকারকারী হলেন, সুফয়ান ইবনে উয়াইনা। হতে পারে উভয়েই এ তাফসীরকে অপছন্দ করেছেন।

ছোটদের প্রতি বড়দের করণীয়

(১) ছোটদেরকে স্নেহ করা।

(২) কথায় কথায় ছোটদেরকে ধমক-ধামক ও তিরস্কার না করা। ছোটদের ভুল-ত্রুটি কিছুটা ক্ষমা-সুন্দর সৃষ্টিতে দেখা। প্রাথমিক পর্যায়ে দু'একবার নম্রভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার পরও কাজ না হলে তখন কঠোরতা গ্রহণ করলে কোন ক্ষতি নেই।

(৩) যার সম্পর্কে লক্ষণ দেখে বুঝা যায়, সে নির্দেশ মান্য করবে না, তাকে নির্দেশ দিয়ে সরাসরি বেআদব প্রমাণিত না করাই ভাল। অবশ্য শরী'আতের কোন ওয়াজিব জিনিস হলে ভিন্ন কথা।

(৪) বিনা নির্দেশে কোন খেদমত করতে আগ্রহ দেখালেও তার সাধ্য এবং কষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তার সাধ্যের বাইরে তার থেকে হাদিয়া নেওয়া অনুচিৎ। তার আরাম, নিদ্রা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। দাওয়াত করলে সাধ্যের বাইরে আপ্যায়ন করা থেকে নিষেধ করবে।

(৫) কখনও ছোটদের প্রতি অতিরিক্ত রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করলে বা শাসন করলে পরবর্তীতে তাদের মন খুশি করে দেওয়া দরকার। কেয়ামতের দিন সকলেই তো সমান হবে। জানা নেই, তখন কে ছোট আর কে বড় হয়! অতএব নিজের পক্ষ থেকে অন্যায় হয়ে থাকলে খোলাখুলি ওযরা খাহি করে নেওয়া ভাল।

(৬) কোন ছোটকে এতটা নৈকট্য প্রদান করবে না অথবা এতটা প্রশয় দিবে না কিংবা তার সুপারিশ এবং তার কথায় এতটা আমল দিবে না, যার কারণে সে মাথায় চড়ে যায়। অথবা অন্যরা তাকেই বড়দের থেকে স্বার্থ বা কাজ হাসিল করার মাধ্যম মনে করবে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার জন্য নানাভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হবে।

(৭) ছোটদেরও অধিকার রয়েছে বড়দেরকে হক কথা বলার। সুতরাং ছোটরা কেউ কোন ন্যায় কথা বললে তাকে খারাপ মনে করার অবকাশ নেই। অবশ্য আদব রক্ষা না করলে তার জন্য ভিন্নভাবে সতর্ক করা যেতে পারে।

(৮) ছোটদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। কেননা ছোট হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে এমন কোন গুণ থাকতে পারে, যা সে বড়র মধ্যে নেই।

(৯) অনিয়ম ও নীতিহীন কোন কিছু ছোটদের সাথেও করবে না।

(১০) ছোটদের বেআদবির কারণে সরাসরি তাদের সাথে কথা বলতে খুব বেশি রাগ এসে গেলে অন্য কারও মাধ্যমে তাদেরকে যা বলার বলে দিবে।

(১১) ছোট যদি অধীনস্ত হয়, তাহলে তাকে শরী'আত মোতাবেক গড়ে তোলা ও শরী'আত মোতাবেক চালানো বড়দের দায়িত্ব। (আদাবুল মু'আশারাত, আহকামে যিন্দেগী)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ رَحْمَةِ النَّاسِ صـ١٤

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬. মানুষের প্রতি দয়া

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ ثنا قَيْسُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ ثنى جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللّٰهُ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو

২৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ....... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহও তার উপর রহম করে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ বিষয়ে আবদুর ইবনে আওফ, আবূ সাঈদ, ইবনে উমার, আবূ হুরাইরা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا اَبُوْ دَاوُدَ ثنا شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ بِهِ اِلَىَّ مَنْصُوْرٌ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ سَمِعَ اَبَا عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّا مِنْ شَقِىٍّ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ۔

وَاَبُوْ عُثْمَانَ الَّذِىْ رَوٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُ اِسْمَهٗ يُقَالُ هُوَ وَالِدُ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ الَّذِىْ رَوٰى عَنْهُ اَبُوْ الزِّنَادَ وَقَدْ رَوٰى اَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرَ حَدِيْثٍ

৩০. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, বদবখত ছাড়া কারও থেকে দয়া ছিনিয়ে নেওয়া হয় না। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান। আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণনাকারী আবূ উছমান রহ.-এর নাম আমাদের জানা নেই। কথিত আছে, তিনি হলেন, মূসা ইবনে আবূ উসমানের পিতা, যার সূত্রে আবুয্-যিনাদ রহ.ও রিওয়ায়াত করেছেন। আবূয্-যিনাদ রহ. –মূসা ইবনে আবূ উসমান –তার পিতা আবূ উছমান –আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ..... عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ اَلرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللّٰهُ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩১. ইবনে আবূ উমার রহ....... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দয়াশীলদের প্রতি রহমানও দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করবে, তাহলে আকাশবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন। রাহেম হল রাহমান শব্দ থেকে উদগত। যে ব্যক্তি রেহেমের বন্ধন অটুট রাখবে, আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ব রাখবেন আর যে ব্যক্তি রেহেমের বন্ধন ছিন্ন করবে আল্লাহও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ارحموا من فى الارض ঃ আল্লামা তীবী রহ. বলেন, এখানে ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক শব্দটি সমস্ত মাখলুককে শামিল করেছে। মানুষ, পশু, পাখি, বৃক্ষলতা এবং মানুষ তন্মধ্যে আবার মুমিন, কাফির, পরহেযগার, ফাসিকসহ সকল শ্রেণীর সৃষ্টিজীবের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। অনুরূপ 'রহম' বলতে সর্বপ্রকার রহমকে বুঝানো হয়েছে। পানাহার করানো, বোঝা উঠানো, রাস্তার কষ্টদায়ক জিনিস সরানোসহ সকল প্রকার রহম এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি কোন সৃষ্টিজীবের জন্য শুভকামনা করাও এ রহমতের শামিল।

يرحمكم من فى السماء ঃ এখানে يرحمكم শব্দটি আমরের জবাব হওয়া কারণে জযমযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টিজীবের উপর রহম কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করবেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে من فى السماء দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আসমানের অধিবাসী ফিরিশতাগণ। কেননা তারা মুমিন বান্দার জন্য দু'আ করেন। সুতরাং এ ব্যক্তির জন্যও তারা বিশেষ দু'আ করবেন।

এ সব আলোচনায় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলামের নবী মানবতার নবী। মুসলিম উম্মাহ মানবতাবাদী উম্মাহ। অন্যথায় দয়া ও করুণার এমন অনুপম আদর্শ, অন্য কোন ধর্ম কিংবা মতবাদে আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

ইসলামে মানবাধিকার

সারা পৃথিবী জুড়ে আজ চলছে দানবীয় রাজত্ব। মজলুম মানুষের করুণ আর্তিতে আজ আকাশ ও প্রকৃতি ভারী হয়ে উঠছে। শৃঙ্খলিত মানবতা আজ মুক্তিরপ্রহর গুণছে। শান্তির অন্বেষায় মানুষ আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলেছে। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির পরিবর্তে নতুন নতুন সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ছে অশান্তি। ধ্বংস হচ্ছে জনপদের পর জনপদ। ঠিক এমনি এক সমস্যা সংক্ষুব্ধ পরিবেশের অজ্ঞানতা, অমানবিকতা, নির্লজ্জতা, হিংস্রতা ও কূপমণ্ডুকতার অক্টোপাশে আবদ্ধ অসুস্থ মৃতপ্রায় মানব সভ্যতাকে রাহুমুক্ত করার এবং নতুন জীবন দানের অংগীকার নিয়ে আজ থেকে দেড় হাজার পূর্বে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন অতুলনীয় গুণসম্পন্ন এক মানব সত্তা, যার পবিত্র নাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর সুসম্পাদিত মহান বিপ্লব সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে আজও এক মহা বিস্ময়। সমগ্র বিশ্বের অকৃত্রিম দরদী বন্ধু অভিভাবক এ মহান মানবতাবাদীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের স্পর্শে অভিভূত হয়েছিল সমকালীন সমাজ ও পৃথিবী। এ অপূর্ব সম্মোহনী শক্তি দিয়ে তিনি আবিষ্কার করে রেখেছিলেন তাঁর কাছের ও দূরের মানুষদের। কুরআনের ভাষায় তার সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে স্থান-কাল নির্বিশেষে গোটা মানব সভ্যতা। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবদান আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আলোচনা করা দরকার মানবাধিকার বলতে আসলে কি বোঝায়? সংক্ষেপে এবং সহজ কথায় মানবাধিকার বলতে আমরা বুঝি ঃ

(ক) নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার।

(খ) স্বাধীনতার অধিকার।

(গ) সম্মানের নিরাপত্তার অধিকার।
(ঘ) জীবিকার অধিকার।
(ঙ) সম্পদের মালিকানা ও নিরাপত্তার অধিকার।
(চ) সুশাসন লাভের অধিকার।
(ছ) বাকস্বাধীনতা তথা কথা বলার অধিকার।
(জ) নারী ও শিশু অধিকার।
(ঝ) অধীনস্থদের অধিকার।
(ঞ) ভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বীদের অধিকার।

নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার

পবিত্র কুরআনে মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

من قتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما

" যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার পরিণাম জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন, অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভয়ংকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা নিসা ঃ ৯৩)

একটি হত্যাকাণ্ডকে গোটা মানব জাতির হত্যার শামিল বলা হয়েছে,

من اجل ذالك كتبناعلى بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل النفس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ـ

"এ কারণেই আমি বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন হত্যার বিনিময় অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করল, সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করল, আর যে একটা প্রাণকে বাঁচাল, সে যেন গোটা মানব জাতিকে রক্ষা করল।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৩২)

হত্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "যখন দু'জন মুসলমান তরবারী নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হয়।"

তিনি আরও বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সবার আগে হত্যার বিচার হবে।"

"আমার নিকট কোন মুমিনের হত্যাকাণ্ড সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ঘটনা।"

পবিত্র কুরআনে রিজিকের অভাবের আশংকায় সন্তান (শিশু অথবা ভ্রূণ) হত্যা হারাম করা হয়েছে। আভিজাত্যের মিথ্যা অহংকারে কন্যাসন্তান হত্যা করা ছিল তদানীন্তন আরবের নিত্যদিনের ঘটনা। পবিত্র কুরআন ও তাঁর নবী অত্যন্ত কঠোরভাবে এ জঘন্য কাজের নিন্দা করার সাথে সাথে তা বন্ধের যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

স্বাধীনতার অধিকার

স্বাধীনতা ছাড়া একজন মানুষ তার সব অধিকার ভোগ করতে পারে না। ইসলাম ও তাঁর নবী তাই মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্নে একবারেই আপোসহীন। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করে কেবল তখন, যখন সে দুনিয়ার সকল মিথ্যা প্রভুর গোলামী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলামী স্বীকার করে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর নফসের দাসত্ব থেকে শুরু করে ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী, রাষ্ট্রক্ষমতা, রসম-রেয়াজ ইত্যাদি অন্ধ আনুগত্যের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামীর জিঞ্জির তাকে আর আবদ্ধ করতে পারে না। যে কোন মূল্য দাসদাসীদের মুক্ত করা এ কারণেই ইসলাম তথা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। যাকাত ব্যয়ের জন্য পবিত্র কুরআনে যে আটটি সুনির্দিষ্ট খাতের উল্লেখ করা হয়েছে, দাস-দাসীদের মুক্তি তার অন্যতম।

সম্মান রক্ষার অধিকার

জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্মান রক্ষায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন। পবিত্র কুরআনে কারো কুৎসা রটনা (তোহমত) করা, পরিচর্চা (গীবত) করা, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তিরস্কার করাকে মারাত্মক অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। গোপন দোষ অনুসন্ধান করা হারাম। কারও সম্পর্কে অকারনে কুধারণা পোষণ করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। (সূরা হুজরাত ঃ ১২)

বিনা অনুমতিতে কারও বাড়ীতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (কুরআন) কারও বাড়িতে উঁকি মারা কঠিন অপরাধ (হাদীস)। বড়কে সম্মান করা এবং ছোটকে স্নেহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বংশগৌরব, ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চল ভেদে বিদ্বেষ পোষণ করা এবং একে অন্যকে হেয় করা অনৈসলামী কাজ। মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর রাসূল। নারী জাতিকে ইসলাম আজন্ম পাপের সর্বের মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে কলঙ্কমুক্ত এবং বিপুলভাবে সম্মানিত করেছে।

জীবিকার অধিকার

ছোট শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ পাক। পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পরিবারের কর্তার। স্বামী স্ত্রীর এবং পিতা সন্তানের (আয়ের উপযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) ভরণ-পোষণ করতে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বাধ্য। উপার্জনক্ষম সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ পোষণ করতে বাধ্য। আত্মীয়-স্বজনের হক, প্রতিবেশীর হক, দরিদ্রের হক, প্রার্থীর হক, মুসাফিরের হক, অসহায় ইয়াতীমের হক সম্পর্কে আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বেশী বলেছেন যার কোন তুলনা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নামে তিন তিনবার কসম খেয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে খায় সে মুমিন নয়। এভাবে মানবতার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবার ও সমাজের এমন এক কাঠামোর জন্ম দিয়েছেন যা প্রতিটি মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানে সক্ষম। সর্বোপরি, রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্ব তো রয়েছেই। অভাবী লোকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্রের।

সম্পদের মালিকানা ও নিরাপত্তার অধিকার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সজ্ঞান মানুষকে সম্পত্তি অর্জন, মালিকানা লাভ ও রক্ষার অধিকার প্রদান করেছেন। এমনকি যে নারীকে তাঁর যুগে লোকেরা সকল মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই নারী জাতিকেও সম্পত্তির মালিকানা অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য অংশগ্রহণ, উত্তরাধিকার লাভ সহ সকল প্রকার অধিকার প্রদানের বিপ্লবী ও যুগান্তকারী ঘোষণা প্রদান করেন। একে অপরের সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ-দখল হারাম ঘোষিত হয়। (আল কুরআন)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যে ব্যক্তি কারো ধনসম্পদ ওপরিবার-পরিজনের ব্যাপারে ধোঁকা দেয় সে জাহান্নামী।" (আল হাদীস)

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি কারও উত্তরাধিকার হরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জান্নাতের উত্তরাধিকার হরণ করবেন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

সঠিক মাপ নিশ্চিত করে সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা হল। (আল কুরআন)।

চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি হারাম ঘোষণা করে এবং এসব মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট ও কঠোর শাস্তির বিধান করে এবং এসব মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট ও কঠোর শাস্তির বিধান সম্পত্তির মালিকানা ন্যায্য মালিকানা ও ভোগ-দখল অধিকতর নিশ্চিত করা হল।

আইনের শাসনের প্রথম ও প্রধান শর্ত হল স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও হস্তক্ষেপমুক্ত বিচার ব্যবস্থা। আমরা জানি,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাসনকালে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির লঘু দণ্ডের পরামর্শ উপেক্ষা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হাত কাটার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা ও চুরি করতো তবে আমি তারও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।

ইসলামে আইনের চোখে সবাই সমান। শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথক। ইসলামের দৃষ্টিতে বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখার সুযোগ নেই। নিবর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইনে কাউকে আটক করার সুযোগও ইসলাম শাসক গোষ্ঠীকে দেয়নি।

সুশাসন লাভের অধিকার

আক্ষরিক অর্থে একটি গণমুখী ও জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসূলের ইসলামী রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র ছিল না। মানবাধিকার সংকট তৈরি করতে পারে এমন কোন আইন বিধানের অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাসনামলে ছিল না। ৫৪ ধারার মত কোন অযৌক্তিক, হাস্যকর ও নিবর্তনমূলক আইন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে ছিল না। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাউকে গ্রেফতার করা খুবই অমানবিক এবং অবশ্যই ইসলামে নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে অকারণে মানুষকে সন্দেহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনে আরও বলা হয়েছে, কোন ফাসিক ব্যক্তি যখন কোন খবর নিয়ে আসে তখন যাচাই বাছাই না করে হুট করে এমন কিছু করে বসো না, যার ফলে অবশেষে তোমরা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হবে।

আধুনিক কালে গ্রেফতার করে রিমাণ্ডে নেওয়া এবং রিমাণ্ডে এনে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে নিষ্ঠুর জুলুম চালানো হয়, ইসলাম তার অনুমোদন দেয়নি। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে 'আদল' ও 'ইহসান' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে– তোমরা ন্যায়ের ঝাণ্ডা উঁচু করে দাড়াও যদিও তা তোমাদের নিজেদের উপর আপতিত হয়।" ইসলাম তথা যে কোন মানবিক আইনে অপবাধ প্রমাণের দুটি পথ রয়েছে।

এক. অপরাধকারীর সেচ্ছা স্বীকারোক্তি আদায়ের এ দানবীয় পদ্ধতি ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এ সত্য কথাটি দেশের আলিম সমাজকে আজ উচ্চকণ্ঠে বলতে হবে।

হযরত উমর রাযি. এর নির্মম শাহাদাতের ঘটনা আমরা জানি। এক কিবতী খলীফা উমরকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদানের পরামর্শ দেন। জবাবে ভয়-লেশহীন খলীফা উমরকে হত্যার হুমকি দেয়। কেউ কেউ তখন খলীফাকে তার নিজ নিরাত্তার স্বার্থে ঐ কিবতীকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদানের পরামর্শ দেন। জবাবে অকোতভয় খলীফা যে কথাটি বলেছিলেন, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি বলেছিলেন, "আমার প্রজাকে তো আমি শাস্তি দিতে পারি না।" পরে ঐ হাবশী ক্রীতদাস নামাযরত অবস্থায় খলীফাকে শহীদ করে। এভাবে নিজের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর নবীর এই মহান সাহাবী ইসলামের সুবিচার ও মানবাধিকার এর তুলনাহীন দৃষ্টন্ত স্থাপন করে গেছেন।

বাকস্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা

জীবনের সর্বস্তরে জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়া মানবাধিকার রক্ষ অসম্ভব। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহীতার পরিবেশ সৃষ্টির দীক্ষা দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন পর্যায়ে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা কতরা হবে।'

তদ্রুপ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই মানুষের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অনুভবশক্তি সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) প্রশ্ন করা হবে।"

আমরা জানি মহানবীর শাসনকালে গনীমতের মাল বণ্টন নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে দুঃখবোধের জন্ম হয়েছে। তারা সরাসরি আল্লাহর রাসূলের কাছে তাদের মনোবেদনার কথা প্রকাশ্যে বলেছেন। আল্লাহর নবী যৌক্তিক জবাব দিয়ে আপত্তি উত্থাপনকারীদের সন্তুষ্ট করেছেন। বাকস্বাধীনতার শুধু সুযোগই দেননি বরং তিনি একে উৎসাহিত করেছেন।

তিনি যথার্থই বলেছেন, "অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"

খলীফা হযরত উমর রাযি. খুতবা দিতে উঠে মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়েছেন। একজন সাধারণ মুসল্লী তাঁর খুতবায় বাঁধা দিয়ে বলেন, রেশনে যে কাপড় দেওয়া হয়েছে, তাতে হযরত উমর রাযি. এর অত বড় জামা তৈরি করা সম্ভব নয়। এ বড় জামাটি তৈরী করা তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হল ? এ কৈফিয়ত জনতার আদালতে পেশ করার পরই তাকে খুতবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

নারী ও শিশু অধিকার

ইসলামের শত্রুরা নানাভাবে অপপ্রচার করে থাকে যে, ইসলাম নারীকে যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার !? নির্যাতনের পৃষ্ঠপোষক। অথচ সত্য কথা হচ্ছে, ইসলামই প্রথম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম নারীকে ক্ষমতা দিয়েছে; অধিকার দিয়েছে সম্পত্তিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের। প্রখ্যাত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী এ্যানি বেসান্ত যথার্থই স্বীকার করেছেন এই মহাসত্যকে। তাঁর ভাষায় ঃ

"The Muslim woman has far better treated than the western woman by the law. By the laws of Islam her property is carefully guarded whereas Christian woman does not enjoy such absolute right. According to the laws of Christian west, I often think that woman is more free in Islam than in Christianity. She is more protected by Islam than by the faith which preaches monogamy."

"In Al-Quran the law about women is more just and liberal. It is only in England in the last 26 years that Christianity has recognized the rights of women to property while Islam assured this right all times. It is a slander to say that Islam preaches that woman has no soul". (Anni Besant in Kamala Lectures)

মানুষের চরম ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ। নারীকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ভাবার পরিবর্তে ভোগের সামগ্রী বানাবার সকল অমানবিক অপচেষ্টাকে চিরতরে বন্ধ করার জন্যই ইসলাম ও তার মহান নবী বেশ্যাবৃত্তি ও উলংগপনাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আজ দুনিয়াজুড়ে বেশ্যাবৃত্তিকে সরকারীভাবে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া এবং বেশ্যাদের আয় থেকে রাজকোষ ভারী করা কি বিশ্রী ভোগবাদী মানসিকতার পরিচয় নয় ? যদি দুনিয়াজুড়ে পতিতাবৃত্তির ব্যবসাটাই গুটিয়ে ফেলা যেত, তাহলে নারী পাচারসহ অনেকগুলি নির্যাতন এমনিতেই বন্ধ হয়ে যেত।

নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নারী নির্যাতনের পথ প্রশস্ত করে। নারী যদি যথেষ্ট নিরাপত্তা ছাড়া পর পুরুষের ধারে কাছে না যায়, তাহলে যৌন নির্যাতন বলি আর পাচার বলি সবই তো দারুণভাবে হ্রাস পাবে। সত্যি বলতে ইসলামের নবী প্রবর্তিত পর্দা হচ্ছে নারীর নিরাপত্তারই অপর নাম।

শিশুদের অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটা সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর গৃহভৃত্য আনাস বিন মালিক রাযি. বলেন, তিনি মহানবীকে বলতে শুনেছেন, "আমি নামায পড়তে শুরু করে তা সাধারণ সময়ের চেয়ে দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু হঠাৎ আমি একটা শিশুর কান্না শুনে নামায থেকে বিরত থাকি। কোন মা তার শিশুর কান্না শুনে যেভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে, আমিও সেই ধরনের অনুভূতি উপলব্ধি করি।" সুবহানাল্লাহ।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট মেয়েকে তার গায়ের হলুদ রংয়ের জামার প্রশংসা করেছিলেন। মেয়েটি সে সময় মহানবীর পিঠে অবস্থিত মহরে নবুয়তে হাত দিয়ে খেলা করছিল। মেয়েটির মা এজন্য তাকে বকা দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তার ব্যাপারে মাথা ঘামিও না।" তারপর তিনি মেয়েটির দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে বললেন, "খুব জোরে ঘর্ষণ করো। দেখ, এটাকে মুছে ফেলতে পারো কি না।"

অধীনস্থদের অধিকার

দাস-দাসী ও অধীনস্থদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোত্তম ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে আদেশ দিয়েছেন অধীনস্থদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে। বিদায় হজ্জের খুতবায় তিনি বলেছেন, "দাস-দাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খেতে দেবে। তোমরা যা পরো তাদেরকে তাই পরতে দেবে।"

হযরত আনাস বিন মালিক রাযি. বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গৃহে দশ বছর কাজ করেছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সাথে কর্কশ ব্যবহার করেছেন বা অন্যায় কাজ করার জন্য সমালোচনা করেছেন, এমন একটি ঘটনাও আমার স্মরণ নেই।"

ভিন্ন মতাবলম্বীদের অধিকার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিন্ন মত ও পথের লোকদের অধিকার রক্ষায় অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়। ভিন্নমতের জাতি-গোষ্ঠীর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। ইতিহাসখ্যাত মদীনা সনদ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক অন্য ধর্মের দেব-দেবীদের গালাগাল দিতে নিষেধ করেছেন।

একদিন এক আরব বেদুইন মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করতে শুরু করে। সাহাবীগণ তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে এবং শাস্তি দিতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বাঁধা দিয়ে বললেন, "তাকে শেষ করতে দাও এবং তার পর ঐ স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও।"

শেষ কথা

এক বিংশ শতাব্দীর যাত্রালগ্নে একটি অনিবার্য পরিবর্তনের অপেক্ষা করছে এবং পৃথিবী ও তার উপরিভাগ বসবাসরত ছয়শ কোটি মানুষ। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে পৃথিবীর। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার প্রতি মোহভঙ্গ ঘটেছে মানব জাতির। সকলেরই প্রত্যাশা একবিংশ শতাব্দী বিশ্বমানবের জন্য কল্যাণকর এক নতুন ব্যবস্থা উপহার দেবে। একটি পরিবর্তন খুবই প্রয়োজন কিন্তু প্রত্যাশিত সে পরিবর্তন আপনা আপনি হয়ে যাবে না। এ জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে জীবন বাজি রেখে। প্রশস্ত হৃদয়, প্রজ্ঞাবান নেতৃত্ব, গণমুখী সংগঠন, সঠিক কর্মকৌশল আর সুদৃঢ় ঐক্য নিয়ে এগিয়ে গেলে আল্লাহর সাহায্য আমরা অবশ্যই পাবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হবে। পৃথিবীতে আবার নবীর পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। রহমত আর বরকতের আসমানী ধারায় সুসিক্ত হবে এই পৃথিবী ও তাতে বসবাসরত ছয়শ কোটি মানুষ। একবিংশ শতাব্দী হবে অনিবার্যভাবে ইসলামের শতাব্দী ইনশা'ল্লাহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّصِيحَةِ ص ١٤

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭. হিত কামনা

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلدِّيْنُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثُ مِرَارٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَتَمِيْمِ الدَّارِيِّ وَجَرِيْرٍ وَحَكِيْمِ بْنِ اَبِى يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ وَثَوْبَانَ

৩২. বুনদার রহ....... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দীন হল মঙ্গল কামনার নাম। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার মঙ্গল কামনা? তিনি বললেন, আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, মুসলিম ইমামগণের এবং সর্বসাধারণের।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ বিষয়ে ইবনে উমর, তামীম দারী, জারীর, হাকীম ইবনে আবূ ইয়াযীদ তার পিতা আবূ ইয়াযীদ ও সাওবান রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ......... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আমি বাই'আত হয়েছি, সালাত কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে এবং প্রত্যেক মুসলিমের মঙ্গল কামনা করতে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

النصيحة ঃ এটি ইসমে মাসদার। শাব্দিক অর্থ হল, নিষ্ঠা, নির্ভেজাল, খাঁটি। যেমন, توبة النصوح অর্থ, খাঁটি বা আন্তরিক তাওবা। বলা হয়- نصح نفسه بالتوبة (সে আন্তরিকভাবে তাওবা করল।) এ শব্দটি দুভাবে ব্যবহৃত হয়।

এক. نصح الثوب অর্থ কাপড় সেলাই করল। নসীহত দ্বারাও যার জন্য কল্যাণ কামনা করা হয়, তার মন্দ অবস্থা ঠিক করা হয়। আর তাওবায়ে নাসূহ এর ক্ষেত্রে কেমন যেন গুনাহর আমলসমূহ দ্বীনের আবরণকে ছিঁড়ে ফেলে, তাওবায়ে নাসূহ তাকে ঠিক করে দেয়।

দুই. অথবা শব্দটি نصح العسل থেকে এসেছে। মধুকে যখন মোম ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার করে, তখন বলে, نصح العسل সে খাঁটি মধু সংগ্রহ করেছে। নসীহত বা শুভকামনা দ্বারাও মন্দত্বকে পরিষ্কার ও পরীশীলিত করা হয়।

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা খাত্তাবী রহ. এর কথা বর্ণনা করে বলেন, النصيحة এমন একটি শব্দ, যে শব্দটি সকল প্রকার কল্যাণকামিতাকে শামিল করে। শব্দটি উচ্চারণে সংক্ষিপ্ত। অথচ এটি অসংখ্য অর্থের উৎস। গোটা আরবী ভাষায় এমন অর্থ সমৃদ্ধ শব্দ আর নেই। এমনকি তার পূর্ণ অর্থ বুঝাতে পারে এমন কোন প্রতিশব্দও নেই। (হাশিয়াতুল কাওকাব)

আল্লামা জাযারী রহ. অনেকটা এমনই বলেছেন,

قال الجزرى : النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هى ارادة الخير للمنصوح وليس يمكن ان يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها (تحفة الاحوذى)

قال:لله ঃ "আল্লাহর জন্য নসীহত" -এর অর্থ হল, বিশুদ্ধ আকীদার সাথে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা। পাশাপাশি ইখলাসের সাথে তার বন্দেগী করা। তাঁর বিধিবিধান মেনে চলা এবং তাঁর নেয়ামতরাজির শুকরিয়া আদায় করা।

لكتابه ঃ "কিতাবের জন্য নসীহত" এর অর্থ হল, একথার বিশ্বাস করা যে, কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আল্লাহর কিতাবের বিধানাবলীর উপর সর্বাবস্থায় আমল করা। কখনও অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা। যথার্থরূপে তিলাওয়াত করা। তিলাওয়াতকালে তার অর্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। প্রতিটি হরফ তাজবীদসহ উচ্চারণ করা। কুরআনকে বিক্রিতি কারীদের অপব্যাখ্যা ও নিন্দ্রুপ থেকে হিফাজত করা। কুরআনের বিষয়াবলীর প্রতি বিশ্বাস রাখা। তাকে কোনও মানবের কথার সঙ্গে তুলনা না করা। মুতাশাবিহ আয়াতগুলোতে মেনে নেওয়া। কালামুল্লাহর আম-খাস, নাসিখ-মানসুখ ইত্যাদি বিষয়গুলো জানা। কুরআনের ধারক-বাহক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্মানসূচক দৃষ্টি রাখা এবং তাদের কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি।

لائمة المسلمين ঃ মুসলমানদের ইমামের জন্য নসীহত –এর অর্থ হল, তাঁদের শরী'আতসম্মত নির্দেশসমূহ মেনে চলা এবং অন্যায় নির্দেশসমূহ সম্পর্কে হেকমতের সাথে তাঁদেরকে সতর্ক করা। তাদের বিরূদ্ধে বিদ্রোহের বীজ বপন না করা।

উলামাগণও সাধারণ মুসলমানদের দ্বীনি পথপ্রদর্শক। বিধায় তাদেরকে সম্মান করা। শরঈ বিধানাবলীর ব্যাপারে তাদের কথা মেনে চলা। তাদের ভাল দিকগুলোর অনুসরণ করা, কোন প্রকার সমালোচনা না করা।

وعامتهم ঃ "সাধারণ মুসলমানের জন্য নসীহত" –এর অর্থ হল, দুনিয়া ও আখেরাতের অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা ও সুপরামর্শ দেওয়া। তাদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়া এবং সর্বাবস্থায় তাদের জন্য কল্যাণকামিতা বজায় রাখা। আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেন, জনগণের শুভকামনা করা ফরযে কিফায়াহ। যে কেউ করলে অন্যদের থেকে এ হুকুম আদায় হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, অবস্থাভেদে এটি ফরয ও হয়ে যায় আবার মুসতাহাব ও হয়। যেমন, নসীহতকারীর কথা গ্রহণ করবে– এরূপ নিশ্চিত আস্থা থাকলে ফরয। পক্ষান্তরে নসীহতকারীর জন্য বিপদের আশঙ্কা থাকলে মুসতাহাব। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য নববী ঃ ১/৫৪)

বলা বাহুল্য, الدين النصحة হাদীসটি جوامع الكلم তথা কথায় সংক্ষিপ্ত। অথচ অর্থে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। দীনের সব বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে এ ছোট্ট হাদীসটিতে চলে এসেছে। এজন্য আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেন, হাদীসটি দীনের এক চতুর্থাংশ। আল্লামা নববী রহ. বলেন, হাদীসটি দীনের সারকথা। (হাশিয়াতুল কাওবাব, নববী, বযলুল মাজহূদ)

بايعت النبى ﷺ الخ ঃ ইবাদত দু'প্রকারা।

(১) عبادت بدنية তথা শারীরিক ইবাদত। যার মধ্যে প্রধান হল, নামায।

(২) عبادت مالية তথা আর্থিক ইবাদত। এর মধ্যে প্রধান হল, যাকাত। উভয় প্রকার ইবাদতের মধ্য থেকে প্রধান ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। যেন উভয়টির আওতায় সমস্ত ইবাদতের কথাও পরোক্ষভাবে চলে আসে।

বিঃ দ্রঃ হযরত জারীর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির সুবাদে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা স্ববিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাতে উল্লেখিত বাই'আতের আ'মলী নমুনাও আমরা অনুধাবন করতে পারি।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত জারীর রাযি. একটি ঘোড়া তিনশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলেন। তারপর তিনি বিক্রেতাকে বললেন, তোমার ঘোড়াটির দাম তো তিনশ টাকার চেয়ে বেশি। সুতরাং তুমি এর মূল্য চারশ দিরহাম

নিবে কি? বিক্রেতা উত্তর দিল, হে আবদুল্লাহর ছেলে! তোমার খুশি। জারীর বললেন, ঘোড়াটির মূল্য চারশ দিরহামেরও বেশি। তুমি কি এর মূল্য পাঁচশ দিরহাম গ্রহণ করবে? এভাবে প্রতিবারে একশ করে বাড়াতে বাড়াতে অবশেষে তিনি আটশ দিরহামের বিনিময়ে ঘোড়াটি খরিদ করলেন।

এ ঘটনা দেখে কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি অযথা ঘোড়ার মূল্য কেন বাড়ালেন? তিনি উত্তর দিলেন। আসল কথা হল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট এই মর্মে বাই'আত হয়েছি যে, সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করব। আমি যখন আমার মুসলমান ভাই ঘোড়ার প্রকৃত মূল্য আমার নিকট চাচ্ছেন, তাই আমি শুভ কামনার দৃষ্টিকোণে অধিক মূল্যে ঘোড়াটি খরিদ করে নিয়েছি। (তুহফাহ)

এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হকসমূহ

(১) কোন মুসলমান পীড়িত হলে তার শুশ্রূষা করা।
(২) কোন মুসলমান মারা গেলে তার জানাযা, দাফন-কাফনে শরিক হওয়া।
(৩) মহব্বত করে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা। ডাকলে সাড়া দেওয়া।
(৪) হাদিয়া-তোহফা দিলে তা গ্রহণ করে তার মন খুশি করা। (যদি শরী'আত কর্তৃক কোন বাঁধা না থাকে।)
(৫) হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে, তার জবাব দেওয়া।
(৬) কোন মুসলমানকে দেখলে সালাম দেওয়া।
(৭) কোন মুসলমান কোন কাজে আটকে গেলে সকলে মিলে তার কাজ উদ্ধার করে দেওয়া।
(৮) মুসলমানের বিবি ও তার সন্তানাদির জীবন ও সম্মান রক্ষা করা।
(৯) কোন মুসলমান যদি কোন বিষয়ে ন্যায্য কসম খেয়ে বসে, তাহলে তা পূর্ণ করা এবং রক্ষা করার জন্য সকলে চেষ্টা করা।
(১০) মযলুম মুসলমানের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং যালিমকে বাঁধা দেওয়া।
(১১) মুসলমানকে মহব্বত করা। সম্মানের চোখে দেখা এবং অবজ্ঞা না করা।
(১২) নিজের জন্য যা পছন্দনীয় মনে হয়, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তা কামনা করা এবং তদ্রূপ ব্যবহার করা।
(১৩) কোন কারণে কোন মুসলমানের সাথে দ্বন্দ্ব-কলহ হয়ে গেলে তিনদিনের অধিক তা জিইয়ে না রাখা এবং সত্বর আপোস-মীমাংসা করে ফেলা।
(১৪) দুই মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ হয়ে গেলে তা মিটমাট করে দেওয়া সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।
(১৫) কোন মুসলমান কোন সুপারিশ করলে যথাসাধ্য গ্রহণ করা এবং কোন আশা করে এলে যথাসম্ভব নিরাশ ও বঞ্চিত না করা।
(১৬) মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা। একান্ত যদি প্রকাশ করতেই হয়, তাহলে তার সংশোধনের নিয়তে শুধু তাকে বলা কিংবা তাকে সংশোধন করতে পারবে তার এমন কোন মুরুব্বির কাছে বলা।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ شَفَقَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ صـ١٤

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮. এক মুসলিমের জন্য আরেক মুসলিমের সহমর্মিতা

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِىُّ ثنا اَبِىْ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَخُوْنُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِ اَنْ يَحْتَقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

৩৪. উবায়দ ইবনে আসবাত ইবনে মুহাম্মদ কুরাশী রহ.... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার খিয়ানত করবে না, তার বিষয়ে মিথ্যা বলবে না। তাকে অপমান হতে দিবে না। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সম্মান, সম্পদ ও রক্ত হারাম। তাকওয়া হল, এখানে (অন্তরে)। কোন ব্যক্তির মন্দতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا ثنا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهٖ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا، هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ وَاَبِيْ اَيُّوْبَ

৩৫. হাসান ইবনে আলী খাল্লাল প্রমুখ রহ......... আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য ইমারতের ন্যায়, যার একটি ইট আরেকটিকে শক্তি যোগিয়ে থাকে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ বিষয়ে আলী ও আবূ আইয়ূব রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا يَحْيٰى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى بِهٖ اَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ وَيَحْيٰى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ضَعَّفَهٗ شُعْبَةُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ،

৩৬. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা একজন তার ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। তার মাঝে যদি সে কোন দাগ দেখতে পায় তবে যেন তা দূর করে দেয়। ইয়াহইয়া ইবনে উবায়দুল্লাহ রহ. কে শু'বা রহ. যঈফ বলেছেন। এ বিষয়ে আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

المسلم اخوالمسلم ঃ অর্থাৎ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ধর্মীয় ভাই। রক্ত সম্পর্কীয় ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের যেরূপ হৃদ্যতা ও ভালবাসা থাকে, অদ্রূপ আন্তরিকতা অপর মুসলমানের জন্য থাকা উচিত।

মাওলানা তকী উসমানী বলেন, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই– হাদীসটির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলতঃ একটি মূলনীতির কথা বলেছেন। তনি এ মূলনীতির মাধ্যমে সমাজে গড়ে উঠা বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার সকল ভিত সমূলে উপড়ে ফেলেছেন। কে কোন দেশের, কার কি ভাষা, গোত্রীয় আভিজাত্যের অধিকারী কে –এসব চিন্তা করার অবকাশ ইসলামে নেই। কারণ, মুসলমান মুসলমানের ভাই। এ হাদীসের পরবর্তী অংশে মুসলমান মুসলমানের ভাই হওয়ার জন্য কিছু নিদর্শন পেশ করা হয়েছে।

التقوى ههنا ঃ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র বক্ষের দিকে ইংগিত করে বলেছেন। উদ্দেশ্য হল, তিনি বলতে চেয়েছেন, তাকওয়া মূলতঃ অন্তরের বিশেষ অবস্থার নাম, যার নিদর্শন দেখা গেলেও মূল তাকওয়া কেউ দেখে না। অতএব কোন মুসলমানকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। কেননা হতে পারে যাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, সে আল্লাহর দরবারে অবজ্ঞাকারীর চেয়েও বেশি প্রিয়।বাক্যটি থেকে আরও বুঝা যায়, একজন মুত্তাকী মুসলমান অপর মুসলমানকে কখনও অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারে না।

একটি সারগর্ভ হাদীস

المسلم اخو المسلم এ হাদীসটি শব্দ-বিচারে সংক্ষিপ্ত হলেও মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, এটি একটি جامع তথা পরিপূর্ণ ও সারগর্ভ হাদীস বিধায় جوامع الكلم এর অন্তর্ভুক্ত।

المؤمن للمؤمن كالبنيان ঃ অর্থাৎ যেমনিভাবে ইমারতের ইটগুলো পরস্পর একসাথে হয়ে একটি শক্তিশালী কিল্লাতে পরিণত হয়, অনুরূপভাবে একজন মুসলমান ইমারতের একেকটি ইটের ন্যায়। ভাষা, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে তারা সকলেই ঐ ইমারতের একেকটি ইট। এর মাধ্যমে তাদেরকে সুদৃঢ় ঐক্যের প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই তারা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা পাবে।

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটি বলার পর তার হাতের আঙ্গুলগুলো একটির মধ্যে আরেকটি প্রবেশ করিয়েছেন।

ان احدكم مرأة اخيه ঃ অর্থাৎ আয়না যেমনিভাবে সৌন্দর্য্য ও খুঁত নিরবে বলে দেয়, অনুরূপভাবে এক মুসলমান অপর মুসলমানের দোষ ও খুঁত অন্যের সামনে প্রকাশ করবে না বরং গোপনে সংশোধনের নিয়তে তাকে অবহিত করবে। আবার চেহারায় কোন ধূলি-ময়লা থাকলে আয়না শুধু বলে দিতে পারে, তা দূর করতে পারে না। অনুরূপভাবে এক মুসলমান অপর মুসলমানের দোষ শুধু বলতে পারে দূর করতে পারে না। দূর করতে হয় স্বয়ং নিজেকে। আর যেমনিভাবে নিজের কাছে আয়না রাখা হয় নিজেরই প্রয়োজনে, যেন পরিপাটি চলা যায়। অনুরূপভাবে এক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানকে একথা বলে রাখা যে, তিনি কোন দোষ-ত্রুটি দেখলে যেন শুধরে দেন। এটা করতে হবে নিজের প্রয়োজনে। যেমনিভাবে আয়না রাখা হয় নিজের প্রয়োজনে

بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّتْرِ عَلى الْمُسْلِمِيْنَ صـ١٤

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯. মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন রাখা

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطِ الْقُرَشِيُّ ثنا اَبِى ثنا الْاَعْمَشُ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوٰى اَبُوْ عَوَانَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ حُدِّثْتُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ

৩৭. উবায়দ ইবনে আসবাত ইবনে মুহাম্মদ কুরাশী রহ......... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব বিপদ-আপদের একটিও দূর করবে, তার কিয়ামতের দিনের বিপদ আল্লাহ তা'আলা দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অসচ্ছল ব্যক্তির সংকট আসান করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার সংকটসমূহ আসান করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।

আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ তার বান্দার সাহায্যে রত থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে। এ বিষয়ে ইবনে উমার ও উকবা ইবনে আমির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবূ আওয়ানা প্রমুখ রহ. এ হাদীসটিকে আ'মাশ – আবূ সালিহ – আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ সনদে حدثت عن ابى صالح বাক্যটি তারা উল্লেখ করেননি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

حدثت عن ابى صالح ঃ ح এর উপর পেশ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আ'মাশ ও আবু সালিহের মধ্যে একটি সূত্র আছে। তিনি হাদীসটি আবু সালিহের কাছ থেকে শুনেননি। তাকে কে বর্ণনা করেছেন তাও তিনি বলেননি। আবু আওয়ানা প্রমুখ এ হাদীসটি আ'মাশ আবু সালিহ– আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমনিভাবে ইমাম তিরমিযী রহ. পরবর্তীতে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, আ'মাশ এ হাদীসটি আবু সালেহ থেকে মধ্যবর্তী সূত্র ছাড়া শুনেছেন। উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্যবিধানের পন্থা হল, আ'মাশ এটি প্রথমে সূত্রসহ শুনেছেন। পরবর্তীতে আবু সালিহের সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে। ফলে মাধ্যম ছাড়া তিনি তার কাছ থেকে হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন।

من ستر على مسلم ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গুনাহ ও দোষ প্রকাশ না করে গোপন রাখে, সে ব্যক্তির গুনাহ ও দোষ আল্লাহ তা'আলা গোপন রাখবেন। সুতরাং সে ব্যক্তির গুনাহ হিসাবের সময় প্রকাশ করা হবে না।

এ হাদীসের আলোকে উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, যে মুসলমানের বাহ্যিক জীবন পবিত্র, মানুষ তাকে ভদ্র ও চরিত্রবান মনে করে, সে মুসলমানের দোষ প্রয়োজন হলেও প্রকাশ না করা মুসতাহাব এবং উত্তম। আর যে মুসলমানের লাজ-শরম উঠে গেছে, প্রকাশ্যে গুনাহ করে বেড়ায়, সে মুসলমানের ঐ গুনাহ বা দোষ প্রকাশ করা ওয়াজিব। তবে সর্বপ্রথম তাকে সতর্ক করতে হবে। তবুও ফিরে না আসলে বিচারক অথবা তার কোন মুরব্বি থাকলে ঐ মুরুব্বিকে অবহিত করতে হবে। আর যারা হাদীসের রাবীদের ব্যাপারে অহেতুক সমালোচনা করে কিংবা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যে লিপ্ত অথবা প্রকাশ্যে অন্যের উপর যুলুম করে– তাদের দোষ-ত্রুটিও প্রকাশ করা অপরিহার্য।

মাওলানা তাকী উসমানী লিখেন, যে গুনাহর প্রভাব অন্যের উপর প্রতিক্রিয়াশীল নয় এবং গুনাহগার গুনাহটি প্রকাশ্যেও করেনি কিংবা সে বারবারও করেনি, তাহলে এ জাতীয় গুনাহ গোপন রাখতে হবে। এরূপ গুনাহ কখনও প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু গুনাহর প্রভাব যদি অন্যের উপর পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং গুনাহটি প্রকাশ্যে করা হয় কিংবা বারবার করা হয়, তাহলে সে গুনাহ কখনও গোপন রাখার যোগ্য নয় বরং তা প্রকাশ করা যাবে।

বলা বাহুল্য যে, উলামায়ে কিরাম বলেছেন, উল্লেখিত হাদীসখানা جوامع الكلم এর শ্রেণীভুক্ত।

بَابَ مَاجَاءَ فِى الذَّبِّ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ ص١٤

অনুচ্ছেদ ঃ ২০. মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করা

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ النَّهْشَلِىِّ عَنْ مَرْزُوْقٍ اَبِىْ بَكْرٍ التَّيْمِىِّ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

৩৮. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... আবূদ দারদা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন. তিনি বলেছেন– যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের উপর আক্রমণকে প্রতিরোধ করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত

দিবসে তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন রোধ করবেন। এ বিষয়ে আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

رد الله عن وجهه ঃ এখানে চেহারা বলে সম্পূর্ণ সত্ত্বা বুঝানো হয়েছে। আর এরূপ উদ্দেশ্য নেওয়া আরবের মাঝে ব্যাপক প্রচলন আছে। আল্লামা মানবী রহ.বলেন, বিশেষভাবে চেহারার কথা বলার কারণ হল, চেহারার মধ্যে যে শাস্তি দেওয়া হয়, সেটা অধিক কষ্টকর হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْهَجْرِ لِلْمُسْلِمِ صـ ١٥

অনুচ্ছেদ ঃ ২১. কোন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ ثنا سُفْيَانُ ثنا الزُّهْرِيُّ ح وثنا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا خَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ،

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَنَسٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَاَبِيْ هِنْدِ الدَّارِيِّ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৯. ইবনে আবূ উমার (রহ. .... আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনদিনের বেশী কোনও মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা, কোনও মুসলমানের জন্য হালাল নয়। দুজনের সাক্ষাত হয়। অথচ একজন এদিকে ফিরে যায়, অপরজন আরেক দিকে ফিরে যায়। এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সেই ব্যক্তি, যেজন প্রথমে সালাম করে।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস, আবূ হুরাইরা, হিশাম ইবনে আমির, আবূ হিন্দ দারী রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لايحل لمسلم ان يهجر اخاه ঃ (ن، هجرا وهجرانا) هجر অর্থ, সালাম-কালাম ছেড়ে দেওয়া, দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দেওয়া এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা। কিন্তু এ هجران তথা সম্পর্ক ছিন্ন করার সীমা কতটুকু? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। যথা–

অধিকাংশ আলেমের অভিমত হল, শুধু সালাম বন্ধ করে দিলেই هجران সাব্যস্ত হবে। অতএব যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সালাম দিবে, সে এর গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে। যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদীস خيرهما الذى يبدأ بالسلام একথারই প্রতি ইংগিতবহ।

ইমাম আহমদ এবং কাযী ইয়ায রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তারা বলেন, কেবল সালাম দ্বারা সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসবে।

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, শরী'আত কর্তৃক নিষিদ্ধ هجران হল, সালাম ও কথাবার্তা উভয়টিকে বর্জন করা। অতএব যদি সালাম করে কিন্তু কথাবার্তা না বলে কিংবা সে ডাক দিলে উত্তর না দেয়, তাহলে এই ব্যক্তি هجران এর গুনাহ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। কেননা কথাবার্তা ছেড়ে দেওয়াও সঙ্গীর জন্য কষ্টদায়ক।

বাকি কথা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী خيرهما الذى يبدأ بالسلام এর অর্থ শুধু সালামের উপর যথেষ্ট করা নয় বরং কথাটি বলা হয়েছে স্বাভাবিক স্বভাবের দৃষ্টিকোণে।

কারণ, মুসলমানের একটা স্বাভাবিক রীতি হল, সাক্ষাতের সময় সালাম দিয়ে কথাবার্তা শুরু করে দেওয়া। সুতরাং হাদীসের অর্থ হল, উত্তম সেই, যে প্রথমে সালাম-কালাম করবে। এ অর্থ এ নয় যে, সালাম করবে তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে। অবশ্য বন্ধু-বান্ধবের ন্যায় প্রফুল্লচিত্তে সাক্ষাত করা জরুরী নয়। এটা هجران তথা বর্জন– তরকের শরঈ অর্থের আওতাভুক্ত নয়। কেননা স্বতঃস্ফূর্ততা ও আনন্দ-প্রফুল্লতা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। অতএব আন্তরিক সঙ্কোচের সাথে হলেও প্রয়োজনের মুহূর্তে কথা-বার্তা বলা দ্বারা সম্পর্ক বর্জনের গুণাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। (তাকমিলাহ)

প্রয়োজনে তিনদিন পর্যন্ত সালাম-কালাম বর্জন করা যাবে

শায়খ আকমাল উদ্দীন হানাফী রহ. বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, মুসলমান মুসলমানের সাথে তিনদিনের অধিক সালাম-কালাম পরিহার করা হারাম। তিনদিনের অধিক শর্ত জুড়ে দেওয়ার কারণ হল, ক্রোধ, আত্মমর্যাদাবোধ ও কঠোরতা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। সুতরাং প্রয়োজনে গোস্বা প্রকাশ করার জন্য তিনদিন পর্যন্ত সালাম-কালাম বর্জন করলে, তা হারাম হবে না। এতটুকু পরিমাণ মাফ। যাতে মানুষের স্বভাবজাত আবেগও ঠিক রাখা যায়। এতে এ ফায়দা হয় যে, তিনদিন সময়ে সাধারণতঃ গোস্বা ও আত্মমর্যাদাবোধের আবেগ বিলুপ্ত হয়ে যায় অথবা কমপক্ষে হালকা হয়ে যায়। অবশ্য তিনদিন পর্যন্ত সালাম-কালাম বর্জনের বৈধতা এ হাদীসের مفهوم مخالف তথা বিপরীত মর্মার্থ থেকে প্রতীয়মান হয়। হাদীসের শব্দ থেকে এ মর্মার্থ বের হয় না। সুতরাং শাফেঈ রহ. প্রমুখ যারা مفهوم مخالف তথা বিপরীত অর্থকে দলীল মনে করেন, তাদের মতে এ হাদীসের বিপরীত অর্থ দ্বারা তিনদিন পর্যন্ত সালাম-কালাম বর্জনের বৈধতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু হানাফীগণ مفهوم مخالف তথা বিপরীত অর্থকে দলীলের উপযুক্ত মনে করেন না। সুতরাং তাদের মতে তিনদিন পর্যন্ত সালাম-কালাম বর্জন করা জায়েয হবে না। তবে মোল্লা আলী কারী রহ. মিরকাত গ্রন্থে এ উক্তিটি অশুদ্ধ বলেছেন। তিনি বলেন, প্রতিটি জিনিসের মূল হল, বৈধতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে সাধারণ বর্জনকে হারাম সাব্যস্ত করেননি বরং শর্তযুক্ত (তিনদিনের অধিক) বর্জনকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া সাধারণ বর্জনকে হারাম আখ্যায়িত করলে তাতে সমূহ সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে।

সারকথা, তিনদিন পর্যন্ত বর্জন স্বভাবমতে বৈধ। চাই مفهوم مخالف কে প্রমাণ মনে করুন অথবা না করুন। উভয় পক্ষের মতই এটা। উল্লেখ্য, এ মাসআলা হল, প্রথমে সালাম দেওয়া সংক্রান্ত। অর্থাৎ যদি তিনদিন পর্যন্ত সালাম না দেয়, তবে গুনাহ নেই। কিন্তু বর্জনকারীদের মধ্য থেকে কেউ যদি অপরজনকে সালাম করে, তখন উত্তরদান সর্বাবস্থাতেই ওয়াজিব। (তাকমিলাহ, মাযাহির, মিরকাত)

বন্ধুত্ব বর্জন যদি দীনী কারণে হয়

তিনদিনের চেয়ে অধিক সম্পর্ক বর্জন তখন নিষেধ, যখন তা পার্থিব কোন কারণে হবে। কিন্তু যদি দীনী কোন স্বার্থে কারও সাথে বন্ধুত্ব বর্জন করতে হয়, তাহলে তা জায়িয। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. নিজের ভাতিজাকে খযফ (আঙ্গুল দ্বারা কংকর নিক্ষেপ করা) থেকে বাঁধা দেওয়া সত্ত্বেও সে শুনেনি। অথচ বিষয়টি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নিষেধ ছিল, তাই সে বিষয়টি ত্যাগ না করার কারণে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. তাকে সাফ জানিয়ে দিলেন– لا اكلمك ابدا 'আমি তোমার সঙ্গে কখনও কথা বলব না। দীনের স্বার্থে তিনি ভাতিজার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। অতএব কোন ফাসিক, বিদ'আতী কিংবা এমন ব্যক্তি যার সঙ্গে মেলামেশা করলে দ্বীন-ধর্মের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এদের সাথে সম্পক ছিন্ন করা জায়িয, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাওবা করবে। তবে তা হতে হবে শালীনতা ও ভদ্রতার মধ্য দিয়ে। শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব থাকলে কিংবা কট্টরতাও উশৃঙ্খলতা প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এরূপ না করাই বাঞ্ছনীয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مُوَاسَاةِ الْأَخِ صـ١٥

অনুচ্ছেদ ঃ ২২. ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثنا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثنا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رض الْمَدِيْنَةَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ اُقَاسِمُكَ مَالِىْ نِصْفَيْنِ وَلِىَ اِمْرَأَتَانِ فَاُطَلِّقُ اِحْدٰهُمَا فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّوْنِىْ عَلَى السُّوْقِ فَدَلُّوْهُ عَلَى السُّوْقِ فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ اِلَّا وَمَعَهُ شَيْئٌ مِنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدِ اسْتَفْضَلَهُ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ وَعَلَيْهِ وَ ضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَمَا اَصْدَقْتَهَا قَالَ نَوَاةً قَالَ حُمَيْدٌ اَوْ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ ثَلٰثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ وَقَالَ اِسْحٰقُ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ اَخْبَرَنِىْ بِذٰلِكَ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَاِسْحَاقَ

৪০. আহমাদ ইবনে মানী রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. যখন মদীনায় আগমন করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এবং সা'দ ইবনুর রাবী রাযি. এর মাঝে ভাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। তখন সা'দ রাযি. তাকে বললেন, আসুন, আমার সম্পদ আপনাকে দুইভাগে ভাগ করে দেই। আমার দুই স্ত্রী রয়েছে। একজনকে তালাক দিয়ে দেই; ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. বললেন, আল্লাহ আপনার সম্পদে এবং পরিবার-পরিজনে বরকত দিন। আমাকে তো বাজারটি দেখিয়ে দিবেন। লোকেরা তাকে বাজার দেখিয়ে দিল। তিনি সেদিনই কিছু লাভ-স্বরূপ কিছু পনির ও ঘি নিয়ে ঘরে ফিরলেন। পরবর্তীতে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গায়ে জাফরান নির্মিত সুগন্ধির হলদে দাগ দেখতে পেয়ে বললেন, কি ব্যাপার ? তিনি বললেন, জনৈকা আনসারী মহিলা বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কি মহরানা দিয়েছ ? তিনি বললেন, খর্জুর বীচি। বর্ণনাকারী হুমায়েদের রেওয়াতে বর্ণিত আছে, খর্জুর বীচির ওজন পরিমান স্বর্ণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একটি বকরী হলেও ওয়ালীমা কর।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, খর্জুর বীচির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ হল, তিন দিরহাম ও এক দেরহামের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওজন স্বর্ণ। ইমাম ইসহাক রহ. বলেন, খর্জুর বীচি পরিমাণ স্বর্ণ হল, পাঁচ দিরহাম পরিমাণ স্বর্ণ। আহমাদ ইব্‌নে হাম্বল ও ইসহাক রহ. থেকে ইসহাক ইব্‌ন মানসুর রহ. মারফত এ তথ্য আমি পেয়েছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قوله هلم ঃ আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বলেন, هلم শব্দটি মূলতঃ ها এবং لم ছিল। উভয়টি মিলিয়ে একটি করা হয়েছে। যার ব্যাখ্যা হল, (لَمًّا .ن) لَمَّ অর্থ মিলানো, একাংশকে পরের অংশের সাথে যুক্ত

করা। যেমন, বলা হয়ে থাকে– لم الله شعثه "আল্লাহ তার বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে সংযুক্ত করে দিলেন।" আর ها শব্দটি تنبيه এর জন্য ব্যবহার হয়। ها থেকে الف কে হযফ করে উভয়টিকে এক করে দেওয়া হয়েছে। هلم হয়ে গেছে। তারপর এটি اسم فعل হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থ– আস, উপস্থিত কর ইত্যাদি। যেমন, هلم شهدائكم "তোমাদের সাক্ষীদের উপস্থিত কর।" আহলে হিজাযের মতে এর واحد - تثنيه ও جمع এবং مذكر ও مؤنث সমান। অর্থাৎ বচন ও লিঙ্গভেদে এর কোন পরিবর্তন হয় না। আর আহলে নাজদ -এর মতে বচন ও লিঙ্গভেদে তার পরিবর্তন হয়। যেমন, هلم هلما هلموا هلمي هلما هلمن

قوله اقاسمك : মীমের উপর জযম সহকারে। এটি هلم এর জওয়াব।

قوله عليه وضرصفرة : و এর উপর যবর, ض এর উপরেও যবর। মূলতঃ এর অর্থ, নিদর্শন। صفرة অর্থ, খালুকের হলুদ রং। খালুক হল, জাফরান ইত্যাদি দ্বারা তৈরী এক প্রকার খুশবু। কেউ কেউ বলেন, صفرة হল এমন সুগন্ধি, যা বাসর রাতে ব্যবহার করা হয়। শুধু জাফরানকেও صفرة বলা হয়। অধিকাংশের মতে এখানে এটাই উদ্দেশ্য।

قوله فقال مهيم ؟ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ مهيم অর্থাৎ এটা কি ? অথবা তোমার এ কী অবস্থা ?

এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিহ্ন বা দাগ লাগার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। অন্যথায় মূলতঃ জাফরান যেহেতু খুব সামান্য ছিল, যার সামান্য দাগ অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিবাদ করেননি। অথবা হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদেরকে খালুক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন, তাই এর দ্বারা তাঁকে সতর্ক করেছেন যে, পুরুষদের জন্য যা নিষিদ্ধ তা তিনি ব্যবহার করলেন কেন ? হযরত আব্দুর রহমান রাযি. উত্তরে বললেন, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে লাগাইনি বরং নববধূর সাথে মেলা-মেশার ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার অগোচরে একটু লেগে গেছে।

قوله أولم ولو بشاة : বিয়ের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে কেবল ওলীমা (বৌভাত) নিয়মতান্ত্রিক সুন্নাত। আলোচ্য হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। তবে এ সম্পর্কে **প্রথমতঃ** মনে রাখতে হবে, এ অনুষ্ঠান এমন কোন ওয়াজিব-ফরয নয়, যা না করলে বিয়ে অসম্পূর্ণ থাকবে। তবে এটি একটি সুন্নাত। তাই সাধ্যমত পালন করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ এ সুন্নাত আদায়ের জন্য শরী'আত কর্তৃক নিমন্ত্রিত মেহমানদের কোন সংখ্যা বা খাদ্যের কোন মানদণ্ড ও পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। যেমন, উপরিউক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, لو بشاة এর ব্যাখ্যায় কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন, ولو بشئ قليل كالشاة তথা বকরীর মত সামান্য কিছু।

অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি ওলীমা করেন, যাতে শুধুমাত্র দুই সের যব ব্যয় করা হয়েছিল। সুতরাং শরী'আতের দৃষ্টিতে ওলীমার সঠিক পন্থা হল, যার সামর্থ কম, সে নিজের সামর্থানুপাতে সংক্ষেপেই কাজ সারবে। হ্যাঁ সামর্থ থাকলে অধিক সংখ্যক মেহমানকে দাওয়াত করাতে এবং উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হল, যশ-খ্যাতি ও প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হতে পারবে না।

ওলীমার ব্যাপারে আরেকটি কথা হল, বিয়ের পর থেকে নিয়ে কন্যা বিদায়ের পর পর্যন্ত যে কোন সময় ওলীমা হতে পারে। তবে ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, কন্যা বিদায়ের পর ওলীমা হওয়া মুস্তাহাব। কন্যা বিদায় দ্বারা বর ও বধূর নির্জন সাক্ষাতই উদ্দেশ্য। এর অধিক কিছু নয়। অর্থাৎ তাদের মাঝে মিলন হওয়া জরুরী নয়। কন্যা বিদায়ের পূর্বেও যদি কেউ ওলীমার অনুষ্ঠান করে, তাহলেও ওলীমা আদায় হয়ে যায়। শুধুমাত্র মুসতাহাব সময় মত হয় না।

(ফয়যুল বারী ঃ ৯/২৩১, যিক্‌র ও ফিক্‌র ঃ ২৯৩-২৯৪)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْغِيْبَةِ صـ١٥
অনুচ্ছেদ ঃ ২৩. পরনিন্দা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْغِيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ،
وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৪১. কুতায়বা রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত কি ? তিনি বললেন, তোমার কোন ভাইয়ের এমন আলোচনা করা, যা তার কাছে অপছন্দনীয়। সে বলল, আপনি বলুন তো, আমি যা বলছি সেই দোষ যদি তার মধ্যে বাস্তবিকই থাকে? তিনি বললেন, তুমি যা বলছ সে দোষ যদি তার মধ্যে থাকে, তবেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর যদি সে দোষ তার মধ্যে না থাকে তবে তো তুমি তাকে অপবাদ দিলে। এ বিষয়ে আবূ বারযা, ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ذكرك اخاك بما يكره ঃ কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার সম্বন্ধে এমন কোন প্রকৃত দোষ বর্ণনা করা যা শুনলে সে মনোকষ্ট পাবে, এরই নাম গীবত। আর প্রকৃতপক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে সেটাকে 'বুহতান'বা অপবাদ বলা হয়। যা গীবতের চেয়েও বড় অপরাধ।

গীবত সম্পর্কে জরুরী কিছু আলোচনা

গীবত কাকে বলে ?

গীবত আরবী শব্দ। শরী'আতের পরিভাষায় গীবতের অর্থ হল– মুখে, কলমে, ইশারা, ইংগিতের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন উপায়ে কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষের কথা আলোচনা করা, যা শুনলে সে মনে আঘাত পেতে পারে। আলোচিত ব্যক্তি মুসলমান হোক কিংবা কাফির। যদি এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা হয়, যা আদৌ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে সেটা গীবত নয় বরং সেটা তোহমত বা অপবাদ এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা গীবতের চেয়ে জঘন্য। কেননা গীবতের সাথে সাথে এখানে মিথ্যা কথা প্রচার করার গুনাহও যোগ হচ্ছে।

গীবত সম্পর্কে অনেকের মধ্যে একটি ভুল ধারণা আছে। তারা মনে করে, গীবতের অর্থ হল, মানুষের গোপনীয় কোন দোষ প্রকাশ করে দেওয়া। অতএব যে দোষের কথা সকলে জানে তা গীবত বলে বিবেচিত হবে না। মনে রাখতে হবে, গোপনীয় কিংবা প্রকাশ্য যে কোন দোষের কথা আলোচনা গীবতরূপে গণ্য হবে। অবশ্য কারও কোন গোপনীয় দোষের কথা প্রকাশ করে দেওয়া আরও জঘন্য অপরাধ। কেননা এখানে গীবতের সাথে লুকিয়ে রাখা দোষ প্রকাশ করে দেওয়ার অপরাধও যোগ হচ্ছে।

মৃত ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা

জীবিত ব্যক্তিদের গীবত যেমন হারাম, তেমনি কোন মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করা, তার গীবত ও দোষ চর্চা করাও হারাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন তাকে তার অবস্থার উপরই ছেড়ে দাও। কোন অবস্থাতেই নিজেকে তার গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত করো না। (আবূ দাঊদ)

গীবতের প্রকার

গীবত বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমনঃ

- শারীরিক দোষ-ত্রুটির গীবত।

- পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত গীবত।
- জাত, বংশ ও খান্দান সম্পর্কিত গীবত।
- বিশেষ কোন বদ-অভ্যাস বা গোনাহর কাজ সম্পর্কিত গীবত ইত্যাদি।

গীবতের উপরোক্ত প্রকার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা

শারীরিক গীবত

কারও আড়ালে, অগোচরে তার বিভিন্ন শারীরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলাপ করা এবং চোখ টিপে হাসাহাসি করা আজ যেন আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই আমরা এ ধরনের আলোচনা করে থাকি, অমুকের গায়ের রংটা কুচকুচে কালো; ঠিক যেন কাকের মামাত ভাই, গলার স্বরটি পেচার মত কর্কশ, দাঁতগুলো যেন বটগাছের শেকড়, নাকটি বেজায় লম্বা, হাঁটলে ভুঁড়িখানা আগে আগে চলে, হাড় কয়খানা হাতে গোনা যায়, চোখ দুইটি যেন গর্তে ঢুকে গেছে, মাথার চুল গুলো যেন খেজুর কাটার মত, হাসলে সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ে, দেখলে মনে হবে তালপাতার সেপাই, লোকটি খুব বেটে আকৃতির ইত্যাদি।

এ ধরনের আলোচনা ও মন্তব্য খুবই অন্যায় কাজ এবং গীবতের ঘৃণ্য প্রকার। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহ পাকের সৃষ্টিতে খুঁত ধরারই শামিল। কোন সাধারণ বা কুৎসিত প্রাণীকেও ঘৃণা করতে নেই। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা'আলার কোন সৃষ্টিই নিরর্থক নয়; প্রতিটি সৃষ্টির পেছনেই রয়েছে তাঁর অপার হিকমত।

পোশাক সম্পর্কে গীবত

পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্ন খুঁত খুঁজে বের করা এবং তা বসে বসে আলোচনা করার প্রবণতাও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষতঃ মহিলাদের মধ্যে এ রোগের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অনেককেই এই ধরনের আলোচনা করতে শোনা যায় যে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়াদারদের মত লেবাস পরে, পায়জামা গোড়ালির নিচে পরে থাকে, শেরেওয়ানি যে একটি জড়িয়েছে, যেন ছালার চট। কাপড় চোপড়ের বাহার দেখে মনে হবে রাজপুত্র অথচ খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঘরে ভাত নেই। কিংবা অমুক মেয়ে পেট কাটা ব্লাউজ পরে, বাজারের মেয়েদের মত শাড়ী পরে, অলঙ্কারগুলি খাঁটি সোনার নয় ইত্যাদি।

যেহেতু এ ধরনের মানুষের কথা মনে ব্যথা দেয়, তাই এগুলোও গীবতের মধ্যে গণ্য হবে। ফকীহ আবূ লাইস গীবত সম্পর্কে বলেন, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিয়্যতে তুমি যদি বল, অমুকের কাপড় খুব খাট কিংবা বেজায় লম্বা। তবে মনে রেখ যে, এটিও গীবত হবে এবং এ জন্য কিয়ামতের দিন তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

বংশ সম্পর্কে গীবত

মানুষের চোখে কাউকে খাটো করার নিয়্যতে কিংবা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ফলানোর উদ্দেশ্যে বংশ ও খান্দান তুলে কথা বলাও গীবতের অন্তর্ভূক্ত। যেমনঃ বলা হয়, অমুকের বংশ ভাল নয়; নীচু বংশের লোক, তিন পুরুষ পূর্বে ওরা হিন্দু ছিল, ক্রীতদাস ছিল, ওর মা বাড়ী বাড়ী ঝিয়ের করে বেড়িয়েছে ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দ্বীনদারী ও ভাল আমল ছাড়া কেউ কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে না। অতএব বংশমর্যাদা নিয়ে বড়াই করা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা কিছুতেই উচিত নয়।

বদ অভ্যাস সম্পর্কে গীবত

সমাজ, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় মানুষের মধ্যে রুচি বিরুদ্ধ কিছু বদ-অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায়, যা অন্যান্যদের কাছে খুবই দৃষ্টিকটু মনে হয়। কিন্তু এ নিয়ে গীবত ও দোষচর্চায় লিপ্ত হওয়া আরও অন্যায় ও ঘৃণ্য কাজ। সেটি যদি হয় রুচিবিরুদ্ধ, তবে এটা হবে মানবতা বিরুদ্ধ। এ ধরনের সমালোচনাও গীবতরূপে গণ্য হবে যে, অমুক ব্যক্তি খুবই পেটুক, মানুষের সামনে দাঁত খুটে, খেতে বসে মুখে বিশ্রী রকম শব্দ করে, ঘুমালে বিশ্রীভাবে নাক ডাকে, দাঁত বের করে হাসে, স্ত্রীর আঁচল ধরে থাকে ইত্যাদি।

পাপাচার সম্পর্কে গীবত

এ ধরনের কথা বলাও গীবতের অন্তর্ভূক্ত যে, অমুক ব্যক্তি মদখোর, চরিত্রহীন, বেনামাযী, মিথ্যাবাদী, ঘুষখোর, পিতা-মাতার অবাধ্য। শেখ সাদী (রহ.) একবার তার উস্তাদের নিকট গিয়ে বললেন, জনৈক সহপাঠি আমার প্রতি অযথা হিংসা পোষণ করে। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে উস্তাদ উত্তর দিলেন, 'হে সাদী! তুমি তোমার সহপাঠীর গীবত করছ।'

পরোক্ষ গীবত

এ পর্যন্ত গীবতের যে কয়টি প্রকার আলোচিত হয়েছে, সেগুলো হল প্রত্যক্ষ গীবত। কিন্তু গীবত যেমন প্রত্যক্ষভাবে হতে পারে, তেমনি হতে পারে পরোক্ষভাবেও। যেমনঃ কোন পঙ্গু ব্যক্তিকে অনুকরণ করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা, কোন অন্ধ ব্যক্তিকে অনুকরণ করে চোখ বন্ধ করে চলা, বোবা ব্যক্তিকে অনুকরণ করে ইশারা-ইংগিতে কথা বলা, হাত নেড়ে বিশেষ কোন ব্যক্তির অনুকরণ করে কথা বলা ইত্যাদি। হাদীস শরীফেও এ ধরনের আচরণকে গীবত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা এটিও মানুষের মনে আঘাত দেয়।

পরোক্ষ গীবতের আরেক প্রকার হচ্ছে, নাম উল্লেখ না করে এমনভাবে কারও দোষ আলোচনা করা, যাতে উপস্থিত সকলে উদ্দিষ্ট্য ব্যক্তিটিকে সহজেই চিনতে পারে। যেমনঃ "অনেককেই দেখা যায় গায়ে লম্বা আলখেল্লা চড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতে তাসবীহ, মুখে সফেদ দাঁড়ি। অথচ তলে তলে শয়তানি আর বদমাইশি। অনেক মুসল্লীর কথাই জানি, কপালে বড় বড় দাগ ফেলেছে অথচ .....। কারও কারও গায়ে এত দুর্গন্ধ যে, পাশে গেলে গা বমি করে। অনেক চতুর ব্যক্তি গীবতের জন্য আরও শিল্পসম্মত পন্থা উদ্ভাবন করেছে। তাদের কথা শুনলে বাহ্যতঃ মনে হবে, নিজের সম্পর্কেই বুঝি কিছু বলা হচ্ছে অথচ আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য কাউকে ঘায়েল করা। যেমনঃ চুরি করা আমার অভ্যাস নয়, মেয়েদের দেখলেই আমার জিহবায় লালা ঝরে না, ঘোমটা ফেলে বুক ফুলিয়ে চলা আমাদের অভ্যাস নয়।

মোটকথা, নাম উল্লেখ না করেও মানুষকে হেয় করার নিয়্যতে যা বলা হবে, যা করা হবে, তা সবই গীবত বলে বিবেচিত হবে।

গীবত শ্রবণ করা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার উপস্থিতিতে যখন কারও দোষ চর্চা হয় তখন তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও এবং তার ভালো ভালো দিকগুলি তুলে ধর। সম্ভব হলে গীবত বন্ধ করানোর চেষ্টা কর; অন্যথায় সে মজলিস বর্জন কর। কেননা চুপ থাকলে তুমিও গীবতকারী বলে গণ্য হবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দোষ প্রকাশ করা জায়েয?

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন রয়েছে সেখানে শরী'আত বিশেষ কোন কারণে কারও দোষ প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছে। সে ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ ঃ

যুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সুবিচার লাভের উদ্দেশ্যে শাসকের কাছে অধীন কর্মচারির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অনুমতি শরী'আত দিয়েছে; এটা গীবত বলে গণ্য হবে না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থেকে যুলুম মেনে নিলে নিজের হক তো নষ্ট হবেই, উপরন্তু জালেমকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে জুলুমও বৃদ্ধি পাবে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কারও দোষ প্রকাশ করে দেওয়া পছন্দ করেন না। তবে মযলুমের জন্য সুবিচার লাভের প্রত্যাশায় অত্যাচারের অভিযোগ তুলে ধরার অবকাশ রয়েছে। যেমনঃ এ ধরনের কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আমার জমি ভোগ দখল করেছে। কিংবা আমার আমানতের টাকা আত্মসাৎ করেছে ইত্যাদি।

সংশোধনের উদ্দেশ্য

কাউকে যদি কোন দোষ বা পাপে লিপ্ত দেখা যায়, তখন সেই কথা এমন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে, যার দ্বারা উক্ত ব্যক্তির সংশোধন হবে বলে আশা করা যায় –এটা গীবত হবে না। কারণ, এখানে উক্ত ব্যক্তিকে হেয় করা উদ্দেশ্য নয় বরং হিতাকাঙ্খা ও কল্যাণ কামনাই মূখ্য। যেমনঃ সন্তানের কোন দোষ পিতা-মাতার কর্ণগোচর

করা, ছাত্রের দোষ শিক্ষকের কাছে প্রকাশ করা কিংবা ঘুষ গ্রহণের কথা শাসকের কানে পৌছে দেওয়া ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে, দোষ এমন ব্যক্তির কাছে কিছুতেই প্রকাশ করা যাবে না, যে সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে না।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. এর মজলিসে জনৈক ব্যক্তি একবার লোমহর্ষক নিষ্ঠুরতার নায়ক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তীব্র সমালোচনা শুরু করল। হযরত ইবনে সীরীন উক্ত ব্যক্তির দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, চুপ হও! তুমি গীবত করছ! কেননা তুমি জানো যে, হাজ্জাজকে সংশোধন করার ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং এটা অনর্থক দোষ চর্চা হচ্ছে।

অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে

অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে দোষ প্রকাশ করার অনুমতিও শরী'আত দিয়েছে। যেমন, কেউ হয়ত কোন অবিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে টাকা আমানত রাখতে যাচ্ছে, এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির অবিশ্বস্ততার কথা প্রকাশ করে দেওয়া যাবে। কিংবা কোন ভালো চরিত্রবান লোক কোন বদ-স্বভাবের লোকের সাথে উঠা-বসা করছে, এরূপ ক্ষেত্রে এ বলে তাকে সতর্ক করে দেওয়া যেতে পারে যে, এ লোক ভালো স্বভাবের নয়। তার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। তদ্রুপ কারও মধ্যে যদি কোটনামীর স্বভাব থাকে কিংবা টাকা ধার নিয়ে তা পরিশোধ না করার অভ্যাস থাকে, তবে সে কথাও মানুষকে জানিয়ে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। কেননা মানুষ তখন উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যাবে এবং তার অনিষ্টতা থেকে বেঁচে যাবে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি লুকিয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে কোন পাপ কাজে লিপ্ত থাকে, যা অন্যান্যদের মাঝে সংক্রমিত হওয়ার ভয় নেই এবং তার পাপ কাজের কারণে অন্য কারও ক্ষতিও হচ্ছে না, তখন মানুষের কাছে তার দোষ প্রকাশ করে দেওয়া কিছুতেই জায়েয নেই।

লজ্জাহীন ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা

যার নির্লজ্জতা এতদূর গড়িয়েছে যে, প্রকাশ্য গোনাহের কাজে লিপ্ত হতে সে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না বরং গর্বই অনুভব করে এরূপ ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেই লজ্জার আবরণ ফেলে দিয়েছে, তার দোষ আলোচনা করা গীবত নয়। শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের দোষ আলোচনা করা অপরাধ নয়। যথা–

(১) নির্লজ্জ ব্যক্তি, যে নিজেই লজ্জার আবরণ ফেলে দিয়েছে।

(২) অত্যাচারী শাসক, যার অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।

(৩) দুষ্ট লোক, যার দুষ্কৃতি মানুষের ক্ষতি সাধন করেছে অথচ অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ সতর্ক হতে পারছে না। যেমন, ওজনে ফাঁকিবাজ ব্যবসায়ী।

কোন অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা নাম উল্লেখ না করে পরিচিত ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা গীবতের অন্তর্ভূক্ত নয়। কিন্তু আকারে-ইংগিতে বা অন্য কোন প্রকারে উদ্দিষ্ট্য ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ পেলে গীবত হয়ে যাবে। যার দ্বারা ধর্মের ক্ষতি হচ্ছে তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেওয়া উচিত। যেন মানুষ তার গোমরাহী সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। উপরিউক্ত কারণেই ভণ্ড পীর তথা ধর্ম-ব্যবসায়ীদের সমলোচনা করা হয়।

শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে

মানুষের ইবরত ও শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন জীবিত কিংবা মৃত ব্যক্তির গোপনীয় দোষ বা মর্মান্তিক পরিণতির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। এটা গীবত বলে বিবেচিত হবে না। যেমন, বলা হল– অমুক ব্যক্তি কথায় কথায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়। ফলে কেউ এখন তার কথা বিশ্বাস করে না। অমুক ব্যক্তি মদখোর কিংবা সুদখোর ছিল। মৃত্যুর সময় তার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। কেউ তার জানাযায় শরিক হয়নি।

গীবতের স্বরূপ

গীবতের কুৎসিত ও বিভৎসরূপ একটি উদাহরণের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

"তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পরস্পরের গীবতে লিপ্ত না হয়। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? এটা যেমন তোমরা ঘৃণা কর, গীবত সম্পর্কেও তোমাদের তেমনি ঘৃণা বোধা করা উচিত।"

অন্য কয়েকটি হাদীসে গীবতকে জীবিত ব্যক্তির গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারও শরীর হতে গোশত কেটে খাওয়াটা যেমন নিষ্ঠুর পৈশাচিকতার পরিচয়, কারও গীবত ও দোষচর্চা করাটাও তেমনি এক হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। কারণ, প্রথমটায় মানুষের শরীর জখম হয় আর দ্বিতীয়টায় জখম হয় মানুষের অন্তর।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গীবত যিনা বা অবৈধ যৌনাচারের চেয়েও ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপ।

শেখ সাদী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কিতাব গুলিস্তায় লিখেছেন, এক রাত্রে আমি আমার পিতার সাথে তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলাম। আমাদের পাশে কিছু লোক ঘুমিয়ে ছিল। আমি বললাম, তারা এমনভাবে ঘুমিয়ে আছে, মনে হয় যেন মরেই গেছে। যদি উঠে তারা দুই রাক'আত নামায পড়ে নিত, তবে কত ভাল হত! আমার পিতা বললেন, কিন্তু তুমি যদি নামায না পড়ে ওদের মত ঘুমিয়ে থাকতে তবে কত ভাল হত! গীবত ও দোষ চর্চার পাপ হতে অন্তত বেঁচে যেতে।

হযরত কা'ব রাযি. বলেছেন, গীবত এমনই অপরাধ যে, গীবতকারী যদি তওবা করে মৃত্যুবরণ করে তবুও সকলের শেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করার সৌভাগ্য না হয়, সকলের পূর্বে সেই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত জয়নুল আবেদীন রহ. বলেছেন, গীবতের আবর্জনা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখ। কেননা গীবতকারী হচ্ছে মানুষরূপী কুকুর।

জাহান্নামে কিছু লোকের ভীষণ খুঁজলি হবে। এমনকি শরীরের বিভিন্ন অংশ হতে গোশত খসে পড়ে যাবে। তারা বলবে, হে পরোয়ারদিগার! এ বিশেষ শাস্তি আমাদেরকে কি অপরাধের জন্য দেওয়া হচ্ছে?

উত্তরে বলা হবে, দুনিয়াতে তোমরা মানুষের গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত ছিলে। মানুষের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করাই তোমাদের কাজ ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহে কষ্টদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করে আযাব দিচ্ছেন।

হযরত হাতের আসাম রহ. বলেছেন, গীবতকারী জাহান্নামে বানররূপে এবং হিংসুক ব্যক্তি শূকররূপে আযাব ভোগ করবে।

হযরত ফুযাইল বিন ই'আত রহ. এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, যদি জাহান্নামের কঠিন আযাব হতে নাযাত পেতে চাও, তবে কারও গীবত করে নিজের মুখকে তুমি অপবিত্র কর না। যদি তুমি গীবতের অপবিত্রতা হতে নিজেকে হিফাযত করতে ব্যর্থ হও তবে মনে রেখ, নিজের হাতেই তুমি তোমার আখেরাত বরবাদ করলে এবং মানুষের অন্তরে এমন ক্ষত সৃষ্টি করলে, যা কোনদিন শুকাবে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, গীবত ঈমানকে ক্ষয় করে ফেলে এবং তা ক্ষয় হতে হতে এক সময় এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে, তার অন্তরে এক তিল পরিমাণ ঈমানও তখন আর অবশিষ্ট থাকে না। ফলে মৃত্যুর সময় তার কলিমা নসীব হয় না। আমাদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলা হিফাযত করুন।

গীবতের কুফল

গীবত প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য ক্ষতি ও ধ্বংসই শুধু ডেকে আনে। আর যার গীবত করা হয় তার জন্য ডেকে আনে কল্যাণ ও পরকালীন মঙ্গল। এ জন্যই এক বুযুর্গ বলেছেন– "যদি কারও গীবত বা দোষ চর্চা করার এতই সাধ হয় তবে আপন মায়ের গীবত করাই উত্তম। কেননা এতে তার কল্যাণ হবে।" গীবত মানুষের জন্য কি কি ক্ষতি ও অকল্যাণ ডেকে আনে এখানে সংক্ষেপে আমরা তা-ই আলোচনা করছিঃ

দু'আ কবূল হয় না

যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের গীবত ও দোষচর্চায় লিপ্ত থাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সে এতই ঘৃণ্য ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হয় যে, তার কোন দু'আই কখনও কবূল হয় না। তওবা করার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রহমত ও করুণা হতে সে বঞ্চিত থাকে।

নেক আমল মিটে যায়

গীবতের দ্বিতীয় ক্ষতি হল, গীবত মানুষের নেক আমল মিটিয়ে দেয়। কিয়ামতের দিন প্রতিটি ব্যক্তি তার আমলনামা দেখতে পাবে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে একদল বলবে, পরওয়ারদিগার! এত ভালো আমল তো আমি করিনি। আমার আমলনামায় এগুলো জমা হল কিভাবে ? উত্তর আসবে, দুনিয়াতে যারা তোমার দোষ চর্চা করেছে, তাদের নেক আমলগুলি তোমার আমলনামায় যোগ হয়েছে। আরেক দল বলবে, পরওয়াদিগার! আমাদের আমলনামায় এমন কিছু নেক আমল দেখতে পাচ্ছি না, যা দুনিয়াতে আমরা করেছিলাম– এর কারণ কি ? উত্তর আসবে, দুনিয়াতে নেক আমলের পাশাপাশি তোমরা মানুষের গীবত করেছ। এ গীবত তোমাদের নেক আমলগুলো মুছে দিয়েছে।

নেক আমল কবূল হয় না

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গীবত হতে বেঁচে থাক। কেননা এতে তিনটি মহাক্ষতি রয়েছে প্রথমতঃ গীবতকারীর দু'আ কবূল হয় না। **দ্বিতীয়তঃ** তার নেক আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণ হয় না। তৃতীয়তঃ তার আমলনামায় বদ আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, শুকনা জিনিসের জন্য আগুন যেমন ক্ষতিকর; নেক আমলের জন্য গীবতও তেমনি ক্ষতিকর। অর্থাৎ আগুন যেমন্ এক মুহূর্তে সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয় তদ্রূপ গীবতও মানুষের সমস্ত নেক আমল এক মুহূর্তে বরবাদ করে দেয়।

হিসাব কঠিন হওয়া

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেছেন, হাশরের মাঠে হিসাব কিতাবের বারটি মঞ্জিল হবে। প্রতিটি মঞ্জিলে একটি করে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে। যদি সে কারও গীবত করে থাকে তবে সেখানেই তাকে হাজার বছর দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। আর অন্যরা নির্বিঘ্নে তার পাশ কেটে জান্নাতে চলে যাবে।

হাশরের মাঠে গোশত খাওয়া

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত থাকবে, কিয়ামতের দিন তার সামনে গীবতকৃত ব্যক্তির লাশ উপস্থিত করে বলা হবে, দুনিয়াতে তুমি এ ব্যক্তির গোশত খেয়েছ। আজ মৃতাবস্থায়ও তোমাকে এর গোশত খেতে হবে। তখন বাধ্য হয়ে সে নিজের দাঁতে কামড়িয়ে সে গোশত খাবে এবং ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে ফেলবে।

কবরের আযাব

হযরত কাতাদা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, কবরের তিন ভাগের এক ভাগ আযাব গীবতের শাস্তিস্বরূপ হয়ে থাকে।

দুনিয়াতে গীবতের একটা বড় কুফল হচ্ছে, গীবতকারী সকলের আস্থা হারিয়ে ফেলে; কেউ তার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে না। কেননা সকলেই একথা মনে করে যে, আজ যেমন সে আমাদের সামনে অন্য মানুষের দোষ আলোচনা করছে, তেমনি অন্যের সামনে সে আমাদের দোষ আলোচনা করবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে?

গীবত শয়তানকে আনন্দ দেয়

পাপ কাজ মাত্রই শয়তানকে আনন্দ দেয়। কিন্তু শয়তান নিজেই এ কথা স্বীকার করেছে যে, গীবতই তাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দিত করে। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একবার শয়তানের সাক্ষাত পেলেন। দেখতে পেলেন, এক হাতে মাটি আর অন্য হাতে কিছু মধু নিয়ে আপন মনে শয়তান হেঁটে যাচ্ছে। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম শয়তানের পথরোধ করে দাঁড়ালেন এবং এ মাটি ও মধু সাথে রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। শয়তান কিছুক্ষণ

ইতস্ততঃ করে বলল, "হুযূর! আদম সন্তানের দুইটি কাজ আমাকে যারপর নাই আনন্দিত করে। তাই আমি তাদেরকে সে দু'টি পাপ কাজে সাধ্যমত উৎসাহ যোগাতে চেষ্টা করে থাকি। হুযূর! সে দুইটি কাজ হচ্ছে– ইয়াতিমের প্রতি নির্দয় ব্যবহার এবং মানুষের গীবত ও দোষ চর্চা। এ মাটি আমি ইয়াতিম ছেলের মুখে ও মাথায় ঢেলে দেই, কেউ তাদের প্রতি কোন মমতা বোধ যেন না করে। আর মধু ঢেলে দেই গীবতকারীর মুখে, যেন তার কথা আরও শ্রুতিমধুর হয়"।

রোযার সাওয়াব নষ্ট হওয়া

উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, রোযা অবস্থায় গীবত করলে সে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। ইমাম সুফিয়ান সাওরী আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, গীবতের কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়। হযরত মুজাহিদ রহ.- ও এ মত পোষণ করেন।

হাদীস শরীফে হয়েছে, চারটি পাপ এমন যার কারণে অযু নষ্ট হয়ে যায়। নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং রোযা ভেঙে যায়। **প্রথমতঃ** গীবত ও দোষচর্চায় লিপ্ত হওয়া। **দ্বিতীয়তঃ** চোগলখোরী করা। **তৃতীয়তঃ** মিথ্যা কথা বলা। **চতুর্থতঃ** পরনারীর দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকানো। এ চারটি জিনিস অপরাধের শেকড়কে সজীব করে, যেমন পানি সজীব করে গাছের শেকড়কে।

বিদ্বেষ ও বিভেদ

দুনিয়াতে গীবতের সবচেয়ে বড় কুফল হচ্ছে, গীবতের ফলে মুসলমানদের একতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বিলুপ্ত হয়। ফলে দুনিয়াতেই সকলে জাহান্নামের অশান্তি ভোগ করে। আজ সমাজের প্রতিটি ঘরে হিংসা-বিদ্বেষ, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অশান্তির আগুন যে দাউ দাউ করে জ্বলছে তার পিছনেও মূলতঃ সক্রিয় রয়েছে গীবতের নাজায়েয ও খারাপ প্রভাব।

গীবতের কারণ ও প্রতিকার

কি কি কারণে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়? এখানে আমরা সংক্ষেপে তা আলোচনা করব।

১. ক্রোধ

ক্রোধ হচ্ছে গীবতের একটি প্রধান কারণ। মানুষ যখন কোন কারণে কারও উপর ক্রুদ্ধ হয়, তখনই শুরু হয় গীবতের পালা শুরু হয় এবং মানুষ মেতে উঠে কুৎসা রটনার নারকীয় উল্লাসে।

২. গর্ব ও অহংকার

গীবতের আরেকটি বড় উৎস হচ্ছে গর্ব ও অহংকার। আর অহংকারের ফলেই মানুষ নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট ভাবতে শুরু করে। নিজের সব কিছুকেই মনে হয় গুণ আর অন্যের সব কিছুকে মনে হয় দোষ। সে দোষের সত্য-মিথ্যা আলোচনায় মানুষ তখন এক রকম পাশবিক আনন্দ অনুভব করে।

৩. পার্থিব সম্মানের মোহ

কারও কাছে আদরণীয় ও প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্যও মানুষ অনেক সময় অন্যের গীবত দোষ চর্চা করে থাকে।

গীবতের কাফ্‌ফারা

প্রতিটি মানুষের জন্যই উচিত নিজেকে গীবতের অপবিত্রতা হতে হিফাযত করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা। কিন্তু কখনও কোন অসতর্ক মুহূর্তে শয়তানের প্ররোচনায় যদি গীবতের অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় তবে সাথে সাথেই তার প্রতিকারের জন্য তৎপর হতে হবে। কখনও যদি গীবতের অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তখন সাথে সাথেই গীবতের ভয়াবহ পরিণতি ও আখেরাতের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করতে হবে। লজ্জা ও অনুতাপের অশ্রু প্রবাহিত করতে হবে। মুখে ইস্তিগফার করতে হবে। সেই সাথে ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে,

এ জঘন্য গুনাহ আর কোনদিন করব না। মৃত মানুষের গলিত দুর্গন্ধময় লাশের গোশত আর কখনও মুখে তুলব না। অতঃপর যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছে গিয়ে মুআ'মালাটি এভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। যথা-

(ক) গীবতকৃত ব্যক্তি যদি এখনও দুনিয়াতে জীবিত থাকে এবং এ গীবত সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকে, তবে তার কাছে গিয়ে অনুতপ্ত ও বিনয়াবনত হয়ে বলতে হবে, ভাই! তুমি জানো আমার দ্বারা তোমার গীবত হয়েছে। ভাই আমি আমার অপরাধের জন্য লজ্জিত। আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও ক্ষমা করে দিবেন।

(খ) যদি উক্ত ব্যক্তির একথা জানা না থাকে যে, কি ধরনের গীবত করা হয়েছে তবে তাকে বিস্তারিতভাবে জানানো উচিত নয়। শুধু এটুকু বলবে যে, ভাই তুমি নিশ্চয় শুনেছ, আমি তোমার গীবত করেছি! দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও।

(গ) যদি গীবতকৃত ব্যক্তি এ সম্পর্কে একবারেই অনবগত থাকে, তবে তাকে সে কথা জানানো উচিত নয় বরং শুধু ইস্তিগফার করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যাবে। কেননা তাকে জানাতে গেলে তার মনে নতুন করে আঘাত দেওয়া হবে।

(ঘ) যদি গীবতকৃত ব্যক্তি দূরে অন্য শহরে থাকে, যেখানে যাওয়া খুবই কষ্টকর তখন পত্র যোগাযোগ স্থাপন করে ক্ষমা চাওয়া উচিত। এটা সম্ভব না হলে ইস্তিগফারই যথেষ্ট।

(ঙ) যদি গীবতকৃত ব্যক্তি দুনিয়াতে না থাকে, তখন তার জন্য খুব দুআ করবে এবং মানুষের কাছে তার প্রশংসা ও সুখ্যাতি বর্ণনা করবে হয়ত এ উসিলায় আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিবেন এবং সেও কিয়ামতের দিন অভিযোগ দায়ের করবে না।

গীবতকারীকে ক্ষমা করার ফযিলত

একথা ঠিক যে গীবতকৃত ব্যক্তিকে শরী'আত এ অধিকার দিয়েছে যে, ইচ্ছা করলে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে অভিযোগ পেশ করতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কেউ যদি দুনিয়াতে মানুষের অপরাধ মাফ করে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করে দিবেন। গীবতকারীকে ক্ষমা করলে আল্লাহ তাআলাও ক্ষমাকারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ক্ষমা করা হচ্ছে আমার গুণ। এটা কি করে হতে পারে যে, তুমি মানুষকে ক্ষমা করে দিবে আর আমি তোমাকে ক্ষমা করব না।

গীবত শ্রবণের গুনাহ ও তার প্রতিকার

ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে, গীবত করা যেমন অন্যায় কাজ গীবত শ্রবণ করাও তেমনি অন্যায় কাজ। কখনও কারও গীবত শ্রবণ করার পর প্রথম কর্তব্য হল, যার গীবত করা হয়েছে তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে না এবং ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যেসব দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা হয়েছে, তা বিশ্বাস করবে না। কেননা গীবত একটি মহাপাপ। অতএব গীবতকারী ব্যক্তি কখনও বিশ্বস্ত হতে পারে না। যখন কোন মজলিসে কারও গীবত করা শুরু হয়, তখন ঐ ব্যক্তির প্রশংসা শুরু করে দেওয়া কর্তব্য অন্যথায় গীবত শ্রবণ করার অপরাধে পাকড়াও হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحَسَدِ ص١٥

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪. হিংসা

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارِ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقَاطَعُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ ،

৪২. আবদুল জাব্বার ইবনে আলা আত্তার ও সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান রহ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। পরস্পরকে ত্যাগ করবে না। পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে না। পরস্পর হিংসা রাখবে না বরং আল্লাহর বান্দা হয়ে ভাই ভাই হিসাবে থাকবে। কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় তার অপর মুসলিম ভাইকে তিন দিনেরও বেশি পরিত্যাগ করে থাকা।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ বিষয়ে আবূ বকর সিদ্দীক, যুবায়র ইবনে আওয়াম, ইবনে মাসউদ এবং আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيَانُ ثنا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِى اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا

৪৩. ইবনে আবূ উমর রহ....... সালিম তার পিতা ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ঈর্ষাযোগ্য নয়। এক ব্যক্তি হল সে, যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা রাত দিন আল্লাহর পথে ব্যয় করে। অপর ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ইলম দিয়েছেন আর সে রাত দিন তা কায়েমের চেষ্টা করে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইবনে মাসউদ ও আবূ হুরাইরা রাযি.-এর বরাতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ولاتقاطعوا ঃ শব্দটি تواصل এর বিপরীত। تقاطع القوم অর্থ, পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করল।

ولا تدابروا ঃ অর্থাৎ পরস্পর বিরোধিতা কর না। শত্রুতা কর না। রশিদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. এ মর্মে বলেন–

التقاطع هو الاعراض من بعد قبل ان يلتقيا والتدابر اعراضها بعد القرب واللقاء

অর্থাৎ تقاطع বলা হয়, দেখা-সাক্ষাতের পূর্বে পরস্পরকে উপেক্ষা করা। আর تدابر হল, দেখা-সাক্ষাতের পর পরস্পরকে উপেক্ষা করা বা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। (তুহফাহ, তাকমিলাহ)

ولاتباغضوا ঃ অর্থাৎ তোমরা পরস্পর ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ কর না। بغض শব্দের প্রতিশব্দ হল, حقد

বিদ্বেষ -এর বাস্তবতা

গোস্বার সময় যখন প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হয়, তখন গোস্বাকে দমিয়ে রাখার কারণে অন্তরে একপ্রকার ঘৃণা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়– তাকেই বলা হয় 'বুগ্য'। এটি দু'প্রকার। যথা–

(১) ঐচ্ছিক তথা অন্তরে কারও প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জিইয়ে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খোঁজ করা। এ প্রকারের 'বুগ্য' হারাম।

(২) অনৈচ্ছিক। অর্থাৎ কারও পক্ষ থেকে মনে কোন ব্যথা পেলে স্বভাবগত একটা ক্ষোভ অন্তরে সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু এটাকে জিইয়ে না রাখা এবং প্রতিশোধের চিন্তা না করা। তাহলে এটা মূলতঃ নিষিদ্ধ بغض এর আওতায় পড়ে না বরং এটাকে বলা হয় স্বভাবগত অসন্তুষ্টি। এটা ইচ্ছাকৃত নয় বিধায় এতে গুনাহও নেই। তবে এটাকেও দূর করতে হবে। কাজেই যার পক্ষ থেকে মনোকষ্ট পেলেন, তাকে খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ।

উল্লেখ্য, এ বিদ্বেষ যদি নিজের কোন স্বার্থের কারণে কিংবা পার্থিব কোন ব্যাপারে হয়, তাহলে নাজায়িয। আর ধর্মীয় স্বার্থে হলে বিদ্বেষ নাজায়েয নয় বরং প্রশংসাযোগ্য।

'বুগ্য'-এর প্রতিকার

যার পক্ষ থেকে মনোকষ্ট পেলেন, তাকে মাফ করে দিয়ে তার সাথে মেলামেশা, কথাবার্তা শুরু করতে হবে। এতে অল্পদিনেই মন পরিস্কার হয়ে যাবে।

হাসাদ বা পরশীকাতরতা

ولاتحاسدوا : حسد অর্থ, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা। পরিভাষায় 'হাসাদ' বলা হয়, অন্যের সুখ-সম্পদ দেখে মনে কষ্ট অনুভব করা এবং অন্যের সুখ-সম্পদ দূর হওয়ার কামনা করা। হাসাদ করা নাজায়িয। কিন্তু যারা খোদাপ্রদত্ত নেয়ামত তথা ধন-সম্পদকে অত্যাচার ও অনাচারে ব্যয় করে, এ রকম লোকদের সম্পদ দূর হওয়ার কামনা করায় কোন গুনাহ নেই বরং উক্ত পাপকর্ম দূর হওয়ার কামনা করাই উচিত। তবে কথা হল, এরূপ ক্ষেত্রেও নিজের অন্তর পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সে ব্যক্তি সুপথে এসে সম্পদ ভোগ করলে, তাতে আপনার মনে কোন শত্রুতা থাকবে কিনা? যদি সে সুপথে আসলে তার সৌভাগ্য ও সম্পদভোগে আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে আপনার মন পবিত্র বলে বুঝতে হবে।

হাসাদের কারণ

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, হাসাদের কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ শত্রুতা। দ্বিতীয়তঃ মনের কৃপণতা ও সঙ্কীর্ণতা। তৃতীতঃ অহংকারের কারণেও এ হাসাদ সৃষ্টি হতে পারে।

হাসাদ এর প্রতিকার

(১) হিংসার পাত্রের প্রশংসা মনে না চাইলেও করা। (২) তার নেয়ামতবৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা। (৩) তার সাথে বিনয়সূচক আচরণ করা। সাক্ষাত হলে তাকে সম্মান করা ও সালাম করা। (৪) মাঝে মধ্যে তাকে হাদিয়া দেওয়া। (৫) মনে না চাইলেও তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে সাক্ষাত করা। (মাওয়ায়েযে হাকীমুল উম্মত)

গিবতা

لا حسد الا فى اثنتين : এখানে হাসাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 'গিবতা'। গিবতা বলা হয়, অন্যের সুখ-সম্পদ সম্মান ও উন্নতি দেখে নিজেও তদ্রুপ লাভের কামনা করা এবং এরূপ আকাঙ্খা করা যে, তার সম্পদ তারই থাক, আমাকেও আল্লাহ তা'আলা তার মত ধন-সম্পদ, সম্মান ও উন্নতি দান করুন। এ গিবতা দোষণীয় নয় বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসনীয়। 'গিবতা' এর বাংলা কোন প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমরা একে গিবতাই বললাম। গিবতার মধ্যে অন্যের উপর বৈরীভাব হয় না বলে এটা দোষণীয় নয়। (আল-কাওকাব, তাবলীগে দ্বীন)

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّبَاغُضِ ص١٥

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫. পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ثنا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْضِ بَيْنَهُمْ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ اَبُوْ سُفْيَانَ اِسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ

৪৪. হান্নাদ রহ...... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শয়তান নিশ্চিত এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, মুসল্লীরা তার উপাসনা করবে। তবে একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার কাজ এখনও তার রয়ে গেছে।

এ বিষয়ে আনাস, সুলায়মান ইবনে আমর ইবনে আহওয়াস তার পিতা আমর ইবনুল আহওয়াস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবূ সুফইয়ান রহ.-এর নাম হল তালহা ইবনে নাফি'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون ঃ এখানে শয়তানের ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পৌত্তলিকতা। শয়তান মানুষকে পৌত্তলিকতার প্রতি আহবান করে। তাই পৌত্তলিকতা মানেই শয়তানকে পূজা করা বা শয়তানের ইবাদত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্বের সময় কুরবানীর ঈদের খোতবায় হাদীসটি বলেছেন। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় وفى جزيرة العرب অংশটি অতিরিক্ত আছে। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ হবে–

(১) শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে পুনরায় পৌত্তলিকতা ফিরে আসবে।

(২) কেউ কেউ বলেন, হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযী উম্মতদের সম্পর্কে বলেছেন অর্থাৎ তারা নামায (আল্লাহর ইবাদত) এবং শয়তানের ইবাদত (মূর্তিপূজা)-কে এক সাথে করবে না। যেমন, করেছিল ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানরা। আর জাযীরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের কথা বিশেষভাবে বলার কারণ হল, ইসলাম তখন মাত্র জাযীরাতুল আরবে প্রচার-প্রসার লাভ করেছিল। মোল্লা আলী কারী এ মর্মার্থকেও অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

(৩) কেউ কেউ বলেছেন, শয়তানের ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য শিরকের আধিক্য। সে মতে আবশ্যক নয় যে, শয়তান চিরদিনের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে বরং এর অর্থ হবে, শয়তান যখন ইসলাম ও ঈমানের আধিক্য দেখে তখন নিরাশ হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ঃ শয়তান যেহেতু জাযীরাতুল আরব থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাহলে সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বহুলোক মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামাহ ও আসওয়াদে আনাসীর অনুসারী হয়ে মুরতাদ হল কিভাবে?

উত্তর ঃ (১) হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা হবে। তখন মর্মার্থ হবে, নামায-রোযা অবস্থায় কোন মুসলমান শয়তাদের অনুসরণ করবে না, এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে গেছে।

ولكن فى التحريض ঃ অর্থাৎ শয়তান যদিও মূর্তিপূজার ব্যাপারে মুসলমানদের থেকে নিরাশ হয়ে গেছে।

কিন্তু মুসলমানদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। তাই সে এ পথ ধরে নিয়মিত চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছে। কিয়ামত পর্যন্ত সে এ ফিতনা উম্মতের মাঝে ছড়াতে থাকবে। (তুহফাহ, তাকমিলাহ্)

ইমাম নববী রহ. বলেন, এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি মু'জিযা।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ص-١٥

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬. পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا اَبُوْ اَحْمَدَ ثنا سُفْيَانُ ح ثنا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا بِشْرُ بْنُ السِّرِّيِّ وَاَبُوْ اَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ الْكِذْبُ اِلَّا فِىْ ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكِذْبُ فِى الْحَرْبِ وَالْكِذْبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ مَحْمُوْدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ لَا يَصْلُحُ الْكِذْبُ اِلَّا فِىْ ثَلَاثٍ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ اَسْمَاءَ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ خُثَيْمٍ وَرَوٰى دَاؤُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ شَهْرِبْنِ حَوْشَبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اَبُوْ كُرَيْبٍ ثنا اِبْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رضى الله عنه

৪৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার ও মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ........ আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি ক্ষেত্র ভিন্ন মিথ্যা বলা হালাল নয়। (১) স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে মিথ্যা বলা। (২) যুদ্ধের প্রয়োজনে মিথ্যা বলা। (৩) পরস্পরে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে মিথ্যা বলা।

মাহমূদ রহ. তার বর্ণনায় বলেন, তিনটি ক্ষেত্র ভিন্ন মিথ্যা বলা নাজায়েয....।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইবনে খুছায়মের সূত্রে আসমা রাযি. বর্ণিত এ হাদীসটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ রহ. এ হাদীসটিকে শাহর ইবনে হাওশাব - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে আসমা রাযি.-এর উল্লেখ নেই। আবূ কুরায়ব - ইবনে আবূ যাইদা দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ রহ. সূত্রে আমার নিকট রিওয়াতটি এরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে আবূ বকর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثنا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهٖ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا اَوْ نَمَا خَيْرًا، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৪৬. আহমাদ ইবেন মানী' রহ..... উম্মু কুলছূম বিনতে উকবা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। আর সে কল্যাণকর কথা বলে বা পৌছায় সে মিথ্যাবাদী নয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لايحل الكذب الا فى ثلاث ঃ কোন কোন আলেম বলেন, এখানে كذب দ্বারা প্রকৃত মিথ্যা উদ্দেশ্য। আর উপকারার্থে মিথ্যা বলা জায়িয। যে মিথ্যায় অনিষ্টতা রয়েছে, তা দোষণীয় ও নাজায়িয।

অধিকাংশ হানাফী আলেমের মতে এখানে كذب দ্বারা প্রকৃত ও স্পষ্ট মিথ্যা উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে تورية বা تعريض বা كناية উদ্দেশ্য। (تورية বলা হয় দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করা, যার একটি অর্থ নিকটবর্তী, অন্যটি দূরবর্তী। আর এ দূরবর্তী অর্থই উদ্দেশ্য নেওয়া। تعريض বলে, ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা।) যেমন, বর্ণিত আছে, শাইখ ইবরাহীম রহ. যখন ঘরের মধ্যে দ্বীনী কাজে মশগুল থাকতেন, তখন বাঁদীকে বলে দিতেন, কেউ আমার খোঁজ করলে বলবে, 'মসজিদে দেখুন'। এখানে 'ঘরে নাই' স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলা হল না। অথচ উদ্দেশ্য সফল হল। এটাকে تورية বা تعريض বা كناية বলে। এরূপ করা মূলতঃ 'মিথ্যা' নয়। কিন্তু একে 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে সম্বোধিত ব্যক্তির দৃষ্টিকোণে। কেননা একথা তার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

যারা মিথ্যা বলা জায়েয বলেন, তাদের দীলল

উপকারস্থলে স্পষ্ট মিথ্যাকে যারা জায়িয সাব্যস্থ করেন, তারা দলীল হিসাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদীসখানা পেশ করেন। তাদের পক্ষে আরও রয়েছে কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনা। যা বুখারী শরীফে নিম্নোক্ত ভাষায় এসেছে-

عن جابر عن النبى ﷺ قال من الكعب بن اشرف؟ فقال محمد بن مسلمة اتحب ان اقتله ؟ قال نعم قال فأذن لى ان اكذب الخ (رواه البخارى)

এ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলার অনুমতি চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই মিথ্যা বলা জায়েয। কিন্তু অধিকাংশ আলেম আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস এবং বুখারী শরীফের উল্লেখিত হাদীসকে تورية ও تعريض এর অর্থে নেন। যেমন, হযরত ইবরাহীম আ. সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, كذب ثلاثا كذبات এখানে সর্বসম্মতিক্রমে كذب দ্বারা تورية ও تعريض উদ্দেশ্য। কেননা নবীগণ কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের হাদীসেও كذب দ্বারা تورية ও تعريض উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ হল-

ائذن لى ان اقول عند كعب ما شئت من التعريض مما رأيته فيه مصلحة

সারকথা, জমহূর আহনাফ এর মতে অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মিথ্যা বলা জায়িয নেই। অতএব আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের মর্মার্থ হবে, তিনটি স্থানে 'তাওরিয়া' বা তা'রীয' সূচক বাক্য বলা বৈধ। তবে অপ্রয়োজনে 'তাওরিয়া' বা 'তা'রীয' বলা জায়িয নেই।

হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ. হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আলোচ্য হাদীসে 'তাওরিয়া' কিংবা 'তা'রীয' সূচক কথা বলা সম্ভব না হলে মিথ্যা বলা জায়িয। আর তাওরিয়া সম্ভব হলে মিথ্যা জায়িয নয়।

হযরম মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে كذب (মিথ্যা) দ্বারা তার প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য। তবে উলামায়ে কিরাম সতর্কতা স্বরূপ তাওরিয়া অর্থ করে থাকেন। যেন সাধারণ মানুষ অহরহ মিথ্যায় জড়িয়ে না পড়ে।

যেসব জায়গায় মিথ্যা বলা যায়

(১) মুসলমানের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মিটানোর উদ্দেশ্যে।

(২) স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্বামী কিংবা স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্ত্রী মিথ্যা বলতে পারবে।

(৩) জিহাদে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে। অবশ্য এরূপ স্থলেও তাওরিয়া উত্তম।

(৪) নিজের কিংবা অপর মুসলমান ভাইয়ের ধন-প্রাণ অত্যাচারীর কবল হতে রক্ষা করার জন্য। নিজের নিকট গচ্ছিত বস্তু সংরক্ষণ এবং নিজের গুনাহ গোপন রাখার জন্যও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া জায়িয। তবে তাওরিয়া সম্ভব হলে জায়িয নেই।

(৫) অপারগ-নিরুপায় অবস্থায়, যখন মিথ্যা না বললে নিজের প্রাণ রক্ষা হবে না, তখন সর্বসম্মতিক্রমে মিথ্যা বলা জায়িয আছে। (তাবলীগে দীন)

উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রাযি. এর পরিচয়

عن ام كلثوم بنت عقبة ابن ابى معيط ঃ উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবি মু'ঈত রাযি.। মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে পাঁয়ে হেঁটে মদীনায় হিজরত করে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বায়'আত হন। তিনি ছিলেন হযরত উসমান রাযি. এর বৈমাত্রেয় বোন। মক্কায় তাঁর কোন স্বামী ছিল না। মদীনায় পৌঁছার পর হযরত যায়দ ইবনে হারেছার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি. মু'তার যুদ্ধে শহীদ হলে তাঁকে যুবায়ের ইবনু আওয়াম রাযি. বিয়ে করেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি তালাকপ্রাপ্ত হন। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. তাকে বিয়ে করেন। এখানে তাঁর ঘরে ইবরাহীম ও হুমাইদ নামে দু'জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তারপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ইন্তেকাল করলে হযরত আমর ইবনে আস রাযি. তাঁকে বিয়ে করেন। মাস খানিক পর হযরত আলী রাযি. এর খেলাফত আমলে ইন্তিকাল করেন। তাঁর নিকট থেকে স্বীয় পুত্র হুমাইদ প্রমুখ রেওয়ায়াত করেন। তিনি নিজেও বহু হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। (আসমাউর রিজাল)

فقال خيرا ঃ অর্থাৎ কল্যাণমিশ্রিত কথা। যেমন, যায়েদ ও আমরের মাঝে বিরোধ আছে। তাদেরকে মেলানোর উদ্দেশ্য বলল, আমর! তোমার কাছে যায়েদ সালাম পাঠিয়েছে।

أونما خيرا ঃ এখানে রাবী থেকে সংশয়। এর অর্থ হল, সন্ধির উদ্দেশ্যে বা কল্যাণের জন্য কারও কাছে খবর পৌঁছানো।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْخِيَانَةِ وَالْغِشِّ صـ١٥

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭. খিয়ানত ও প্রতারণা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ لُؤْلُؤَةَ عَنْ اَبِىْ صِرْمَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

৪৭. কুতায়বা রহ... আবূ সিরমা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে, আল্লাহ তা দিয়েই তার ক্ষতি করেন। যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয় আল্লাহও তাকে কষ্ট দেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

حدثنا عبد بن حميد ثنا زيد بن حباب العكلى ثنى ابو سلمة الكندى ثنا فرقد السبخى عن مرة بن شراحيل الهمدانى وهو الطيب عن ابى بكر الصديق قال قال رسول الله ﷺ ملعون من ضار مؤمنا او مكر به، هذا حديث غريب

৪৮. আবদ ইবনে হুমায়দ রহ... আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি, যে অন্য মুমিনের ক্ষতি করে বা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عن ابى صرمة : আবু সিরমা কুনিয়ত। নাম মালেক ইবনে কায়স অথবা কায়স ইবনে মালেক মাযেনী। তিনি একজন আনসারী সাহাবী। কেউ কেউ তাঁকে কায়েস ইবনে সিরমাও বলেছেন। তবে তিনি 'আবু সিরমা' কুনিয়াতেই প্রসিদ্ধ। তিনি বদরসহ পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন। صرمه শব্দে ص এ যের, ر সাকিন।

আমানত সম্পর্কে আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, 'আমানত' শব্দটির অর্থ হল, কারও উপর কোন বিষয়ে ভরসা করা। সুতরাং প্রত্যেক ঐ জিনিস যা অন্যের নিকট সোপর্দ করা হয় আর সোপর্দকারী তার উপর এ ভরসা করে যে, সে এর হক পূর্ণরূপে আদায় করবে –একেই ইসলামী শরী'আতে 'আমানত' বলা হয়।

তিনি বলেন, আমরা আমানতের সীমারেখা খুবই সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছি। আমাদের ধারণা মতে কেউ যদি আমার নিকট এসে বলে, টাকার এ থলেটি আপনার নিকট আমানত রাখলাম। প্রয়োজন হলে নিয়ে যাব। কেবল এটাই বুঝি আমানত। তাই এখানে খেয়ানত করলে আমরা একেই মনে করি আমানতের খিয়ানত। আমানতের খেয়ানত সম্পর্কে আমাদের ধারণা এর চেয়ে বেশি কিছু নেই। হ্যাঁ, এটাও অবশ্যই আমানতের খেয়ানত। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের ভাষায় আমানত কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আমানতের মর্মার্থ ব্যাপক-বিস্তৃত।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ حَقِّ الْجِوَارِ صـ١٦

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮. প্রতিবেশীর হক

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثنا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُوْرَ وَبَشِيْرٍ أَبِيْ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِيْ أَهْلِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَازَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ،

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَأَبِيْ شُرَيْحٍ وَأَبِيْ أُمَامَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،

৪৯. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা রহ...... মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত। একবার আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি.-এর পরিবারে একটি বকরী যবাহ করা হয়। তিনি আসার পর বললেন, আমাদের ইয়াহুদী প্রতিবেশীকে তোমরা কি কিছু হাদিয়া দিয়েছ? আমাদের ইয়াহুদী প্রতিবেশীকে তোমরা কি কিছু হাদিয়া দিয়েছ? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, জিবরাঈল সবসময়ই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ওয়াসিয়াত করেছেন। আমার ধারণা হয়েছিল, তাকেও শীঘ্রই ওয়ারিছ বানিয়ে দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে আয়েশা, ইবনে আব্বাস, উকবা ইবনে আমের, আবূ হুরাইরা, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবূ শুরায়হ ও আবূ উসামা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ সূত্রে গরীব। মুজাহিদ আয়েশা রাযি. এবং আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ اِبْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَازَالَ جِبْرَئِيْلُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ،

৫০. কুতায়বা রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জিবরীল আ. সব সময়ই আমাকে এমনভাবে প্রতিবেশী সম্পর্কে ওসিয়ত করেছেন যে, আমার ধারণা হয়েছিল, শীঘ্রই তাকেও ওয়ারিছ বানিয়ে দেওয়া হবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ شَرِيْكٍ عَنَ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهٖ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهٖ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَاَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ اِسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ

৫১. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ..... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ সঙ্গী হল, যে স্বীয় সঙ্গীর কাছে ভাল। আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী হল, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

আবূ আবদুর রহমান হুবালী রহ.-এর নাম হল আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

حق الجوار ঃ এখানে (ج) বর্ণে যের-পেশ উভয় দেওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, যেরসহ পড়াটা অধিক শুদ্ধ। অর্থ, প্রতিবেশী।

اهديتم ঃ এটি مجرد এবং مزيدفيه উভয়ভাবে পড়া যাবে। তবে مجرد পড়লে হামযাটি همزه استفهام হবে আর مزيدفيه পড়লে همزه استفهام বা প্রশ্নবোধক অব্যয় উহ্য মানতে হবে।

জিবরাঈল আ. এর অসিয়তের অর্থ

مازال جبريل يوصينى بالجار ঃ হযরত জিবরাঈল আ. আমাকে সর্বদা অসিয়ত করতে থাকেন, আমি যেন উম্মতকে প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেই। এমনকি আমার ধারণা হতে লাগল, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে পৈত্রিক সম্পত্তিতেও উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করবেন।

কারও কারও মতে এর অর্থ হল, يوصيني بالجار اى يوصيني نفسي برعاية حق الجار حتى ظننت انه سيورثه। অর্থাৎ জিবরাঈল আ. আমাকে প্রতিবেশীর বিশেষভাবে খেয়াল রাখার জন্য অনবরত নির্দেশ দিতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হতে লাগল যে, প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারিছ সাব্যস্ত করা হবে।

এ অর্থ নিলে একটি প্রশ্ন হয়। তা হল, হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষায় এসেছে, নবীর কোন ওয়ারিছ হয় না। অথচ এ হাদীসের শেষোক্ত অর্থ উদ্দেশ্য নিলে নবীর ওয়ারিছ হয় বলে প্রমাণিত হয়।

এর উত্তর হল, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস খানা সে হাদীসের পূবে বর্ণনা করা হয়েছে, যে হাদীসে বলা হয়েছে- নবীর কোন ওয়ারিছ হয় না। অথবা এ হাদীস দ্বারা প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি তাকীদ ও মুবালাগা তথা আতিশয্য বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা যেখানে নবীর উত্তরাধিকারী হওয়ার অবকাশ নেই, সেখানেও উত্তরাধিকারী হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়।

যিম্মী প্রতিবেশীর অন্তর্ভূক্ত কিনা ?

حتى ظننت أنه سيورثة ঃ কেউ কেউ এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, এখানে হাদীসে প্রতিবেশী দ্বারা মুসলমান প্রতিবেশী উদ্দেশ্য। যিম্মী তার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা কাফির মুসলমানের ওয়ারিছ হয় না। তবে এ প্রমাণ সঠিক নয়। কেননা হাদীসের উদ্দেশ্য হল, প্রতিবেশীর অধিকার সাব্যস্ত করা। মীরাছের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় থাকলে সেটা এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। তাছাড়া হযরত জাবির রাযি. বর্ণিত হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে- ان الجار المشرك لـه حق الجوار

এ হাদীস দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায়, কাফির ও প্রতিবেশীর শামিল। সুতরাং 'প্রতিবেশী' এর প্রতিপাদ্য উদ্দেশ্য ব্যাপক। এতে মুসলমান, কাফির, আবিদ, ফাসিক, শত্রু, মিত্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলেই অন্তর্ভুক্ত। তবে প্রতিবেশীর অধিকারের মাঝে স্তরবিন্যাস আছে। যেমন, তাবারানীর হাদীসে হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, যার অর্থ হল, কাফির প্রতিবেশী শুধুমাত্র প্রতিবেশী হিসাবে অধিকার পাবে। পক্ষান্তরে মুসলমান প্রতিবেশী দুটি অধিকার পাবে।

১. প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার। ২. মুসলমান হওয়ার কারণে ভ্রাতৃত্বের অধিকার। এ হিসেবে মুসলমান আত্মীয় প্রতিবেশী তিনটি অধিকার পাবে। ১. প্রতিবেশীত্বের। ২. মুসলমানিত্বের। ৩. আত্মীয়তার।

প্রতিবেশীর অধিকার

এ হাদীসের মাধ্যমে প্রতিবেশীর অধিকার প্রমাণিত হয়েছে। এক বর্ণনা মতে বাড়ির চতুর্দিক চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সকলেই প্রতিবেশীর আওতাভুক্ত। তাছাড়া শহরে বা গ্রামে বাড়ির পার্শ্ববর্তী লোকজন যেমন প্রতিবেশী, তদ্রুপ বাড়ি থেকে যার সাথে একত্রে সফরে যাওয়া হয় বা বিদেশে গিয়ে একসঙ্গে সফর করা হয় -এসব সফরসঙ্গী এবং মাদ্‌রাসা, স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত বা যে কোনও কর্মস্থলে একসঙ্গে যারা কিছুক্ষণের জন্য হলেও থাকে, তারাও প্রতিবেশী। সাময়িকের জন্য হলেও প্রতিবেশী। ততক্ষণের জন্য প্রতিবেশীর নির্ধারিত অধিকার তাদের প্রাপ্য।

একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত

মূলতঃ কুরআন-হাদীসের এসব শিক্ষার আলোকে যে সমাজ গড়ে উঠে, সেখানে প্রতিবেশীর গুরুত্ব ও মর্যাদা একজন নিকটাত্মীয়ের চেয়ে কম থাকে না। একই সঙ্গে বসবাসকারীরা পরস্পরের সুখ-দুঃখেই শুধু শরীক থাকে না বরং তারা পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেও আনন্দ লাভ করে।

হযরত মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতিয়ে আযম তথা প্রধান মুফতী। তাঁকে 'মুফতীয়ে আ'যম হিন্দ' তথা ভারতবর্ষের প্রধান মুফতীও বলা হত। বংশমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকেও তিনি বিশিষ্ট জন ছিলেন। কিন্তু তার প্রতিদিনের অভ্যাস ছিল, তিনি সকালবেলা মাদরাসায় যাওয়ার পূর্বে

প্রতিবেশী সাধারণ গৃহসমূহে বসবাসকারী বিধবা ও অসহায় মহিলাদের বাড়ীতে গিয়ে সবার নিকট থেকে কার কি বাজার সদাই আনানো প্রয়োজন জিজ্ঞেস করতেন। এভাবে প্রতিবেশীদের সদাইয়ের দীর্ঘ একটি তালিকা নিয়ে বাজারে যেতেন। নিজ হাতে তাদের সদাই এনে দিতেন। অনেক সময় এমনও হত যে, কোন মহিলা বলত, মুফতি সাহেব! আপনি এ জিনিসটি ভুলে এনেছেন, আমি তো অমুক জিনিস আনতে বলেছিলাম বা এ পরিমাণ আনতে বলেছিলাম। মুফতী সাহেব হাসি-মুখে বলতেন, আমাকে মাফ করবেন, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি এখনি গিয়ে পরিবর্তন করে এনে দিচ্ছি। এ বলে পুনরায় বাজারে গিয়ে পরিবর্তন করে এনে দিতেন।

মুফতি সাহেবের অনেক শাগরিদ ছিল। তিনি নিজে না করে এ কাজ শাগরিদের দ্বারাও করাতে পারতেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন, এরা আমার প্রতিবেশী। তাই এ কাজ আমি নিজ হাতে করব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِحْسَانِ اِلَى الْخَادِمِ ص١٦
অনুচ্ছেদ ঃ ২৯. খাদিমের প্রতি সদয় হওয়া

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ فِتْيَةً تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهٖ وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهٖ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهٗ فَاِنْ كَلَّفَهٗ مَا يَغْلِبُهٗ فَلْيُعِنْهُ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَاُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৫২. বুনদার রহ......... আবূ যার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে তোমাদের অধীন খাদেম বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যার যে ভাই তার অধীন রয়েছে, তাকে যেন সে নিজের খাদ্য থেকে খাদ্য দেয়। নিজের পোশাক থেকে পোশাক পরায় এবং এমন কোন কাজের যেন দায়িত্ব চাপিয়ে না দেয়, যা তার শক্তিকে অক্ষম করে দেয়। এমন কাজের দায়িত্ব যদি তাকে দেয় যা তাকে অক্ষম করে ফেলে তবে সে যেন এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করে। এ বিষয়ে আলী, উম্মু সালামা, ইবনে উমর ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ, বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثنا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيٰى عَنْ فَرْقَدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ ، هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِىْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهٖ

৫৩. আহমদ ইবনে মানী' রহ...... আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুর্ব্যবহারকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

ইমাম তিরমিযী রহ, বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

আইয়ূব সাখতিয়ানী প্রমুখ রহ. ফারকাদ সাবাখী রহ.-এর স্মরণ শক্তির সমালোচনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اخوانكم ঃ এখানে গোলাম ও মালিককে পরস্পর ভাই বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ উভয়ই আদম-হাওয়ার সন্তান হিসেবে। তাছাড়া উভয় যদি মুসলমান হয় তাহলে পরস্পর তারা ধর্মীয় ভাই।

فليطعمه من طعامه ঃ মালিক যা খাবে, গোলাম এবং খাদেমকেও তাই খাওয়াবে। মালিক যা পরিধান করবে, তাদেরকেও তা পরিধান করাবে। এ নির্দেশটি মূলতঃ সকলেরই মতে امر استحباب তথা মুসতাহাব হিসেবে। তবে ওয়াজিব হল, যে এলাকায় যে প্রচলন সেই এলাকার সেভাবেই খাওয়ানো এবং পড়ানো। এমনকি মালিক যদি কৃপনতা কিংবা দুনিয়া বিমুখতার কারণে খোরপোষে সঙ্কীর্ণতা করে, তাহলে গোলাম বা খাদেমের জন্যও সঙ্কীর্ণতা করা জায়িয নেই বরং এলাকার প্রচলন অনুযায়ীই গোলামকে খোরপোষ দিতে হবে।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, এখানে فليطعمه নির্দেশটি ওয়াজিব বুঝানোর জন্য। কিন্তু এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, খাদেমের খোরপোষ মনিবের মত হতে হবে বরং উদ্দেশ্য হল, মনিব যে প্রকারের খাবার খাবে, গোলাম বা খাদেমকে সে জাতীয় খাবার খাওয়াবে। এর প্রমাণ মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস–

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين -

বলা বাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য হল, সহমর্মিতা, সবদিক থেকে সাম্য রক্ষা করা উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য সাম্য রক্ষা করা উত্তম। মুয়াত্তা মালিকের একটি হাদীসে এ ব্যাপারে আরও স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে –

عن أبي هريرة رض مرفوعا للملوك طعامه وكسوته بالمعروف

ولا يكلفه ما يغلبه ঃ গোলাম ও খাদেমকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজের আদেশ দেওয়া। সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয বরং প্রয়োজনে নিজে তার সাহায্য করবে অথবা অন্য ব্যক্তি দ্বারা তার সহযোগিতা করাবে।

ইসলাম ও দাস প্রথা

ইসলামের উপর তথাকথিত প্রগতিবাদীদের পক্ষ থেকে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে দাস প্রথা তার একটি। মার্কসবাদীরা মানুষকে ইসলাম থেকে বিমুখ করার হীন উদ্দেশ্যে এ হাতিয়ারটিকে সাময়িকভাবে ব্যবহার করে। তাদের দাবী ইসলাম সাময়িকভাবে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে তা সর্বকালের জন্যে মানবতার একমাত্র আদর্শ হতে পারে না। কারণ, ইসলাম দাস প্রথাকে স্বীকার করে। অথচ এ ছিল ইতিহাসের গতিধারায় এক পর্যায়ের অনিবার্য ব্যবস্থা। ইসলাম যদি সর্বকালের মানুষের জন্যে জীবন বিধানরূপে স্রষ্টার পক্ষ থেকে মনোনীত হত, তাহলে এ প্রথাটিকে কখনই স্বীকৃতি দিত না। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলাম ছিল সাময়িক জীবন দর্শন। সাময়িকভাবে তা সফল ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এখন তা অচল। প্রগতিশীলদের এরূপ প্রচারণার ফলে মুসলিম যুব সমাজ আজ বিপর্যস্ত। তারা ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য, এটি ইসলাম থেকে মুসলিম যুব সমাজকে বিচ্ছিন্ন করার একমাত্র চক্রান্ত নয়। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষার নানা আবরণে মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পশ্চিমাদের নিয়মিত কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত।

ইউরোপের নতুন সভ্যতার প্রশংসা ও গুণগান করতে গিয়েই আধুনিক শিক্ষিত সমাজ পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থার ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য সনাক্ত করার প্রয়াস চালায়। ইসলামের কথা আসতেই তারা দাস প্রথার কথা বেশ রং লাগিয়ে ফলাও করে প্রকাশ করেন। অথচ ইসলামই প্রথম ব্যবস্থা যা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তিদানের বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে। ইসলামের সাথে দাস প্রথার সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যে আমাদেরকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে।

বিংশ শতাব্দী শেষ প্রান্তে এসে মানুষ যখন সভ্যতার শীর্ষে উপনীত হওয়ার দাবী করছে, তখন দাস প্রথা একটি প্রাচীন মানবেতর সমাজের চিত্র হিসেবে তাদের নিকট প্রতিভাত হয়। আজকের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যদি কেউ প্রাচীন যুগের দাস প্রথার কথা ভাবেন এবং দাস শ্রেণীর সাথে কি ধরণের ঘৃণ্য আচরণ করা হত, তা যদি চিন্তা করা হয়, তবে এটিকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এক ব্যবস্থা বলে মনে হবে। আমরা হয়ত ভাবতেই পারব না যে, কোন জীবন ব্যবস্থা এরূপ একটি প্রথাকে কিভাবে অনুমোদন দেয়। অথচ ইসলাম মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ব্যতীত অন্য কারও দাসত্ব স্বীকার করতে নিষেধ করে। মুসলমানদের অনেকের ধারণা ইসলাম যদি খোলাখুলিভাবে দাস প্রথা নিষিদ্ধ করত, তাহলে কতই না সুন্দর হত। তবে প্রথমেই বলে রাখা ভাল, দাস প্রথা পৃথিবীর প্রাচীন প্রতিটি সভ্যতায়ই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অন্যান্য সভ্যতায় দাস শ্রেণীর সাথে যে আচরণ করা হত, তা সাথে সাথে মুসলমানদের আচরণ বিচার করলেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানবিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ রোমান সমাজের কথা উল্লেখ করা যায়। রোমানরা দাসদেরকে মানুষ বলে গণ্য করত না। দাস ছিল পণ্য সামগ্রী। তাদের কোন অধিকারের প্রশ্নই ছিল না বরং তাদেরকে সারাক্ষণ নানা কাজে লিপ্ত রাখা হত। অন্যান্য সমাজের অবস্থাও ছিল অনুরূপ।

দাস প্রথার উদ্ভব কিভাবে হলো তার কোনও প্রামাণ্য দলীল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু বলা যায়, সম্ভবত যুদ্ধজয়ের সামগ্রী রূপেই দাস শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। অথচ এসব যুদ্ধের পিছনে কোন নীতি বা আদর্শের বিষয় ছিল না বরং কোন জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যেই তাদের সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালিত হত। রোমান জাতির যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল, তাদের বিলাস বহুল জীবনের সামগ্রী যোগান দেওয়া। আনন্দদায়ক সুখ সামগ্রী অর্জনের জন্যে তারা বিভিন্ন জাতিকে অধীন করে রাখতে চাইত। এসব যুদ্ধে যারা বন্দী হত, তাদেরকে নিতান্ত অপরাধী গণ্য করত। তাই তাদের কোন অধিকারই স্বীকৃত ছিল না। অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদেরকে হত্যা করা হত। আশুরী, মিসরী ও ইয়াহুদী জাতি যুদ্ধবন্দীদের সাথে এরূপ আচরণই করত।

কিছুদিন পর তাদের এ নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসে। যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করার পরিবর্তে তাদেরকে দাস বানানোর নীতি প্রচলিত হল। কিন্তু তাদের উপর চলত অমানুষিক নির্যাতন। দাসদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হত। মাঠে কাজ করার সময় তারা যাতে পালাতে না পারে সে জন্য পাহারার ব্যবস্থা থাকত। অথচ তাদের হাতে পায়ে লোহার শিকল ও বেড়ি পরানো হত। তাদের আহারের ব্যবস্থা ছিল অতি নিম্নমানের। কোন মতে বেঁচে থাকার মত খাবারই তাদেরকে দেওয়া হত। তা-ও দেওয়া হত কাজ নেওয়ার স্বার্থে। তারা যাতে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্যেই এ খাবারটুকু দেওয়া হত। এ খাবারটুকু যে তাদের প্রাপ্য তা তারা মনে করত না। অথচ মজার ব্যাপার হল-পশুপাখি ও গাছপালার যত্ন নেওয়া তাদের নিকট খুব প্রয়োজনীয় ছিল। কাজের সময়ও তাদের প্রতি নির্যাতন চালানো হত। কাজের শেষে তাদেরকে রাখা হত অন্ধকার এক কুঠরীতে, তাও শিকল পরিয়ে। রোমানদের সমাজে এক অদ্ভুত বিত্তবিনোদনের রীতি প্রচলিত ছিল। দাসদেরকে বল্লম ও তরবারী দিয়ে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়ে প্রভুরা সে দৃশ্য দেখত। স্বয়ং সম্রাট এ যুদ্ধ উপভোগ করার জন্য মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন। দাসরা মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হত। তরবারি ও বল্লম নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তো প্রতিপক্ষের উপর। এতে উভয়ই ক্ষত-বিক্ষত হত। এভাবে এক সময় একজন নিহত হত নির্মমভাবে। প্রভুরা আনন্দে করতালি বাজিয়ে বিজয়ী দাসকে অভিনন্দন জানাত আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত।

আইনের দৃষ্টিতে দাসদের অবস্থা কি তা আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা দাসদের হত্যা করার, শাস্তি দেওয়ার বা নির্যাতন করার ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার ছিল প্রভুদের। এমনকি কোথাও কোন অভিযোগ করারও সুযোগ ছিল না। পারস্য, ভারত ও অন্যান্য দেশেও দাসদের অবস্থা এরূপই ছিল। সামান্য কিছু তারতম্য থাকলেও মোটামুটি সব দেশেই দাসদের জীবন ছিল মানবেতর। তাদের জীবনের কোন মূল্য ছিল না। কেউ তাদের হত্যা করলে তার কোন বিচার হওয়ার ব্যবস্থা ছিল না।

ইসলাম যখন আবির্ভূত হয় তখন সারা দুনিয়ায় দাস জীবনের চিত্র ছিল এরূপ। ইসলাম এসেই দাস শ্রেণীকে মানবীয় মর্যাদা দান করে। ইসলাম দাসদের ব্যাপারে প্রভুদের সতর্ক করে দিয়ে বলল, তোমরা একই আদমের সন্তান। অতএব তোমরা ভাই ভাই। ইসলাম মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি করল তাকওয়াকে। নিছক দাস হওয়ার কারণে কেউ নিচু মর্যাদার ব্যক্তি হতে পারে না। ইসলাম মনিবদেরকে দাসদের সাথে সদ্ব্যবহারন করতে নির্দেশ দিল। ইসলাম শিক্ষা দিল মুনিব ও দাসদের সম্পর্ক হবে আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। ইসলামে দাসদেরকে নিছক পণ্য সামগ্রী বলে বিবেচনা করা হয় না বরং তাদেরকে মানবীয় মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। ইসলামের এ নীতি বাস্তবায়িত হয়েছিল পুরোপুরি। এমনকি ইসলাম বিদ্বেষী ইউরোপীয় লেখকরাও স্বীকার করেছেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে দাস শ্রেণী যে উচ্চ মানবিক মর্যাদা লাভ করেছিল, ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যায় না। তখন দাসরা ছিল মনিবদের মতই মুক্ত ও ভয়শূন্য।

ইসলামে দাসদের আইনগত নিরাপত্তা ও ছিল। করা বা কাজে তাদের অধিকার হরণ করার অনুমতি ছিল না। কিন্তু তাই বলে একটি মাত্র ঘোষণার মাধ্যমে দাস প্রথা উচ্ছেদ করার কোন সুযোগ ছিল না। তবে দাসদের মুক্তির ব্যাপারে ইসলাম দুটি প্রধান ব্যবস্থা নেয়। যথা– মনিবদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিদানের ব্যবস্থা এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে স্বাধীনতা প্রদান।

প্রথমতঃ মনিবদের বলা হল, স্বেচ্ছায় দাসদের মুক্তি দিতে। ইসলাম এজন্যে মনিবদেরকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং অনেক দাসকে মুক্তি দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসরণে বহু দাস কিনে মুক্তি দেন।

ইসলাম কোন কোন গোনাহের কাফ্ফারা হিসেবে দাস মুক্তিদানের নির্দেশ দেয়। যেমন, অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড, শপথ, ইচ্ছাকৃত রোযা ভঙ্গ ইত্যাদি। এভাবে উৎসাহদানের কারণে এক বিপুল সংখ্যক দাস মুক্তি লাভ করেছিল যে, ইসলাম আসার আগে বা পরে এর কোন নজির পাওয়া যায়নি। একমাত্র মুসলমানরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিভিন্ন পন্থায় অসংখ্য দাসকে মুক্তি দিয়েছে।

দাসদের মুক্তি দানের দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল, মুক্তিপণ বিনিময়। ক্রীতদাস যদি অর্থের বিনিময়ে মালিক থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে তাহলে মালিক তা মেনে নিতে নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারত না। মালিক যদি অস্বীকার করত তা হলে বিচারলয়ের মাধ্যমে দাস নিজ অধিকার আদায় করে নিতে পারত। ইউরোপে এ ব্যবস্থা অনুমোদিত হয় সাত শ' বছর পরে।

সরকারী তহবিল থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে দাসমুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামের এ দুটি ব্যবস্থার কারণে দাস শ্রেণীর ইতিহাসে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। মানব জাতির ইতিহাস এ দ্বারা সাত শ' বছর এগিয়ে যায়।

তবে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। ইসলাম যখন দাসদের মুক্তির ব্যাপারে এত বড় প্রদক্ষেপ নিল, এমনকি বাইরের কোনরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ ছাড়াই অসংখ দাস মুক্তি পেয়ে গেল, তখন একই সঙ্গে দাস প্রথাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি কেন? এরূপ করলে তো মানব জাতির চরম কল্যাণ সাধিত হত। এ প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা। তখনকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো খতিয়ে দেখলেই বিষয়টি পরিস্কার হবে। ইসলাম দাসপ্রথা উচ্ছেদের সোজাসুজি নির্দেশ না দিয়ে বরং তা ক্রমবিলোপের ব্যবস্থা করে। ইসলামের এ ব্যবস্থা যদি পরবর্তীকালে অব্যাহতভাবে অনুসরণ করা হত, তাহলে অনতিকাল পরেই দাসপ্রথার বিলুপ্তি বাস্তবায়িত হত। কিন্তু ইসলাম যখন দুনিয়াতে আগমন করে, তখন দাস প্রথা ছিল গোটা দুনিয়ায় স্বীকৃত একটি রীতি। এ সময় কেউ তা বাঁধা দেবার বা পরিবর্তন করার কথা চিন্তা করত না। তাই হঠাৎ করে এ প্রথা বিলোপের ঘোষণা দেওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না। ঠিক এমনই অবস্থা ছিল মাদবকদ্রব্যের বেলায়। তৎকালীন আরব সমাজে তা এতই প্রচলিত ছিল যে, আকস্মিকভাবে তা নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করলে তা হত বাস্তবতা বিরোধী। ইসলাম মানব প্রকৃতির কোন পরিবর্তন সাধন করতে চায়নি বরং সেটিকে সংশোধিত করে উন্নততর করতে চেয়েছে। তাও সময় সুযোগ দিয়ে

করতে চেয়েছে। কোনরূপ জোর জবরদস্তি করা ইসলামের পছন্দ নয় বরং স্বাভাবিক দুর্বলতা কাটানোর সুযোগ দিয়ে মানুষকে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় দেওয়াই ইসলামের রীতি।

ইসলাম দাস শ্রেণীকে মুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাদেরকে স্বাধীন মানুষের সমান মর্যাদা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ফুফাতো বোন যয়নব রাযি. কে বিয়ে দিয়েছিলেন তারই মুক্ত দাস হযরত যায়েদের সাথে। হযরত বেলাল রাযি. যিনি ছিলেন হযরত আবু বকর রাযি. এর মুক্ত দাস। তাকে মুসলমানদের প্রথম মুয়াযযিন নিযুক্ত করা হয়। হযরত উমর রাযি. তার নাম উচ্চারণ করার সময় বলতেন, মান্যবর বেলাল।

ইসলাম মানবজাতির জন্য শান্তির পয়গাম। জীবনের সকল পর্যায়ে সকল শ্রেণীর জন্যেই শান্তির বার্তা শোনায় ইসলাম। ইতিহাসের এক পর্যায়ে সে দাস প্রথার উদ্ভব হয়েছিল ইসলাম তা বাস্তব উপায়ে বিলুপ্ত করার ব্যবস্থা নিয়েছিল। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করাই ইসলামের নীতি। ঘৃণিত দাস প্রথা বিলোপে এটিই মূলতঃ কার্যকর ব্যবস্থা।

চাকর-নওকরদের সাথে করণীয়

(১) নিজেরা যা খাবে চাকর-নওকরকেও তা খাওয়াবে।

(২) নিজেরা যা পরিধান করবে, চাকর-নওকরকে সেরূপ পোশাক দিবে।

(৩) তাদের দ্বারা সাধ্যাতীত কাজ নিবে না।

(৪) কোন কাজ তাদের কষ্টসাধ্য হলে ঐ কাজে তাদের সহয়তা করবে।

(৫) তাদরে সাথে উত্তম ব্যবহার করবে অর্থাৎ কঠোর ব্যবহার ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবে না।

(৬) তারা রোগাক্রান্ত হলে কিংবা কোন কষ্টে পড়লে তাদেরকে সমবেদনা জানাবে।

(৭) তাদেরকে দ্বীন-শরী'আত মোতাবেক চালাবে। কেননা অধীনস্তকে দ্বীনের উপর চালানো কর্তব্য।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدَّامِ وَشَتْمِهِمْ صـ١٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০. খাদিমদের মারা এবং গালিগালাজ করা নিষেধ

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اُبْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِيْهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوالْقَاسِمِ ﷺ نَبِيُّ التَّوْبَةِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بَرِيْئًا مِمَّا قَالَ لَهُ اَقَامَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ يُكْنٰى اَبَا الْحَكَمِ

৫৪. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তওবার নবী আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন নির্দোষ গোলামকে কেউ যদি অপবাদ দেয় আল্লাহ তা'আলার কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির উপর হদ কায়েম করবেন। অবশ্য গোলামটি বাস্তবিকই দোষী হয়ে থাকলে ভিন্ন কথা।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ বিষয়ে সুওয়ায়দ ইবনে মুকাররিন ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে আবূ নু'ম রহ. হলেন আবদুর রহমান ইবনে আবূ নু'ম বাজালী। তাঁর কুনিয়ত বা উপনাম হল আবুল হাকাম।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا مُؤَمَّلٌ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرٰهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا لِي فَسَمِعْتُ قَائِلًا مِنْ خَلْفِي يَقُولُ إِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ فَالْتَفَتُّ فَإِذًا أَنَا بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَلّٰهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوكًا لِي بَعْدَ ذَالِكَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنُ شَرِيكٍ

৫৫. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ..... আবূ মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক গোলামকে পিটাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার পিছন থেকে একজনকে বলতে শুনলাম, হে আবূ মাসউদ! জেনে রেখ! হে আবূ মাসউদ! জেনে রেখ! আমি ঘুরে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বললেন, তুমি এর উপর যতটুকু ক্ষমতা রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান। আবূ মাসউদ রাযি. বলেন, এরপর আর কোন দিন গোলামকে আমি মারিনি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবরাহীম তায়মী রহ. হলেন, ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ ইবনে শারীক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

نبى التوبة : এটি ابو القاسم থেকে بدل হয়েছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে نبى التوبة বলা হয় এজন্য যে, তিনি অধিকহারে তাওবা করতেন। এমনকি একটি হাদীসে এসেছে, তিনি দৈনিক সত্তরবার কিংবা একশ' বারও তাওবা করতেন। অথবা তাঁকে نبى التوبة বলার কারণ হতে পারে তিনি যেহেতু বিশ্বাসগত এবং মৌখিক তাওবা কবূল হওয়ার সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন। অথচ কোন কোন পূর্ববর্তী নবীর উম্মতের তাওবা ছিল হত্যা করা। তাই তাকে نبى التوبة বলা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে তাওবা দ্বারা উদ্দেশ্য ঈমান এবং কুফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ইসলামের ছায়াতলে আসা। অতএব نبى التوبة এর মর্মার্থ হল, نبى الرجوع من الكفر الى الاسلام অর্থাৎ যে নবীর উসীলায় মানুষ কুফরি ত্যাগ করে ঈমানের দিকে ফিরে এসেছে। (বযলুল মাজহূদ, তাকমিলাহ)

اقام الله عليه الحديوم القيامة : হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মালিক যদি তার গোলাম-বাঁদীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তাহলে তার উপর 'হদ্দে কযফ' প্রয়োগ হবে না। –আল-কাওকাব

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. হাফিয ইবনে হাজার রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে উম্মতের উলামায়ে কিরাম একমত যে, আযাদ ব্যক্তি যদি গোলামের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে, তাহলে 'হদ্দে কযফ' ওয়াজিব হবে না। আলোচ্য হাদীস এর প্রতিই ইংগিত করে। কেননা দুনিয়াতে 'হদ্দে কযফ' প্রয়োগ হলে হাদীসে অবশ্যই তা বলা হত। যেমনিভাবে আখেরাতের কথা বলা হয়েছে। (হাশিয়াতুল কাওকাব ঃ ২/২১)

لله اقدرعليك منك عليه : এখানে لله শব্দটি لام 'ফাতাহ' এর সাথে। অর্থাৎ তুমি গোলামের যতটুকু কর্তৃত্ব রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর এর চেয়ে বেশি কর্তৃত্ব রাখেন।

بَابُ مَاجَاءَ مِنْ أَدَبِ الْخَادِمِ ص١٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১. খাদিমকে আদব শিক্ষা দেওয়া

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ هَارُوْنَ الْعَبْدِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ فَارْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ

وَاَبُوْهَارُوْنَ الْعَبْدِيُّ اِسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ضَعَّفَ شُعْبَةُ اَبَاهَارُوْنَ الْعَبْدِيَّ قَالَ يَحْيٰى وَمَازَالَ ابْنُ عَوْنٍ يَرْوِىْ عَنْ اَبِىْ هَارُوْنَ حَتّٰى مَاتَ

৫৬. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ..... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তার খাদেমকে মারে আর সে যদি তখন আল্লাহর দোহাই দেয়, তবে তোমরা তোমাদের হাত উঠিয়ে নিবে।

আবূ হারূন আবদী রহ.-এর নাম হল উমারা ইবনে জুওয়াইন রহ.। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. বলেন, শু'বা রহ. আবূ হারূন আবদীকে যঈফ বলেছেন। ইয়াহইয়া রহ. আরও বলেন, ইবনে আওন রহ. মৃত্যু পর্যন্ত আবূ হারূন রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক মারওয়াযী। বনু হানাযালার আযাদকৃত দাস। প্রথমশ্রেণীর প্রখ্যাত তাবেঈ। তিনি হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া, ইমাম মালিক, সুফয়ান সওরী, শো'বা, আওযাঈ প্রমুখ মনীষীদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর নিকট থেকে সুফয়ান ইবনে উয়াইনা, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মঈন প্রমুখ রেওয়ায়াত করেন। তিনি এক দিকে দিকে ছিলেন উলামায়ে রাব্বানী, ইমামে ফিকহ, হাফেযে হাদীস, দুনিয়াবিমুখ, মুত্তাকী, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস অপরদিকে ছিলেন প্রখ্যাত দানশীল। ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ বলেন, সে যুগে দুনিয়ার বুকে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের চেয়ে বড় আলিম কেউ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মধ্যে সব রকমের গুণাবলী একসাথে দান করেছিলেন। বহুবার তিনি বাগদাদে আগমন করেছেন এবং হাদীসের দরস দিয়েছেন। তিনি ১১৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে ১৮১ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

সনদ-সংক্রান্ত আলোচনা

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. বলেছেন, শো'বা রহ. আবু হারুন আ'বদী সম্পর্কে দুর্বল মন্তব্য করেছেন।

তাকবীর গ্রন্থে রয়েছে, আবু হারূন আল-আবদীর নাম উমারা ইবনে জুয়াইন। তিনি তাঁর উপনামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু পরিত্যাক্ত রাবী। কেউ কেউ তাকে মিথ্যাবাদী ও শিয়া বলেছেন।

শো'বা রহ. এর মন্তব্যটি ছিল, এরূপ যে, আবু হারুন থেকে হাদীস বর্ণনা করার চেয়ে আমার নিকট প্রিয় হল, আমি কারও সামনে এগিয়ে যাই, সে আমার ঘাড়ে আঘাত করুক।

ইমাম দারাকুতনী রহ. বলেছেন, তিনি বিভিন্ন রং ধারণ করেন, কখনও খারিজী আবার কখনও শী'আ, ফলে সাওরী রহ. তার থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা তিনি গ্রহণ করেন ও নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

আল্লামা তীবী বলেন, এ হুকুম তখনকার জন্য প্রযোজ্য, যখন এ সাজা হবে শিষ্টাচার শেখানোর উদ্দেশ্যে। পক্ষান্তরে যদি حدود شرعية হয়, তাহলে ছাড়া দেওয়া জায়িয হবে না। অনুরূপভাবে যদি সে ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে ফরিয়াদ করে তাহলেও হাত গুটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ নেই। লজ্জিত হয়ে ফরিয়াদ করলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْعَفْوِعَنِ الْخَادِمِ ص١٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২. খাদিমকে ক্ষমা করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى هَانِى الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ الْجَلِيْدِ الْحَجْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ اَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ اَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِى هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ هٰذَا

৫৭. কুতায়বা রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদিমকে কতবার মাফ করব ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে রইলেন। লোকটি আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদেমকে কতবার মাফ করব? তিনি বললেন, প্রতিদিন সত্তরবার।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহব রহ. এটিকে আবূ হানী খাওলানী রহ. থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اَبِى هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو

৫৮. কুতায়বা রহ........ আবূ হানী খাওলানী রহ. থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রহ. থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তা আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বলে উল্লেখ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فصمت النبى ﷺ ঃ প্রথমবার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চুপ ছিলেন কেন? সম্ভবতঃ তিনি নিশ্চুপ থেকে বুঝাতে চেয়েছেন, প্রশ্নটি আমার নিকট অপ্রিয়। কেননা খাদেম ও গোলামের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা সাওয়াবের কাজ। এতে আল্লাহ খুশি হন। তাই যতবার সম্ভব হবে, ততবার মাফ করে দেওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর অপেক্ষা করেছিলেন। এখানে আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় আছে, সাহাবী মোট তিনবার প্রশ্ন করেছিলেন। দু'বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ ছিলেন। আর তৃতীয়বার উত্তর দিয়েছেন।

كم اعفواعن الخادم ঃ এখানে খাদেম দ্বারা গোলাম এবং চাকর উভয়ই উদ্দেশ্য।

كل يوم سبعين ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলতঃ এ বাক্যটিতে বুঝিয়েছেন, যত বেশি পার ক্ষমা কর। কারণ, سبعين শব্দটি এখানে تحديد তথা নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো জন্য আসেনি বরং تكثير তথা আধিক্য বুঝানোর জন্য এসেছে। আর আরবী ভাষায় এরকম ব্যবহার অনেক।

মাওলানা মনযূর নু'মানী রহ. বলেন– অধমের মতে ক্ষমার এ হুকুমের অর্থ হল, তাকে প্রতিশোধমূলক শাস্তি দিবে না। সংশোধন ও আদব শেখানোর উদ্দেশ্যে কিছু ভৎর্সনা সমীচীন মনে করলে তার পূর্ণ অধিকার আছে। এ অধিকার প্রয়োগ করা উপরিউক্ত হুকুমের পরিপন্থী হবে না বরং ক্ষেত্র বিশেষ এটাই উত্তম হবে। (মা'আরিফুল হাদীস)

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ أَدَبِ الْوَلَدِ صـ١٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩. সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ نَاصِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ ،هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ،

وَنَاصِحُ بْنُ عَلَاءِ الْكُوْفِيُّ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ بِالْقَوِيِّ وَلَا يُعْرَفُ هٰذَ الْحَدِيْثُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَنَاصِحٌ شَيْخٌ آخَرَ بَصْرِيٌّ يَرْوِيْ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ هٰذَا

৫৯. কুতায়বা রহ...... জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া এক সা' পরিমাণ বস্তু সাদকা করা অপেক্ষা উত্তম। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি গরীব।

নাসিহ আবুল–আলা কূফী রহ. হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে শক্তিশালী নন। এ সূত্র ছাড়া এ হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই। নাসিহ নামে অপর একজন বাসরী শাইখ আছেন যিনি রিওয়ায়াত করেন আম্মার ইবনে আবূ আম্মার প্রমুখ রহ. থেকে। তিনি এই নাসিহ থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثنا عَامِرُ بْنُ أَبِيْ عَامِرِ الْخَزَّازُ ثنا أَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَامِرِ بْنِ أَبِيْ عَامِرِ الْخَزَّازِ وَأَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ وَهٰذَا عِنْدِيْ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ

৬০. নাসর ইবনে আলী রহ....... আইয়ূব ইবনে মূসা তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন, পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা মর্যাদাবান আর কোন জিনিস দান করতে পারেন না। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি গরীব। আমি ইবনে আবূ আমির খাযযায -এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই। তিনি হলেন, আমির ইবনে সালিহ রুসতম আল-খাযযায, আইয়ূব ইবনে মূসা হলেন আইয়ূব ইবনে মূসা ইবনে আমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস। আমার মতে এ হাদীসটি মুরসাল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يؤدب الرجل ولده ... الخ ঃ সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া একাধিক কারণে সদকার চেয়েও উত্তম। উদাহরণস্বরূপ এক ছা' সদকা করা কেবলই একটা সদকা। কিন্তু সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া 'সদকায়ে জারিয়াহ'। আর স্পষ্টতই নিছক সদকা থেকে সদকায়ে জারিয়া অনেক উত্তম। কেননা সন্তান যে আদব শিখবে, সে আদবের উপর আমল করবে। তারপর সে নিজে যখন একদিন পিতা হবে তখন তার সন্তানদেরকে এসব আদব শিক্ষা দিবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। ফলে প্রথম শিক্ষাদানকারী তার সাওয়াব পেতে থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ নিজের সন্তানকে আদব শিক্ষা দিলে এই নিশ্চয়তা থাকে যে, নেক কাজটি সঠিক স্থানে করেছি। পক্ষান্তরে সদকা করলে সদকা সঠিক পাত্রে দেওয়া হয়েছে কি না এই নিশ্চয়তা থাকে না?

তৃতীয়তঃ হতে পারে সদকা না করলে এর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু সন্তানকে সঠিক আদব না শেখালে তো আযাব ভোগ করতে হবে। ইত্যাদি।

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় তথা সন্তানের অধিকারসমূহ

(১) সুসন্তানের জন্য একটি আদর্শ মায়ের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ নম্র-ভদ্র ও নেককার নারীকে বিয়ে করা। তাহলে তার গর্ভে সু-সন্তানের আশা করা যায়। কারণ, সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব অনস্বীকার্য।

(২) সন্তানের জীবন রক্ষা করা। ইসলাম জাহিলি যুগের সন্তান হত্যার কুপ্রথাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম আখ্যায়িত করেছে। সন্তানের জীবন রক্ষার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা পিতা-মাতার কর্তব্য। সন্তানের উপর থেকে বালা-মুসীবত যেন দূর হয় –এ উদ্দেশ্যে সন্তানের আকীকাকে সুন্নাত করা হয়েছে।

(৩) সন্তানকে লালন-পালন করাও পিতা-মাতার দায়িত্ব। এজন্য মাতার উপর দুধ পান করানোকে ওয়াজিব করা হয়েছে। মাতার অবর্তমানে বা তাঁর অপারগতার অবস্থায় দুধমাতার মাধ্যমে সন্তানকে দুধপান করানো হলে তার ব্যয়ভার বহন করা সন্তানের পিতার উপর ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, দুধমাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার মহিলাকে নির্বাচন করা কর্তব্য। কারণ, সন্তানের চরিত্র গঠনে দুধের একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। এমনিভাবে সন্তানের লালন-পালন হালাল সম্পদ দ্বারা হওয়া উচিত। অন্যথায় সন্তান বড় হওয়ার পর হালাল-হারাম এর পার্থক্য করার মন-মেযাজ থাকবে না।

(৪) সন্তানকে আদর-সোহাগের সাথে লালন-পালন করা কর্তব্য। কেননা আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত হলে সন্তানের মন-মেযাজে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

(৫) সন্তানের ভাল নাম রাখা পিতা-মাতার দায়িত্ব। এটা সন্তানের অধিকারও।

(৬) সন্তানকে সুশিক্ষা দান করা। শিক্ষার এ ধারা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হবে। তাই সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আযানের শব্দগুলো এবং বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শোনানো সুন্নাত। যেন এ শব্দগুলোর একটা সুন্দর ও পবিত্র প্রভাব তার জীবনের সূচনাতেই পড়ে। সন্তানকে প্রথমেই যে কথা শিক্ষা দিতে হবে, তাহল লা-ইলা ইল্লাল্লাহ। সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়াও পিতা-মাতার দায়িত্ব। সন্তানের পার্থিব অধিকারের মধ্যে রয়েছে। তাদেরকে সাতার কাটা, জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন বৈধ পেশা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া।

(৭) সন্তানকে আদব, আমল ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেওয়া। দুধের শিশু অবস্থা থেকেই তার আদব ও চরিত্র শিক্ষা শুরু হয়ে যায়। তাই ইসলামী শিষ্টাচারে বলা হয়েছে। দুধের সন্তান জাগ্রত থাকা অবস্থায়ও তার সামনে মাতা-পিতা জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় ঐ সন্তানের মধ্যে নির্লজ্জতার বীজ বপন হতে পারে। সন্তানের সাত বছর বয়স হলে তাকে নামাযের নির্দেশ প্রদান এবং দশ বছর বয়স হলে শাসনপূর্বক তাকে নামায পড়ানো –এগুলো সন্তানকে আমল শিক্ষা দেওয়ার অংশ বিশেষ।

(৮) সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ রক্ষা করা, সন্তানদেরকে ধন-সম্পদ দান প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ভাল। তবে কোন সন্তান তালিবে ইলম হলে সে যেহেতু দীনের কাজে নিয়োজিত থাকায় জীবিকা উপার্জনে স্বাভাবিকভাবে পিছিয়ে থাকবে, তাই তাকে কিছু বেশি দান করলে কোন অন্যায় হবে না। এমনিভাবে কোন সন্তান রোগের কারণে বা স্বাস্থ্যগত কারণে উপার্জন অক্ষম হলে তাকেও কিছু বেশি দেওয়া যাবে।

(৯) বিবাহের উপযুক্ত হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা। তবে বিয়ের খরচ বহন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব নয়।

(১০) কন্যা বিধবা কিংবা স্বামী পরিত্যক্তা হলে পুনঃবিবাহ পর্যন্ত তাকে নিজেদের কাছে রাখা এবং তার প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। (আহসানুল ফাতাওয়া ঃ ৫, মা'আরিফুল হাদীস)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ وَالْمُكَافَاةِ عَلَيْهَا ص١٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪. হাদিয়া গ্রহণ করা ও তার বদলা দেওয়া

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَكْثَمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا ثنا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ

৬১. ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম ও আলী ইবনে খাশরাম রহ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিয়া কবূল করতেন এবং এর বদলা দিতেন।

এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা, আনাস, ইবনে উমর ও জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ সূত্রে গরীব। ঈসা ইবনে ইউনুস রহ.-এর রিওয়ায়াতের মাধ্যমেই কেবল আমরা এটিকে মারফূ হিসাবে জানি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদিয়া ঃ হাদিয়া বলে যা অপরকে খুশী করার জন্য এবং তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি। এই উপঢৌকন যদি নিজ থেকে ছোট মানুষকে দেওয়া হয় তখন এর মাধ্যমে স্নেহ-মমতা প্রকাশ পায়। বন্ধু-বান্ধবকে হাদিয়া দেওয়া মহব্বত ও ভালোবাসার নিদর্শন। দুর্বলকে দেওয়া হলে সেবা ও সহমর্মিতার নিদর্শন ও তার মনোরঞ্জনের কারণ। কোন নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিকে দেওয়া হলে সেটা হবে ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন ও নযরানা। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তিকে মুখাপেক্ষী মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং সাওয়াবের নিয়তে দেওয়া হলে সেটা হাদিয়া হবে না বরং সদকা হবে। হাদিয়া তখনই হবে যখন এর মাধ্যমে মহব্বত ও আন্তরিকতা প্রকাশ উদ্দেশ্য হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়। হাদিয়া যদি ইখলাসের সাথে দেওয়া হয়, তবে এর সাওয়াব সদকার চেয়ে কম নয়; বরং ক্ষেত্র বিশেষ বেশিও। (মাআরিফুল হাদীস)

আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিয়া কবুল করতেন। হাদিয়া গ্রহণ করা তাঁর নবুওয়াতের একটি নিদর্শনও। কেননা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিদর্শনাবলিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি সদকা খান না, তবে হাদিয়া নেন।

يثيب عليها ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামহাদিয়া গ্রহণ করতেন। তারপর আল্লাহ তা'আলার বাণী هل جزاء الاحسان الا الاحسان এর উপর আমল করার লক্ষ্যে হাদিয়া প্রদানকারীকে নিজেও হাদিয়া দিতেন। ঐ সময়ে দিতেন বা পরবর্তী কোন সময়ে দিতেন।

হাদিয়া প্রদান করার আদব ও তরীকা

- হাদিয়া শুধুমাত্র কোন মুসলমানের মন জয় করার উদ্দেশ্যে এবং মহব্বত থেকে হতে হবে। অন্য কোন প্রকার উদ্দেশ্যে হতে পারবে না।
- হাদিয়া গোপনে দেওয়াই নিয়ম।
- হাদিয়া দেওয়ার আগে বা পরে নিজের কোন মতলবের কথা না বলা আদব। কেননা এতে হাদিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে।
- নগদ অর্থ প্রদান করলে হাদিয়া মোসাফাহায় সময় দেওয়া ঠিক নয়।

✪ নগদ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু হাদিয়া দিলে এমন বস্তু বা এত পরিমাণে দেওয়া উচিত নয়, যা হাদিয়া গ্রহণকারীর পক্ষে আপন ঠিকানায় বহন করে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হবে। এরূপ করতে হলে তার ঠিকানায় ঐ হাদিয়া পৌছিয়ে দিবে।

✪ নগদ অর্থ ছাড়া অন্য কোন বস্তু হাদিয়া দিলে জিজ্ঞেস করে নেওয়া উত্তম যে, তার কোন বস্তুর প্রতি আগ্রহ আছে?

✪ সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর হাদিয়া দিবে, নতুবা গ্রহণকারীর জন্য এটা দ্বিধা-সঙ্কোচ কিংবা লজ্জার কারণ হতে পারে।

✪ যুযুর্গদের কাছে যেতে হলে হাদিয়া নিয়েই যেতে হবে –এ ধরনের বাধ্যবাধকতার পেছনে পড়া আদব পরিপন্থী। (আদাবুল মু'আশারাত)

হাদিয়া গ্রহণ করার আদব ও তরীকা

✪ হাদিয়া গ্রহণ করা সুন্নাত। এ সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়তে হাদিয়া গ্রহণ করবে।

✪ যার সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম, তার হাদিয়া কবুল করা নাজায়িয। আর সুনিশ্চিতভাবে যদি জানা থাকে যে, হারাম মাল থেকেই হাদিয়া দেওয়া হচ্ছে, তখনও গ্রহণ করা নাজায়িয।

✪ হাদিয়া গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রদানকারীর সামনে সেটা অন্যকে প্রদান করবে না। এতে হাদিয়া প্রদানকারী মনে কষ্ট পেতে পারে।

✪ যে বস্তু হাদিয়া দেওয়া হল, তার মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না। এতে বস্তুর মূল্য কম হলে হাদিয়া প্রদানকারী হয়ত ভাববে, আমার হাদিয়াকে তুচ্ছ কিংবা অবজ্ঞা করা হয়েছে।

✪ হাদিয়ার বদলে হাদিয়া দিবে। কমপক্ষে তার জন্য তৎক্ষণাৎ মুখে দু'আ করে দিবে। এ বাক্যে দু'আ করা যায়– بارك الله فيكم অথবা جزاك الله خيرا বাক্যেও দু'আ করা যায়।

✪ যার মাঝে হাদিয়ার বদলে হাদিয়া পাওয়ার আগ্রহ ও আশা আছে বোঝা যায়, তার হাদিয়া গ্রহণ করবে না। যেমন, প্রচলিত বিয়ে-শাদিতে উপহারের ক্ষেত্রে এরূপ বোঝা যায়। (আদাবুল মু'আশারাত)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الشُّكْرِلِمَنْ اَحْسَنَ اِلَيْكَ ص١٧

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫. অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা আদায় করা

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৬২. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া করে না, সে আল্লাহরও শুকরিয়া করে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ثنا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى ح وثنا سُفْيٰنُ بن وَكِيْعٍ ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّوَاسِىُّ عَنْ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهِ

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَالْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৬৩. হান্নাদ রহ...... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে

ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া করে না। এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা, আশআছ ইবনে কায়স, নু'মান ইবনে বাশীর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

من لايشكرالناس لايشكرالله ঃ এর ব্যাখ্যায় আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেছেন, এর দু'টি মর্মার্থ হতে পারে।

এক. যে ব্যক্তির মাঝে মানুষের প্রতি অকৃতজ্ঞতার অভ্যাস আছে, সে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করারও অভ্যাস নেই। **দুই.** যেই ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ঐ ব্যক্তি আল্লাহর শোকর আদায় করলেও আল্লাহ তা কবুল করেন না, যেই ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (হাশিয়াতুল কাওকাব)

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর শোকর আদায় করার অর্থ হল, তার বিধিবিধান মতে চলা। আর আল্লাহ তা'আলারই একটি বিধান হল, কেউ ইহসান করলে তার শুকরিয়া আদায় করা। এ ব্যক্তি যেহেতু আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেছে, তাই বলা হবে, এ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করেনি।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صَنَائِعِ الْمَعْرُوْفِ صـ١٧

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬. সদাচার প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيِّ ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ ثنا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا اَبُوْزُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍرض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبَسُّمُكَ فِىْ وَجْهِ اَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَاَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَاِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِىْ اَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيِّ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ دَلْوِاَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ

وَفِى الْبَابِ عَنْ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ وَحُذَيْفَةَ وَعَائِشَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَاَبُوْ زُمَيْلٍ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْحَنَفِيُّ

৬৪. আব্বাস ইবনে আবদুল আযীম আম্বারী রহ...... আবূ যার্র রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাসি তোমার জন্য সদকা স্বরূপ। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজের নিষেধ করাও সদকা, পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়াও সদকা, দৃষ্টিহীনকে পথ দেখানো সদকা, রাস্তা থেকে পাথর, কাটা, হাড্ডি বিদূরীত করাও তোমার জন্য সদকা, তোমার বালতি থেকে তোমার (দীনী) ভাইয়ের বালতীতে পানি ঢেলে দেওয়া তোমার জন্য সদকা স্বরূপ।

এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, জাবির, হুযায়ফা, আয়েশা ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

আবূ যুমায়ল হলেন সিমাক ইবনে ওয়ালীদ আল-হানাফী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

صنائع ঃ এটি صنيعة ، صنيع এর বহুবচন। অর্থ– কাজ, কর্ম, অবদান, সৃষ্টি, অনুগ্রহ। **المعروف** ঃ শরী'আত যেটাকে ভালো জানে, সেটাই মা'রূফ।

المنكر ঃ শরী'আত যেটাকে মন্দ বলে জানে, সেটা হল মুন্‌কার।

تبسمك فى وجه اخيك الخ ঃ কাযী আয়ায রহ.বলেন, এসব উত্তম বিষয়কে সদকা বলার কারণ হল, যেমনিভাবে সদকা করলে সাওয়াব পাওয়া যায়, তেমনিভাবে এসব উত্তম বিষয়ের মধ্যে সাওয়াব বিদ্যমান।

امرك بالمعروف ঃ ইমাম নববী রহ. বলেন, আ'মর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বাঁধা প্রদানের গুরুত্ব এ হাদীসে উল্লেখিত অন্যান্য নেক আমলের চেয়েও বেশি। কেননা আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার হল, ফরযে কিফায়াহ। আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে, ফরযের গুরুত্ব নফল থেকেও বেশি।

ইমাম গাযালী রহ. তার 'আরবাঈন' নামক গ্রন্থে বলেন, সৎকর্মের প্রতি আহবান করা এবং অসৎকর্ম থেকে বাঁধা দেওয়া ওয়াজিব। এতে অবহেলা করা নাজায়িয। অবশ্য দু'টি কারণে এ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যথা–

এক. যদি এমন প্রবল ধারণা হয় যে, উপদেশ দিতে গেলে তোমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হবে এবং তোমার উপদেশ কোন ফলও হবে না, এমতাবস্থায় উপদেশ দেওয়া ওয়াজিব নয়। অবশ্য উপদেশ দিলে সাওয়াব হবে।

মনে রাখতে হবে, এমতাবস্থায় উপদেশ দেওয়া ওয়াজিব না হলেও অন্যত্র চলে যাওয়া ওয়াজিব। কারণ, সেখানে থাকা-না থাকা নিজের ইচ্ছাধীন। আর নিজের ইচ্ছায় পাপ দর্শন করাও পাপ।

দুই. কোন স্থানে গুনাহর কাজ হচ্ছে। কিন্তু তুমি বাঁধা দিতে গেলে মার খাওয়ার প্রবল আশংকা আছে। এমনস্থলেও চুপ থাকায় দোষ নেই। যেমন, কোথাও মদের আসর বসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে সব তছনছ করে দিতে পার। কিন্তু পরে বিপদে পড়ার খুব ভয় আছে। এরূপ অবস্থায় চুপ থাকতে পারবে। অবশ্য এরূপ অবস্থায়ও যদি বাঁধা দিতে পার, তবে অশেষ সাওয়াব পাবে। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আ'নিল মুনকার করতে গেলে খাতির নষ্ট হবে, মনক্ষুণ্ন হবে, বন্ধুত্ব চলে যাবে, হাদিয়া-তোহফা কমে যাবে –এ জাতীয় অমূলক 'কারণ' শরী'আত সমর্থন করে না। অতএব এসব কারণে ওয়াজিব হতে নিস্কৃতি পাবে না। (আল-আরবাঈন)

ارشادك الرجل فى ارض الضلال ঃ এখানে ارض শব্দটিকে ضلال এর দিকে ইযাফত করা হয়েছে। কারণ, কেমন যেন উক্ত যমীনটিকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভুল পথে যাওয়ার জন্য। ارض الضلال বলা হয় এরূপ যমীনকে, যার মধ্যে পথের কোন নিদর্শন থাকে না। ফলে লোকজন পথ হারিয়ে ফেলে।

بصرك للرجل الردى البصر ঃ এখানে الردى এর শেষে ء সহ অথবা ইদগামকৃত ى সহ। এরূপ ব্যক্তিকে যে অন্ধ অথবা অল্প অল্প দেখে। البصر এর অর্থ হল, দৃষ্টিশক্তি। মিশকাত শরীফে প্রথম بصرك এর স্থলে نصرك শব্দ এসেছে। মোল্লা আলী কারী বলেন, কেমন যেন এখানে বলা হয়েছে, সে তাকে প্রতিটি কষ্টদায়ক জিনিসের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।

بَابُ مَاجَاءَفِى الْمَنْحَةِ صـ١٧

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭. মিনহা প্রদান

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثنا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْسَجَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ

سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةَ لَبَنٍ اَوْ وَرِقٍ اَوْ هَدٰى زُقَاقًا كَانَ لَهٗ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوٰى مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَشُعْبَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَفِى الْبَابِ عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةً وَرِقٍ اِنَّمَا يَعْنِىْ بِهٖ قَرْضَ الدَّرَاهِمِ وَقَوْلُهٗ اَوْ هَدٰى زُقَاقًا اِنَّمَا يَعْنِىْ بِهٖ هِدَايَةَ الطَّرِيْقِ وَهُوَ اِرْشَادُ السَّبِيْلِ.

৬৫. আবূ কুরায়ব রহ....... বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, কেউ যদি দুধের জন্য মিনহা প্রদান করে বা কাউকে অর্থ ঋণ দেয় বা পথহারা লোককে পথ দেখিয়ে দেয়, তবে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব তার হবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবূ ইসহাক – তালহা ইবনে মুসারিরফ সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা। মানসূর ইবনে মু'তামির এবং শু'বা রহ.ও এ হাদীসটি তালহা ইবনে মুসাররিফ থেকে বর্ণনা করেছেন।এ বিষয়ে নু'মান ইবনে বাশীর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। من منح منيحة ورق এ বক্তব্যের মর্ম হল, দিরহাম (অর্থ) ঋণ প্রদান করা। او هدى رقاقا –এর মর্ম হল, পথপ্রদর্শন করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

من منح منيحة لبن او ورق ঃ এখানে ورق শব্দটিতে راء কে كسرہ এবং ساكن উভয়ভাবে পড়া যায়। ورق অর্থ– রূপা-বৃক্ষপাতা। আল্লামা জাযারী রহ. বলেন, منيحة الورق অর্থ, রৌপ্য ঋণ দেওয়া। আর منيحة اللبن অর্থ, কাউকে উটনী-বকরি ইত্যাদি এ শর্তে প্রদান করা যে, সে তার দুধ দ্বারা উপকৃত হয়ে পুনরায় ফিরিয়ে দিবে। কেউ কেউ বলেন, منيحة الورق অর্থ, কোন বৃক্ষ-লতাকে গরু-ছাগল ইত্যাদির জন্য অবমুক্ত করে দেওয়া।

وهدى زقاقا ঃ الزقاق অর্থ হল গলিপথ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পথভ্রান্ত লোককে পথ দেখায় অথবা অন্ধ লোককে পথ দেখায়। এখানে হাদীসে رقاق শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাস্তা।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اِمَاطَةِ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ ص١٧

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮. পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ فِى الطَّرِيْقِ اِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَاَخَّرَهٗ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهٗ فَغَفَرَ لَهٗ. وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ ذَرٍّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৬৬. কুতায়বা রহ........ আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি হেঁটে চলার সময় রাস্তায় কোন কাটাদার ডাল পেয়ে যদি সে এটিকে সরিয়ে দেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজটির মর্যাদা দিয়ে তাকে মাগফিরাত দান করেন।

এ বিষয়ে আবূ বারযা, ইবনে আব্বাস ও আবূ যারর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের শিক্ষা কেবল আকাইদ ও ইবাদতের গণ্ডি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। একজন মুসলমানের দায়িত্ব শুধু নামায-রোযা আদায় করার দ্বারাই শেষ হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং হাদীসে ইরশাদ করেছেন, ঈমানের সত্তরাধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা তাওহীদ। আর সর্বনিম্ন শাখা পথের ময়লা-আবর্জনা ও কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।

فشكرالله له : এর অর্থ رضى بفعله وقبله منه আল্লাহ তার এ কাজটি দেখে খুশি হন এবং কবুল করে নেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে শোকর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তাকে কাজটির প্রতিদান দেন। কারও কারও মতে এখানে শোকর দ্বারা উদ্দেশ্য, মাগফিরাত অর্থাৎ আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। কোন কোন আলেম বলেন, شكره الله এর অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের সামনে তার প্রশংসা করেন।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْمَجَالِسَ بِالْاَمَانَةِ ص١٧

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯. মজলিসের কার্য্যাবলী আমানতস্বরূপ

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ اَمَانَةٌ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَاِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ

৬৭. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন কথা বলার পর এদিক-সেদিক তাকায় তবে তার এ কথা আমানত বলে গণ্য।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইবনে আবূ যিব রহ.-এর রিওয়ায়াত হিসাবে কেবল এটি সম্পর্কেই আমরা জানি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ثم التفت : কোন কথা বলে ডান-বামের দিকে তাকানোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে কথাটিকে অন্যের কাছ থেকে গোপন করতে চাচ্ছে। সুতরাং তার এদিক-সেদিক তাকানোর উদ্দেশ্য হল, اكتم هذا عنى اى خذه عنى واكتمه وهو عندك امانة অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে কথাটি গোপন রাখবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ হয়ত মজলিসের কোন গোপন কথা আরেকজনের নিকট ফাঁস করে দিল। সাথে সাথে তাকে সতর্ক করে বলে[illegible]টা একান্ত গোপন কথা, তোমাকে বললাম। তুমি আর কাউকে বল না। এভাবে সতর্ক করে [illegible]নায়তা রক্ষা করেছে। অনুরূপ পদ্ধতি অব্যাহতভাবে চলতে লাগল। আর সকলেরই ধারণা, [illegible] করেছে। অথচ এটাও খেয়ানত, যা সম্পূর্ণ নাজায়িয। অবশ্য মজলিসে যদি অন্যের ক্ষতিসাধনের কোন কথা [illegible] হয়ে থাকে, তখন ভিন্ন কথা। যেমন, দুই-তিনজন মিলে কুমতলব আঁটল যে, অমুকের বাড়ি ডাকাতি করব। তখন স্বাভাবিকভাবেই এ জাতীয় কথা ফাঁস করে দেওয়া জায়িয।

بَابُ مَاجَاءَفِى السَّخَاءِ صـ١٧

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০. দানশীলতা প্রসংগে

حَدَّثَنَا اَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيٰى الْحَسَّانِىُّ الْبَصْرِىُّ ثنا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ثنا اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَيْسَ لِىْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ اَفَاُعْطِى قَالَ نَعَمْ لاَ تُوْكِىْ فَيُوْكَى عَلَيْكِ يَقُوْلُ لاَ تُحْصِى فَيُحْصَى عَلَيْكِ ،

وَفِىْ الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ عَنْ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ وَرَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا عَنْ اَيُّوْبَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

৬৮. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবনে ইয়াহইয়া হাসসানী বসরী রহ....... আসমা বিনতে আবূ বকর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী যুবাইর আমার নিকট যা দেন, তা ছাড়া আমার কিছু নেই। আমি কি তা দান করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি থলের ফিতা বেঁধে রাখবে না? কারণ, তা করলে (আল্লাহর পক্ষ থেকেও রিযিকের থলে) তোমার জন্য বেঁধে রাখা হবে।

জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলেছেন, গণে গণে আল্লাহর পথে ব্যয় কর না, তবে আল্লাহও তোমাকে গণে গণে দিবেন। এ বিষয়ে আয়েশা ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

কতক রাবী এ হাদীসটিকে উক্ত সনদে ইবনে আবী মুলায়কা........ আববাদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে যুবায়র, আসমা বিনতে আবী বকর রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একাধিক রাবী এটিকে আইয়ূব রহ.-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তারা এতে আববাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র রহ.-এর উল্লেখ করেন নি।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثنا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ السَّخِىُّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهٗ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَدْ خُوْلِفَ سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِىْ رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ اِنَّمَا يُرْوٰى عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ شَىْءٌ مُرْسَلٌ

৬৯. হাসান ইবনে আরাফা রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষেরও নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। আর কৃপন ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের

কাছে। দানশীল মূর্খ ব্যক্তিও আল্লাহর নিকট নফল ইবাদতকারী অপেক্ষা প্রিয়। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি গরীব। সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদের উদ্ধৃতি ছাড়া ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ– আ'রাজ – আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. থেকে এ হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে সাঈদ ইবনে মুহাম্মদের ব্যাপারে এর খেলাফ রয়েছে, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ – আয়েশা রাযি. সূত্রে এ বিষয়ে কিছু মুরসালরূপে বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

السخاء ঃ শব্দটি (س) سَخِيَ ـ (ك) سَخُوَ ـ (ن، س) سخا এর মাসদার। অর্থ– দানশীলতা, বদান্যতা। ইমাম গাযালী রহ. বলেন, আল্লাহর পথে দানকারী মুসলমানগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

এক. যারা তাদের সব কিছু অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়। যেমন, হযরত আবু বকর রাযি.।

দুই. যারা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে না ঠিক, কিন্তু তাঁরা নিজেদের জন্যও দরকারের অতিরিক্ত খরচ করেন না। নিজেদের প্রয়োজন সেরে তারা সব সময় দুস্থ মানবতার সেবায় তৎপর থাকে।

তিন. সর্বনিম্ন শ্রেণী। অর্থাৎ যারা কেবল যাকাতের নির্ধারিত অংশ দান করাকেই যথেষ্ট মনে করে। তবে অতিরিক্ত দান না করলেও যাকাতের পরিমিত অংশ দান করতে মোটেও অবহেলা করেন না। (আল-আরবাঈন)

দানকারীদের কর্তব্য

দান-সদকা করার সময় পাঁচটি বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য।

(১) গোপনভাবে দান করবে, যেন কেউ জানতে না পারে। কেননা প্রকাশ্যভাবে দান করলে মনের মধ্যে 'রিয়া' বা লোকদেখানো ভাব জাগ্রত হতে পারে। অবশ্য অন্যকে দানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করার উদ্দেশ্য হলে প্রকাশ্যে দান করা যাবে।

(২) কাউকে কিছু দান করলে মনে করবেন না যে, আপনি তার বড় উপকার করে ফেলেছেন।

(৩) তোমার ধন-দৌলতের মধ্যে যেটি সর্বোত্তম এবং তোমার নিকট অধিক প্রিয় সেটি দান করতে সচেষ্ট হবে। কেননা যা তোমার নিকট অপছন্দনীয়, সেটা আল্লাহর দরবারে পেশ করা বেমানান নয় কি ?

(৪) কোন কিছু দান করার সময় আনন্দচিত্তে, খুশিমনে ও হাসিমুখে দান করবে।

(৫) দান করার উপযুক্ত স্থান ও পাত্রের খোঁজ করাও বিশেষ কর্তব্য। যেমন, কোন দীনদার পরহেযগারকে দান করার চেষ্টা করবে।

ليس لى الا ما ادخل على زبير ঃ এখানে ما ادخل দ্বারা ঐসব ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য, যা হযরত যুবাইর রাযি. নিজের স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ বাবত দিয়েছিলেন। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য, স্বামীর ধন-সম্পদ। সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, স্ত্রীর জন্য যদি স্বামীর পক্ষ থেকে সরাসরি অথবা ইংগিতে কিংবা প্রচলন হিসাবে স্বামীর ধন-সম্পদ খরচ করার অনুমতি থাকে তাহলে সে খরচ করতে পারবে।

نعم ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমা রাযি. কে অনুমতি দিয়ে একথা বলেছেন অর্থাৎ সে তার স্বামী যুবাইর রাযি. এর ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে পারবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন, এতে যুবাইর রাযি. তাঁর স্ত্রীকে বাঁধা দিবেন না। (আল-কাওকাব)

الجاهل السخى ঃ এখানে جاهل سخى ব্যবহৃত হয়েছে عابد এর বিপরীতে। উদ্দেশ্য হল, ঐ দানশীল ব্যক্তি, যে ফরযসমূহ আদায় করে ঠিক, কিন্তু নফলের পাবন্দি করে না। অনুরূপভাবে عابد بخيل দ্বারা উদ্দেশ্য, এমন কৃপন ব্যক্তি, যে নফলসমূহ খুব আদায় করে, চাই সে আলেম হোক বা না হোক। (তুহফাহ)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْبُخْلِ ص١٧

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১. কৃপনতা প্রসংগে

حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثنا اَبُوْ دَاؤُدَ ثنا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى ثنا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَالِبِ الْحُدَّانِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِىْ مُؤْمِنٍ اَلْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ صَدَقَةَ بْنِ مُوْسٰى

৭০. আবূ হাফস আমর ইবনে আলী রহ...... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনের মাঝে দুটি স্বভাব একত্রিত হতে পারে না। কৃপনতা ও অসৎচরিত্র।

এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। সাদাকা ইবনে মূসা রহ.-এর সূত্র ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُنِيْعٍ ثنا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثنا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

৭১. আহমদ ইবনে মানী' রহ....... আবূ বকর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতারণাকারী, কৃপণ এবং দান করে খোঁটা প্রদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

৭২. মুহাম্মদ ইবনে রাফি' রহ....... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন হল সরল ভদ্র আর কাফির হল, ধূর্ত প্রতারক ও নীচ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

خصلتان لايجتمعان ঃ অর্থাৎ একজন পরিপূর্ণ মুমিনের জন্য উচিত নয় যে, এ বদস্বভাব দুটি একই সঙ্গে তার মধ্যে থাকবে। কারণ, ঈমানের দাবী হল, একজন মুমিন থেকে আল্লাহর সৃষ্টিজীব উপকৃত হবে। কিন্তু যার মধ্যে এ দুটি বদস্বভাব থাকবে, তার থেকে আল্লাহর বান্দারা উপকৃত হতে পারে না। তার সম্পদ থেকে উপকৃত হতে পারে না কৃপনতার কারণে। আর তার ব্যক্তিত্ব থেকে উপকৃত হতে পারে না বদস্বভাবের কারণে। অথবা এর মর্মার্থ হল, পরিপূর্ণ ঈমানদারের মধ্যে এ দুটি বদস্বভাব জায়গা করে নিতে পারে না। সাময়িকের জন্য জায়গা করে নিলেও পরক্ষণেই ঈমানদারের ঈমানী চেতনা জেগে উঠে এবং লজ্জিত হয়ে তাওবা করে নেয়।

لا يدخل الجنة خب ঃ অর্থাৎ এ তিন শ্রেণীর লোক নিজেদের অপরাধের শাস্তি ভোগ করা ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

বুখ্‌ল কাকে বলে ?

বুখ্‌ল অর্থ কৃপণতা। অর্থাৎ শরী'আতের আলোকে কিংবা মানবিক কারণে যেখানে ব্যয় করা জরুরি, এরূপ স্থানে ব্যয় করতে হাত সঙ্কোচনের নামই কৃপণতা। প্রথম স্থানে ব্যয় না করা গুনাহ আর শেষোক্ত স্থানে গুনাহ নয়, তবে অনুত্তম। এ কৃপণতা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্বভাব। ফলশ্রুতিতে অনেক ফরয-ওয়াজিব পর্যন্ত আদায় হয় না। যেমন, যাকাত দেওয়া, কুরবানি করা, অভাবীকে সাহায্য করা, গরীব আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা ইত্যাদি। এগুলো হল, ধর্মীয় ক্ষতি। তাছাড়া কৃপণকে সকলেই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এটা হল, পার্থিব ক্ষতি।

প্রতিকার

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, বুখ্‌ল (কৃপনতা) রোগের দু'টি চিকিৎসা আছে।

প্রথমতঃ বাতেনী বা আত্মিক চিকিৎসা।

দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক চিকিৎসা। আত্মিক চিকিৎসা হল, কৃপনতার অপকারিতাগুলো জেনে সেগুলো সবসময় হৃদয়-মানসপটে অংকিত রাখবে। নিজের চিন্তা ছেড়ে ওয়ারিসগণের জন্য তোমার এত বেশি চিন্তা করার কোনও দরকার নেই। যদি তারা নেককার হয়, তাহলে আল্লাহই তাদেরকে পদে পদে সাহায্য করবেন। আর বদকার হলে তোমার সঞ্চিত ধন তারা কুপথে ব্যয় করে তোমাকে গুনাহগার বানাবে। সুতরাং উভয় দৃষ্টিকোণে তাদের জন্য সঞ্চয় করে রাখা নিস্ফল। আর বাহ্যিক চিকিৎসা হল, তোমার মনের বিরুদ্ধে জোর করে ব্যয় করার অভ্যাস করবে। এভাবে তোমার নফসকে পদদলিত করতে পারলে 'ইনশাআল্লাহ' বুখ্‌ল (কৃপনতা) রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ ص١٨

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২. পরিবার-পরিজনের জন্য অর্থ ব্যয়

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى اَهْلِهِ صَدَقَةٌ، وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৭৩. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... আবূ মাসউদ আনসারী রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আপন পরিজনদের জন্য ব্যয় করাও সদকা।এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরী ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الدِّيْنَارِ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى دَابَّتِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ قِلَابَةَ بَدَاَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ وَاَىُّ رَجُلٍ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلٰى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٌ يُعِفُّهُمُ اللّٰهُ بِهِ وَيُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ بِهِ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৭৪. কুতায়বা রহ....... ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) হল, যা একজন লোক তার পরিজনদের জন্য ব্যয় করে, যে দীনারটি একজন লোক আল্লাহর পথে তার বাহনের জন্য ব্যয় করে এবং যে দীনারটি সে আল্লাহর পথে তার সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করে।

আবূ কিলাবা রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে তাঁর পবিত্র বক্তব্য শুরু করেছেন পরিবার-পরিজনদের কথা উল্লেখ করে। এরপর তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির তুলনায় বিরাট ছওয়াবের অধিকারী আর কে হতে পারে যে ব্যক্তি তার ছোট ছোট পরিবারের সদস্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হারাম থেকে পবিত্র রাখেন এবং অমুখাপেক্ষী করে দেন। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কারও সংশয় হতে পারে, নিজের পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহন করা যেহেতু নিজের কর্তব্যভুক্ত, তাই এ ক্ষেত্রে সাওয়াব আবার কিসের? এ সংশয় নিরসনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে সদকা সাব্যস্থ করেছেন। বলা হয়েছে, তাদের জন্য খরচ করলে বিরাট সাওয়াবের অধিকারী হবে। মুহাল্লাব রহ. বলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করা ওয়াজিব। এটাকে সদকা এজন্য বলা হয়েছে। মানুষ এটাকে বাধ্যতামূলক জরিমানা বা স্বাভাবিক তাগাদা মনে করে।

স্ত্রীর জন্য স্বামীর করণীয় তথা স্ত্রীর অধিকারসমূহ

- হালাল মাল দ্বারা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব। স্ত্রীর হাত খরচার জন্যও পৃথকভাবে কিছু দেওয়া উচিত। যাতে সে তার একান্ত প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, যা সব সময় ব্যক্ত করা অশোভনীয়।
- স্বামীর স্বচ্ছলতা থাকলে স্ত্রীর জন্য চাকর-নওকরের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। অবশ্য স্বচ্ছলতা না থাকলে স্ত্রীকেই তখন ঘরকন্নার কাজ সামাল দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী অসুস্থতার কারণে বা ধনী ঘরের কন্যা হওয়ার কারণে নিজে করতে সক্ষম না হয়, তাহলে স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর খাবারে ব্যবস্থা করা।
- স্ত্রীর বসবাসের জন্য পথক ঘর বা কমপক্ষে পৃথক রুম পাওয়া স্ত্রীর অধিকার, যেখানে সে তার মাল-আসবাব হেফাজত করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে একান্তে স্বামীর মনোরঞ্জন করতে পারে। উল্লেখ্য, শশুর-শাশুড়ির খেদমত করা স্ত্রীর উপর আইনগত ওয়াজিব নয়। তবে নৈতিক দাবি বিধায় করলে সাওয়াব আছে বরং এ খেদমতের দায়িত্ব তার স্বামীর। স্বামী তার মাতা-পিতার খেদমত নিজে করতে না পারলে লোক দ্বারা করাবে।
- স্ত্রীর সঙ্গে সদাচারণ করা অযথা মনোকষ্ট না দেওয়া। পুরুষ তার কর্তৃত্বসূলভ ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনভাবেই স্ত্রীর সাথে অসৌজন্য আচরণ করতে পারবে না। এটা স্ত্রীর অধিকার।
- স্ত্রীর চরিত্রের ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ বা কুধারণা না রাখা। আবার একেবারে অসতর্ক থাকাও উচিত নয়।
- হায়েয-নেফাস প্রভৃতির বিধান ও দ্বীনী মাসায়েল নিজে শিখে স্ত্রীকে তা শেখানো। নামায-রোযাসহ দ্বীনের জরুরি বিষয়ের উপর আমল করার জন্য স্ত্রীকে তাগিদ দেওয়া। শরী'আত পরিপন্থী বিষয়াদি থেকে স্ত্রীকে বিরত রাখা।
- প্রয়োজন অনুপাতে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা। প্রতি চার মাসে কমপক্ষে একবার স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম করা ওয়াজিব।
- স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার সাথে আযল (যৌন সঙ্গম চলাকালে যোনির বাইরে বীর্যপাত) না করা।
- স্ত্রীর মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রমুখ রক্ত সম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে তাকে দেখা করতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া। তবে যাতায়াতের ভাড়া দেওয়া স্বামীর আইনগত কর্তব্য নয়, দিলে সাওয়াব হবে। মাতা-পিতার সাথে চাইলে সপ্তাহে একবার। অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়ের সঙ্গে বছরে একবার সাক্ষাত করতে দিবে।
- স্ত্রীর সাথে কৃত যৌনসঙ্গম প্রভৃতি গোপন বিষয় অন্যত্র প্রকাশ না করা। এটাও স্ত্রীর অধিকারভুক্ত।
- পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে যে ক্ষেত্রে কিছুটা প্রহার করার অনুমতি স্বামীকে দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রেও স্বামী সীমালংঘন করতে পারবে না।

- ✪ বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক না দেওয়া। স্ত্রীর ব্যভিচার, মিথ্যা মতবাদে বিশ্বাস, ফাসেকি প্রভৃতি কারণে তালাক দেওয়া হলে স্বামীর জন্য অন্যায় হবে না।
- ✪ স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য অন্ততঃ কিছুক্ষণ তাকে সময় দেওয়া, তার সাথে হাস্য-রস ও আনন্দ-ফুর্তি করা।
- ✪ রাতে স্ত্রীর নিকট শয়ন করাও স্ত্রীর অধিকার।
- ✪ স্ত্রীর মান-অভিমান করারও অধিকার রয়েছে।
- ✪ স্ত্রীর ভুল-ত্রুটি হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, যতক্ষণ সীমালংঘন পর্যন্ত না হয়।
- ✪ মহর স্ত্রীর অধিকার। স্বামীর উপর মহর প্রদান করা ফরয। স্বামী মহর প্রদান ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর মহর আদায় করা হবে।
- ✪ একাধিক স্ত্রী থাকলে ভরণ-পোষণ, রাতযাপন ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব।

(আহসানুল ফাতাওয়া, তুহফাহ)

পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে কেন ?

ইসলাম নারীকে পুরুষের মতই স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী বলে বিবেচনা করে। তাই প্রত্যেকের দায়দায়িত্ব তার নিজের উপরই বর্তায়। যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ নিজেই নিজের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করবে। অবশ্য অপারগতার ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একজন নারী তার জীবনের গতিও আচরণের পরিসর যেহেতু সীমিত করতে বাধ্য হয়, তাছাড়া পরিবার প্রতিপালনের মত গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়, তাই তার পক্ষে উপার্জনী কোন কার্যক্রমে অংশ নেওয়া সম্ভব হয় না। প্রকৃতির স্বাভাবিক চাহিদাও হল, গৃহস্থলী কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয় নারীকে। পুরুষ সব সময় বহির্মুখী। কিন্তু নারীর সহজাত প্রবণতা হল, গৃহমুখী। সন্তানাদির প্রতিপালনেই তারা অপার আনন্দবোধ করে। তাই ইসলামেও মহিলাদেরকে একাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

আসলে মানুষের জীবনে দুইটি দিকই রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র গৃহমুখী হয়ে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বাইরে তাকে বেরুতেই হবে। জীবিকা উপার্জন ও সামষ্টিক মানবীয় প্রয়োজনে মানুষের ঘরের বাইরে যেতেই হবে। আবার তাকে ঘরেও ফিরতে হবে। পরিশ্রমের পরে ক্লান্তি দূর করার জন্য তার প্রয়োজন নিবিড় ও কোলাহলহীন পরিবেশ। এটিই তো তার পারিবারিক জীবন। পানাহার ও বিশ্রামের জন্য তাকে আশ্রয় নিতে হবে গৃহভ্যন্তরে। তাই এদিকটির ব্যবস্থাপনাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানব জীবনের এ দুটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য দিক ব্যবস্থাপনার জন্য নারী-পুরুষকে দায়িত্ব নিতে হবে। স্বাভাবিকতার দাবী একেকজনকে নিতে হবে এক একটি দিকের দায়িত্ব। আর পুরুষকে নিতে হবে বাইরের জগতের। নতুবা এর বিপরীত করতে হবে। পুরুষ নেবে ঘরের দায়িত্ব আর নারী নেবে বাইরের দায়িত্ব। প্রকৃতিগত কারণে নারীর পক্ষে কঠিন ও প্রতিযোগিতামূলক দিকের দায়িত্ব ও ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। সৃষ্টিগতভাবে তার কমনীয় ও নমনীয় কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হল, অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ আবেগমথিত কার্যক্রম। সে জন্যই তাকে গৃহস্থলী কাজে বেশি উপযুক্ত দেখা যায়। অপরপক্ষে প্রকৃতির রুঢ়তা ও কঠোরতার মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন পুরুষের সুঠাম অবয়বের। ক্ষমতার দুর্বলতার কাছে পরাজিত না হওয়ার মত প্রকৃতি বিশিষ্ট পুরুষ জাতিই নিতে পারে বাইরের জগতের ব্যবস্থাপনার দায়ভার। তাই জীবিকা উপার্জন ও সামাজিক জীবনের কার্যাবলী সম্পাদনের ভার অর্পিত হতে পারে পুরুষের ওপর।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الضِّيَافَةِ وَغَايَةِ الضِّيَافَةِ كَمْ هُوَ؟ صـ١٨

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩. যিয়াফত এবং যিয়াফতের শেষ সীমা কয় দিন ?

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ اَنَّهُ قَالَ اَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ قَالَ مَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৭৫. কুতায়বা রহ....... আবূ শুরায়হ আদবী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ কথা বলেছিলেন, তখন আমার দু'চোখ তাঁকে দর্শন করেছে এবং আমার দুই কান তাঁকে কথা বলতে শুনেছে। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে; তাকে "জাইযা" দেয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, জাইযা কি? তিনি বললেন, এক দিন ও এক রাত্রের সম্বল সঙ্গে দিয়ে দেওয়া। তিনি আরও বলেন, মেহমানদারীর সীমা হল তিন দিন তিন রাত্র। এর অতিরিক্ত যা হবে, তা হল সদকাস্বরূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيٰنُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَا اُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ لَا يَثْوِى عِنْدَهُ يَعْنِى الضَّيْفَ لَا يُقِيْمُ عِنْدَهُ حَتّٰى يَشْتَدَّ عَلٰى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَالْحَرَجُ هُوَ الضِّيْقُ اِنَّمَا قَوْلُهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ يَقُوْلُ حَتّٰى يُضَيِّقَ عَلَيْهِ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَاَبُوْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ هُوَ الْكَعْبِيُّ وَهُوَ الْعَدَوِيُّ وَاِسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو

৭৬. ইবনে আবী উমর রহ...... আবূ শুরায়হ আল-কা'বী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মেহমানদারী হল, তিন দিন। জাইযা হল, একদিন এক রাতের সম্বল প্রদান। মেহমানের জন্য এরপর যা ব্যয় করবে তা হল সদকা। এতদিন কারও কাছে অবস্থান করা যে শেষ পর্যন্ত সে বিরক্ত হয়ে উঠে –মেহমানের জন্য তা জায়েয নয়। لا يثوى عنده কথাটির মর্ম হল, মেহমান এত দিন কারও কাছে অবস্থান করবে না যে, বাড়িওয়ালার জন্য তার অবস্থান কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। الحرج হল, সংকোচ ও সংকট সৃষ্টি হওয়া। حتى يحرجه অর্থ হল, এমনকি শেষ পর্যন্ত বাড়িওয়ালার জন্য সে সংকট সৃষ্টি করে তুলল।

এ বিষয়ে আয়েশা ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি মালিক ইবনে আনাস এবং লায়ছ ইবনে সা'দ রহ.ও সাঈদ আল মাকবুরী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবূ শুরায়হ খুযা'ঈ রহ. হলেন, কা'বী। তিনি আদাবী ও তাঁর নাম হল খুওয়াইলিদ ইবনে আমর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عن ابى عن شريح العدوى : আবু শুরাইহ তাঁর কুনিয়াত। নাম খুয়াইলিদ ইবনে আমর কাবী আদাভী খুযাযী' রাযি.। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর কাছে ছিল খুযায়ী' গোত্রের

ঝাণ্ডা। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। তাঁকে আহলে হিজাযের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি কুনিয়তেই প্রসিদ্ধ। হিজরী ৬৮ সালে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর নিকট হতে বহুসংখক রাবী হাদীস বর্ণনা করেন।
(আসমাউর রিজালঃ ৬৩)

من كان يؤمن بالله ঃ এখানে مبالغة বা আতিশয্য বুঝানো উদ্দেশ্য; হাকীকত উদ্দেশ্য নয়। যেমন, বলা হয় ان كنت ابني اطعني বলা বাহুল্য, এখানে পিতার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান উদ্দেশ্য; পিতৃত্ব ছিন্ন করা নয়।

فليكرم ضيفه جائزته ঃ ضيفه শব্দটি مفعول হিসাবে মানসূব। আর جائزته শব্দটি যবর হবে بدل الاشتمال হিসাবে। جائزة এর অর্থ হল, দান, পুরস্কার, পারিতোষিক, বৃত্তি। এর বহুবচন جوائز جائزات। মেহমানের جائزه হল, প্রথমদিনের আড়ম্বরতাপূর্ণ খাদ্য-পানীয়। আর কেউ কেউ বলেছেন, মেজবান মেহমানকে বিদায়কালে একদিন একরাতের যে খাবার দিয়ে দেয় সেটাকে বলে جائزه।

وماجائزته ঃ এখানে جائزة তথা দান সংক্রান্ত প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য নয় বরং جائزه এর মেয়াদ নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য। এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরে মাঝে অমিল থাকবে না। (আল কাওকাব)

الضيافة ثلاثةايام ঃ মেহমানকে তিন দিন এভাবে মেহমানদারি করবে যে, প্রথম দিন মেহমানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন লৌকিকতা ব্যতীত যা সম্ভব তাই মেহমানদারি করবে। অতএব মেযবান মেহমানকে প্রথমদিন যে আড়ম্বরতাপূর্ণ খানা নিজের স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বাড়তি খাওয়ায়, সেটাকে جائزه বলে। এটা তিনদিনের বেশী নয়। কেউ কেউ বলেন, جائزه দ্বারা উদ্দেশ্য– মেযবান মেহমানকে বিদায়কালে একদিনের খাদ্য হিসাবে যতটুকু দেয়, যদ্বারা সে এক মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। এতে বোঝা যায়, جائزه মেহমানদারির পরে হবে এবং এটি হবে মেহমানদারী থেকে অতিরিক্ত জিনিস।

মেহমানদারির বিধান

মেহমানদারি করা ওয়াজিব-না সুন্নাত –এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। লাইছ ইবনু সা'দ রহ. এর মতে মেহমানদারি করা ওয়াজিব। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, গ্রামে ওয়াজিব আর শহরে সুন্নাত। কেননা শহরে সব কিছু পাওয়া যায় বিধায় মেহমান নিজের প্রয়োজন বাজার থেকে পূরণ করতে পারে। জমহূরে ফুকাহা বলেন, মেহমানদারি সুন্নত।

ওয়াজিব-এর পক্ষে দলীলসমূহ

(১) আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস। এখানে فليكرم ضيفه বাক্যটিতে আমরের সীগাহ এসেছে। আর কায়েদা আছে, الامر للوجوب তথা আমর বা নির্দেশ হয় ওয়াজিব হিসেবে।

(২) উকবা ইবনু আমের রাযি.-এর হাদীস। যা মুসলিম শরীফে নিম্নরূপে এসেছে–

انه قال قلنا يارسول الله ! انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله ﷺ ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغي لهم (رواه مسلم)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মেহমানদারি ওয়াজিব।

(৩) আবু দাউদ শরীফে এসেছে– ليلة الضيف حق على كل مسلم এ হাদীস দ্বারাও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মেহমানদারি ওয়াজিব।

জমহূরের বক্তব্য

জমহূর বলেন, মেহমানদারির বিষয়টি উত্তম চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর আখলাক বিষয়ক বিধান সুন্নাত-মুসতাহাব হয়ে থাকে। অতএব এটাও সুন্নাত বলে গণ্য হবে।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

(১) এসব হাদীসে امر এর সীগা ইসতিহবাবের জন্য বা মুস্তাহাব হিসেবে এসেছে।

(২) এসব হাদীস حالت اضطرار অপারগ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্নাত হিসাবে ধরা হবে।

(৩) ইসলামের শুরুর দিকে পারস্পরিক সহমর্মিতা ওয়াজিব ছিল। কেননা সে সময়ে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। হাদীসগুলো সে সময়ের, পরবর্তীতে এসে রহিত হয়ে গেছে।

(৪) واجب এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য। পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। যেমন, غسل الجمعة واجب على كل مسلم এ হাদীসে আভিধানিক ওয়াজিব উদ্দেশ্য।

(৫) ইমাম তিরমিযী রহ. ইংগিত করেছেন, এটা সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে প্রয়োজনের মুহূর্তে মুখাপেক্ষী হয়ে খাদ্য খরিদ করতে চায় আর খাদ্যের মালিক বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তার উপর চাপ সৃষ্টি করে সে খাবার নিতে পারে।

(৬) এ বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়োজিত সদকা ওসুলকারী ও কর্মচারীদের জন্য ছিল। কারণ তারা তাদের কাজ করতঃ বিধায় এদের ব্যয়ভারও তাদের দায়িত্বে। হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. এর হাদীসে قوله انك تبعثنا এরই প্রতি ইংগিতবহ।

(৭) আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেন, এ বিধান জিম্মিদের সঙ্গে খাছ। হযরত উমর রাযি. যখন শামের খ্রিস্টানদের উপর জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন, তখন তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, যখন কেউ তাদের কাছে মেহমান হবে তখন তাদের মেহমানদারি করতে হবে। হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জিম্মির উপর এরূপ শর্তারোপ করেছিলেন। সুতরাং বিধানটি তাদের জন্য খাছ।

মেযবানের করণীয় বিশেষ আ'মলসমূহ

- মেহমানকে সাদর অভ্যর্থনাও সম্মানের সাথে এবং সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে।
- প্রত্যেক মেহমানকে তার মর্যাদা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং সে হিসাবে তার খাতির করবে। সকলকে এক পাল্লায় মাপা ঠিক নয়। খাওয়ার সময় হলে যথাশীঘ্র মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করবে।
- মেযবান মেহমানের সঙ্গে এমন কাউকে একত্রে বসাবে না, যার মন-মানসিকতাও রুচি ভিন্ন হওয়ার কারণে মেহমানের খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- মেযবান অতিরিক্ত খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়া করবে না।
- সম্ভব হলে মেহমানের রুচি অনুযায়ী খাদ্য প্রস্তুত করবে।
- সাধ্য এবং প্রচলন অনুযায়ী মেহমানের জন্য কমপক্ষে একদিন উন্নত খাবারের আয়োজন করা সুন্নত।
- সম্ভব হলে বিদায়ের সময় মেহমানকে কিছু হাদিয়া প্রদান করবে।
- বিদায়ের সময় মেহমানকে ঘর থেকে দরজা পর্যন্ত পৌছানো সুন্নাত। (তা'লীমুদ্দীন, ইসলামী তাহযীব)

মেহমানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ

- কেউ নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াত দিলে তা কবূল করবে (এটা সুন্নাত) তবে দাওয়াত দাতার সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ সম্পদ হারাম উপায়ে অর্জিত হলে তার দাওয়াত কবূল করা উচিত নয়।

- সুন্নাতের অনুসরণ ও মুসলমানদের মন খুশি করার নিয়তে দাওয়াত কবুল করতে হবে।
- একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি দাওয়াত দিলে যার ঘর অধিক নিকটে তার দাওয়াত কবূল করা সুন্নত।

(গুলজারে সুন্নাত)

- দাওয়াত বা পূর্ব এত্তেলা (Information) ছাড়াই খাওয়ার সময় কারও নিকট মেহমান হিসাবে উপস্থিত হওয়া উচিৎ নয়। একান্তই এরূপ সময় যেতে হলে বাইরে থেকে খেয়ে যাবে, যাতে অসময়ে মেযবানকে খানা পাকানোর-খানার ব্যবস্থা করার বিড়ম্বনা পোহাতে না হয় কিংবা তাদের খাবার মেহমানকে দিয়ে তাদেরকে অভুক্ত থাকতে না হয়। আর বাইরে থেকে খেয়ে গেলে যেয়েই মেযবানকে তা অবহিত করা আদব, অন্যথায় মেহমানের খানা প্রয়োজন ভেবে মেযবান খাবারের ব্যবস্থা করবে। তারপরে দেখা যাবে মেহমানের প্রয়োজন নেই। এতে করে খাবার নষ্ট হবে কিংবা অন্ততঃ মেযবান বিব্রত বোধ করবেই। তবে বিশেষ কারও ব্যাপারে যদি জানা থাকে যে, পূর্ব অবগতি ছাড়া মেহমান হলেও তিনি কোনরূপ বিব্রতবোধ করবেন না, তাহলে তার ব্যাপারটা ভিন্ন। (আদাবুল মু'আশারাত)
- দাওয়াত দেওয়া হয়নি– এমন কাউকে মেহমান সাথে আনবে না। আনলে মেযবানের অনুমতি গ্রহণ করবে। তবে মেযবানের কোনই আপত্তি থাকবে না– এমন বুঝতে পারলে অনুমতির প্রয়োজন নেই।
- মেহমান মেযবান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বসবে এবং থাকবে।
- মেহমান মেযবানের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত কাউকে ডেকে খানায় শরীক করবে না বা কাউকে খানা থেকে কিছু প্রদান কবে না।
- মেহমান খাওয়ার মজলিসে এমন কিছুর আবদার করবে না, যা যোগাড় করা মেযবানের জন্য কষ্টসাধ্য হবে।
- খাওয়ার ব্যাপারে মেহমানের কোন বাছ-বিচার থাকলে কিংবা বিশেষ কোন অভ্যাস বা রুটিন থাকলে পূর্বেই তা মেযবানকে অবহিত করা উচিত। দস্তরখানে এসে এরূপ কিছু উত্থাপন করে মেযবানকে বিব্রত করা উচিৎ নয়। (ইসলামী তাহজীব)
- কোন বিশেষ অসুবিধা না থাকলে মেযবান কর্তৃক উপস্থিত সব রকম খাবার থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে তাকে খুশি করা উচিত।
- মেহমান মেযবানের নিকট এত বেশী সময় বা এত বেশী দিন অবস্থান করবে না, যাতে মেযবানের কষ্ট; ক্ষতি বা বিরক্তি হতে পারে। এরূপ করা নিষিদ্ধ।
- কারও নিকট দাওয়াত খেলে খানা শেষে এ দু'আ পড়বে– اللهم اطعم من اطعمنى واسق من سقانى

(হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও এবং যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও।

- বিদায় গ্রহণের সময় মেযবান থেকে অনুমতি নিয়ে বিদায় নেওয়া আদব।
- মেযবানের ঘর থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মেহমান পড়বে–

اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفرلهم وارحمهم (مسلم)

হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের উপর রহম কর।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّعْىِ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْيَتِيْمِ ص١٨

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪. ইয়াতীম ও স্বামীহীনাদের জন্য ভরণ-পোষণের প্রচেষ্টা করা

حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ ثنا مَعْنٌ ثنا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ كَالَّذِى يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ

৭৭. আনসারী রহ...... সাফওয়ান ইবনে সুলায়ম রাযি. মারফূরূপে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মিসকীন ও স্বামীহারা-বিধবাদের ভরণ-পোষণের জন্য যে ব্যক্তি উপার্জনের প্রচেষ্টা চালায়, সে হল আল্লাহর পথে মুজাহিদের মত বা ঐ ব্যক্তির মত পুণ্যের অধিকারী সে হবে যে ব্যক্তি দিন ভর সিয়াম পালন করে এবং রাত ভর আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে।

حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ ثنا مَعْنٌ ثنا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَاَبُو الْغَيْثِ اِسْمُهُ سَالِمٌ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطِيْعٍ وَثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ شَامِىٌّ وَثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَدَنِىٌّ

৭৮. আনসারী রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত রয়েছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। রাবী আবুল গায়ছ রহ. এর নাম হল সালিম। তিনি ছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মূতী রাযি. এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস। ছাওর ইবনে ইয়াযীদ হলেন, শামী আর ছাওর ইবনে যায়দ হল মাদানী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

الارملة ঃ হামযার উপর যবর, ر এর উপর জযম, م এর উপর যবর। যার স্বামী নেই, চাই পূর্বে তার বিয়ে হোক বা না হোক। কারও কারও মতে বিয়ের পর যে মহিলা স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাকে ارملة বলে। কামূসে আছে– إمرأة أرملة যে মহিলা মুখাপেক্ষী ও মিসকীন। বহুবচন ارامل، اراملة

كالساعى على الارملة ঃ চেষ্টা-প্রচেষ্টার একটা পদ্ধতি হতে পারে, নিজে পরিশ্রম করে উপার্জন করে বিধবা-এতিমদের জন্য ব্যয় করবে। অথবা অন্যান্য লোককে তাদের সেবায় আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা করবে। (মা'আরিফ)

এতিম-বিধবা ও দুস্থ মানুষের জন্য করণীয়

এতীম, মিসকীন, বিধবা, অন্ধ, পঙ্গু, আতুর, চিররোগা, ভিক্ষুক, মুসাফির প্রভৃতি দুঃস্থ ও আশ্রয়হীন মানুষেরও অনেক অধিকার রয়েছে এবং তাদের জন্যেও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন ঃ

(১) তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

(২) টাকা-পয়সা বা খাদ্য পোশাক দিয়ে তাদের সাহায্য করা। তবে এমনভাবে সাহায্য করা ঠিক নয়, যাতে ভিক্ষাবৃত্তি প্রশ্রয় পায়। কেননা ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলাম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এ জন্যেই যার নিকট এক দিনের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে, তারপক্ষে খোরাকীর জন্য হাত পাতা জায়েয নেই এবং জেনে শুনে এরূপ ব্যক্তিকে দান করাও নিষেধ। এমনিভাবে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়য়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও সওয়াল করা হারাম। (আহসানুল ফতওয়া)

এছাড়া যে ব্যক্তি উপার্জন করে খাওয়ার ক্ষমতা রাখে তার জন্যও হাত পাতা নিষেধ এবং এরূপ হাতপাতা ব্যক্তিকে দান করাও নিষেধ।

(৩) তারা কাজ করতে অক্ষম হলে তাদের কাজ করে দেওয়া।
(৪) কথা দ্বারা তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং তাদের সাথে ভাল কথা বলা।
(৫) যথাসাধ্য তাদের আকাংখা ও আবদার রক্ষা করা।
(৬) তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, নম্র ব্যবহার করা এবং রূঢ় ব্যবহার না করা।
বিঃ দ্রঃ সরকারেরও দায়িত্ব দুঃস্থ মানুষের ভরণ-পোষণ এবং যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করা।

بَابُ مَاجَاءَفِى طَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْبِشْرِ صـ١٨

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫. উজ্জ্বল ও হাসি মুখ থাকা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ وَاِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِى اِنَاءِ اَخِيْكَ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ هٰذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৭৯. কুতায়বা রহ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটি নেক কাজই সদকা। তোমার কোন (দীনী) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে মিলিত হওয়া এবং তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেওয়াও নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

এ প্রসঙ্গে আবূ যার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ্

ان تلق اخاك بوجه طلق ঃ এর দ্বারা বুঝা যায়, কোন মুসলমানের সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল মুখে কথা বলা মুস্তাহাব। এতেও সাওয়াব রয়েছে।

باب ماجاء فى الصدق والكذب صـ١٨

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬. সত্যবাদিতা ও মিথ্যাচার প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ثنا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ، وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَمَايَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ وَعُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ وَابْنِ عُمَرَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৮০. হান্নাদ রহ...... ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সত্যকে অবলম্বন করবে। কেননা সত্য সৎকর্মের দিকে ধাবিত করে আর সৎকর্ম ধাবিত

করে জান্নাতের দিকে। কোন ব্যক্তি যদি সদা সত্য কথা বলতে থাকে এবং সত্যের প্রতিই সদা মনোযোগ রাখতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেও সিদ্দীক হিসাবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়। তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা মিথ্যা অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়। আর অন্যায় নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে। কোন বান্দা যখন মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার প্রতিই তার খেয়াল থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেও কায্যাব (চরম মিথ্যাবাদী) বলে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়।

এ বিষয়ে আবূ বকর সিদ্দীক, উমর, আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর এবং ইবনে উমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوسٰى قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ هَارُوْنَ الْغَسَّانِيِّ حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْنِ مَاجَاءَ بِهِ قَالَ يَحْيٰى فَاقَرَّبِهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُوْنَ وَقَالَ نَعَمْ ،

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُوْنَ

৮১. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ...... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন তার এ কর্মের দুর্গন্ধের কারণে (সঙ্গী রহমতের) ফিরিশতা তার থেকে দূরে সরে যায়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। কেবল রাবী আবদুর রহমান ইবনে হারূন এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عليكم بالصدق : মুখের ভাষা দিলের ভাষা অনুযায়ী হওয়া এবং বাস্তবসম্মত হওয়াকে 'সততা' বা 'সত্যবাদিতা' বলে। ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেন, মু'আমালা, মু'আশারাসহ যাবতীয় ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা ও সততার উপর অবিচলে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও পক্ষ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে মিথ্যাকে করা হয়েছে হারাম। মিথ্যাচারিতার পরিণাম হল ধ্বংস ও ব্যর্থতা।

ইসলামী শরী'আতে 'সিদক' তথা সততা ও সত্যবাদিতা একটি ব্যাপক বিষয়। কথা, কাজ, অবস্থা-পরিস্থিতিসহ সর্বক্ষেত্রে এ সিদক প্রযোজ্য। صدق الاقوال অর্থাৎ কথাবার্তায় সত্যবাদিতা বলা হয়, নির্ভেজাল বাস্তবসম্মত কথা বলা। এ গুণটি যার মাঝে থাকবে, তাকে বলা হয় صادق الاقوال তথা কথাবার্তায় সত্যবাদী। আর صدق الافعال তথা কাজকর্মে সত্যবাদিতা হল, প্রত্যেক কাজ আল্লাহর বিধি-বিধানের আওতায় শরী'আত সম্মতভাবে পরিচালিত করা। এ গুণে গুণান্বিত লোককে বলা হয় صادق الافعال তথা কাজ-কর্মে সত্যবাদী। صدق الاحوال হল, সর্বাবস্থায় সুন্নাতের অনুসরণ করা। এ গুণটি থাকলে তাকে বলা হয় صادق الاحوال তথা সর্বাবস্থায় সত্যবাদী।

বলা বাহুল্য, আলোচ্য হাদীসে صدق দ্বারা উদ্দেশ্য হল صدق الاقوال তথা কথাবার্তায় সত্যবাদীতা।

حتى يكتب عند الله صديقا : এর কয়েকটি মর্মার্থ হতে পারে। যেমন,

(ক) এমন ব্যক্তিকে সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত করা হয় এবং সে প্রেক্ষিতে প্রতিদান দেওয়া হয়।

(খ) ফেরেশতাদের জামাতে 'সিদ্দীক' নামে তাকে পরিচিত করা হয়।

(গ) আমলনামায় তার নাম সিদ্দীক হিসেবে লেখা হয়।

(ঘ) দুনিয়ার মানুষ তাকে সত্যবাদী জানে এবং ফেরেশতাদের মাঝে সে ধীরে ধীরে এ নামে পরিচিতি লাভ করে। ফলে সকলেই তাকে সত্যবাদী ভাবে।

فان الصدق يهدى الى البر ঃ ب এর নিচে যের। মূল অর্থ হল, ভালো কাজে প্রশস্ততা ও উদারতা। এটি একটি ব্যাপক শব্দ। যত রকমের ভালো কাজ আছে যেমন, নেককাজ করা, মন্দকাজ বর্জন করা –এসবগুলোকেই শব্দটি শামিল করে। এটির প্রয়োগ সবসময় খালেছ আমলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কারও কারও মতে بر এর অর্থ হল, জান্নাত।

حتى يكتب عند الله كذابا ঃ অর্থাৎ (ক) যে মিথ্যা কথা বলে, তার ব্যাপারে 'মিথ্যুক' হিসেবে ফয়সালা করা হয় এবং এর ভিত্তিতে তাকে আযাব দেওয়া হয়।

(খ) উদ্দেশ্য হল, ফেরেশতাদের জামাতে 'মিথ্যুক' নামে তাকে পরিচিত করা হয়।

(গ) আমলনামায় তার নাম 'মিথ্যুক' হিসেবে লেখা হয়।

(ঘ) দুনিয়ার মানুষ তাকে 'মিথ্যুক' হিসাবে জানে এবং ফেরেশতাদের মধ্যেও সে ধীরে ধীরে এ নামে পরিচিতি লাভ করে। ফলে সকলেই তাকে মিথ্যাবাদী ভাবে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল, সত্য কথা বলা ওয়াজিব। তবে যদি সত্য কথা বললে কারও হক নষ্ট হয় অথবা অন্যায়ভাবে কারও খুন প্রবাহিত হয় তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

قلت لعبد الرحيم بن هارون ঃ আব্দুর রহীম। কুনিয়াত আবু হাশিম ওয়াসিতী। জীবনের শেষ দিকে বাগদাদে গিয়ে বসবাস করেন। রাবী হিসাবে দুর্বল। নবম শ্রেণীর রাবী। ইমাম দারাকুতনী তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।

تباعد الملك من نتن ماجاء ঃ যেমনিভাবে এ পার্থিবজগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ হয়ে থাকে। আমরা তা অনুভব না করলেও ফিরিশতা অনুভব করেন। কোন কোন ঐ সমস্ত নেককার বান্দাও তা অনুভব করেন। যাদের রূহানিয়্যাত বস্তুজগতকে ভেদ করতে সক্ষম। (মা'আরিফুল হাদীস)

ইমাম দারাকুতনী রহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য, আলোচ্য অনুচ্ছেদে আরেকটি হাদীস রয়েছে, যে হাদীসটি তিরমিযীর ভারতীয় কপিতে নেই। নিম্নে তা তুল ধরা হল–

حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ مَاكَانَ خُلُقٌ اَبْغَضَ إِلىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكِذْبِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِى نَفْسِهِ حَتّٰى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৮২. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা .... হযরত আয়েশা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট মিথ্যার চেয়ে অধিক ঘৃণিত স্বভাব অন্য কিছু ছিল না। কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে মিথ্যা বললে সর্বদা তার মনে থাকত, যতক্ষণ না তিনি অবগত হতেন যে, মিথ্যাবাদী মিথ্যা থেকে তাওবা করেছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْفُحْشِ ص ١٨

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭. অশ্লীলতা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاكَانَ الْفُحْشُ فِىْ شَيْئٍ اِلَّا شَانَهٗ وَمَاكَانَ الْحَيَاءُ فِىْ شَيْئٍ اِلَّا زَانَهٗ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ـ

৮৩. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা সানআনী প্রমুখ রহ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অশ্লীলতা কোন বস্তুর কেবল ক্লেদ বৃদ্ধিই করে আর লজ্জা কোন জিনিসের কেবল শ্রী বৃদ্ধি করে। এ বিষয়ে আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবদুর রায্যাক রহ.-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خِيَارُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَلَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَامُتَفَحِّشًا ، هذا حديث حسن صحيح

৮৪. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র অধিক সুন্দর, সেই তোমাদের মধ্যে উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্লীল ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ভানও করতেন না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ماكان الفحش فى شئ الا شانه ঃ এখানে فحش শব্দটির মূল অর্থ হল, কোন কথায় বা কাজে সীমালংঘন করা। কুৎসিত কথা বুঝানোর অর্থে এ শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়। অশ্লীলতা ও যৌনতার ইংগিতবহ কথা বুঝানোর ক্ষেত্রেও শব্দটি বহুল প্রচলিত। অনুরূপভাবে যে কোনও বড় অপরাধ বুঝাতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

কেউ কেউ বলেছেন, فحش দ্বারা উদ্দেশ্য কুৎসিত রূঢ় কথা। আল্লামা তীবী রহ. বলেন, فحش এর বিপরীত শব্দ হল, লজ্জা ও ভদ্রতা। সুতরাং শব্দটির অর্থ হল, অশ্লীলতা ও অভদ্রতা।

وماكان الحياء فى شئ الازانه ঃ আল্লামা তীবী রহ. বলেন, فى شئ দ্বারা مبالغه বা আতিশয্য বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে, অশ্লীলতা অথবা লাজুকতা কোন জড়পদার্থে রয়েছে, তবে সেটিকেও সুসজ্জিত করে ফেলত অথবা কুৎসিত করে ফেলত। সুতরাং মানুষের মধ্যে হলে তো অবশ্যই তা সুসজ্জিত কিংবা কুৎসিত করার কারণ হবে। (তুহফাহ ৬/৯৩)

بَابُ مَاجَاءَفِى اللَّعْنَةِ ص١٨
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮. অভিশাপ দেওয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ، وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৮৫. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ...... সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা পরস্পরে আল্লাহর লা'নত, তাঁর গযবের বা জাহান্নামের অভিশাপ দিবে না।

এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস, আবূ হুরাইরা, ইবনে উমর ও ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى الْاَزْدِىُّ الْبَصْرِىُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِىِّ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ

৮৬. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আযদী বাসরী রহ...... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি অপবাদ দেয় না, অভিসম্পাত করে না, অশ্লীলতা করে না এবং কটু বা রুঢ় ভাষী হয় না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবদুল্লাহ রাযি. থেকে এটি অন্যসূত্রেও বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ الطَّائِىُّ الْبَصْرِىُّ ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثنا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيْحَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَا تَلْعَنِ الرِّيْحَ فَاِنَّهَا مَامُوْرَةٌ وَاِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ، لَا نَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَهُ غَيْرَ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ

৮৭. যায়দ ইবেন আখযাম তাঈ বসরী রহ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি একবার এর সামনে বাতাসকে লা'নত করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বাতাসকে লা'নত দিবে না। কেননা এতো নির্দেশিত। কেউ যদি কোন বস্তুকে লা'নত দেয় আর সে বস্তু উক্ত লা'নতের পাত্র না হয়, তবে সেই লা'নত লা'নতকারীর দিকে ফিরে আসে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। বিশর ইবনে উমর রহ. ছাড়া আর কেউ এটিকে মুসনাদ রূপে রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমরা জানি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, লা'নত ও গালি-গালাজ থেকে বেঁচে থাকা। কোনও ব্যক্তিকে লা'নত দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। এমনকি অভিশপ্ত ব্যক্তিকেও নয়। তবে ঐ কাফিরকে অভিশাপ-লা'নত করা যাবে, যার অভিশপ্ততা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে প্রমাণিত। এ লা'নত তথা অভিশাপ দু'প্রকার।

(১) কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর রহমত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হিসাবে আখ্যায়িত করা এবং আল্লাহর অশেষ রহমত থেকে নিরাশ করা। এ ধরনের লা'নত শুধু কাফিরদের বেলায় প্রযোজ্য।

(২) কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য থেকে বঞ্চিত আখ্যায়িত করা। যেমন, কিছু কিছু নেক আমল না করলে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীসে লা'নত বিবৃত হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَعْلِيمِ النَّسَبِ ص١٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯. নসবনামা শিক্ষাদান

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِيسَى الثَّقَفِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَلَّمُوا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَاتَصِلُونَ بِهِ اَرْحَامَكُمْ فَاِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الْاَهْلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَاةٌ فِى الْاَثَرِ،

هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَمَعْنٰى قَوْلِهِ مَنْسَأَةٌ فِى الْاَثَرِ يَعْنِى بِهِ الزِّيَادَةُ فِى الْعُمُرِ

৮৮. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের নসবনামা শিক্ষা করবে, যাতে তোমরা তোমাদের আত্মীয়দের সম্পর্ক বজায় রাখতে পার। কেননা রেহেম সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা স্বজনদের পরস্পরে প্রেম-প্রীতির সৃষ্টি হয়, সম্পদে প্রাচুর্য আসে এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি এ সূত্রে গরীব। منساة فى الاثر –এর মর্ম হল, আয়ূ বৃদ্ধি হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

تعلموا من انسابكم ঃ অর্থাৎ তোমরা নিজ পিতা, প্রপিতা, মা, দাদী, নানী, তাদের সন্তান-সন্তুতি, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় রাখবে। তাদের নাম জেনে রাখবে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে জেনে রাখবে। যাতে তোমরা ঐ সকল আত্মীয়দের সাথে সদাচারণ করতে পার, যাদের ব্যাপারে তোমর উপর অধিকার আছে। (মাযাহিরে হক)

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচারী হওয়া এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলা, রিযিকের প্রশস্ততা এবং আয়ূ বৃদ্ধির কারণ। প্রশ্ন হয়, রিযিক ও হায়াত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মীমাংসিত বিষয়। এগুলোর মধ্যে বাড়ানো-কমানো যায় না। তাহলে হাদীসে উল্লেখিত রিযিকের প্রবৃদ্ধি এবং হায়াত বৃদ্ধির মর্মার্থ কি?

এর উত্তর হল, বাড়ানো ও কমানো বিষয়টি تقدير معلق এর সাথে সম্পৃক্ত বিধায় বাড়তে পারে; কমতেও পারে। এর ব্যাখ্যা হল, রিযিক ও হায়াত সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য আল্লাহ তা'আলা দায়িত্বশীল ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণ যখন রিযিক-হায়াত বৃদ্ধিকারী কোন আমল দেখেন তখন আল্লাহ তা'আলাকে অবহিত করেন। আর আল্লাহ তা'আলার ইলমে তো বিষয়টি পূর্ব থেকেই জানা আছে। তাই তিনি يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء "যা বাড়ানোর তা বাড়ান, আর যা কমানোর তা কমান।"

অতএব রিযিক ও হায়াত মীমাংসিত বিষয় –এ কথাটা যথাস্থানে সঠিক। কেননা আল্লাহর ইলমে তো তা অবশ্যই মীমাংসিত। আবার বাড়ানো হয় কমানো হয়– এটাও যথাস্থানে সঠিক। কেননা ফেরেশতাদের ইলম মোতাবেক তো তা বাড়ানো হয় এবং কমানো হয়।

কেউ কেউ এর উত্তর দিয়েছেন, হায়াত বাড়বে– এর অর্থ সংখ্যার দিক থেকে হায়াত বাড়বে এমন নয় বরং গুণগত মানের দিক থেকে হায়াত বাড়বে অর্থাৎ নির্ধারিত হায়াতে ঐ ব্যক্তি অধিক হায়াতের কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে। অনুরূপভাবে রিযিক বাড়বে এর অর্থ হল, নির্ধারিত রিযিকে বরকত লাভ হবে। (তাকমিলাহ ও উমদাতুল কারী)

بَابُ مَاجَاءَ فِى دَعْوَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ص١٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০. এক ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য আরেক ভাইয়ের দু'আ করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ثنا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادَةِ بْنِ أَنْعُمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَادَعْوَةٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ ، هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَالْأَفْرِيقِيُّ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيثِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْأَفْرِيقِيُّ

৮৯. আবদ ইবনে হুমাইদ রহ..... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একজনের অনুপস্থিতিতে তার জন্য অন্য জনের দু'আর মত এত শীঘ্র আর কোন দু'আ কবুল হয় না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইফরীকী হাদীসের ক্ষেত্রে যঈফ। তিনি হলেন, আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনআম আল ইফরীকী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بِظَهْرِ الْغَيْبِ ঃ ظهر শব্দটি অতিরিক্ত। তাকীদের জন্য আনা হয়েছে। অর্থাৎ, যার জন্য দু'আ করা হয় তার অনুপুস্থিতিতে। সে উপস্থিত থাকলেও মনে মনে দু'আ করা বা মুখে এমনভাবে দু'আ করা যে, সে শুনল না।

গায়েবানা দু'আ তথা অপরের অনুপস্থিতিতে দু'আ করলে তাড়াতাড়ি কবুল হয়। কারণ, এ ধরনের দু'আর মধ্যে ইখলাসের সম্ভাবনা বেশি থাকে। গায়েবানা দু'আর একটি পদ্ধতি এরূপ হতে পারে যে, যার জন্য দু'আ করা হচ্ছে ঐ ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে সে যেন না শুনে, এমনভাবে তার জন্য দু'আ করা।

ইমাম নববী রহ. বলেছেন, সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে দু'আ করলেও 'ইনশাআল্লাহ' এ ফযীলত পাওয়া যাবে। অনেক বুযুর্গের অভ্যাস ছিল, প্রথমে তাঁরা সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করতেন। তারপর নিজের জন্য করতেন।

– নববী

بَابُ مَاجَاءَ فِى الشَّتْمِ ص١٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১. গালিগালাজ করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِى مِنْهُمَا مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ، وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৯০. কুতায়বা রহ.... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন, পরস্পর গালি গালাজাকারী ব্যক্তিদ্বয় একে অন্যকে যা বলে, এ অপরাধ যে শুরু করে তাঁর উপর বর্তায়। যতক্ষণ না মজলুম ব্যক্তি (যাকে প্রথমে গালি দেওয়া হয়েছে) সীমালংঘন করে।

এ প্রসঙ্গে সা'দ, ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَتُؤْذُوْا الْاَحْيَاءَ

وَقَدْ اِخْتَلَفَ اَصْحَابُ سُفْيٰنَ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ فَرَوٰى بَعْضُهُمْ مِثْلَ رِوَايَةِ الْحَفَرِىِّ وَرَوٰى بَعْضُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عِنْدَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৯১. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ.... মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করবে না। কেননা এতে জীবিত ব্যক্তিদেরকে তুমি কষ্ট দিলে। সুফিয়ান রহ. এর শাগরিদগণের এ হাদীসটির রিওয়ায়াতে পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ তো হুফারী রহ. এর মত রিওয়াত করেছেন। আর তাদের কতক বলেছেন, সুফিয়ান.... যিয়াদ ইবনে ইলাকা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا وَكِيْعٌ ثنا سُفْيٰنُ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، قَالَ زُبَيْدٌ قُلْتُ لِاَبِىْ وَائِلٍ اَاَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৯২. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ.... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিমকে গালি-গালাজ করা, ফিস্‌ক ও নাফরমানীর কাজ। আর তাঁর সঙ্গে লড়াই করা, কুফরী কাজ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যা প্রকাশে মানুষ লজ্জাবোধ করে, তা পরিস্কার ভাষায় ব্যক্ত করাকে বলা হয়, গালি বা অশ্লীল কথা। আর যদি সেটা অবাস্তব হয় তাহলে মিথ্যা অপবাদেরও গুনাহ হবে।

গালিগালাজের বিধান

المستبان ما قالا ঃ ب এর উপর তাশদীদ অর্থাৎ যে দু'জন পরস্পরে গালি-গালাজ করে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল, একজন গালি দেয় অপরজন গালির জবাব দেয়। যদি দুই ব্যক্তি একে অপরকে গালিগালাজ করতে আরম্ভ করে এবং পরস্পর অশালীন কথা বলে, তাহলে তাদের প্রত্যেকের গালি ও অশালীন কথার গুণাহ সেই ব্যক্তির উপর বর্তাবে, যে এর সূচনা করেছে। অর্থাৎ সূচনাকারী নিজের গুণাহ তো পাবেই, অপর জনের গালি-গালাজেহর গুনাহও তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা এ মন্দ কাজের সূচনাকারী সে এবং সে এর মাধ্যমে অপরকেও এ মন্দকাজের প্রতি উস্কে দিয়েছে। যার মাধ্যমে সে তার প্রতি সর্বপ্রথম জুলুম করেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি যা করে, তা সাধারণতঃ প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে করে। তবে হ্যাঁ, দ্বিতীয় ব্যক্তিও যদি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে, ফলে তাহলে সীমালঙ্ঘনের গুনাহ তার আমলনামায় যোগ হবে। (তাকমিলাহ, মাযাহিরে হক, বযলুল মাজহূদ)

ইমাম নববী রহ. এর মতে অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া হারাম। যাকে গালি দেওয়া হয়, সে যদি চায় তাহলে তার প্রতিশোধ নিতে পারে। তবে শর্ত হল, সমান বদলা হতে হবে, মিথ্যাচার হতে পারবে না, অপবাদ

থাকতে পারবে না এবং পূর্ববর্তীদেরকে অথবা বংশের নাম ধরে গালিগালাজ করতে পারবে না। প্রতিশোধ গ্রহণকারীর জন্য বৈধ পদ্ধতি হল, যেমন এরূপ বলল, হে জালিম! হে আহমক! হে পাষাণ্ড! হে কটু কথা উচ্চারণকারী ইত্যাদি। তবে সর্বোপরি ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

ولمن صبر وغفر ذالك من عزم الأمور

'যে ধৈর্য্য ধারণ করবে এবং ক্ষমা করে দেবে, এটা তার দৃঢ়প্রত্যয়ের বিষয়।' (নববী)

কেউ কেউ বলেন, মজলুম যদি প্রতিশোধ নেয় তবে প্রথমে আরম্ভ করেছে তার গুনাহ সম্পূর্ণ উঠে যাবে। তখন على البارى এর অর্থ হবে, যে সূচনা করবে তার নিন্দা করা হবে। (তাকমিলাহ)

মৃতদেরকে গালি দেওয়া

لا تسبوا الاموات : মৃতদেরকে লা'নত করা, তিরস্কার করা, গালাগালি করা হারাম। যদিও তারা ফাসিক হোক না কেন। তবে কাফির হলে এবং কুফরির উপর তাদের মৃত্যু নিশ্চিত হলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। যেমন, আবু জাহ্ল, আবু লাহাব, ফেরাউন প্রমুখকে তিরস্কার বা লা'নত করা যাবে। (মিরকাত ১৪৫)

আল্লামা আইনী রহ.বলেছেন, এখানে الاموات শব্দের আলিফ-লাম عهدى তথা নির্দিষ্টবোধক। আর معهود হল, মুসলিম মাইয়্যিত। সুতরাং কাফিরদের দোষ বর্ণনা করা যাবে। আবু দাউদ ও তিরমিযীর একটি বর্ণনা দ্বারা এর সমর্থনও পাওয়া যায়। যেমন–

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم

তবে অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদেরকে তিরস্কার করতে নিষেধ করেছেন। ইবনু আবিদ্দুনইয়া সহীহ সনদে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল–বাকির থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন–

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسب قتلى بدر المشركين

সুতরাং এর সামঞ্জস্যবিধান কিভাবে হবে ? তুহফাতুল আহওয়াযীব গ্রন্থকার এই বিরোধ মীমাংসায় বলেন, কাফিরদের বদনাম করার সাথে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এর দ্বারা যদি তাদের কোন মুসলমান সন্তান কষ্ট পায়, তাহলে কাফিরদেরও বদনাম করা যাবে না। মূলকথা হল, কাফিরের দোষ বর্ণনা দ্বারা যদি দীনী ও দুনিয়াবী কোন ফায়দা উদ্দেশ্য না থাকে, তখন কাফিরের বদনাম করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

قتاله كفر : এখানে কুফর শব্দের অর্থ নেয়ামতের নাশোকরী।

الفسق : এর অর্থ হল, বেরিয়ে যাওয়া।

শরী'আতে এর অর্থ হল, আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া। এটি নাফরমানি থেকে আরও বেশী মারাত্মক। কুরআন মজীদে এসেছে – وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان

بَابُ مَاجَاءَ فِى قَوْلِ الْمَعْرُوْفِ صـ١٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২. ভাল কথা বলা।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا فَقَامَ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ

৯৩. আলী ইবনে হুজর রহ.... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার ভিতর থেকে বাইর এবং বাইর থেকে ভিতর পরিদৃষ্ট হবে। তখন জনৈক বেদুইন উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি কার হবে? তিনি বললেন, এটি হবে তার, যে ভাল কথা বলে, অন্যকে আহার করায়, সর্বদা রোযা রাখে এবং যখন রাতে সব মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন সে উঠে নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি গরীব। আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক রহ.-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কোনও কোনও আলেম বলেছেন, এ হাদীসের মধ্যে যে ادام الصيام এসেছে, এর সর্বনিম্ন স্তর হল, প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনটি নফল রোযা রাখা। (তুহফাহ)

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ ص١٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩. নেককার দাসের মর্যাদা

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعِمَّ لِاَحَدِهِمْ اَنْ يُطِيْعَ رَبَّهٗ وَيُؤَدِّيْ حَقَّ سَيِّدِهٖ يَعْنِي الْمَمْلُوْكَ وَقَالَ كَعْبٌ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى وَابْنِ عُمَرَ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৯৪. ইবনে আবূ উমর রহ.... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কতই না উত্তম সে ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তার মালিকেরও হক আদায় করে। কা'ব আল আহবার বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য কথা বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে আবূ মূসা ও ইবনে উমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ ثنا وَكِيْعٌ عن سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ اُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُنَادِيْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سُفْيٰنَ وَاَبُو الْيَقْظَانِ اِسْمُهٗ عُثْمَانُ بْنُ قَيْسٍ

৯৫. আবূ কুরাইব রহ.... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ধরনের ব্যক্তি এমন যারা কিয়ামতের দিন মিশকে আম্বরের টিলায় অবস্থান করবে। (১) এমন গোলাম যে আল্লাহর হকও আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে। (২) এমন ইমাম যার উপর তার মুসল্লীরা সন্তুষ্ট। (৩) এমন ব্যক্তি যে দিনে ও রাতে প্রত্যেহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দিকে আহ্বান করে।

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। সুফিয়ান রহ.-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। বর্ণনাকারী আবুল ইয়াকযান রহ.-এর নাম হল উসমান ইবনে কায়স।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قال كعب صدق الله ورسوله ঃ সম্ভবত কা'ব রাযি. পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে নেককার গোলাম সম্পর্কে

এ ধরনের কোন ফযীলতের বিষয় পড়ে থাকবেন। তাই তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসত্য বলেছেন। আল-কাওকাব

ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্তব্য পালনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। কারণ, একজনের কর্তব্যই অন্যজনের অধিকার। তাই প্রথম ব্যক্তি তার কর্তব্য আদায় করলে দ্বিতীয়জনের অধিকার আপনা আপনি আদায় হয়ে যাবে। মালিক তার কর্তব্য পালন করলে গোলামের অধিকার আদায় হয়ে যাবে। আর গোলাম নিজের কর্তব্য পালন করলে মালিকের অধিকার আদায় হয়ে যাবে। বড় কর্মকর্তা যদি তার কর্তব্য পালন করেন তাহলে অধীনস্থরা তাদের অধিকার পেয়ে যাবে। আর অধীনস্থরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করলে কর্মকর্তা তার অধিকার পেয়ে যাবে। মোটকথা, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মধুময় থাকার মূল রহস্যই হল, প্রত্যেক পক্ষ নিজের কর্তব্য উপলব্ধি করে তা যথাযথভাবে পালন শুরু করবে, তাহলে উভয় পক্ষের মধ্য থেকে কারও অধিকার হরণের অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে না। আলোচ্য হাদীসটি আমাদেরকে এ শিক্ষাই প্রদান করে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামযেমনিভাবে গোলামের অধিকারের কথা বলেছেন, অনুরূপভাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদে মালিকের অধিকার আদায়ের প্রতিও গোলামকে উৎসাহিত করেছেন। (মা'আরিফুল হাদীস, যিক্‌র ও ফিক্‌র)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ ص١٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪. মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৯৬. বুন্দার রহ..... আবূ যার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন, যেখানেই থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে, মন্দ কাজের অনুবর্তীতে কোন নেক কাজ করে ফেলবে তাতে মন্দ বিদূরীত হয়ে যাবে। মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে। এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا اَبُوْ اَحْمَدَ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ مَحْمُوْدٌ ثنا وَكِيْعٌ عن سُفْيَانَ عن حَبِيْبِ بن اَبِىْ ثَابِتٍ عن مَيْمُوْنِ بن اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ مَحْمُوْدٌ وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ اَبِىْ ذَرٍّ

৯৭. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ.... হাবীব রহ. থেকে উক্ত সনদে পুনশ্চঃ মাহমূদ রহ. মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। মাহমূদ রহ. বলেন, আবূ যার রাযি. বর্ণিত হাদীসটি সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اتق الله ঃ তাকওয়া হল, দীনের ভিত্তি। মানুষের হৃদয় থেকে যখন এ তাকওয়া চলে যায়, তখন সমাজের অবস্থা হয় খুবই শোচনীয় ও দুর্বিসহ। পক্ষান্তরে সমাজের সম্পূণ শৃংখলা নির্ভর করে এ তাকওয়ার ওপর। তাকওয়া নেই তো শান্তি-শৃংখলাও নেই। কারণ, পুলিশের ভয়, জেল ও শাস্তির ভয় হয়ত মানুষকে লোকালয়ে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে। কিন্তু নির্জন অন্ধকারের অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে না। অন্যদিকে কারও হৃদয়ে

আল্লাহর ভয় থাকলে সে সর্বাবস্থায় অপরাধ করবে না। এভাবে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি শুদ্ধ হয়ে গেলে সেই সমাজ হয় সোনালী সমাজ। কেননা ব্যক্তির সমষ্টিকেই তো বলা হয় 'সমাজ'। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈনন্দিন জীবনের সর্বাবস্থায় এ তাকওয়া অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন।

اتبع السيئة الحسنة ঃ اتبع এটি باب افعال থেকে متعدى بدو مفعول হয়েছে। সগীরা কিংবা কবীরা গুনাহকে السيئة। বলা হয়। হাদীসের ব্যাপকতাও এটাই বুঝায়। কোন কোন আলিমও এটাই বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে এটি সগীরা গুনাহর সাথে খাছ। الحسنة। অর্থ নেককাজ। যেমন, নামায-সদকাই ইত্যাদি।

নেককাজ দ্বারা উদ্দেশ্য কি ?

কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য, তাওবা এবং সাধারণ নেককাজ।

কতক আলিম বলেন, উদ্দেশ্য হল, গুনাহের বিপরীতে নেককাজ। আল্লামা তীবী বলেন, কেউ কোন মন্দকাজ করে ফেললে তার পরিবর্তে অবশ্যই একটি নেককাজ করে নিবে। যেমন– মদপান করে ফেললে, এর পরিবর্তে অবশ্যই একটি নেককাজ করে নিবে। এর পরিবর্তে হালাল কোন জিনিস আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিবে। অহঙ্কার মনে আসলে, মনের বিপরীতে বিনয় প্রকাশ করবে।

বলা হয়েছে, যেন সে নেকী দ্বারা মন্দকাজ মিটিয়ে দেয় অর্থাৎ, ঐ নেকীর কারণে বান্দার অন্তর থেকে কৃত গুণাহর প্রতিক্রিয়া বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথবা মুনকার নাকীরের দফতর থেকে সে মন্দ কর্মটি মিটিয়ে দেওয়া হয়।

بَابُ مَاجَاءَفِىْ ظَنِّ السُّوْءِ ص١٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫. কুধারণা পোষণ করা

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيٰنُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَسَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ سُفْيٰنَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ اَلظَّنُّ ظَنَّانِ فَظَنٌّ اِثْمٌ وَظَنٌّ لَيْسَ بِاِثْمٍ فَامَّا الظَّنُّ الَّذِىْ هُوَ اِثْمٌ فَالَّذِىْ يَظُنُّ ظَنًّا وَيَتَكَلَّمُ بِهٖ وَاَمَّا الظَّنُّ الَّذِىْ لَيْسَ بِاِثْمٍ فَالَّذِىْ يَظُنُّ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهٖ

৯৮. ইবনে আবী উমর রহ.... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা কুধারণা করা হল সবচে মিথ্যা কথা।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবদ ইবনে হুমাইদ রহ. কে সুফিয়ান রহ. এর কতিপয় শাগরিদের বরাতে বলতে শুনেছি যে, সুফিয়ান বলেছেন, ধারণা হল দু'ধরনের। এক প্রকারের ধারণা পাপ; আরেক প্রকারের ধারণা পাপ নয়। পাপ ধারণা হল, কুধারণা করে তা অন্যকে ব্যক্ত করা। আর যে ধারণায় পাপ নেই তা হল, কোন ধারণা হলে তা ব্যক্ত না করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে ظن শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কুধারণা অথবা বিশ্বাসজনিত বিষয়ে এবং নিশ্চিত বিষয়ে অহেতুক ধারণা করা উদ্দেশ্য। এখানে ظن দ্বারা دلائل ظنيه উদ্দেশ্য নয় কিংবা ঐ কুধারণাও উদ্দেশ্য নয়, যা মানুষের মনে অনিচ্ছাকৃত উদিত হওয়ার কারণে ক্ষমাযোগ্য। কেননা যা ইচ্ছাকৃত নয়, তার জন্য মানুষকে জবাবদিহী করতে হবে না। কিন্তু যদি মনের মাঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে উদিত কুধারণা জিইয়ে রাখা হয়, তাহলে সে কুধারণা নিষিদ্ধ ও গুনাহ।

মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরের সেসব কুধারণা মাফ করে দিয়েছেন, যেগুলো শুধু খেয়াল বশতঃ আন্তরিক ইচ্ছা ছাড়া উদিত হয়। কেননা এর উপর বান্দার ক্ষমতা নেই, এগুলো প্রতিহত করাও সম্ভব নয়। কেউ কেউ বলেন, নিষিদ্ধ ও গুনাহ ঐ কুধারণা, যা মনে উদিত হওয়ার পর মুখেও তা প্রকাশ করা হয়। (হাশিয়ায়ে তিরমিযী, তাকমিলাহ)

কুধারণাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করা হয়েছে কেন ?

فان الظن اكذب الحديث ঃ কুধারণা পোষণ করা সবচেয়ে মিথ্যা কথা বলা– এটা কারণ কি ? এ ব্যাপারে একাধিক উক্তি পাওয়া যায়। যেমন–

(১) যখন কারও সম্পর্কে কুধারণা হয়, তখন নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, অমুক এমন। অথচ সে লোক বাস্তবে এমন নাও হতে পারে। তাই তার নিজস্ব সিদ্ধান্তকে অহেতুক বুঝানোর উদ্দেশ্যে مبالغه বা আতিশয্য বলা হয়েছে। এটা নিকৃষ্টতম মিথ্যা।

(২) যে কুধারণা এমনিতে মনের মাঝে অতিক্রম করে, কিন্তু স্থির হয় না, তাকে حديث النفس বলা হয়। নিষিদ্ধ কুধারণা যেহেতু এ حديث النفس এর তুলনায় আরও মারাত্মক, তাই তাকে اكذب الحديث বলা হয়েছে।

(৩) কতক আলিম বলেন, হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য, সাধারণ কথা ظن দ্বারা উদ্দেশ্য, অপবাদ, যে অপবাদ কুধারণার কারণে দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর মর্মার্থ হল, তথ্যানুসন্ধান ব্যতীত কোন মুসলমানকে অপবাদ দেওয়া সে মিথ্যা থেকে আরও মারাত্মক, যে মিথ্যা দ্বারা কাউকে অপবাদ দেওয়া হয়নি। সুতরাং এখানে দুটি প্রসঙ্গ আছে। একটি মিথ্যা অপরটি অপর মুসলমানের অনিষ্ট সাধন। (তাকমিলা)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمِزَاحِ ص١٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬. কৌতুক প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْوَضَّاحِ الْكُوفِيُّ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتّٰى اِنْ كَانَ لَيَقُوْلُ لِاَخٍ لِى صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ،

৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াযযাহ কুফী রহ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে মিশতেন। এমনকি আমার এক ভাইকে (কৌতুক করে) বলতেন, ওহে আবূ উমায়ের! কী করেছে নুগায়ের।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ثنا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ، نَحْوَهُ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَاَبُو التَّيَّاحِ اِسْمُهٗ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ

১০০. হান্নাদ রহ.... আনাস রাযি. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বর্ণনাকারী আবুত তায়্যাহ রহ.-এর নাম হল, ইয়াযীদ ইবনে হুমাইদ যুবাঈ।

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِىُّ ثنا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ اِنِّىْ لَا اَقُوْلُ اِلَّا حَقًّا هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا اِنَّمَا يَعْنُوْنَ اِنَّكَ تُمَازِحُنَا

১০১. আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ দুওয়ারী রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন? তিনি বললেন, আমি সত্য ব্যতীত কিছু বলি না। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। انك تداعبنا অর্থ, আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا اَبُوْ اُسَامَةَ عن شَرِيْكٍ عن عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ذَا الْاُذُنَيْنِ قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ اِنَّمَا يَعْنِيْ بِهِ اِنَّهُ يُمَازِحُهُ

১০২. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ.... আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে "ইয়া যাল উযুনাইন"– "হে দু'কান ওয়ালা" বলে ডাকতেন। মাহমূদ রহ. বলেন, আবূ উসামা রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৌতুক করে এ কথা বলতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّيْ حَامِلُكَ عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلَ اِلَّا النُّوْقُ، هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

১০৩. কুতায়বা রহ.... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে আরোহনযোগ্য একটি বাহন চাইলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তোমাকে আমি একটি উটনীর বাচ্চার উপর আরোহন করাব। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উটনী ছাড়া অন্য কিছু কি উট জন্ম দেয়?

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ان كان لى اخ ঃ হযরত আনাস রাযি. -এর ছোট ভাইয়ের নাম ছিল কাবাশাহ। সে ছিল হযরত আনাস রাযি.-এর বৈপিতৃয় ভাই। পিতার নাম ছিল, আবু তালহা যায়েদ ইবনে সাহ্ল আল-আনসারী রাযি.। তবে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, আবু উমাইর কি তার প্রথম থেকেই কুনিয়্যাত ছিল নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম এ কুনিয়্যাতে ডেকেছেন। বিশুদ্ধ মতে কুনিয়্যাতটি তার পূর্ব থেকেই ছিল। যেমন, মুসলিম শরীফের বর্ণনাতে এসেছে, وَكَانَ لِىْ اَخٌ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ عُمَيْرٍ এর দ্বারা বুঝা যায়, কাবশাহ্র ডাকনাম আবু উমাইর হিসাবে পূর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল।

ما فعل النغير ঃ নুগাইর এক প্রকার ছোট পাখি। অনেকটা চড়ুই পাখির মত ছোট। ঠোঁট লাল। কেউ কেউ বলেছেন, নুগাইর ছোট চড়ুই পাখিকে বলে। যার মাথা লাল। কারও কারও অভিমত হল, এটিকে মদীনাবাসী বুলবুল পাখি বলে। (খাসায়েলে নববী)

হাদীসটির ব্যাখ্যা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামমাঝে মাঝে উম্মে সুলাইম রাযি.-এর ঘরে তাশরীফ নিতেন। তার এক ছেলের ডাকনাম ছিল আবু উমাইর। সে একটি পাখি পালত। একদিন পাখিটি মারা গেল। ফলে সে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ল। এক সময় বিচলিত অবস্থায় সে বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামপাখিটির মৃত্যুর খবর জানতেন। তাই তিনি কৌতুকচ্ছলে তাকে বললেন, কি হে আবু উমাইর! কি হল তোমার নুগাইর? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামজানা সত্ত্বেও নিছক তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য এমন কৌতুক করেছেন, যে কৌতুক ছিল ভাষার নতুনত্ব। অর্থাৎ 'নুগাইর' শব্দটির সাথে অন্তমিল রক্ষা করে তাকে 'আবু উমাইর' উপনামে ডাক দিলেন। (তাকমিলাহ, খাসায়েলে নববী)

প্রশ্ন হয়, যেমনিভাবে হাসি-কৌতুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত, অনুরূপভাবে এ থেকে নিষেধাজ্ঞাও তো প্রমাণিত। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। এক হাদীসে এসেছে– لا تمار اخاك ولا تمازحه। সুতরাং উক্ত উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে করা হবে?

ইমাম নববী রহ. এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেছেন, অধিক হাসি-কৌতুক করলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর যিকির-ফিকির ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যাপারে উদাসীনতা সৃষ্টি হয়, লজ্জা-শরম চলে যায়, গাম্ভীর্য হ্রাস পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্যের মনোকষ্টের কারণ হয়, তাই অধিক হাসি-কৌতুক থেকে বারণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যে হাসি-কৌতুকের মধ্যে এসব ক্ষতিকর দিক নেই এবং সেই হাসি-কৌতুক যদি অপর মুসলমান ভাইকে আনন্দ দেওয়ার লক্ষ্যে হয়, তাহলে সেটা মুসতাহাব।

আরেকটি প্রশ্ন হয়, পশু-পাখি খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা এবং পশু-পাখি নিয়ে খেলাধুলা করা তো তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার নামান্তর। আর হাদীস শরীফে পশু-পাখিকে কষ্ট দেওয়া থেকে বারণ করা হয়েছে। অথচ এ হাদীসে দেখা যায়, পশুপাখিকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। অতএব এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে হবে?

এর উত্তরে বলা হয়, পশু-পাখিকে কেবল আবদ্ধ করে রাখা এবং আদর-যত্নের সাথে লালন-পালন করে পোষ মানানো এক জিনিস। আর কষ্ট দেওয়া ভিন্ন জিনিস। এ জন্যই উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, পশু-পাখি আবদ্ধ করে রাখা ঐ ব্যক্তির জন্য জায়িয, যে ব্যক্তি এদেরকে কষ্ট দেয় না বরং আন্তরিকতার সাথে যত্নসহ লালন-পালন করে।

হাসি-কৌতুক সম্পর্কে বিধিবিধান

- শরী'আতের সীমানা লংঘন করে হাসি-ঠাট্টা করলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়, গাম্ভীর্য হ্রাস পায়, আল্লাহর যিকির ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে উদাসীনতা সৃষ্টি হয়, লজ্জা-শরম ও পরহেযগারী চলে যায়।
- কোন শোকাতুর বা বিপদগস্থকে সান্ত্বনা দেওয়া ও তার মন খুশি করার জন্য হাসি-ফূর্তির কথা বলা জায়িয বরং উত্তম। এমনিভাবে দীনের কাজ ও ইবাদতের জন্য মনকে সতেজ করার উদ্দেশ্যে এবং মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য হাসি-ফূর্তি ও রসিকতা করা হলে তাও উত্তম।
- হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুক করার সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। (ক) মিথ্যা যেন না হয়। (খ) কারও মনে বা ইজ্জতে যেন আঘাত না লাগে। (গ) অতিরঞ্জিত যেন না হয়। (ঘ) সারাক্ষণ যেন এতে লেগে থাকা না হয়। এ শর্তগুলো না পাওয়া গেলে সে হাসি-ঠাট্টা শরী'আতের সীমানা লংঘন করেছে বলে আখ্যায়িত করা হবে।

(শরী'আত ও তরীকত)

ফায়দা ও মাসআলা

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, অনেক আলেম এ হাদীস থেকে শতাধিক ফায়দা ও মাসআলা বের করেছেন। নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হল,

- সীমার ভেতরে থেকে হাসি-ফূর্তি করা জায়িয বরং সুন্নাত।
- অল্পবয়সের ছেলেকেও 'উপনাম' দেওয়া যায়। এটা মিথ্যা হবে না বরং শুভকামনার স্নিগ্ধতা প্রকাশ পাবে।
- মদীনার হারাম শরীফে শিকার করা জায়িয।
- ইসমে তাসগীর দ্বারা নাম রাখা জায়িয।
- শিশুদেরকে খুশি করার জন্য চড়ুই পাখি ইত্যাদি উপহার দেওয়া জায়িয। তবে শর্ত হল, শিশুটি পাখিকে কষ্ট দিবে না– এ নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
- শিশুদের সাথে হাসি-কৌতুক করা জায়িয। (নববী, হাশিয়ায়ে তিরমিযী)

قالوا يارسول الله! انك تداعبنا ঃ আপনি আমাদের সঙ্গে মজাক করেন? সাহাবায়ে কিরাম কেমন যেন এটাকে অযৌক্তিক মনে করেছেন। তবে স্পষ্ট কথা হল, তাঁদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসি-কৌতুক করতে নিষেধ করেছেন, তাছাড়া এটা বড়ত্ব ও গাম্ভীর্যতার পরিপন্থীও বটে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন, আমার হাসি-কৌতুক এ ধরনের কোন কিছু নয়। তিনি হাসি-কৌতুকেও কখনও ভুল ও উদ্ভট কথা বলতেন না। তাছাড়া তাঁর জন্য একটু হাসি-কৌতুকের প্রয়োজনও ছিল। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও সম্ভ্রমপূর্ণ ছিলেন বিধায় একটু হাসি কৌতুক যদি না করতেন, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কাছে ঘেরাও মুশকিল ছিল। এতে দ্বীনের মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করতে তাদের সংকোচবোধ হত, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের স্বার্থেই হাসি-কৌতুক করতেন। যেন সাহাবায়ে কিরাম নির্দ্ধিধায় যে কোন বিষয় জানতে পারে। (খাসায়েলে নববী)

يا ذا الأذنين ঃ কান তো সকলেরই দুটি থাকে। তা সত্ত্বেও তাঁকে দু' কান বিশিষ্ট বলেছেন, কোন স্বতন্ত্র বিশেষত্বের কারণে। যেমন, তার কান হয়ত বড় ছিল বা শ্রবণশক্তি ভালো ছিল, দূর থেকেও কথা বুঝে ফেলত। এটি সবচেয়ে নিকটতম কারণ। (খাসায়েলে নববী)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمِرَاءِ صـ ٢٠

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭. বিবাদ-বিসম্বাদ প্রসংগে

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ ثنا ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ اللَّيْثِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِىَ لَهُ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِىَ لَهُ فِى وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِىَ لَهُ فِى اَعْلَاهَا ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ اَنَسٍ

১০৪. উকবা ইবনে মুকাররাম আম্মী বসরী রহ.... আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিত্যাগ করে.... আর মিথ্যা তো বাতিলই হয়ে থাকে, তার জন্য জান্নাতের পার্শ্বে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। হক থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিবাদ-বিসম্বাদ পরিত্যাগ করে, তার জন্য জান্নাতের মাঝে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্র সুন্দর করে, তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। সালমা ইবনে ওয়ারদান – আনাস রাযি. সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوْفِيُّ ثنا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰى بِكَ اِثْمًا اَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا ،

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هٰذَا اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

১০৫. ফাযালা ইবনে ফাযল কুফী রহ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঝগড়াটে হওয়াই তোমার পাপের জন্য যথেষ্ট।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ ثنا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِى سُلَيْمٍ عَنْ الْمَلِكِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ. هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَ الْوَجْهِ

১০৬. যিয়াদ ইবনে আইয়ূব বাগদাদী রহ.... ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমার দীনী ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে না। তাকে বিদ্রুপ করবে না। তার সঙ্গে এমন ওয়াদা করবে না, যা তুমি পরে ভঙ্গ করে বসবে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

المراء ঃ বতিল উদ্দেশ্যে কথায় বা কাজে বা আকীদা বিষয়ে ঝগড়া করা। যদি হকের উদ্দেশ্য ঝগড়া করা হয় সেটাকে جدال বলে। মূলতঃ শব্দটি مريت الناقة (যখন উটনীর স্তনের দুধ বের করা হয়) থেকে গৃহীত। যেন আপনি তার কাছে যে উক্তি আছে তা গিয়ে টেনে বের করে আনলেন।

মানুষে মানুষে বা দলে দলে মতানৈক্য-মতবিরোধ বা বিবাদ প্রায় ঘটে থাকে। সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষই কিছু কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলে এবং কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে। ফলে যা করার তা না করে যা বর্জন করার তা করে বসে। এ সব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মানা উচিত।

(১) প্রতিপক্ষের বক্তব্য, তাদের যুক্তি-প্রমাণ ও তাদের অবস্থানকে সত্যিকারভাবে না বুঝেই তাদের প্রতি কুধারণা করা অন্যায়। এরূপ না করা উচিত।

(২) এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক কথাই সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে বা অতিরঞ্জিত হয়ে কানে এসে থাকে। তাই নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ছাড়া কোন কিছু কানে আসলে যাচাই করা ব্যতীত তা বিশ্বাস করা উচিত নয়। এমনকি তদন্ত ছাড়া সে ব্যাপারে মুখ খোলাও অনুচিত। অন্যথায় অনেক সময় পরবর্তীতে অনুতপ্ত হতে হয়।

(৩) প্রতিপক্ষের সমালোচনা ও মন্তব্য করতে গিয়ে বিবেক-বুদ্ধি ঠিক করে বলা উচিত।

(৪) প্রতিপক্ষের ভালকে ভাল বলার ব্যাপারে উদারতা থাকা উচিত। তাদের ভালকেও বাঁকা চোখে দেখা অনুচিত।

(৫) অন্য যে কেউ কোন দোষ করলে সেটার জন্য প্রতিপক্ষকে অভিযুক্ত করে তাদেরকে ঘায়েল করার অপচেষ্টা একটা জঘন্য মনোকষ্ট ও মিথ্যাচারের শামিল, বিধায় তা মহাপাপ।

(৬) এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায়, একপক্ষের লোকজন আমভাবে অপরপক্ষের সবার ব্যাপারে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন এবং প্রতিপক্ষের সকলের ব্যাপারে লাগামহীন মন্তব্য শুরু করেন। আদৌ লক্ষ্য করা হয় না যে, আমি প্রতিপক্ষের যার ব্যাপারে যা-তা বলছি, তিনি আমার চেয়ে জ্ঞানে, গুণে, আমলে, আখলাকে অনেক উর্ধ্বে। আমি তার সমপর্যায়ের নই। অতএব তার ব্যাপারে আমার মুখ খোলা শোভা পায় না। তার ব্যাপারে তিনিই মুখ খুলতে পারেন, যিনি তার সমপর্যায়ের। (আল-ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল)

ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব না মুস্তাহাব ?

ولاتعده موعدافتخلفه ঃ ওয়াদা পূর্ণ করা মানবতার বহিঃপ্রকাশ এবং ইসলামী আখলাক ও শিষ্টাচারের দাবী। ওয়াদা খেলাফ করা একটি অমানবিক ও খুবই দোষণীয় কাজ। তবে কথা হল, ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব না মুসতাহাব। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এবং যমহূরে ফুকাহা রহ. এর অভিমত হল, ওয়াদা পূর্ণ করা মুসতাহাব এবং পূরণ না করা মাকরূহ ও মারাত্মক দোষণীয়। ওয়াদা খেলাফ করলে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু এ ওয়াদা খেলাফ যদি অন্যের কষ্টের কারণ হয়, তাহলে অপরকে কষ্ট দেওয়ার গুনাহ অবশ্যই হবে।

অপর এক দলের দাবী হল, ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. এ দলের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন আলেম লিখেছেন, বিনা ওযরে বা অকারণে ওয়াদা খেলাফ করা হারাম। কোন ব্যক্তি যদি ওয়াদা করার সময় মনে মনে এ নিয়ত করে যে, এ ওয়াদা পূর্ণ করব না, তাহলে এটা মুনাফেকী এবং মারাত্মক গুনাহ। আর যদি কৃত ওয়াদা পূরণ করার নিয়ত থাকা সত্ত্বেও কোন গ্রহণযোগ্য কারণে পূরণ না করতে পারে, তাহলে এটা মুনাফেকি নয় বরং এতে কোন গুনাহও হবে না। হযরত ইবনু মাসউদ রাযি. এর আ'মল ছিল, তিনি ওয়াদা করার সময় 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ জুড়ে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি عسى শব্দসহ ওয়াদা করতেন। (আল-কাওকাব, হাশিয়ায়ে তিরমিযী, মাযাহেরে হক)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُدَارَاةِ ص٢٠

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮. মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيٰنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاْذَنَ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ اَوْ اَخُو الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ اَذِنَ لَهُ فَاَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ ثُمَّ اَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَ يَاعَائِشَةُ اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১০৭. ইবনে আবু উমর রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করল। আমি সে সময় তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, 'কবীলার এ লোকটি বড় খারাপ'। যা হোক! এরপর তিনি তাঁকে আসতে অনুমতি দিলেন এবং তার সঙ্গে নম্রতার সাথে কথা-বার্তা বললেন।

লোকটি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ লোকটি সম্পর্কে তো আপনি যা বলার বলেছিলেন। অথচ পরে তার সঙ্গে নম্রতার সাথে কথা-বার্তা বললেন। তিনি বললেন, হে আয়েশা! লোকদের মধ্যে সবচে খারাপ হল সেই ব্যক্তি, যার অশ্লীল কথা থেকে আত্মরক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে ত্যাগ করে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নিহায়াহ গ্রন্থে রয়েছে– المداراة بلاهمز ملاينة الناس وحسن صحبتهم وقد يهمز অর্থাৎ مداراة বলা হয়, মানুষের সাথে কোমল আচরণ করা এবং উত্তম সঙ্গ দেওয়া।

এ হাদীসে যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তির নাম ছিল, উ'য়াইনাহ ইবনে হিসন আল-ফাযারী। এ ব্যক্তির বদস্বভাব ও রুক্ষ মেযায খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সে ছিল গোত্রের নেতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যুগেই তার ঈমান ও আ'মলে ত্রুটিক-বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ইনতেকালের পর ঈমানচ্যুত হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর রাযি. তাকে পাকড়াও করেন। পরবর্তীতে সে পুনরায় তাওবা করে ঈমান গ্রহণ করে। অবশেষে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

হাদীসে উল্লেখিত ঘটনাটি ছিল ইসলামের প্রথম দিকের। এ ব্যক্তি তখন মুসলমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিলেন এবং মজলিসে উপস্থিত লোকজনকে বললেন, লোকটি তার গোত্রের মধ্যে নিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা বলেছেন, উপস্থিত লোকজনকে তার ধোঁকা থেকে সতর্ক হওয়ার জন্য। অতঃপর লোকটি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে ইসলামের গ্রহণের কথা প্রকাশ করল। অবশ্য তার ইসলাম নির্ভেজাল এবং তার ঈমান সুদৃঢ় ছিল না। বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মন্তব্যটি ছিল, একটা মুজিযা। উদ্দেশ্য ছিল, তার গোপনাবস্থা সম্পর্কে আগাম সতর্ক করে দেওয়া। যেন মানুষ অনাগত বিষয়ে তার কাজ-কারবার দেখে ধোঁকায় না পড়ে। সুতরাং এটা গীবতভুক্ত নয়। কেননা এতে দুষ্টপ্রকৃতির লোকটির কুমনোবৃত্তি মানুষকে অবহিত করা উদ্দেশ্য ছিল। যেন মানুষ ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারে। উপরন্তু লোকটি ছিল, প্রকাশ্য ফাসিক। আর এ ধরনের ফাসেকের গীবত জায়িয । (খাসায়েলে নববী)

فألان له القول : এর দ্বারা বুঝা গেল, মেহমানের সঙ্গে কোমল সদাচারণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাত করা জায়েয, যদিও মেহমান ফাসিক কিংবা কাফির হোক বরং স্বাভাবিকক্ষেত্রে এটা মুস্তাহাব।

من تركه الناس الخ : এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে।

(১) من দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অর্থ হবে, আমি এ ব্যক্তির মুখের উপর মন্দ বলিনি এজন্য যে, যেন আমাকে ঐসব মানুষের দলভুক্ত না করা হয়, যারা রূঢ় কথা বলে। কেননা তাদের দলভুক্ত হলে মানুষ আমার কাছে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিবে এবং এতে দাওয়াতে দীনের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

(২) অথবা من দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি। তখন মর্মার্থ হবে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন যেন উক্ত বাক্যের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, এ ব্যক্তি যেহেতু দুষ্টপ্রকৃতির, তাই তার কুমনোবৃত্তি থেকে বেঁচে থেকেছি এবং তার মুখের উপর কিছু বলিনি। (আল-কাওকাব, খাসায়েলে নববী)

مدارة এবং مداهنة এর মধ্যে পার্থক্য

মুদারাত এবং মুদাহানাত এর সংজ্ঞা হল–

ان المدارة بذل الدنيا لصلاح الدنيا او الدين او كليهما والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا

অর্থাৎ দুনিয়া অথবা দীন কিংবা উভয়ের স্বার্থে দুনিয়াকে বিসর্জন দেওয়া। (এটা জায়িয বরং ক্ষেত্রবিশেষ মুসতাহাব। যেমন, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়েছেন দ্বীনের স্বার্থে।) পক্ষান্তরে মুদাহানাত বলা হয়, দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীনকে ছেড়ে দেওয়া। এটা হারাম।

কাফিরের সাথে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর

(১) موالات অর্থাৎ আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক। এ স্তরের সম্পর্ক কোন কাফিরের সাথে করা মোটেই জায়িয নয় বরং এ স্তরের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে কাম্য।

(২) مواسات অর্থাৎ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্খা ও উপকার করা। এ স্তরের সম্পর্ক স্থাপন যুদ্ধরত কাফির সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সব কাফিরের সাথে জায়িয। আর মুসলমানের সাথে হলে সাওয়াব ও প্রতিদান পাবে।

(৩) مدارة অর্থাৎ সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর তথা বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এ সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধন অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব কাফিরের সাথেই এটা জায়িয।

(৪) معاملات তথা লেনদেনের স্তর। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকুরি, শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সব কাফিরের সাথে জায়িয। তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয়, তাহলে জায়িয নয়। ফিকাহবিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত কাফিরদের হাতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন। (মা'আরিফুল কুরআন ঃ ২)

ফাওয়ায়েদ ও মাসায়েল ঃ

উক্ত হাদীস দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতীয়মান হল–

(ক) কারও মন্দ এ উদ্দেশ্যে প্রকার যাতে মানুষ তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পায় এবং সে কোন ধরনের অনিষ্ট করার সুযোগ না পায়– এটা জায়েয। এটা গীবতের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা যে প্রকাশ্যে ফাসেকীতে লিপ্ত তার সে গুনাহর কথা বলা জায়েয আছে।

(খ) কারও নিকট থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তার সঙ্গে বাহ্যিক ভাল ব্যবহার ও বন্ধুসুলভ আচরণ করা জায়েয আছে।

(গ) মেহমানের সঙ্গে নম্র ব্যবহার জায়েয বরং মুসতাহাব। এমনকি সে কাফির অথবা ফাসিক হলেও।

(ঘ) মন্দ লোকের সাথেও সদাচরণ ও ভদ্রোচিত ব্যবহার করাই শিষ্টাচার। (নববী, হাশিয়ায়ে তিরমিযী)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِقْتِصَادِ فِى الْحُبِّ وَالْبُغْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯. বিদ্বেষ ও ভালবাসা উভয় ক্ষেত্রেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِىُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ اَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى اَنْ يَكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًامَا وَاَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًامَا عَسَى اَنْ يَكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًامَا ،

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَيُّوْبَ بِاِسْنَادٍ غَيْرِ هٰذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ اَبِىْ جَعْفَرٍ وَهُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ اَيْضًا بِاِسْنَادٍ لَهُ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَالصَّحِيْحُ هٰذَا عَنْ عَلِىٍّ مَوْقُوْفٌ قَوْلَهُ

১০৮. আবূ কুরায়ব রহ.... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে মারফূরূপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার বন্ধুর ভালবাসায় আতিশয্য দেখাবে না। কারণ, এক দিন হয়ত সে তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। তোমার শত্রুকে শত্রুতার ক্ষেত্রে আতিশয্য প্রদর্শন করবে না। কারণ, এক দিন হয়ত সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। উক্ত সূত্রে এ ভাবে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আইয়ূব রহ. থেকে ভিন্ন সনদেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। এটি হাসান ইবনে আবূ জা'ফর রহ. তৎসনদে আলী রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এটিও যঈফ। সহীহ হল আলী রাযি. থেকে মওকূফরূপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اراه ঃ হামযাহ ضمه এর সাথে। এখানে اظن এর অর্থ ব্যবহৃত। অর্থাৎ আমি ধারণা করছি। অর্থাৎ আমার ধারণা মতে আবু হুরাইরা রাযি. মারফূ হিসাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ ধারণাটি মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ. এর।

احبب حبيبك هونا ما ঃ باب افعال থেকে। অর্থাৎ তাকে কম মহব্বত করবে। বন্ধুর ভালোবাসায় আতিশয্য দেখাবে না বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। ما শব্দটি এখানে স্বল্পতার অর্থ বুঝিয়েছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা হল, বন্ধুর বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করে সব গোপন কথা ও ভেদের বিষয় বন্ধুর নিকট বলে দেওয়া উচিত নয়। হতে পারে কখনও বন্ধু শত্রুতার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং তোমার গোপন কথা তার শত্রুতার

কাজে লাগাবে। অনুরূপভাবে শত্রুর শত্রুতার ক্ষেত্রেও চরমপন্থা অবলম্বন করবে না। হতে পারে শত্রু বন্ধু হয়ে যাবে, তখন তার সাথে তোমার আচরণে লজ্জিত হতে হবে এবং চলাফেরা সংকোচবোধ হবে।

উল্লেখ্য, হাদীসটি কেবল ইমাম তিরযিমী রহ. কর্তৃক সংকলিত। এছাড়া সিহাহ সিত্তহ্র অন্য কিতাবে নেই।

بَابُ مَاجَاءَفِي الْكِبْرِ ص ٢٠

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০. অহংকার

حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ نا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১০৯. আবূ হিশাম রিফাঈ রহ..... আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যার অন্তরে সামান্য দানা পরিমাণ ঈমান থাকে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, সালামা ইবনে আকওয়া ও আবূ সাঈদ রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا ثنا يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّهُ يُعْجِبُنِىْ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبِىْ حَسَنًا وَنَعْلِىْ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلٰكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

১১০. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না ও আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রহ... আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনু পরিমাণ অহংকারও যার অন্তরে থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর অনূ পরিমাণ ঈমান যার অন্তরে থাকে সে জাহান্নামে দাখেল হবে না। এক ব্যক্তি তখন বলল, আমর যে ভাল লাগে আমার কাপড়টা সুন্দর হোক, আমার জুতাটা সুন্দর হোক। তিনি বললেন, আল্লাহ তো সৌন্দর্য ভালবাসেন। তবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় মনে করা হল অহংকার।

কোন কোন আলিম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অনু পরিমাণ ঈমান যার অন্তরে থাকে সে জাহান্নামে দাখেল হবে না –এর অর্থ হল, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ثنا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتّٰى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا أَصَابَهُمْ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

১১১. আবূ কুরায়ব রহ..... ইয়াস ইবনে সালামা ইবনে আকওয়া তার পিতা সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি নিজেকে বড় বলে ভাবতে থাকে। শেষে তাকে জাব্বার ও অহংকারীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে ফেলা হয়। পরিণামে তাদের যা ঘটে এর ভাগ্যেও তা ঘটে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسٰى بْنِ يَزِيْدَ الْبَغْدَادِيُّ ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لِيْ فِيَّ التِّيْهُ وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ وَقَدْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَلَيْسَ فِيْهِ مِنَ الْكِبْرِ شَيْءٌ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

১১২. আলী ইবনে ঈসা ইবনে ইয়াযীদ বাগদাদী রহ.... নাফি ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'ইম তার পিতা যুবাইর ইবনে মুত'ইম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাঝে অহংকার আছে। অথচ আমি গাধায় আরোহণ করি, চাদর পরিধান করি, বকরীর দুধ দোহন করি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কাজগুলো করে, তার মাঝে সামান্যতম অহংকারও নেই।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অহংকার কাকে বলে ?

জ্ঞান-বুদ্ধি, ইবাদত-বন্দেগী, মান-সম্মান, ধন-দৌলত ইত্যাদি যে কোন দ্বীনী বা দুনিয়াবী গুণে নিজেকে বড় মনে করা আর অন্যকে সেক্ষেত্রে তুচ্ছ মনে করাকে তাকাব্বুর বা অহংকার বলে। সুতরাং অহংকারে দু'টি অংশ। যথা–

(১) নিজেকে বড় মনে করা। (২) অন্যকে ছোট মনে করা। অহংকার কবীরা গুনাহ।

বলা বাহুল্য, মানুষের মনে এ রোগ সৃষ্টি হলে স্বভাবতই আত্মশ্লাঘা বৃদ্ধি পায়। নফ্স ফুলে উঠে এবং পদে পদে অহংকারের নিদর্শন প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন, পথচলার সময় সকলের আগে চলতে আগ্রহ করা। সভার কেন্দ্রস্থলে বসতে প্রয়াসী হওয়া। অন্যকে অবজ্ঞার চোখে দেখা। অন্যকে সালাম না করা এবং অপরের সালাম পাওয়ার আশা করা ইত্যাদি।

অহংকারের অপকারিতা

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, অহংকারের অনেক অপকারিতা রয়েছে। যথা–

(১) বড়ত্ব আল্লাহ তা'আলার গুণ। এ গুণ কেবল তাঁরই শোভা পায়। মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষি। সুতরাং মানুষ নিজের দুর্বলতা ও মুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গে লড়াই বাঁধাতে গেলে তা বোকামি বৈ কিছু নয়।

(২) অনেক সময় অহংকারের কারণে সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হয়। যার কারণে দ্বীনের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। আর অহংকারী আল্লাহর সৃষ্টিজীবকে অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে। আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা খুবই অপছন্দনীয়।

(৩) অহংকার মানুষকে কোন প্রকার সদগুণ অর্জন করতে দেয় না। ফলে অহংকারী নম্রতাহারা হতে থাকে। অহংকারী হিংসা ও ক্রোধ দমন করতে পারে না। অহংকারী ব্যক্তি নিজের আত্মগরিমার নেশায় মত্ত থাকার কারণে কারও উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতে চায় না। (তাবলীগে দ্বীন, আল-আরবাঈন)

(৪) এসব বদস্বভাবের কারণে মানুষ তাকে ঘৃণা করে এবং সময়-সুযোগে তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। কাজেই অহংকারকে সকল আত্মিক ব্যাধির মূল বলা হয়।

অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়

(১) নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যে, আমি অপবিত্র পানি থেকে সৃষ্ট এবং বর্তমানেও আমার পেটে নাপাক ভরা, চোখে, মুখে ও নাকের ভেতর ময়লা ভর্তি। আর মৃত্যুর পর আমার সবকিছু পঁচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে ইত্যাদি।

(২) একথা চিন্তা করা যে, এ সমস্ত গুণ একমাত্র আল্লাহর দান। আমার বুদ্ধির জোরে কিংবা বাহুবলে এগুলো অর্জিত হয়নি। তাই তো আমার চেয়ে কত বুদ্ধিমান বা শক্তিশালী ব্যক্তি এ গুণ অর্জন করতে পারে নি। অতএব আল্লাহর দয়ায় যা অর্জিত হয়েছে, তার জন্য আমার অহংকার ও বড়ত্ববোধ করা বোকামি বৈ কিছু নয় বরং এর জন্য আল্লাহর সামনে আমার বিনয়ী হওয়া উচিত।

(৩) যাকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হবে, মনে না চাইলেও জোর-জবরদস্তি তার সাথে কোমল ব্যবহার করতে হবে।

(৪) অভাবী ও গরীব শ্রেণীর লোকদের সাথে বেশি উঠা-বসা করা।

(৫) মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করা।

(৬) নিজের দোষ-ত্রুটি, নিন্দা, সমালোচনা শুনেও প্রতিবাদ না করা।

(৭) ক্রোধ প্রকাশ পেলে ক্ষমা চেয়ে নিবে। এমনকি ছোটদের থেকে হলেও।

(৮) একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজের ছোটখাট কাজ নিজেই করা, মজদুর বা চাকর-নওকর না লাগানো।

(৯) আগে আগে সালাম দেওয়া, অপরের সালামের প্রত্যাশী না হওয়া।

(১০) অহংকারের ধরণ ও বিবরণ জানিয়ে হক্কানী পীর ও শায়খে তরীকত থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা জেনে সে অনুযায়ী আ'মল করা। (শরী'আত ও তরীকত, আহকামে যিন্দেগী)

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال الخ :

(ক) ফক্বীহুন নাফ্স আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, এর অর্থ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে অহংকার থেকে পবিত্র না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর পবিত্র করার দু'টি পদ্ধতি আছে। হয়ত শাস্তির মাধ্যমে পবিত্র করা হবে অথবা মাফ করে দেওয়া হবে।

(খ) অথবা এর অর্থ হল, অহংকারী মুত্তাকীদের সাথে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; বরং শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে।

(গ) কেউ কেউ বলেন, অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না– এর অর্থ হল, অহংকার মূলতঃ জান্নাত থেকে দূরে রাখার এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত স্বভাব।

(ঘ) কতক আলিমের মতে এখানে অহংকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঈমান আনয়ন তেকে অহংকার ও কুফর। কেউ যদি কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয় সে জান্নাতে যেতে পারবে না।

এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লামা নববী রহ, বলেন, এ ব্যাখ্যাটি যৌক্তিক নয়। কেননা এ হাদীস অহংকার সম্পর্কে এসেছে। সুতরাং হাদীসটিকে তার প্রকৃত অর্থেই নিতে হবে। প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করে অন্য অর্থ নেওয়া মোটেও উচিত হবে না। (নববী)

لايدخل النار من كان فى قلبه ঃ যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ সে কাফির-মুশরিকদের মত সর্বদা জাহান্নামে থাকবে না।

فقال رجل ঃ এর দ্বারা কোন সাহাবী উদ্দেশ্য ? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, সাহাবীর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আ'মর ইবনুল আ'স রাযি.।

কেউ কেউ বলেছেন, রাবি'আ ইবনু আমির রাযি. ছিলেন উক্ত সাহাবী।

ইমাম নববী উল্লেখ করেন, ঐ সাহাবীর নাম ছিল, মালেক ইবনে মারারাহ আর-রাহাবী রাযি।

انه يعجبنى ان يكون ثوبى الخ ঃ হালাল বস্তু দ্বারা সাজসজ্জা করা যেমন নতুন কাপড়, নতুন জুতো পরিধান করা অহংকার নয় বরং জায়িয। তবে শর্ত হল, অমুসলিমদের কোন নিদর্শন ব্যবহার করা যাবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ حُسْنِ الْخُلُقِ ص ـ ٢٠

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১. সদ্ব্যবহার

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ ثنا سُفْيَانُ ثنا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ اَبِى مَلِيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَاشَئٌ اَثْقَلُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ ،

وَفِى الباب عن عائشة وابى هريرة وانس واسامة بن شريك هذا حديث حسن صحيح

১১৩. ইবনে আবূ উমর রহ.... আবুদ-দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য মীযানের পাল্লায় সদ্ব্যবহারের চেয়ে অধিক ভারি আর কিছু হবে না। আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল এবং কটুভাষীকে অবশ্যই ঘৃণা করেন। এ বিষয়ে আয়েশা, আবূ হুরাইরা, আনাস ও উসামা ইবনে শরীক রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثنا قَبِيْصَةُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ شَئٍ يُوْضَعُ فِى الْمِيْزَانِ اَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَاِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهٖ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ والصَّلٰوةِ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

১১৪. আবূ কুরায়ব রহ.... আবুদ-দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, সদ্ব্যবহারের চেয়ে ভারি কোন জিনিস মীযানের পাল্লায় রাখা হবে না। সদ্ব্যবহারের অধিকারী ব্যক্তি সওম ও সালাতের অধিকারী ব্যক্তির দরজায় অবশ্যই পৌছে যায়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গরীব।

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ ثنى اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ هُوَ اِبْنُ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَوْدِىْ

১১৫. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ.... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন আমল দ্বারা মানুষ বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর ভীতি এবং সদাচারের কারণে। জিজ্ঞাসা করা হল, কোন কাজের দরুণ মানুষ বেশি জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস রহ. হলেন, ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদুর রহমান আওদী।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ نَا اَبُوْ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ اَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الْخُلُقِ فَقَالَ هُوَ بَسْطُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوْفِ وَكَفُّ الْاَذٰى

১১৬. আহমদ ইবনে আবদা যাব্বী রহ.... আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.... থেকে বর্ণিত। তিনি সদাচারিতার বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, তা হল হাস্যোজ্জল চেহারা, উত্তম জিনিস দান এবং কষ্ট-ক্লেশ প্রদানে বিরত থাকা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ ঃ উম্মে দারদার নাম খাইরাহ। আবু হাদরাদ আসলামীর কন্যা। হযরত আবু দারদা রাযি. এর স্ত্রী। তিনি ছিলেন, মহিলা সাহাবীদের মধ্যে মর্যাদাসম্পন্ন বুদ্ধিমতি বিচক্ষণ মহিলা। ইবাদতগুযার ও শরী'আতের পাবন্দ। অনেক লোক তাঁর নিকট হতে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। স্বামী আবুদ্দারদা রাযি. এর দুই বৎসর পূর্বে হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফত আমলে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ঃ আবুদ্দারদা উ'য়াইমির ইবনে আমির খাযরাজী রাযি.। তিনি আবুদ্দারদা কুনিয়তে প্রসিদ্ধ। দারদা তাঁর মেয়ের নাম। তিনি নিজ গোত্রের সকলের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবন ছিল অতি উত্তম। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ, আলিম ও প্রজ্ঞাবান। সিরিয়ায় অবস্থান করতেন। হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফতের শেষ দিকে হিজরী ৩২ সালে দামিশকে ইন্তেকাল করেন।

اَلْبَذِى ঃ হযরত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর অর্থ করেছেন, অহেতুক ও অনর্থকভাষী। কিন্তু মোল্লা আলী কারী রহ.-এর মতে এর অর্থ চরিত্রহীন, অশ্লীলভাষী। শেষোক্ত অর্থই এখানে যথোপযুক্ত।

مَا شَيْئٌ اَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ ঃ এ জাতীয় হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলা যাবে না যে, আখলাকে হাসানাহ্র মর্যাদা ঈমান এবং আরকানের চেয়ে বেশি। সাহাবায়ে কিরাম যারা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাত্র। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে এ জ্ঞান লাভ করেছেন যে, ইসলাম ধর্মে ঈমান এবং তাওহীদের স্তর সর্বোচ্চ। তারপর হল, আরকানের স্তর। তারপরের স্তরে রয়েছে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়। যেসব বিষয়ে একটির মর্যাদা অপরটির তুলনায় অধিক। আখলাকে হাসানারও নিশ্চয় অনেক মর্যাদা ও ফযীলত রয়েছে। মানুষের সফলতার জন্য আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা লাভের ক্ষেত্রে এ আখলাকের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। (মা'আরিফুল হাদীস)

আখলাক কাকে বলে ?

মানুষের ঐ সকল আত্মিক প্রতিভা, যেগুলোর কারণে নেক আমল প্রকাশ পায়- সে সব প্রতিভা ও শক্তিকে বলা হয় 'আখলাক'। আখলাক হল, আমলের বুনিয়াদ। যেমন আখলাক হবে, তেমন আ'মল প্রকাশ পাবে। যেমন বীরত্বের আখলাক থাকলে আক্রমণ ও আগ্রাসনের অবস্থা ফুঠে উঠবে। দানশীলতার প্রতিভা থাকলে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার গুণ প্রকাশ পাবে।

সব আখলাক বা চরিত্রই মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। জন্মগতভাবে কোন আখলাকই নিন্দিত কিংবা নন্দিত নয় বরং নিন্দিত ও নন্দিত হয় কার্যক্ষেত্রে এসে। হাদীস শরীফে এসেছে– مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ এখানে দেওয়া এবং না দেওয়ার সঙ্গে لِلّٰهِ শব্দ যোগ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, দানশীলতা শর্তহীনভাবে প্রশংসনীয় নয় বরং যখন আল্লাহর জন্য হবে তখন হবে প্রশংসনীয়। অন্যথায় দোষণীয়।

আখলাক দু'প্রকার। (১) আখলাকে হাসানাহ এবং (২) আখলাকে যামীমাহ। অন্তরের শক্তির ভারসাম্যতার নাম আখলাকে হাসানাহ। আখলাকে হাসানার কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন– ইখলাস, তাকওয়া, বিনয়, তাওয়াক্কুল, যুহ্দ, শোকর ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে অন্তরের শক্তির সীমালংঘন কিংবা সংকোচনের নাম আখলাকে যামীমাহ। এক কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন– বুখল, তাকাবুর, হাসাদ, বুগ্য, রিয়া ইত্যাদি। আখলাকে যামীমাহকে পরিশুদ্ধ করে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসাই হল তাসাওউফের মূলকথা।

আখলাক কোত্থেকে সৃষ্টি হয় ?

হযরত থানভী রহ. বলেন, আখলাকের উৎসস্থল তিনটি। যেগুলো থেকে আখলাক সৃষ্টি হয়। (১) বিবেকের শক্তি (২) যৌনশক্তি(৩) ক্রোধশক্তি।

সারকথা, দুনিয়াবী কিংবা আখেরাতের উপকার অর্জন করার জন্যও ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন।

(১) সেই শক্তি যার মাধ্যমে লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা যায়। এর নাম বিবেকের শক্তি।

(২) আরেকটি হল, লাভ বুঝে তা অর্জন করা। এ শক্তির নরাম যৌনশক্তি।

(৩) আরেকটি হল, ক্ষতি বুঝে তা প্রতিহত করা। এটি হল, ক্রোধ শক্তি।

অতঃপর এ তিনটি শক্তি থেকে বিভিন্ন কাজের প্রতি আগ্রহ অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। সে কাজগুলোর তিনটি স্তর রয়েছে। (১) চরমপন্থা, (২) মধ্যপন্থা(৩) শিথিল পন্থা। বিবেক শক্তির চরমপন্থা হল, এ পরিমাণে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা এবং তার উপর আস্থাশীল হওয়া যে, ভালো-মন্দ নির্নয়ের জন্য এ বুদ্ধিকেই একমাত্র মাপকাঠি মনে করে ইলমে অহীকে অস্বীকার করা। শিথিলপন্থা হল, একেবারে অজ্ঞতা ও মুর্খতার স্তরে নেমে যাওয়া, যার কারণে ভালো-মন্দ বুঝার শক্তি হারিয়ে ফেলে। অনুরূপভাবে যৌনশক্তির চরমপন্থা হল, অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার ফলে স্ত্রী ও পরনারীকে সমানতালে ভোগ করার প্রতি উৎসাহী হওয়া। শিথিলস্তর হল, এত বেশী বৈরাগী হয়ে যাওয়া যে, নিজ স্ত্রী থেকেও দূরত্ব বজায় রেখে চলা। আর ক্রোধশক্তির চরমপন্থা হল, যেখানে সেখানে রেগে যাওয়া, অহংকার ও রিয়া জাতীয় ব্যাধি নিজের ভেতর চলে আসা। শিথিলপন্থা হল, এত বেশী নরম হয়ে যাওয়া যে, প্রয়োজনের স্থানেও ক্রোধ আসে না। যেমন, দ্বীনের ব্যাপারে কেউ কটাক্ষ করলেও ক্রোধ না আসা।

এ হল, চরমপন্থা ও শিথিলপন্থা। আরেকটি হল, এ তিনটি শক্তির মধ্যপন্থা। অর্থাৎ শরী'আত যেখানে অনুমতি দিয়েছে কিংবা নির্দেশ দিয়েছে সেখানে তিন শক্তির ব্যবহার করব। যেখানে অনুমতি দেয়নি বা নিষেধ করেছে, সেখানে এ তিন শক্তি ব্যবহার না করা।

অতএব প্রতিটি শক্তির তিনটি স্তর হল, চরমপন্থা, শিথিলপন্থা ও মধ্যপন্থা। এ মোট নয়টি স্তরের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে বিবেকশক্তির চরম পন্থার নাম اِفْرَاط তথা বাড়াবাড়ি। শিথিলপন্থার নাম تَفْرِيْط তথা অবহেলা। একে حِمَاقَت বা বেকুবিও বলে। মধ্যমপন্থাকে বলা হয়, حِكْمَت তথা প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা। যৌনশক্তির চরমপন্থাকে বলে فُجُوْر তথা পাপ বা অন্যায়। শিথিলপন্থাকে বলে جُمُوْد বা নিষ্ক্রিয়তা। মধ্যমপন্থার নাম হল, عِفَّت তথা পবিত্রতা।

ক্রোধশক্তির চরমপন্থার নাম تَحَيُّر তথা দিশেহারা হয়ে যাওয়া। শিথিলপন্থার নাম جُبْن তথা ভীরুতা বা কাপুরুষতা। মধ্যপন্থার নাম شُجَاعَت তথা বীরত্ব।

এ হল, মোট নয়টি জিনিস। যেগুলো সকল আখলাকে হাসানাহ ও আখলাকে যামীমাহকে শামিল করে। কাম্য হল, শুধু মধ্যপন্থার তিনটি স্তর। অর্থাৎ حِكْمَتْ বা প্রজ্ঞা, عِفَّتْ বা পবিত্রতা, شَجَاعَتْ বা বীরত্ব।

আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্রের মূল হল, এ তিনটি জিনিস। এ তিনটি ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলো মন্দ আখলাক। এ তিনটিকে একসাথে বলা হয়, عَدَالَتْ তথা ইনসাফ ও ভারসাম্যতা। এ জন্য এ উম্মতের উপাধি হল, اُمَّةً وَسَطًا তথা মধ্যমপন্থী উম্মত। মূলতঃ প্রকৃত মানব সে-ই যার মধ্যে মধ্যপন্থা থাকে। যখন এ শক্তিগুলো মধ্যপন্থায় থাকবে, তখন একজন মানুষকে উত্তম ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী বলা যাবে। (কামালাতে আশরাফিয়া)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِحْسَانِ وَالْعَفْوِ صـ٢١

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২. অনুগ্রহ ও ক্ষমা

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالُوْا نَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّجُلُ اَمُرُّ بِهٖ فَلَا يَقْرِيْنِىْ وَلَا يُضَيِّفُنِىْ فَيَمُرُّبِىْ اَفَاَجْزِيْهِ قَالَ لَا اَقْرِهٖ قَالَ وَرَاٰنِىْ رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ قَالَ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ قَالَ فَالْيُرَ عَلَيْكَ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاَبُوْ الْاَحْوَصِ اِسْمُهٗ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ الْجُشَمِىُّ وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ اَقْرِهٖ يَقُوْلُ اَضِفْهُ وَالْقِرٰى اَلضِّيَافَةُ

১১৭. বুনদার, আহমদ ইবনে মানী' ও মুহাম্মদ ইবনে গায়লান রহ.... আবুল আহওয়াস তৎ পিতা (মালিক ইবনে নাযলা) রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে আমি গেলাম কিন্তু সে ব্যক্তি আমার মেহমানদারি করেনি, সে যদি আমার নিকট দিয়ে যায়, তবে কি আমি তার সাথে অনুরূপ আচরণ করে বদলা নিতে পারি? তিনি বললেন, না বরং তুমি তার মেহমানদারী করবে।

মালেক রাযি. বলেন, আমাকে তিনি অনেক পুরানো কাপড়ে দেখে বললেন, তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? আমি বললাম উট, ছাগল. সব ধরনের সম্পদ আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার মাঝে এর নিদর্শন যেন পরিলক্ষিত হয়।

এ বিষয়ে আয়েশা, জাবির ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবুল আহওয়াস রহ.-এর নাম হল আওফ ইবনে মালিক ইবনে নাযলা জুশামী। اَقْرِهٖ অর্থ মেহমানদারী করবে। اَلْقِرٰى অর্থ যিয়াফত করা, মেহমানদারী করা।

حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاؤُا اَفَلَا تَظْلِمُوْا. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

১১৮. আবূ হিশাম রিফা'ঈ রহ... হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অন্ধ অনুকরণকারী হয়ো না যে, তোমরা বলবে, লোকেরা যদি সদ্ব্যবহার করে তবে

আমরাও সদ্ব্যবহার করব। আর তারা যদি অন্যায় আচরণ করে, তবে আমরাও অন্যায় আচরণ করব। বরং তোমাদের হৃদয়ে গেঁথে নাও যে, লোকেরা সদাচরণ করলে তো সদাচারণ করবেই; এমনকি তারা অসদ্ব্যবহার করলেও তোমরা (তাদের সাথে) অন্যায় আচরণ করবে না। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْاِحْسَانُ ঃ ইহসানের অর্থ হল, সৌজন্যমূলক আচরণ। عَفْو এর অর্থ অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া, শাস্তি না দেওয়া। অবশ্য তার মূল অর্থ হল, মিটিয়ে দেওয়া বা চিলুপ্ত করে দেওয়া।

عَنْ اَبِيْهِ ঃ তিনি হলেন মালিক ইবনে নাযলা। কথিত আছে, তাকে মালিক ইবনে আওন ইবনে নাযলাহ আল-জুশামীও বলা হয়। আবুল আহ্ওয়াছের পিতা। খুব অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী রাযি.।

فَلَا يَقْرِيْنِىْ ঃ ى এর উপর যবর। এর তাফসীর হল, পরবর্তী ফে'ল وَلَا يُضَيِّفُنِىْ এখানে ى এর উপর পেশ। ইমাম রাগিব রহ. বলেন, ضَيْف এর মূল অর্থ হল, ঝুঁকে পড়া। যে ব্যক্তি মেহমান হন, তিনিও মেযবানের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আল কাওকাব গন্থে রয়েছে, এখানে قِرْى দ্বারা উদ্দেশ্য হল, খানা খাওয়ানো। আর ضِيَافَة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নিজের ও পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিয়ে নেওয়া।

হাদীসের সারনির্যাস

উক্ত হাদীসের প্রথম অংশের সারনির্যাস হল, মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে নয়; মন্দের বদলা ভালো দিয়ে হওয়া উচিত। একে বলা হয় মাকারিমে আখলাক বা উত্তম চরিত্র।

দ্বিতীয় অংশের মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে পার্থিব নি'আমত দান করেন, তখন তা প্রকাশার্থে নিজের সাধ্য অনুপাতে ভালো পোশাক পরবে। নিয়ত করবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, অপচয়, অপব্যয়, অহংকার ও রিয়া যেন স্পর্শ করতে না পারে।

এ হাদীস দ্বারা আর বুঝা গেল, আল্লাহর নেয়ামত গোপন করা নিন্দনীয়। রূহানি নেয়ামত যেমন ইলম, জ্ঞান-গরিমার ক্ষেত্রেও এ একই কথা।

এ হাদীস দ্বারা আরও প্রতীয়মান হল, অপব্যয় ও কৃত্রিমতা অলৌকিকতা ছাড়া যে কোন পোশাক পরিধান করা জায়েয। গর্ব, অহংকার, লৌকিকতা ও সুখ্যাতির নিয়তে যে কোন পোশাক পরিধান জায়েয নেই।

সুতরাং জোড়া-তালি লাগানো কাপড় পরিধান করার উদ্দেশ্য রিয়া, সুখ্যাতি ও বুযুর্গী দেখানো হয়, তাহলে এটাও নিন্দনীয়

عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُمَيْعٍ ঃ ج এর উপর পেশ, م এর উপর যবর, তাসগীর। তিনি হলেন যুহরী ও মক্কী। কুফায় এসে পরবর্তীতে আবাসন গড়ে তুলেন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, অবশ্য ভুলে যেতেন। তাকে শী'আ মতবাদের অভিযোগ অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে এটা সঠিক নয়, তিনি পঞ্চম স্তরের রাবী ছিলেন।

لَاتَكُوْنُوْا اِمَّعَةً ঃ اِمَّعَةٌ মূলতঃ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে না। যে যে দিকে ডাকে সে দিকেই ঝুঁকে পড়ে। কেমন যেন প্রত্যেককেই বলে– اَنَا مَعَكَ 'আমি তোমার সাথে আছি'। শব্দটি নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। যেমন, اِمْرَأَةٌ اِمَّعَةٌ বলা হয় না।

কেউ কেউ বলেন, হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ ব্যক্তি, যে বলে, মানুষ আমার সাথে যেমন আচরণ করবে, আমিও তার সাথে অনুরূপ আচরণ করব। সদাচারণ করলে সদাচরণ করব। মন্দ আচরণ করলে মন্দ আচরণ করব।

আল্লামা তীবী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিক-নির্দেশনা হল, তোমরা এ ধরনের হবে না। কেননা এটা দ্বীন ও বিবেকের পরিপন্থী কাজ। ভালোর বদলা ভালো দিবে। কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তার সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করবে। কেননা প্রতিশোধ হিসাবে মন্দ কাজের বদলা মন্দ কাজ দ্বারা না দেওয়া 'ইহসান'।

إِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا ঃ এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

(১) কেউ যদি তোমার সঙ্গে অসদাচারণ করে তবে সীমালংঘন না করে প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি তোমার আছে।

(২) অথবা এর অর্থ হল, ঈমানদারদের উচিত সবসময় সদাচারণ করা, এ সদাচরণটা শুধু তাদের সাথেই হবে না, যারা ইহসান করে বরং তাদের সাথেও হতে হবে, যারা খারাপ আচরণ করে। (মাযাহিরে হক)

بَابُ مَاجَاءَ فِى زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ صـ٢١

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩. দীনী ভাইদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِىْ كَبْشَةَ الْبَصْرِىُّ قَالَا ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِىُّ نا أَبُوْسِنَانِ الْقسملىُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِىْ سَوْدَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْزَارَ أَخًا لَهُ فِى اللّٰهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا ، هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَأَبُوْ سِنَانٍ اِسْمُهُ عِيْسٰى بْنُ سِنَانٍ وَقَدْ رَوٰى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ شَيْئًا مِنْ هٰذَا

১১৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার ও হুসাইন ইবনে আবূ কাবশা বসরী রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় বা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার কোন দীনী ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করে, তখন তাকে জনৈক আহবানকারী (ফিরিশতা) ডেকে বলতে থাকেন, 'মঙ্গলময় তোমার জীবন, মঙ্গলময় তোমার পথ চলা, তুমি তো জান্নাতে তোমার আবাস নির্ধারণ করে নিলে!

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। বর্ণনাকারী আবূ সিনান রহ.-এর নাম হল ঈসা ইবনে সিনান। হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ.ও সাবেত – আবূ রাফি' – আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ কিছু রিওয়ায়াত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

أَنْ طِبْتَ ঃ এখানে তিনটি শব্দ অর্থাৎ طِبْتَ এবং طَابَ এবং تَبَوَّأْتَ খবর হিসাবে আনা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়গুলো লাভ করার সুসংবাদ দিচ্ছেন। অথবা এ তিনটি শব্দ جُمْلَه دُعَائِيَه হিসাবেও আসতে পারে।

সাক্ষাতের সুন্নাত ও আদবসমূহ

- কারও নিকট সাক্ষাতের জন্য এমন সময় যাবে না, যখন গেলে তার ঘুম, ওযীফা কিংবা বিশেষ কোন কাজের ব্যঘাত ঘটবে। কারও কাছে পূর্বে না জানিয়ে' (Information) কিংবা নাস্তা বা খাওয়ার সময় যাবে না। গেলে খেয়ে যাবে এবং গিয়েই খাওয়ার কথা জানিয়ে দিবে।
- আগেই অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি না হলে অথবা তিনি বিশেষ কোন কাজে লিপ্ত রয়েছেন। ফলে এ মুহূর্তে সাক্ষাত প্রদান করতে গেলে তার কষ্ট বা ক্ষতি হবে– এরূপ অবস্থা হলে চলে আসা উচিত কিংবা এমন স্থানে বসে তার অপেক্ষা করতে থাকবে, যেন তিনি জানতে না পারেন।

অতঃপর স্বাধীনভাবে যখন তিনি কাজ থেকে অবসর হবেন, তখন সাক্ষাত প্রার্থনা করে এমন স্থানে অপেক্ষায় থাকবে না। যেন তিনি বুঝতে পারেন এবং ব্যস্ততার কারণে সাক্ষাত প্রদান করতে না পেরে বা সময় দিতে না পেরে লজ্জিত হন।

- দেখা হওয়ার পর সালাম দিবে। আর মুসাফাহা ও মু'আনাকার জন্য অগ্রসর হওয়া অপর পক্ষের কাজ। সে স্বেচ্ছায় অগ্রসর না হলে বা কোন বিশেষ কাজে লিপ্ত থাকলে মুসাফাহা-মু'আনাকা করতে গিয়ে তাকে বিব্রত করবে না।
- যদি তার সাথে পরিচয় নতুন হয় কিংবা এত হালকা হয় যে, তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে নিজের পরিচয় বলে দিয়ে তার দ্বিধা দূর করবে। একথা বলে তাকে লজ্জা দিবে না যে, আমাকে চিনতে পারেন নি?
- দীর্ঘ কথা বলতে গেলে তার এত কথা শোনার সময় হবে কিনা তা জেনে নিতে হবে।
- মুরুব্বী ও গুরুজনদের নিকট সাক্ষাতের জন্য যেতে হলে যদি তাদের সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময় থাকে তাহলে সেই নির্ধারিত সময়ে যাবে।
- সাক্ষাতের পর মজলিসের সুন্নাত, আদব ও কথা বলার সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যার সাথে সাক্ষাত প্রার্থনা করা হয় তার কর্তব্য
- কোন বিশেষ ওযর বা একান্ত অসুবিধা না হলে সাক্ষাত প্রদান করতে গড়িমসি করবে না।
- বিশেষ সাক্ষাতপ্রার্থী হলে পরিপাটি হয়ে তার সাথে সাক্ষাত প্রদান করা উত্তম।
- সাক্ষাতপ্রার্থীর জন্য বসা বা স্থান গ্রহণের জায়গা করে দিবে বা মজলিসে স্থান না থাকলে অন্ততঃ একটু নড়েচড়ে বসে তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে। এতে সাক্ষাতপ্রার্থী প্রীত হবে।
- সাক্ষাতপ্রার্থী অপরিচিত হলে তার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চেয়ে তার দ্বিধা-সংকোচকে দূর করবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحَيَاءِ ص۲۱

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪. লজ্জাশীলতা

حَدَّثَنَا اَبُوكُرَيْبٍ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو نَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ، وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَاَبِى بَكْرَةَ وَاَبِى اُمَامَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১২০. আবূ কুরাইব রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। ঈমানের স্থান হল জান্নাত। অশ্লীলতা হল অবাধ্যতা ও অন্যায় আচরণের অঙ্গ অন্যায় আচরণের স্থান হল জাহান্নাম।

এ বিষয়ে ইবনে উমর, আবূ উমামা ও ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নিন্দাবাদ ও সমালোচনার ভয়ে কোন দোষণীয় কাজ করতে মানুষের মধ্যে যে জড়তাবোধ হয়ে থাকে, তাকে বলা হয়, حَيَاء বা লজ্জাশীলতা। এ লজ্জা মানুষকে ভাল কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

উল্লেখ্য যে, কোন ভাল কাজ করতে যদি কখনও জড়তাবোধ হয় তাহলে সেটা লজ্জা বা প্রশংসনীয় গুণ সাব্যস্ত হবে না। যেমন– পর্দা করতে, দাঁড়ি রাখতে বা টুপি মাথায় দিতে জড়তাবোধ হলে এটা লজ্জা নয় বরং হীনমন্যতা।

এমনিভাবে নিজেকে যখন তখন ছোট করে প্রকাশ করা, যেখানে সেখানে চুপ করে থাকা এবং হীনতা প্রকাশ করা এটাও লজ্জা বলে প্রশংসিত হওয়ার নয় বরং এটা হল, স্বভাবগত দুর্বলতা।

যদি কেউ দৈহিক বা আত্মিক শক্তিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে এবং পানাহারের চাহিদা ও আত্মিক কামনাসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে তাহলে তার মধ্যে লজ্জার যথার্থ বিকাশ ঘটবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّأَنِّى وَالْعَجَلَةِ صـ٢١

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫. ধীরতা এবং তাড়াহুড়া

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

১২১. নাসর ইবনে আলী রহ.... আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস মুযানী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সুন্দর আচরণ, ধীরস্থিরতা এবং মধ্যপন্থা হল নবুওয়াতের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَاصِمٍ وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ

১২২. কুতায়বা রহ.... আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস রাযি. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ সনদে আসিম রহ.-এর নাম উল্লেখ নেই। নাসর ইবনে আলী রহ.-এর রিওয়ায়াতটি সহীহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِى جَمْرَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِاَ شَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، وَفِى الْبَابِ عَنِ الْاَشَجِّ الْعُصَرِيِّ

১২৩. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বাযী রহ.... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদে কায়স গোত্রের সর্দার আশাজ্জ রাযি. কে বলেছিলেন, তোমার এমন দুটি গুণ রয়েছে যে দুটি গুণকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। সহিষ্ণুতা এবং ধীরস্থিরতা। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ বিষয়ে আল-আশাজ্জ 'উসারী রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدِيْنِيُّ نَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَنَاءَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ اَهْلُ الْعِلْمِ فِىْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ

১২৪. আবূ মুসআদ মাদানী রহ..... সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ধীরস্থিরতা আল্লাহ থেকে এবং তাড়াহুড়া শয়তান থেকে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কতক হাদীসবিদ আলিম রাবী আবদুল মুহায়মিন ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সমালোচনা করেছেন এবং স্মরণ শক্তির দিক থেকে তাকে যঈফ বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَرْجِسَ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস মুযানী রাযি.। বনু মাখযূমের মিত্র ছিলেন। তাই তাঁকে মাখযূমীও বলা হত। তিনি বসরায় বসবাস করতেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস বসরাবাসীদের মধ্যে বেশী প্রচলিত। তাঁর নিকট থেকে আসিমুল-আহওয়াল রহ. প্রমুখ রেওয়ায়াত করেন। সারজিস নারজিসের ওজনে দুইটি সিন মধ্যে জীম দ্বারা উচ্চারিত। দ্রুত কাজ করা দু'প্রকার।

প্রথমতঃ কোন জিনিসের জন্য তাড়াহুড়া করা। যেমন, নামাযের সময় হলে নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করা। এটা প্রশংসনীয়।

দ্বিতীয়তঃ কোন জিনিসের মধ্যে তাড়াহুড়া করা। যেমন, তড়িঘড়ি করে নামায পড়ে ফেলা। এটা দোষণীয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা উসমানী রহ. বলেন, নেক কাজের প্রতিযোগিতা করা প্রিয় ও প্রশংসনীয়। অন্যান্য জিনিসে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালান দোষণীয়। যেমন, অর্থ-সম্পদ উপার্জনে, সম্মান-প্রতিপত্তি, খ্যাতি লাভে, পদ-মর্যাদার লোভে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করা দোষণীয়।

অতএব নেক কাজের আকাংখা মনে জাগার সাথে সাথে চট-জলদি শুরু করে দাও। বিলম্ব করে আগামীকালের জন্য তা ফেলে রেখ না।

اَلْاِقْتِصَادُ ঃ এর অর্থ হল, প্রতিটি কাজে সর্বাবস্থায় মধ্যবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। চরমপন্থা ও শিথিলপন্থা থেকে বেঁচে থাকে। যেমন, ব্যয়ের ক্ষেত্রে না অপচয় করা না বখিলী করা বরং মধ্যপন্থা তথা উদারতা অবলম্বন করা। অনুরূপভাবে আকীদা, আমল, মু'আমালা, মু'আশারা তথা মানবজীবনের প্রতিটি শাখায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। কুরআন মজীদে এসেছে جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا এ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য।

جُزْءٌ مِّنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ النُّبُوَّةِ ঃ এ হাদীসে তিনটি গুণকে নুবওয়াতের একটি অংশ বলা হয়েছে অথবা তিনটি মিলে নবুওয়াতের একাংশ কিংবা প্রত্যেকটিই পৃথকভাবে নবুওয়াতের একাংশ হতে পারে।

নবুওয়াতের অর্থ হওয়ার অর্থ কি ?

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, اِنَّهَا جُزْءٌ مِّنْ خَصَائِلِ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْخَصَائِلَ مِنْ شَمَائِلِ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ এসব গুণ নবীদের স্বভাবের একাংশ। আর এসব স্বভাব নবীদের জন্মগত স্বভাবের একাংশ।

আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন– اِنَّ هٰذِهِ الْخَصَائِلَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَا اِلَيْهَا الْاَنْبِيَاءُ "এসব স্বভাবসহ আম্বিয়ায়ে কিরাম এসেছেন এবং মানুষকেও এগুলো অর্জনের প্রতি দাওয়াত পেশ করেছেন।"

কারও কারও অভিমত হল, এর হাকীকত একমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসূল জানেন যে, কেন এসব খাসলতকে নবুওয়াতের অংশ বলা হয়েছে।

বিরোধ নিরসন

এখানে হাদীসটির সাথে অন্য হাদীসের বাহ্যিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেননা আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। হযরত আনাস রাযি. বর্ণিত হাদীসে পঁচাত্তর ভাগের এক ভাগ করা হয়েছে। অথচ এ হাদীসে বলা হয়েছে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

এর উত্তর হল, মূলতঃ হাদীসসমূহে সংখ্যা নির্ধারণ উদ্দেশ্য নয় বরং আধিক্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তাছাড়া হতে পারে ভিন্ন কোন রহস্য রয়েছে। (তুহফাতুল আহওয়াযি)

لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ ঃ আব্দুল কায়েসের আশাজ্জ। ইযাফত সহকারে। কোনও কোনও সংস্করণে যবর সহকারে আছে। এটি গায়রে মুনসারিফ। আব্দুল কায়েস হল, একটি বড় গোত্র। তারা বাহরাইনে বসবাস করত। তাদের

সম্বোধন করা হয় আব্দুল কায়েস ইবনে আকসার দিকে। এটি রবী'আ ইবনে নাযার এর শাখাগোত্র। এর দ্বিতীয় ভাই ছিল মুযার গোত্র। যাদের সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । আশাজ্জের নাম হল, মুনযির ইবনে আ'ইয। উল্লেখ্য, তাদের গোত্রনেতার উপাধি ছিল, আশাজ্জ।

প্রতিনিধি দল মদীনায় কিভাবে এলো ?

আব্দুল কায়েস প্রতিনিধি দলের মদীনায় আসার ঘটনা হল, আব্দুল কায়েস গোত্রের এক ব্যক্তি ছিলেন মুনকিয ইবনে হাইয়্যান। তিনি বাণিজ্যিক কাজে বাহরাইন থেকে মদীনায় এসেছিলেন। একদিন তিনি মদীনার বাজারে ছিলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। মুনকিয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখে দাঁড়িয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বাহরাইনের খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর জাতির সম্ভ্রান্ত নেতাদের নাম ধরে ধরে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। আশাজ্জ উপাধিপ্রাপ্ত গোত্রনেতা মুনযির ইবনে আইযের নাম বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করলেন। ফলে মুনকিয বিস্ময়াভিভূত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তারপর সূরা ফাতিহা ও সূরা ইকরা শিখেন। তিনি যখন দেশে ফেরার প্রস্তুতি নেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গোত্রনেতাদের নামে চিঠি লিখে তাঁর হাতে দেন। কিন্তু তিনি কিছুকাল পর্যন্ত নিজের ইসলামের কথা গোপন রাখলেন এবং চিঠিও গোপন রাখলেন। মুনকিযের স্ত্রী ছিল আশাজ্জের মেয়ে। এ সুবাদে মুনকিযের স্ত্রী কয়েকবার তার নামাযের কথা পিতা আশাজ্জের নিকট বর্ণনা করেন। আশাজ্জ এসব শুনে একদিন জামাতা মুনকিযের সাথে সাক্ষাত করেন। মুনকিয পুরা ঘটনা খুলে বললেন এবং পবিত্র চিঠিও প্রদান করেন। ফলে প্রভাবিত হয়ে আশাজ্জ ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর একটি প্রতিনিধি দল প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে পাঠান। এ সেই প্রতিনিধি দল, যাদের কথা আলোচ্য হাদীসে এসেছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرِّفْقِ صـ٢١

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬. নম্রতা

حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِى عُمَرَ نَا سُفْيٰنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُمَلَّكٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ اُعْطِىَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِى هُرَيْرَةَ هٰذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১২৫. ইবনে আবূ উমর রহ.... আবূ দারদা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যাকে নম্রতার অংশ দেওয়া হয়েছে, তাকে কল্যাণের অংশ প্রদান করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি নম্রতার অংশ থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণের অংশ থেকে বঞ্চিত। এ বিষয়ে আয়শা, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কোমল আচরণ ও স্নেহ-মমতা উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। হৃদয়ের যে কমনীয়তা, মাধুর্য, আবেগ, অনুরাগ এবং অনুগ্রহ, ক্ষেত্র বিশেষে সেটাকে স্নেহ-মমতা বলা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেটাকে প্রেম-ভালবাসা বলে ব্যক্ত করা হয়। আবার গুরুজন ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রতি সেটাকে নিবেদন করা হলে তা ভক্তি-শ্রদ্ধা বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। তদ্রুপ এ সব অনুভূতি যখন মনের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বজনীন মানুষের প্রতি মানুষ হিসাবে নিবেদিত হয় তখন তাকে বলা হয় সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। আর শুধু মুসলমানদের প্রতি নিবেদিত হলে সেটাকে বলা হয় ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। আলোচ্য হাদীসে এরই প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ ص۲۱

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭. মজলুমের দু'আ

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ نَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَاَبُوْ مَعْبَدٍ اِسْمُهُ نَافِذٌ، وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَبِىْ سَعِيْدٍ

১২৬. আবূ কুরাইব রহ.... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআযকে ইয়ামানে প্রেরণকালে বলেছিলেন, মজলূমের (বদ) দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা এ বদদু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই। এ বিষয়ে আনাস, আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং আবূ সাঈদ রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। রাবী আবূ মা'বাদ রহ. এর নাম হল নাফিয।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بَعَثَ مُعَاذًا ঃ مُ এর উপর পেশ। মু'আয ইবনে জাবাল ইবনে আ'মর ইবনে আওস আনসারী, খাযরাজী রাযি.। কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ। মদীনার আনসারদের যে ৭০ (সত্তর) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বিতীয় বাই'আতে আকাবায় উপস্থিত ছিলেন, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি বদর ও পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ৯ম হিজরীতে কাযী ও মু'আল্লিম পদে নিযুক্ত করে ইয়ামান দেশে পাঠান। হযরত উমর রাযি. তাঁর খেলাফত আমলে হযরত আবু উবায়দাহ রাযি. এর পরে তাঁকে সিরিয়ার শাসক নিযুক্ত করেন। ১৮ হিজরী সালে সিরিয়ায় আমওয়াসের প্লেগ রোগে ৩৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। হযরত মু'আয রাযি. ১৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন। তাঁর নিকট হতে হযরত উমর রাযি., ইবনে উমর রাযি. ও ইবনে আব্বাস রাযি. -সহ বহুলোক হাদীস রেওয়ায়াত করেন। মযলুম ব্যক্তির বদ দু'আ আল্লাহ তা'আলা দ্রুত কবুল করেন। কেননা মযলুম অন্তর সাধারণতঃ দুর্বল ও ভঙ্গুর হৃদয়ের হয়ে থাকে। মযলুম কাফির হলেও আল্লাহ তা'আলা তার বদ দু'আ কবুল করেন। (আল-কাওকাব)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ خُلُقِ النَّبِيِّ ﷺ ص۲۱

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ اُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا وَمَا مَسَسْتُ خَزًّا قَطُّ وَلَا حَرِيْرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلَا عِطْرًا كَانَ اَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْبَرَاءِ هٰذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১২৭. কুতায়বা রহ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দশ বছর খেদমত করেছি। তিনি কখনও আমাকে "উফ" পর্যন্ত বলেননি। কোন কিছু করে ফেললে, সে সম্পর্কে কখনও বলেননি- কেন তুমি তা করলে ? কোন কাজ না করলেও কখনও বলেননি, কেন তা করলে না ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন, সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ। রেশম বা খায বা অন্য যাই হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের তালু অপেক্ষা কোমল কিছু আমি কখনও স্পর্শ করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘাম অপেক্ষা সুঘ্রাণযুক্ত কোন মিশ্‌ক আম্বর বা আতরের গন্ধ কখনও আমি নেইনি।

এ বিষয়ে আয়েশা ও বারা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ نَا اَبُو دَاؤدَ اَنْبَأنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِىَّ يَقُولُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَلاَ صَخَّابًا فِى الْاَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِىْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِىُّ اِسْمُهُ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ وَيُقَالُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدٍ

১২৮. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ...... আবূ আবদুল্লাহ জাদালী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযি.-কেরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, তিনি অশ্লীল বা কটূভাষী ছিলেন না। ভাল করেও অশ্লীল কথা তিনি বলেননি। তিনি বাজারে চিৎকার করতেন না। অন্যায় আচরণের মাধ্যমে অন্যায়ের বদলা নিতেন না বরং তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন এবং তা উপেক্ষা করতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। রাবী আবূ আবদুল্লাহ জাদালী রহ.-এর নাম আবদ ইবনে আবদ। আবদুর রহমান ইবনে আবদ বলেও কথিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত আনাস রাযি. রাসূল ﷺ এর কত বছর খেদমত করেছেন ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন। তখন হযরত আনাস রাযি.-এর বয়স এ বর্ণনা মতে আট অথবা দশ বছর ছিল। হযরত আনাস রাযি.-এর মা ছিল উম্মে সালীম। বিয়ে হয়েছে আবু তালহার সাথে। আনাস রাযি. ছিলেন উম্মে সালীমের আগের ঘরের সন্তান। একদিন আবু তালহা রাযি. উম্মে সালীমের সন্তান আনাস রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিয়ে আসলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস হুঁশিয়ার ছেলে। আপনার খেদমত করবে। সেই থেকে হযরত আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমত করেছেন। এক বর্ণনা মতে নয় বছর। আর উপরিউক্ত হাদীস মতে দশ বছর। মূলতঃ উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, নয় বছরের বর্ণনাতে বাড়তি অর্ধ্ব বছর বাদ দেওয়া হয়েছে। আর দশ বছরের বর্ণনায় অর্ধ্ব বছরকে এক বছর ধরা হয়েছে। কেননা খেদমত ছিল মূলতঃ সাড়ে নয় বছর।

مَاقَالَ لِىَ اُفٍّ قَطُّ : ء এর উপর পেশ, ف এর নিচে যের, তানবীনসহ অথবা তানবীন ছাড়া। কিংবা ف এর উপর যবর, তানবীনসহ বা তানবীন ছাড়া। অনেক লোগাত পাওয়া যায়। ইমাম নববী রহ. বলেছেন, কাযী ইয়ায রহ. এর মতে اُفّ এর মধ্যে ১০টি লোগাত আছে। কামূস -এর বর্ণনা মতে এর মধ্যে ৪০টি লোগাত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জিনিস সম্পর্কে উফ পর্যন্ত না বলা, এটা তাঁর পরিপূর্ণ চরিত্র ও

নেহায়েত বিনয়ের কারণে ছিল। এটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দিতেন। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের এতটুকু ইজ্জত কেউ নষ্ট করলে এর প্রতিশোধ অবশ্যই নিতেন।

وَلَامَسَسْتُ خَزًّا ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হস্ত মুবারক অত্যন্ত নরম ছিল। তবে জিহাদের ময়দানে অত্যন্ত শক্ত হয়ে যেত। এটা ছিল তাঁর মু'যিজা।

وَلَاشَمَمْتُ مِسْكًا ঃ এটা কোন অতিশয়োক্তি কিংবা অতি ভক্তির কথা নয় বরং এটাই ছিল বাস্তব। তাঁর ঘাম মুবারকও ছিল আতরের চেয়ে অধিক খোশবুদার। প্রশ্ন হয়, তাহলে তিনি খোশবু ব্যবহার করতেন কেন? এর উত্তর হল, যেহেতু খোশবু ব্যবহার করা ছিল সকল নবীর সুন্নাত। আর তিনিও একজন নবী হিসাবে এ সুন্নাত অব্যাহত রেখেছেন। (আল-কাওকাব, খাসায়েলে নববী)

হাদীসে মুসালসাল বিল মুসাফাহ

আনাস রাযি. বর্ণিত হাদীসটি হাদীসে মুসলসাল-এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসটির শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করে হাদীসটিকে مُسَلْسَلْ بِالْمُصَافَحَةِ বলা হয়। কেননা বর্ণিত আছে, হযরত আনাস রাযি. একদিন অত্যন্ত আবেগ ও মহব্বতের সাথে হাদীসে উল্লেখিত মুসাফাহার বিষয়টি বলছিলেন। তার সামনে শাগরিদ উপস্থিত। সে হাদীসটি শোনার পর বলে উঠল, আমিও ঐ হাতে মোসাফাহা করতে চাই, যে হাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাতের সাথে মোসাফাহা করেছে। তারপর থেকে এ সিলসিলা আজ চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত চলছে। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. তার 'মুসালসালাত' নামক কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

لَمْ يَكُنْ فَاحِشًاوَلَامُتَفَحِّشًا ঃ অনেক মানুষ স্বভাবগতভাবে অশ্লীল ও অহেতুক কথা বলে। আবার কেউ কেউ আড্ডা জমানোর লক্ষ্যে উদ্ভট মনগড়া অশ্লীল কথা বলে। হযরত আয়েশা রাযি. উভয় প্রকার অশ্লীলতাকে নিষেধ করলেন।

وَلَا صَخَّابًا ঃ প্রয়োজনে বাজারে গমন করাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সেখানে গিয়ে হৈ চৈ করা কিংবা আড্ডায় মেতে উঠা নিজের মান-সম্মান ও ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী। (খাসায়েলে নববী)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ حُسْنِ الْعَهْدِ ص ٢١

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯. উত্তম ওয়াদা পালন

حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِىُّ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ وَمَابِىْ اَنْ اَكُوْنَ اَدْرَكْتُهَا وَمَاذَاكَ اِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهَا وَاِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةَ فَيُهْدِيْهَا لَهُنَّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

১২৯. আবূ হিশাম রিফাঈ রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অর্ধাঙ্গিনীদের মধ্যে হযরত খাদীজা রাযি. -এর মত আর কারও প্রতি আমার এত ঈর্ষা (গায়রত) হয়নি। অথচ তাঁকে আমি পাইনি। আর এর কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা খুবই আলোচনা করতেন। তিনি কোন বকরী যবাহ করলে খাদীজা রাযি.-এর বান্ধবীদের তালাশ করে তাদেরকে তা হাদিয়া পাঠাতেন। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَا بِى اَنْ اَدْرَكْتُهَا ঃ হযরত আয়েশা রাযি.-এর আত্ম-মর্যাদাবোধ জেগে উঠা কোন দোষণীয় নয়। কেননা এটা নারীদের স্বভাবগত। তবে এক্ষেত্রে সীমালংঘন করা অবশ্যই নিন্দনীয়। কেউ কেউ উক্ত বাক্যের মর্মার্থে বলেন, আয়েশা রাযি. বলেন, আমার আত্মমর্যাদাবোধ এ জন্য জেগে উঠত যে, আমি যদি খাদীজার যুগ পেতাম! যদি তাঁর মত সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম!

بَابُ مَاجَاءَ فِى مَعَالِى الْاَخْلَاقِ صـ٢٢

অনচ্ছেদ ঃ ৭০. মহৎ চারিত্রিক গুণ

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ نَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ثَنِى عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَحَاسِنَكُمْ اَخْلَاقًا وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدِكُمْ مِنِّى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارِيْنَ وَالْمُتَشَدِّقِيْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالَ اَلْمُتَكَبِّرُوْنَ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ اَلثَّرْثَارُ هُوَ كَثِيْرُ الْكَلَامِ وَالْمُتَشَدِّقُ هُوَ الَّذِى يَتَطَاوَلُ عَلَى النَّاسِ فِى الْكَلَامِ وَيَبْذُوْ عَلَيْهِمْ وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ وَهٰذَا اَصَحُّ

১৩০. আহমদ ইবনে হাসান ইবনে খিরাশ বাগদাদী রহ...... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ও ব্যবহার ভাল, সে ব্যক্তি আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামত দিবসে সে আমার সবচেয়ে নিকট অবস্থান করবে। আর আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে যারা আমার থেকে দূরে থাকবে। সেই ব্যক্তিরা হল, যারা ছারছারূন তথা অনর্থক বক বক করে, মুতাশাদ্দিকুন যারা উপহাস করে এবং মুতাফায়হাকূন যারা অহংকার প্রদর্শন করে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছারছারূন এবং মুতাশাদ্দিকুন তো আমরা জানি কিন্তু মুতাফায়হাকূন কি ? তিনি বললেন, যারা অহংকার করে।এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, ও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি এ সনদে গরীব। اَلثَّرْثَارُ যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে। اَلْمُتَشَدِّقُ যে ব্যক্তি কথাবার্তায় লোক সমাজে অহংকার প্রদর্শন করে এবং অন্যদের উপর অশ্লীল ও উপহাসমূলক কথা প্রয়োগ করে। কতক রাবী এ হাদীসটিকে মুবারক ইবনে ফাযালা – মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির – জাবির রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আবদ রাব্বিহী ইবনে সাঈদ রহ.-এর নাম উল্লেখ নেই। এটি অধিকতর সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَعَالِى الْاَخْلَاقِ ঃ এটি مَعْلَاةٌ এর বহুবচন। কামূস গ্রন্থে এসেছে, معلاة এর অর্থ হল, মর্যাদা লাভ করা।

اَلثَّرْثَارُوْنَ ঃ দ্বীনী ও প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া বেশি কথা বলাও একটি বদ অভ্যাস। এর দ্বারাও মানুষ শত শত

গুনাহে লিপ্ত হয়। যেমন– মিথ্যা বলা, গীবত করা, নিজের বড়ত্ব বয়ান করা, কাউকে অভিশাপ দেওয়া, কারও সাথে অহেতুক তর্ক জুড়ে দেওয়া, অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এর বিপরীতে কম কথা বলার অভ্যাস থাকলে বহু পাপ থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

اَلْمُتَشَدِّقُوْنَ ঃ এখানে উদ্দেশ্য, অসতর্কভাবে অনর্থক কথা বলা। কেউ কেউ বলেন, ঠাট্টা-মশকারি করা। اَلشِّدْقُ এর অর্থ, মুখের এক পার্শ্ব।

اَلْمُتَفَيْهِقُوْنَ ঃ এটি اَلْفَهْقُ থেকে উৎসারিত। অর্থ হল, ভর্তি বা পূর্ণ হয়ে যাওয়া। এটি পূর্বের শব্দের ব্যাখ্যা। যারা বাছ-বিচার ছাড়াই বেশি কথা বলে এবং দুর্লভ ভাষা-সাহিত্য দিয়ে নিজের বড়ত্ব ও মর্যাদাকে প্রকাশ করে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাখ্যায় اَلْمُتَكَبِّرُوْنَ শব্দে দিয়েছেন।

এ রোগের চিকিৎসা

এ রোগের চিকিৎসা নিম্নরূপ–

- কথা বলার পূর্বে চিন্তা করে নেওয়া। সাওয়াবের বা প্রয়োজনীয় হলে বলা আর অনুরূপ না হলে বর্জন করা। উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনীয় কথা তিন প্রকার। যথাঃ (১) নেকি অর্জনের উদ্দেশ্যে কথা বলা। (২) গুনাহ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বলা। (৩) যা না বললে দুনিয়াবী ক্ষতি হয়।
- নফ্স ভেতর থেকে কথা বলার জন্য খুব বেশি তাগাদা করলে তাকে এ বলে বুঝানো যে, এখন চুপ থাকতে যে কষ্ট তার থেকে অধিক কষ্ট হবে দোযখের আযাবে। একান্ত না বলে থাকতে না পারলে অল্প বলে চুপ হয়ে যাবে। এভাবে কথা কম বলার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

بَابُ مَاجَاءَفِى اللَّعْنِ وَالطَّعْنِ ص۲۲

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১. লা'নত এবং গালি-গালাজ করা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ نَا اَبُو عَامِرٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا

وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ لَا يَنْبَغِىْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا

১৩১. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন লা'নতকারী হয় না। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। কতক রাবী উক্ত সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিনদের জন্য লা'নতকারী হওয়া পছন্দনীয় নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَللَّعْنُ وَالطَّعْنُ ঃ লা'নত অর্থ দূরীভূত করা। কাফিরদের ক্ষেত্রে লা'নত হল, আল্লাহর রহমত থেকে দূর করা। আর ফাসিকের ক্ষেত্রে লা'নত হল, ঐ সকল খাছ রহমত থেকে দূরীভূত করা, যেসব রহমত আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাদের উপর বর্ষণ করেন।কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয় যে, অপর মুসলমান ভাইয়ের উপর বদদু'আ করবে। আর আল্লাহর লা'নত ইত্যাদি বাক্যে বদদু'আ করা তো অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ এবং গুনাহ। কারও জন্য অভিশম্পাত করা। যেমন– তোর উপর আল্লাহর লা'নত, তোর উপর আল্লাহর গযব ইত্যাদি বলা নাজায়িয।

অনুরূপভাবে কাউকে তিরস্কার করা, দোষারোপ করাও নাজায়িয। এখানে لَعَّانٌ মুবালাগার সীগাহ আনা হয়েছে। কারণ, অল্প-সল্প লা'নত থেকে বেঁচে থাকাটা বিরল। ইবনুল মালিক বলেন, আতিশয্য বুঝানোর শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এ দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, অনিচ্ছাকৃত এক দু'বার লা'নতবাক্য প্রকাশ পেলে গুনাহ হবে না।

بَابُ مَاجَاءَفِى كَثْرَةِ الْغَضَبِ صـ٢٢

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২. অধিক ক্রোধ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا وَلَا تُكْثِرْ عَلَىَّ لَعَلِّىْ اَعِيَهُ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَا تَغْضَبْ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَاَبُوْ حُصَيْنٍ اِسْمُهٗ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَسَدِىُّ

১৩২. আবূ কুরাইব রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। আমার জন্য যেন তা বেশী না হয়ে যায়। আমি যেন তা আত্মস্থ করতে পারি। তিনি বলেন, রাগ করবে না। লোকটি তার প্রশ্নের কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল। প্রতিবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, রাগ করবে না। এ বিষয়ে আবূ সাঈদ এবং সুলায়মান ইবনে সুরাদ থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ সূত্রে গরীব। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ রহ.-এর নাম উসমান ইবনে আসিম আসাদী।

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ ثَنِىْ اَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّنَفِّذَهٗ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ فِىْ اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

১৩৩. আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ দূরী প্রমুখ রহ... সাহল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস জুহানী তাঁর পিতা (মু'আয ইবনে আনাস) জুহানী রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সকল মানুষের সমক্ষে ডাকবেন এবং যে কোন হূরকে সে চায় তাকে গ্রহণের ইখতিয়ার দিবেন। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْغَضَبُ ঃ غ এর উপর যবর, ض এর উপর যবর। এটি সন্তোষের বিপরীত। অর্থাৎ ক্রোধ। কেউ কেউ বলেন, গযবের অর্থ হল, কষ্টদায়ক জিনিস বা বিষয় প্রতিহত করার জন্য অথবা কোন পীড়াদায়ক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অন্তরে উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি হওয়া।

প্রশ্নকারী লোকটির মাঝে গোস্বার অভ্যাস বেশি ছিল। এজন্য সে যতবারই বলেছে, আমাকে কিছু শেখান, ততবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়েছেন, গোস্বা কর না। এটা ছিলরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামএর চিকিৎসা পদ্ধতি। রোগীর রোগ নির্ণয় করে তিনি চিকিৎসা করতেন। তাছাড়া গোস্বার একটা কুপ্রভাব মানুষের বাইরে ও ভেতরে সমভাবে প্রকাশ পায়। মানুষ এ গোস্বার কারণে সহজেই শয়তানের জালে আটকা পড়ে। এর কারণে হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার প্রকাশ পায়। অনেক ক্ষেত্রে গোস্বা মানুষকে কুফরের দিকে টেনে নেয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত উপদেশ বারবার করেছেন। (মুজাহেরে হক)

গোস্বার হাকীকত ও প্রকারভেদ

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রক্তের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয়, গোস্বা। গোস্বা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এর জন্য মানুষ দায়ী নয়। তবে গোস্বা চরিতার্থ না করা মানুষের ইচ্ছাধীন। তাই এর জন্য সে দায়বদ্ধ।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, গোস্বা বা ক্রোধের মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলা হয় বীরত্ব। আল্লাহর নিকট বীরত্ব পছন্দনীয়। গোস্বা অতিরিক্ত হওয়াও দূষণীয়। কম হওয়াও দূষণীয়। গোস্বার আধিক্যতাকে দুঃসাহস এবং স্বল্পতাকে কাপুরুষতা বলে। বলাবাহুল্য, এ দুটি অবস্থাই নিন্দনীয়। গোস্বার মধ্যবর্তী অবস্থায় নম্রতা, দয়া, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, ধৈর্য্য, স্থিরতা, ক্রোধ দমনে সক্ষমতা, কাজে দূরদর্শিতা এবং গাম্ভীর্যের উদয় হয়ে থাকে। গোস্বার আধিক্যে অদূরদর্শিতা, অস্থিরতা, ক্রোধান্বতা, অহংকার, আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গোস্বার স্বল্পতার কারণে কাপুরুষতা, ভীরুতা, আত্মসম্মান, জ্ঞানহীনতা এবং নীচুতার যাবতীয় নিদর্শন প্রকাশ পায়।

গোস্বা দমনের পন্থা

- গোস্বা আসলেই أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে নেওয়া এবং لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ পড়া।
- যার উপর গোস্বা করা হয় তাকে সম্মুখ থেকে সরিয়ে দেওয়া কিংবা নিজে অন্যত্র সরে পড়া।
- তারপর এ চিন্তা করা যে, আমার নিকট সে যতটুকু অপরাধী, আমি আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বেশি অপরাধী। আমি যেভাবে চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, তেমনি আমারও উচিত তাকে ক্ষমা করা।
- এতেও গোস্বা না থামলে দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে পড়বে।
- তাতেও রাগ না গেলে ঠাণ্ডা পানি পান করবে বা অযূ কিংবা গোসল করে নিবে।
- এ চিন্তা করবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। অতএব আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করার কে?
- স্বভাবগত যিনি বেশি রাগী, তার রাগ দমনের পন্থা হল, যার উপর রাগ করা হয়, জনসমুক্ষে তার হাত পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তার জুতা সোজা করে দিবে। দু'একবার এরূপ করলেই রাগের হুঁশ ফিরে আসবে। (শরী'আত ও তরীকত, আহকামে যিন্দেগী)

دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ...الخ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিবসে সমস্ত মাখলুকের সামনে তার সনাম করবেন। তার প্রশংসা করবেন এবং এর উপর গৌরব প্রকাশ করবেন। ঘোষণা দিবেন এই সেই ব্যক্তি, যার মাঝে এত বড় গুণ আছে।

حَتّٰى يُخَيِّرَاللّٰهُ ঃ গোস্বা নিয়ন্ত্রণকারী এত মর্যাদা দান করা হবে কেন ? কারণ গোস্বা মূলতঃ নফসে আম্মারার একটা লম্ফ-ঝম্ফের নাম। আর যে গোস্বা দমন করল, সে যেন নফসে আম্মারাকে পিষে ফেলল। বলা বাহুল্য, গোস্বা নিয়ন্ত্রণকারী যদি এ মহান মর্যাদার অধিকারী হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির মযাদা কোথায় হবে যে ব্যক্তি গোস্বা নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি গোস্বাকৃত ব্যক্তির সাথে সদাচারণ করেছে। –তুহফাহ অবলম্বনে

بَابُ مَاجَاءَ فِى اِجْلَالِ الْكَبِيْرِ صـ٢٢
অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩. বড়কে সম্মান করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا يَزِيْدُ بْنُ بَيَانٍ الْعُقَيْلِىُّ ثَنِى اَبُو الرِّجَالِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهٖ اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهٗ مَنْ يُّكْرِمُهٗ عِنْدَ سِنِّهٖ

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ هٰذَ الشَّيْخِ يَزِيْدَ بْنِ بَيَانٍ وَاَبُو الرِّجَالِ الْاَنْصَارِىُّ اُخَرُ

১৩৪. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ...... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন যুবক যদি বয়সের কারণে কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার বৃদ্ধ বয়সে তার জন্য এমন লোক নিয়োগ করে দিবেন, যারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি গরীব। এ শায়খ অর্থাৎ ইয়াযীদ ইবনে বয়ান রহ.-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। সনদে অপর একজন আবূ রিজাল আনসারী রহ. নামক রাবী রয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত মাওলানা তাকী উসমানী দা. বা. এ প্রসঙ্গে মূলনীতি স্বরূপ বলেন, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবি হল, বড়রা কোন কাজের নির্দেশ দিলে তা পালন করা। যদিও তা ভদ্রতা পরিপন্থী হয় এবং ভদ্রতার দাবি মতে তা পালনযোগ্য নাও হয়। কারণ, ভদ্রতার চেয়েও নির্দেশ পালনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, একজন বুযুর্গ বিশেষ কোন আসনে বসে আছেন। হয়ত তিনি খাটে উপবিষ্ট। এক লোক বুযুর্গের চেয়ে ছোট। সে বুযুর্গের কাছে আসল। বুযুর্গ তাকে বলল, ভাই! তুমি এখানে চলে আস, আমার কাছে বস। তখন বুযুর্গের কথা মত তার কাছে বসতে হবে। যদিও তাঁর মত বুযুর্গের সঙ্গে একই আসনে বসা আদব পরিপন্থী। এমন নির্দেশ পালন করা যদিও ভদ্রতার অনুকূলে নয়, তবুও মানতে হবে। কেননা এটা বড়র নির্দেশ। বড়র নির্দেশ পালন করাই হল, বড়র প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন।

এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতের বরকতে দ্বীন-দুনিয়ার অনেক বড় পুরস্কার ও সাওয়াব লাভ করেছেন। তিনি প্রায় একশ' তিন বছর অত্যন্ত পবিত্র ও সাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদও দান করেছেন, আবার প্রচুর সন্তান-সন্তুতিও তিনি লাভ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُتَهَاجِرِيْنَ صـ٢٢
অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪. পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারী প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ فِيْهِمَا لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ اِلَّا الْمُتَهَاجِرِيْنَ يَقُوْلُ رُدُّوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَيُرْوٰى فِىْ بَعْضِ الْحَدِيْثِ ذَرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ الْمُتَهَاجِرِيْنَ يَعْنِى الْمُتَصَارِمِيْنَ وَهٰذَا مِثْلُ مَارُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ

১৩৫. কুতাইবা রহ....... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারী ব্যক্তিদ্বয় ব্যতীত যারা শিরক করে নিই। তাদের সকলকেই মাফ করে দেওয়া হয়। পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারীদ্বয় সম্পর্কে বলা হয়, পরস্পর সমঝোতা স্থাপন না করা পর্যন্ত এদের দু'জনের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে দাও। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, পরস্পর সমঝোতা স্থাপন না করা পর্যন্ত এদের ব্যাপারটি স্থগিত রাখ।

اَلْمُتَهَاجِرَيْنِ অর্থ, পরস্পরে সম্পর্ক কর্তনকারীদ্বয়। এটি হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত এ হাদীসটির মত; তিনি বলেন, কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় তার (কোন মুসলিম) ভাইকে তিন দিনের অধিক পরিত্যাগ করে রাখা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ ঃ শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. লিখেছেন, দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিবেন– এর দ্বারা একথার প্রতি ইংগিত দেওয়া হয়েছে যে, এ দুই বান্দাকে অনেক মাগফিরাত দান করা হবে। আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, সঠিক কথা হল, হাদীসকে তার যাহেরী অর্থেই নেওয়া উচিত। অতএব হাদীসের অর্থ হবে, তাদের জন্য জান্নাতে আটটি স্তর কিংবা আটটি বালাখানা খুলে দেওয়া হবে। (তুহফাহ, তাকমিলাহ)

فَيُغْفَرُفِيْهِمَا ঃ আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, এখানে মাগফিরাত দ্বারা উদ্দেশ্য, সগীরা গুনাহ ক্ষমা করবেন। কেননা শরী'আতের সর্বজন স্বীকৃত নীতি হল, কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না।

اِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ ঃ পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারীর সগীরা গুনাহও মাফ হয় না। কেউ কেউ বলেছেন, সগীরা গুনাহ অবশ্য তাদের মাফ হয়। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ তাদের কাঁধে থেকে যায়, যা কবীরা গুনাহ। –তাকমিলাহ

رُدُّوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের বলেন, তাদের ব্যাপারটি বিলম্বিত কর। তারপর যখন তারা সমঝোতা ও মীমাংসা করে আসবে, তখন তাদের এ গুনাহ এবং অন্যান্য সগীরা গুনাহ মাফ করে দিবেন। –তাকমিলাহ

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّبْرِ صـ٢٢

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫. ধৈর্য ধারণ

حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ نَا مَعْنٌ نَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْا فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ وَاَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَيُرْوٰى هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مَالِكٍ فَلَنْ اَذْخَرَهُ عَنْكُمْ وَيُرْوٰى عَنْهُ فَلَمْ اَذْخَرَهُ عَنْكُمْ وَالْمَعْنٰى فِيْهِ وَاحِدٌ يَقُوْلُ لَنْ اَحْبِسَهُ عَنْكُمْ

১৩৬. আনসারী রহ...... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। আনসারের কিছু লোক একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের কিছু সাহায্য দিলেন। এরপর তারা আবার

সাহায্য চাইলে তিনি তাদের তা দিলেন। অনন্তর বললেন, আমার কাছে যে অর্থ সম্পদ আছে তোমাদের না দিয়ে আমি তা কখনও পুঞ্জিভূত করে রাখি না। যে মুখাপেক্ষীহীন হতে চায়, আল্লাহ তাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেন। যে ব্যক্তি (যাঞ্চা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের তাওফীক চায় আল্লাহ তাকে সবরের তাওফীক দিয়ে দেন। ধৈর্য ধারনের চেয়ে ভাল এবং বিপুল কোন সম্পদ কাউকে প্রদান করা হয়নি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মালিক রহ. সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। এতে হযরত আনাছ থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ তার বরাতে এও বর্ণিত আছে যে, فَلَنْ اَدْخَرَهُ عَنْكُمْ মর্ম একই। অর্থাৎ তিনি বলেছেন, তোমাদের না দিয়ে আমি তা (সম্পদ) জমা করে রাখি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ثُمَّ سَأَلُوا فَأَعْطَاهُمْ ঃ এখানে বুখারী এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনায় حَتَّى مَا نَفِدَ عِنْدَهُ অতিরিক্ত আছে। এ হাদীসে উদ্বোদ্ধ করা হয়েছে। মানুষের কাছে হাত না পাতা এবং অল্পেতুষ্টির প্রতি। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত পাতে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের মুখাপেক্ষি করেন না। ফলে তার আত্মমর্যাদাবোধ টিকে থাকে। অল্পেতুষ্টির গুণ সে সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। আর যে ব্যক্তি অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষিত হয় না, অন্যের কাছে হাত পাতে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে অন্তরের ধনী বানিয়ে দেন। আর যে আল্লাহর নিকট সবরের তাওফীক প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে সবর করার তাওকীফ দান করেন। আর আল্লাহর দানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দান হল, 'সবর'।

সবরের অর্থ ও তাৎপর্য

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, সবরের অর্থ ভোগ-বিলাস কামনা বর্জন পূর্বক আল্লাহর আদেশের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা। তিনি বলেন, মানবজাতি ছাড়া অন্য কারও মধ্যে সবর পাওয়া যেতে পারে না। কারণ, একমাত্র মানবদেহেই পরস্পর বিরুদ্ধবাদী দুই দল সৈন্য বিদ্যমান।

এক. খোদাই লস্‌কর। বিবেক-বুদ্ধি, ফেরেশতা এবং শরী'আতের সৈন্যদল। এরা চায় মানুষকে শরী'আত নির্ধারিত সুপথে পরিচালিত করতে।

দুই. শয়তানি লস্‌কর। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপু এ দলের সেনানায়ক। এদের উদ্দেশ্য, প্রবৃত্তির বেড়ি পায়ে পরিয়ে নিজেদের আয়ত্তে রেখে দোযখগামী করা এবং শরী'আতের আলোর পথে চলতে না দেওয়া। মানুষ যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথে তাকে নিয়ে দু'দলের ঘোর সংগ্রাম শুরু হয়। ভাগ্যবান মানুষকে প্রথমোক্ত সৈন্যদল সাহায্য করতঃ জয়যুক্ত করে। আর তারই সবরের মর্যাদা লাভ হয়েছে বলে বুঝতে হবে। এমন লোককে 'সাবের' বা ধৈর্যশীল বলা হয়।

সবর কয়েক প্রকার

(১) ইবাদতের মধ্যে সবর

অর্থাৎ ইবাদত ও নেক কাজের উপর মনকে পাবন্দির সাথে রাখা এবং রিয়াকারী ইত্যাদি পরিত্যাগ করে সহীহ তরীকায় ইখলাসের সাথে তা আদায় করা।

(২) গুনাহ হতে সবর

মনকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা। একটু কষ্ট হলেও গুনাহ কোনভাবেই করা যাবে না।

(৩) অত্যাচারের উপর সবর

অর্থাৎ কেউ তোমাকে কোনভাবে কষ্ট দিল, তুমি তার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম। তবু প্রতিশোদধ না নেওয়া সবরের অন্তর্গত। এরকম সবর কোন সময় ওয়াজিব আর কখনও সুন্নাত।

(৪) মুসীবতের উপর সবর

অর্থাৎ জান-মালের কোন ক্ষতি হলে বা রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হলে সবর করা। এ বিষয়ে সবর করার অর্থ মনঃক্ষুণ্ন না হওয়া। সবরের বিপরীত কোন শব্দ উচ্চারণ না করা এবং এমন কোন কাজ না করা যাতে অধৈর্য্য প্রকাশ পায়।

(৫) সচ্ছল অবস্থায় সবর

অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও যশ-খ্যাতির প্রতি মন আকৃষ্ট না হওয়া। এরূপ ধারণা হওয়া যে, আল্লাহ্ আমাকে যা দান করেছেন, তা তার আমানত। যতদিন আল্লাহ এ দান আমার কাছে থাকবে ততদিন তার শোকর আদায় করা আমার কর্তব্য। আর আল্লাহ আমার থেকে এগুলো নিয়ে গেলে দুঃখিত হওয়া অনুচিত। সচ্ছলাবস্থায় সবর না থাকলে মানুষের আত্মিক পতন ঘটে। মানুষ দুনিয়া, নফ্‌স ও শয়তানের গোলাম হয়ে যায়।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ ذِى الْوَجْهَيْنِ ص٢٢

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬. দু'মুখো মানুষ

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَمَّارٍ وَاَنَسٍ، هٰذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৩৭. হান্নাদ রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মন্দ লোক হবে দু' মুখো মানুষ। এই বিষয়ে আম্মার ও আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কিছু লোকের অভ্যাস হল, বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে উভয় পক্ষের কাছে যায় এবং অপরপক্ষের নিন্দাবাদ করে। এভাবে উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়। আবার কেউ কেউ মুখেমুখে অন্তরঙ্গতা দেখায় আর পেছনে গেলে বিরুদ্ধাচরণ করে। এমন লোককে আরবীতে ذُو الْوَجْهَيْنِ (দ্বিমুখী লোক) বলা হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ কাজ এক প্রকার মুনাফেকির। তাই এ দু'মুখী ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে নিকৃষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّمَّامِ ص٢٢

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭. চোগলখোর

حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ عُمَرَ نَا سُفْيٰنُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقِيْلَ لَهٗ اِنَّ هٰذَا يُبَلِّغُ الْاُمَرَاءَ الْحَدِيْثَ عَنِ النَّاسِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ قَالَ سُفْيٰنُ وَالْقَتَّاتُ اَلنَّمَّامُ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৩৮. ইবনে আবূ উমর রহ..... হাম্মাদ ইবনে হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত। হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এর পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। তাঁকে বলা হল, এ ব্যক্তি প্রশাসকদের নিকট লোকদের কথা লাগায়। হুযাইফা রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'কাত্তাত' জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাবী সুফিয়ান রহ. বলেন, কাত্তাত অর্থ চোগলখোর।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

'নামীমাহ' বা চোগলখুরি অর্থ, কারও এমন কথা বা কাজ সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করে দেওয়া, যা সে তার কাছে গোপন করতে বা গোপন রাখতে চায় এবং তার শ্রুতিগোচর হওয়াকে সে অপছন্দ করে। এটা কোন দোষের কথা বা দোষের কাজ হলে চোগলখুরির সাথে সাথে গীবতও হয়ে যাবে। তাহলে তখন একই সঙ্গে দুই পাপ হবে। আর প্রকৃতপক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে 'বুহতান' বা মিথ্যা অপবাদের গুনাহও হবে। চোগলখুরি করা কবীরা গুনাহ। যা মানুষের পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্কে ধ্বংস করে দেয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। বাংলাতে একে কুটনামীও বলা হয়। আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এর অর্থ হল, চোগলখোরির অভ্যাস এমন জঘন্য গুনাহ যে,এটি জান্নাতে প্রবেশের পথে অন্তরায় হতে সক্ষম। বাঁধাহীনভাবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ যদি মাফ করে দেন তখন ভিন্ন কথা। –মা'আরিফুল হাদীস

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْعِيِّ ص٢٢

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮. স্বল্পভাষী হওয়া

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ اَبِى غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ ،

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ اَبِى غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ قَالَ وَالْعِيُّ قِلَّةُ الْكَلَامِ وَالْبَذَاءُ هُوَ الْفُحْشُ فِى الْكَلَامِ وَالْبَيَانُ هُوَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ مِثْلُ هٰؤُلَاءِ الْخُطَبَاءِ الَّذِيْنَ يَخْطُبُوْنَ فَيُوَسِّعُوْنَ فِى الْكَلَامِ وَيَتَفَصَّحُوْنَ فِيهِ مِنْ مَدْحِ النَّاسِ فِيمَا لَا يُرْضِى اللّٰهَ

১৩৯. আহমদ ইবনে মানী' রহ...... আবূ উমামা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লজ্জাশীলতা এবং রুদ্ধবাক হওয়া ঈমানের দু'টি শাখা। অশ্লীলতা (লজ্জাহীনতা) ও বাচাল হওয়া মুনাফেকীর দু'টি শাখা। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবূ গাসসান মুহাম্মদ ইবনে মুতাররিফ রহ. সূত্রেই কেবল হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** اَلْعِيُّ অর্থ স্বল্পবাক, রুদ্ধবাক। اَلْبَذَاءُ অর্থ, অশ্লীল কথাবার্তা। اَلْبَيَانُ বেশি কথা বলা, বাচাল হওয়া। যেমন এই যে, (আজকাল কার) বক্তারা বক্তৃতা দেয় আর কথাকে এত দীর্ঘ এবং ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসায় এত পঞ্চমুখ হয়ে উঠে যে, আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট থাকেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মিসবাহুল লুগাতে রয়েছে– عَيَّ يَعْيَى عَيًّا عِيَاءً بِأَمْرِهِ অর্থ, অক্ষম হল বা নিখুঁতভাবে করতে ব্যর্থ হল।

عَيِىَ يَعْى عَيًّا فِى الْمَنْطِقِ অর্থ, তার কথা আটকে গেল বা বাকরুদ্ধ হল।

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেন,

اَلْعِيُّ اَلْعَجْزُ فِى الْكَلَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ فِى هٰذَا الْمُقَامِ هُوَ السُّكُوْتُ عَمَّا فِيهِ اِثْمٌ مِنَ النَّثْرِ وَالشِّعْرِ لَا مَا يَكُوْنُ لِلْخَلَلِ فِى اللِّسَانِ

অর্থাৎ العى এর অর্থ কথায় অক্ষমতা। আর এখানে উদ্দেশ্য হল, গদ্য ও পদ্যের যে অংশে গুনাহ রয়েছে, সে অংশ থেকে নীরব থাকা। শব্দটি এখানে 'বাকরুদ্ধ' বা 'তোতলামি' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

ইমাম তিরযিমী রহ. এর ব্যাখ্যা মতে বুঝা যায়, اَلْعِیُّ অর্থ, গদ্য কিংবা পদ্যে কম কথা বলা যেন অনর্থক কথা ও গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

اَلْبَذَاءُ ঃ অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা। শব্দটি اَلْحَيَاءُ এর বিপরীত শব্দ।

اَلْبَيَانُ ঃ এখানে اَلْبَيَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত বাগ্মীতা। কেননা অতিরিক্ত বাকপটুতা কিংবা অনবরত কথা বলা জিহ্বার অনেক গুনাহকে শামিল করে। এ জাতীয় অভ্যাস মানুষকে নিফাকের দিকে ঠেলে দেয়। বিধায় নেফাকের অংশ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে কম কথা বলা এবং লজ্জাশীলতা ঈমান থেকে উৎকলিত দু'টি প্রশংসনীয় অভ্যাস। তাই এগুলোকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًاص٢٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯. কিছু কিছু বয়ান যাদুময়

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا فِى زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمَا فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا اَوْ اِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَمَّارٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৪০. কুতাইবা রহ....... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর যুগে দুই ব্যক্তির আগমন হয়। তারা ভাষণ দেয়। তাদের বাগ্মিতায় লোকজন খুবই আশ্চার্যান্বিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে বললেন, কিছু কিছু বয়ান যাদুময় হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আম্মার, ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا اَوْ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ ঃ এখানে اَوْ শব্দটি বর্ণনাকারীর সংশয়ের কারণে এসেছে।

হাদীসের শানে ওরূদ

ঘটনাটি নবম হিজরীর। বনু তামীমের একটি প্রতিনিধিদল আরবের পূর্ব এলাকা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দরবারে হাজির হল। ঐ দলে দু'জন বাগ্মী লোক ছিল। যারা ছিল বাকপটুতায় অত্যন্ত দক্ষ। তাদের এক ব্যক্তির নাম হাছীন ইবনে বদর, আর উপাধি যিবিরক্বান। অপর ব্যক্তির নাম আ'মর ইবনে উহাইম। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সামনে পরস্পর বাগ্মিতায় লিপ্ত হল। যিবিরক্বান নিজের অত্যন্ত সুন্দর উপস্থাপন ও ভাষার যাদু দিয়ে নিজের বড়ত্ব, মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরল। আ'মর তার কথা শুনে নিজের ঝাপি মেলে ধরল। ভাষার অগ্নিবানে যিবিরক্বানকে জর্জরিত করে দিল। যিবিরক্বানের বক্তৃতামালা আ'মরের বক্তৃতার কাছে নুইয়ে পড়ল। যিবিরক্বানও হার মানল না। সে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে বলল, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আ'মর যা বলছে তা হৃদয়ের কথা নয়। আসলে সেও আমার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানে এবং ভালভাবেই জানে। কিন্তু হিংসা তার সত্য উচ্চারণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে আছে। যিবিরক্বানের এ মন্তব্য শুনে আ'মর আরও কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ জানায়।

ইহয়াউল উলূম গ্রন্থে রয়েছে, আ'মর একদিন যিবিরক্বানের প্রশংসা করে। পরের দিন তার নিন্দা করে। এ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটাও কি সম্ভব? আ'মর তখন উত্তর দিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রথম দিন যেমনিভাবে সত্য বলেছি, পরের দিনও তেমনিভাবে সত্য উচ্চারণ করেছি। প্রথমদিন সে আমার

সাথে সদাচারণ করেছে, তাই আমার স্মৃতি থেকে তার ভাল গুণগুলো তুলে ধরেছি। আর দ্বিতীয় দিন সে আমার সাথে অসদাচরণ করেছে, ফলে স্মৃতি মন্থন করে তার দোষগুলো তুলে ধরেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ان من البيان لسحرا (তুহফাহ, বযলুল মাযহূদ)

ان من البيان لسحرا ঃ অর্থাৎ যেমনিভাবে যাদু মানুষের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নিমিষে মানুষের অবস্থা পাল্টে দেয় এবং বাতিলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে, তদ্রুপ কিছু কিছু বয়ানেও থাকে প্রচণ্ড মোহিনী শক্তি। মানুষের গভীরে ভাষার যাদু তাড়াতাড়ি প্রভাব সৃষ্টি করে। মানুষ তন্ময় হয়ে পড়ে এবং বক্তার বক্তৃতার দোলে দুলতে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষার লৌকিকতার উপর নিন্দাবাদ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, পাণ্ডিত্য প্রদর্শন না করে স্বাভাবিকভাবে কথা বলাই ভাল। এতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না হলেও মানুষ আমলের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপূরী রহ. বলেন, মূলতঃ এখানে বক্তৃতার সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হয়েছে। ওয়ায ও বক্তৃতার ভাষা আকর্ষণীয় হওয়া উচিত– এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

কারও কারও অভিমত হল, আসলে এ হাদীসে সুন্দর বক্তৃতার প্রশংসা করা হয়েছে। আবার নিন্দাবাদও করা হয়েছে। ওয়ায-বক্তৃতা, উপদেশ ইত্যাদির ভাষা সুন্দর হওয়া বড় কথা নয়। বড় কথা হল, যে কথাগুলো বলা হয়, সেগুলো কতটুকু সত্য। আর সত্য কথা সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে বলা অবশ্যই প্রশংসনীয়। যেমন, এক হাদীসে কবিতা আবৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে– الشعر هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح (বযলুল মযহূদ,)

بَابُ مَاجَاءَفِى التَّوَاضُعِ ص٢٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০. বিনয়

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ رَجُلاً بِعَفْوٍ اِلاَّ عَزًا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ، وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِىِّ وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৪১. কুতাইবা রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সদকার কারণে সম্পদ হ্রাস পায় না, ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারীর সম্মানই বদ্ধি করে থাকনে, আল্লাহর জন্য যদি কেউ বিনয় প্রকাশ করে তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার মর্যাদা সমুন্নত করেন।

এ বিষয়ে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, ইবনে আব্বাস, আবূ কাবশা আনমারী – তার নাম উমর ইবনে সাঈদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বিনয় -নম্রতা

تواضع ঃ অর্থ নিজেকে ছোট মনে করা (ان لا يعتقد نفسه اهلا للرفعة) বাংলা ভাষায় একে বলা হয়, বিনয়। বিনয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনয়শূন্যতা মানুষকে ফেরাউন এবং নমরূদের স্তরে নিয়ে যায়। বিনয় অন্তরের একটি অবস্থার নাম। অন্তর বিনয়ী না হলে অহংকারী হবে। সে অন্তর অপরকে তুচ্ছ ভাববে। অহঙ্কার করবে। আর অহংকার সকল আত্মিক ব্যাধির মূল।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, আমি বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানকে আমার চেয়েও

উত্তম মনে করি। আর সম্ভাবনাময় হিসাবে প্রত্যেক কাফিরকে আমার চেয়েও উত্তম মনে করি। কারণ, মুসলমান তো একজন মুসলমান এবং ঈমানদার ব্যক্তি। আর কাফিরকেও হয়ত আল্লাহ তা'আলা একসময় ঈমানের তাওফীক দিবেন এবং সে আমার চেয়েও মর্যাদাবান হয়ে যাবে। এজন্য তাদেরকে আমি উত্ম মনে করি। কাজেই আল্লামা তাক্বী উসমানী বলেন, এক হল, নিজেকে ছোট মনে করা। অপরটি হল, নিজেকে ছোট দাবি করা। নিজেকে ছোট দাবি করার নাম বিনয় নয়। যেমন, কেউ নিজের নামের সঙ্গে 'নগন্য' 'অধম' 'গুনাহগার' প্রভৃতি শব্দ জুড়ে দিল। মনে করল, আমার বিনয় প্রকাশ হয়ে গেল। তাহলে প্রকৃতপক্ষে এটাও বিনয় নয়। বিনয় তো তখনই হবে, যখন অন্তর থেকে নিজেকে ছোট মনে করবে। শুধু নিজের মুখের নয় বরং হৃদয়ের ভাষাতে বলবে, আমার কোন ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব নেই।

বিনয় কিভাবে অর্জন করবে?

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দু'টি কাজ করবে।

(১) নিজের ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব ও কর্তৃত্বের উপর আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করবে। আল্লাহর দয়ার কথা অধিক স্মরণ করবে।

(২) অধিকহারে ইসতিগফার কর। ভুল-ভ্রান্তি ও অহংকার প্রকাশ পেলে বেশিবেশি আল্লাহর দরবারে তওবা কর।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الظُّلْمِ صـ٢٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১. যুলম

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ نَا اَبُوْ دَاؤُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَاَبِىْ مُوْسٰى وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ عُمَرَ

১৪২. আব্বাস আম্বরী রহ....... ইবনে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যুলম কিয়ামতের দিন বহু অন্ধকারের কারণ হবে। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আয়েশা, আবূ হুরাইরা ও জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلظُّلْمُ ঃ ইমাম রাগিব রহ. বলেন, জুলুমের অর্থ কোন জিনিসকে তার যথার্থ স্থান ছাড়া অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া। অথবা কোন জিনিসে অনর্থক হ্রাস-বৃদ্ধি করা অথবা স্থান-কাল থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে রাখা। (তুহফা)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যালিমের চারিদিকে থাকবে অন্ধকার আর অন্ধকার। সে নূর থেকে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে মুমিন বান্দা নূর পাবে। যেমন, কুরআন মজীদে এসেছে–

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

কেউ কেউ বলেন, ظُلُمَات দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আখেরাতের সমূহ বালা-মুসিবত। যেসব মুসিবত কেয়ামত দিবসেও যালিমদের উপর আসবে। কুরআন মজীদের কোন কোন স্থানে ظُلُمَات শব্দের অর্থ, মুসিবত ও আযাব নেওয়া হয়েছে। যেমন, এক আয়াতে এসেছে قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ "বলে দিন! জল ও স্থলের মুসিবত থেকে কে তোমাদেরকে মুক্তি দিবে?"

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَرْكِ الْعَيْبِ لِلنِّعْمَةِ ص۲۳

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২. নেয়ামতের দোষ না ধরা

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيٰنَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ طَعَامًا قَطُّ كَانَ اِذَا اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِلَّا تَرَكَهُ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاَبُوْ حَازِمٍ هُوَ الْاَشْجَعِىُّ وَاسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلٰى عَزَّةَ الْاَشْجَعِيَّةِ

১৪৩. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি। যদি তা পছন্দ হত তবে খেতেন নতুবা বর্জন করতেন। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বর্ণনাকারী আবূ হাযিম হলেন আশজাঈ কূফী। তাঁর নাম হল সালমান। তিনি ছিলেন, আযযা আশজাঈ এর আযাদকৃত দাস।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করতেন না। যদি তাঁর পছন্দ হত, খেয়ে নিতেন। আর পছন্দ না হলে রেখে দিতেন, খেতেন না। কিন্তু খাবারের দোষ বর্ণনা করতেন না। কারণ, যে কোন খাবারই হোক, তা আমার পছন্দ হোক বা না হোক, এটা তো আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। আর আল্লাহর দেওয়া রিযিকের সম্মান করা আমাদের কর্তব্য। তাছাড়া এ খাবার হয়ত আমার পছন্দ নয়, কিন্তু অন্য লোকের তো প্রিয় হতে পারে।

উপকারীতা

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, আলোচ্য হাদীসকে সামনে রেখে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, যে কোন খাবার কারও নিকট মনঃপূত না হলে সে যেন তার দোষ বর্ণনা না করে। আর মনঃপূত হলে যেন ঐ খাবারের প্রশংসা করে। এ প্রশংসা দ্বারা উদ্দেশ্য হতে হবে, আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা। এতে রান্নাকারীর মনও খুশি হবে। যে রান্নাকারীর প্রশংসা কিংবা খাবারের প্রশংসা করতে পারল না, সে প্রশংসার ক্ষেত্রে কৃপণ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَعْظِيْمِ الْمُؤْمِنِ ص۲۳

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩. মুমিনকে সম্মান করা

حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَكْثَمَ وَالْجَارُوْدُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى نَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ اَوْفٰى بْنِ دَلْهَمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهٗ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِىْ جَوْفِ رَحْلِهٖ قَالَ وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا اِلَى الْبَيْتِ اَوْ اِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ مَا اَعْظَمَكَ وَاَعْظَمَ حُرْمَتَكَ وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللّٰهِ مِنْكَ ،هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، وقد رَوٰى اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ السَّمَرْقَنْدِىُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ نَحْوَهٗ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا

১৪৪. ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম ও জারূদ ইবনে মুআয রহ...... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং উচ্চস্বরে ডাকলেন, হে ঐ সম্প্রদায়, যারা মুখে ঈমান এনেছে কিন্তু হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি! শোন, তোমরা মুমিনদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না, তাদের গোপন দোষ খুঁজে বেড়াবে না। কেননা যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ খুঁজে বেড়াবে, আল্লাহ্ তার গোপন দোষ ফাঁস করে দিবেন। আর আল্লাহ্ যার দোষ প্রকাশ করে দিবেন, তাকে তিনি লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন, যদিও সে তার হাওদার অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে।

রাবী বলেন, ইবনে উমর রাযি. একবার বাইতুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকালেন এবং বললেন, কত মর্যাদা তোমার, কত বিরাট তোমার সম্মান! কিন্তু আল্লাহর নিকট মুমিনের মর্যাদা তোমার চেয়েও বড়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। হুসাইন ইবনে ওয়াকিদের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম সমরকন্দী রহ. ও হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ রহ. থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ বারযা আল-আসলামী রাযি.-এর বরাতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يَا مَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ ঃ এখানে মুমিন এবং মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর সামনের বাক্য অর্থাৎ وَلَمْ يُفْضِ مِنَ الْاِيْمَانِ اِلٰى قَلْبِهٖ দ্বারা ফাসিকদেরকেও শামিল করে নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাখ্যাই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা আরেকটু সামনে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ يَتَّبِعُ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ

এতে স্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্বোধন সকল মুসলমানকে উদ্দেশ্য করে ছিল। মুমিন-মুনাফিক এবং কাফির সকলেই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সম্বোধনটি শুধু মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে হত, তাহলে মুমিন এবং মুনাফিকের মধ্যে যেহেতু ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নেই, তাই এটি যুক্তিযুক্ত হত না। আর তখন اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ বলা হত না। অতএব তীবী রহ. এর বক্তব্য- يَا مَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু মুনাফিক- এটা সঠিক নয়। কেননা এটা উদ্দেশ্য পরিপন্থী।

وَمَنْ لَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ ঃ এ বাক্য দ্বারা এদিকেও ইংগিত রয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমানের নূর অন্তরকে আলোকিত করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার মা'রিফত লাভ হবে না এবং তাঁর হকসমূহও আদায় হবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর মারিফত লাভ করে, তাঁর হকসমূহ আদায় করে, সে কখনও অন্যকে কষ্ট দেয় না। এমনকি কারও দোষও খুঁজে বেড়ায় না।

وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ ঃ অর্থাৎ কারও দোষ সন্ধান কর না কিংবা যে দোষ সম্পর্কে তুমি জান, সে দোষ অন্যের নিকট প্রকাশ কর না।

মাসআলা ঃ মুসলমানের দোষ প্রকাশ করা গুনাহ। গোপনে কিংবা নিদ্রার ভান করে কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে অথবা অন্য মুসলমানের হেফাযতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে অনিষ্টকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দূরভীসন্ধি অনুসন্ধান ও ফাঁস করা জায়িয। (তাকমিলাহ, মা'আরিফুল কুরআন)

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّجَارِبِ صـ٢٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪. অভিজ্ঞতা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَلِيْمَ اِلَّا ذُوْ عَثْرَةٍ وَلَا حَكِيْمَ اِلَّا ذُوْ تَجْرِبَةٍ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

১৪৫. কুতাইবা রহ...... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পদস্খলিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ সহিষ্ণু হয় না। আর অভিজ্ঞতা ছাড়া কেউ প্রজ্ঞাবান হয় না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ক্রোধ বা গোস্বা দমন করার গুণটি যখন স্বভাবের পরিণত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন সে গুণটিকে বলা হয় হিল্‌ম বা সহনশীলতা। যেমন– রাগের মুহূর্তে উত্তেজনাকে বলপূর্বক দমন করে রাখলে সেটা হবে রাগ দমন আর সর্বক্ষণ এরূপ করতে করতে যখন রাগ দমনটা তার স্বভাবে পরিণত হবে তখন সেটা সহনশীলতা বলে গণ্য হবে।

لَاحَلِيْمَ اِلَّا ذُوْ عَثْرَةٍ ঃ সহনশীলতার গুণ সে ব্যক্তির মাঝে পূর্ণাঙ্গরূপে থাকে যার মধ্যে পদস্খলন ও ভুল-ত্রুটি পাওয়া যায়। কেননা সে আপন দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সাবধান হওয়ার পর অপরের ক্ষমার মুখাপেক্ষী হয়। এরূপ লোক ভালো করে জানে, কারও দোষ গোপন করা এবং কারও দোষ ক্ষমা করে দেওয়া কতটা প্রয়োজনীয় বিষয়। তাই সে অন্যদের ব্যাপারে সহনশীল ও শুভাকাংখী হয়।

لَاحَكِيْمَ اِلَّاذُوْ تَجْرِبَةٍ ঃ হাকীম শব্দটি হিকমত থেকে এসেছে। হিকমত এর অর্থ হল বিজ্ঞ হওয়া, প্রাজ্ঞ হওয়া। তাজরিবা অর্থ হল, অভিজ্ঞতা পরীক্ষামূলক ব্যবহার বা প্রয়োগ। কোন জিনিসের অভিজ্ঞতা ছাড়া সে জিনিস সম্পর্কে প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না। তাই বলা হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাবান সেই, যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। আর حَكِيْم শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য যদি চিকিৎসক হয় তাহলে অর্থ স্পষ্ট।

بَابُ مَاجَاءَفِى الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ صـ٢٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫. যা দেওয়া হয় নি তা পেয়েছে বলে দেখানো

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ .... عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَاِنَّ مَنْ اَثْنٰى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْكَفَرَ وَمَنْ تَحَلّٰى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ وَعَائِشَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ،وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ يَقُوْلُ كَفَرَ تِلْكَ النِّعْمَةَ

১৪৬. আলী ইবনে হুজর রহ....... জাবির রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কাউকে কিছু হাদিয়া দেওয়া হলে সে যদি সঙ্গতি পায় তবে সে যেন এর বদলা দিয়ে দেয়। আর যদি সঙ্গতি না পায় তবে যেন সে তার প্রশংসা করে। কেননা যে ব্যক্তি প্রশংসা করল সে শুকরিয়া আদায় করল। আর যে তা গোপন রাখল, সে নাশুকরী করল। যা দেওয়া হয়নি এমন বিষয় যে দেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ করে, সে মিথ্যার দু'টি পোশাক পরিধানকারীর মত। এ বিষয়ে আসমা বিনতে আবূ বকর ও আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। مَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ বাক্যটির মর্ম হল, যে অনুগ্রহ গোপন করল সে ঐ নেয়ামতের কুফরী করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْمُتَشَبِّعُ ঃ আল্লামা নববী রহ.বলেন–

قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ اَلْمُتَكَثِّرُ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ بِاَنْ يُّظْهِرَ اَنَّ عِنْدَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ يَتَكَثَّرُ بِذَالِكَ عِنْدَ النَّاسِ وَيَتَزَيَّنُ بِالْبَاطِلِ وَيَدْخُلُ فِيْهِ كُلُّ مَنْ يُّظْهِرُ خَصْلَةً لَا تُوْجَدُ فِيْهَا

অর্থাৎ উলামায়ে কিরাম বলেছেন, اَلْمُتَشَبِّعُ অর্থ হল, যা নিজের কাছে নেই তা নিয়ে গর্ব করা তথা নিজের কাছে আছে বলে মানুষের কাছে প্রকাশ করা এবং জালভাবে সজ্জিত হওয়া। প্রত্যেক ঐ স্বভাব, যা নিজের কাছে নেই, তাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

مَنْ اُعْطِىَ عَطَاءً ঃ অর্থাৎ হাদিয়ার পরিবর্তে হাদিয়া না দিতে পারলেও কমপক্ষে প্রদানকারীর শুকরিয়া প্রকাশ করা উচিত এবং দু'আ করা উচিত। جَزَاكَ اللّٰهُ অথবা بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা দু'আ করা যেতে পারে।

مَنْ تَحَلّٰى بِمَالَمْ يُعْطَ ঃ এ বাক্যটি اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَالَمْ يُعْطَهُ এর ব্যাখ্যা।

মিথ্যার দুটি বস্ত্র পরিধানকারী -এর ব্যাখ্যা

كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ ঃ এখানে مُتَشَبِّعٌ بِمَالَمْ يُعْطَهُ কে মিথ্যার দু'টি বস্ত্র পরিধানকারী বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

(১) কেউ কেউ বলেছেন – كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ اَىْ كَمَنْ كَذَبَ كِذْبَيْنِ اَوْ اَظْهَرَ شَيْئَيْنِ كَاذِبَيْنِ

অর্থাৎ যে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করেছে, যা তার মধ্যে নেই। তাহলে সে যেন দু'টি মিথ্যা কথা বলেছে অথবা দু'টি মিথ্যা বস্তু প্রকাশ করেছে।

(২) কারও কারও মতে

اَلظَّاهِرُ اَنَّ مَعْنَاهُ كَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا تَحْتَ ثَوْبٍ وَلَيْسَ ذَالِكَ وَحْدَهُ وَاِنَّمَا اَرَادَ اَنْ يَّسْتَغِرَّ النَّاسُ بِذَالِكَ فِى الْمُعَامَلَةِ مِنْهُ

অর্থাৎ যে এমন স্বভাবও প্রভাব প্রকাশ করল, যা তার মধ্যে অনুপস্থিত সে ঐ নিঃস্ব ব্যক্তির মত, যে নিজেকে ধনী হিসাবে প্রকাশ করার জন্য একটি পোশাকের নিচে আরেকটি পোশাক পরেছে। তার উদ্দেশ্য, মানুষ যেন ধোঁকাবশতঃ তার সাথে লেন-দেন করে।

(৩) এখানে ثَوْبَىْ زُوْرٍ কে দ্বিবচন এনে এ দিকে ইংগিত দেওয়া হয়েছে যে, مُتَشَبِّعٌ থেকে দু'টি নিকৃষ্ট অবস্থা প্রকাশ পায়।

এক. যে সাজে সে নিজেকে প্রকাশ করেছে, সেটা তার মধ্যে না থাকা।

দুই. মিথ্যাকে প্রকাশ করা।

(৪) খাত্তাবী রহ. বলেন, আরবে এক ব্যক্তির অভ্যাস ছিল, নিজেকে ধনী সম্মানিত লোকদের মত প্রকাশ করত। এ উদ্দেশ্যে সে দু'টি দামি পোশাক পরত। মতলব ছিল, মানুষ যেন তার বেশভূষা দেখে ধোঁকা খায় এবং মিথ্যা সাক্ষী, লেনদেন ইত্যাদিতে তার কথাকে বিশ্বাস করে। যেহেতু তার পোশাকদ্বয় মিথ্যার 'কারণ' হয়েছে, তাই বলা হয়েছে ثَوْبَىْ زُوْرٍ। অতএব مُتَشَبِّعٌ بِمَالَمْ يُعْطَهُ ও এই ব্যক্তির মত।

(৫) ইবনে মুনীর রহ. বলেন, ثَوْبَىْ زُوْرٍ সাধারণতঃ দুই পোশাকধারীকে বোঝায়। মূলতঃ উদ্দেশ্য এক পোশাকধারী। যেমন, কারও কারও অভ্যাস আস্তিনের ভেতর আরেকটি আস্তিন রাখা, যেন মানুষ ডাবল পোশাক মনে করে। এ ব্যক্তি যেমনিভাবে একপ্রকার মিথ্যাবাদী, অনুরূপভাবে مُتَشَبِّعٌ بِمَالَمْ يُعْطَهُ ও একপ্রকার মিথ্যাবাদী।

(৬) হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, হতে পারে ثَوْبَىْ زُوْرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য যা তার মধ্যে রয়েছে সেটাকে গোপন করা আর যা তার মধ্যে নেই সেটাকে ফুটিয়ে তোলা। কেননা জাহেল যখন আলেমের পোশাকে নিজেকে প্রকাশ করবে, তখন এখানে দু'টি মিথ্যাচার থাকে।

এক. নিজের জিহালাত গোপন করা।

দুই. ইল্ম প্রকাশ করা। সুতরাং مُتَشَبِّعٌ بِمَالَمْ يُعْطَهُ ব্যক্তিও এই ব্যক্তির ন্যায়।

(৭) কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় হাদীসটির একটি শানে ওরূদ উল্লেখ করেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটি ঐ মহিলাকে বলেছিলেন, যে মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ لِىْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنْ اَتَشَبَّعَ بِمَالَمْ يُعْطِنِىْ زَوْجِىْ اَىْ اُظْهِرُ الشِّبَعَ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার একজন সতীন আছে, যদি আমি সেই সতীনের সামনে এমন বেশভূষায় উপস্থিত হই যা আমার স্বামী আমাকে দেয়নি, তাহলে কি কোন গুনাহ হবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি এমন করবে সে যেন মিথ্যার দু'টি কাপড় পরিধান করল। অর্থাৎ সে দু'টি মিথ্যা প্রকাশ করল।

এক. اَعْطَانِىْ زَوْجِىْ 'স্বামী আমাকে এগুলো দিয়েছে'।

দুই. اِنَّ زَوْجِىْ يُحِبُّنِىْ مِنْ ضَرَّتِىْ 'স্বামী আমাকে আমার সতীনের চেয়ে অধিক ভালবাসে'। সুতরাং এ মহিলাটি যেমনিভাবে দুই মিথ্যায় মিথ্যাবাদী, অনুরূপভাবে اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَالَمْ يُعْطَهُ ও দুই মিথ্যায় মিথ্যাবাদী। (তাকমিলাহ, তুহফাহ, আল-কাওকাব, বয্ল)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الثَّنَاءِ بِالْمَعْرُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬. আরও উপযুক্ত প্রশংসা করা

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ بِمَكَّةَ قَالَا ثَنَا الْاَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ جَيِّدٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلُهُ آخِرُ اَبْوَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

১৪৭. ইবরাহীম ইবনে সাঈদ রহ. ও হুসাইন ইবনে হাসান মারওয়াযী (ইনি মক্কায় বসবাস করতেন) রহ..... উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কাউকে কোন অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا "আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দিন" তবে সে অশেষ প্রশংসা করল। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, জায়্যিদ ও গরীব। এ সূত্র ছাড়া উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মদ রহ.-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অর্থাৎ কেউ কোন দয়া বা উপকার করলে উপকারীর উপকারের বদলা না দিতে পেরে যদি جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا বলে দেয়, তাহলে সে উপকারীর পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। কেননা এ ব্যক্তি উপকারের বদলে উপকার না করতে পারা একপ্রকার তার ত্রুটি। আর সে এ ত্রুটি ও অক্ষমতা স্বীকার করে বদলার দায়িত্বটা প্রকৃত উপকারী আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছে। আর আল্লাহর দান তো অবশ্যই সসীম নয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَبْوَابُ الطِّبِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صـ ٢٣

চিকিৎসা অধ্যায়

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আম্বিয়ায়ে কিরাম উম্মতের জন্য আত্মার চিকিৎসক। দৈহিক চিকিৎসা করা আম্বিয়ায়ে কিরামের কাজ নয়; উদ্দেশ্যও নয়। অবশ্য আখেরী নবী মুহাম্মদুররাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন রোগ-ব্যধির ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। যেগুলোকে হাদীস বিশারদগণ أَبْوَابُ الطِّبِّ শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। এটা মুহাম্মদী শরী'আতের পূর্ণাঙ্গতার প্রমাণ।

طِبٌّ শব্দটি بِكَسْرِ الطَّاءِ প্রসিদ্ধ। আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন, ط বর্ণে তিন হরকতই দেওয়া যাবে। অর্থ– চিকিৎসা করা, ব্যবস্থাপত্র দেওয়া। যাদু করার অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ জন্যই যাদু আক্রান্ত মানুষকে مَطْبُوْب বলা হয়।

জমহূরে উম্মত চিকিৎসাকে জায়িয মনে করেন।

কেউ কেউ মুসতাহাবও বলেন। হযরত জাবির রাযি. বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيْبَ دَوَاءُ دَاءٍ بَرَأَ بِإِذْنِ اللّٰهِ (رواه مسلم)

অনুরূপভাবে মুসনাদে আহম-এ এসেছে–

تَدَاوَوْا يَا عِبَادَ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ اَلْهَرَمِ

কোনও কোনও কট্টর সূফী চিকিৎসাকে অস্বীকার করেন। তারা বলেন, রোগ-ব্যাধি আল্লাহর তাকদীর। এর মোকাবেলায় চিকিৎসা না করা উচিত। কিন্তু মূলতঃ তাদের এ মন্তব্য হাদীসের আলোকে শুদ্ধ নয়। কেননা চিকিৎসাও তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকদীরে রয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে বলেছেন– هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ অনুরূপভাবে ক্ষুৎপিপাসা অনুভব হওয়া তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলে কি পানাহার করা তাকদীর পরিপন্থী হবে? এমন হলে তো সবকিছুই ছেড়ে দিতে হবে।

শরী'আতে নববীতে চিকিৎসার অবস্থান

কোনও কোনও আলেমের অভিমত হল, চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে যেসব হাদীস রয়েছে, এগুলো শরী'আতের অংশ নয়। এগুলোর উপর ঈমান আনা কিংবা অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়। যেমন, ঐতিহাসিক ইবনু খালদুন তাঁর মুকাদ্দামাহ-তে লিখেছেন, দৈহিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে ইসলামী শরী'আতে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলো অহী নয় বরং অভিজ্ঞতা ও স্বভাবসিদ্ধ বিষয়। অতএব চিকিৎসার ব্যাপারে যেসব হাদীস রয়েছে, সেসব হাদীসকে শরী'আতের অংশ বলা উচিত হবে না। হ্যাঁ, কেউ যদি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে নিয়তকে বিশুদ্ধ করে সেগুলো ব্যবহার করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে বিরাট উপকার পাবে। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কিন্তু এগুলোকে শরী'আত বা ঈমানের অংশ বলা সমীচীন নয়।

তবে সঠিক কথা হল, কিছু কিছু নববী চিকিৎসার উৎস হল, ইলমে অহী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। যেমন, অমুক রোগের চিকিৎসা অমুক জিনিসে রয়েছে। আবার কিছু কিছু নববী চিকিৎসার ভিত্তি হল, অভিজ্ঞতা। তাছাড়া চিকিৎসার ব্যাপারে যেসব হাদীস রয়েছে, সেগুলো তো তাবলীগে রেসালাতের মধ্য থেকে নয় এবং শরী'আতের এমন কোন অধ্যায়ও নয় যে, সকলের জন্য, সকল স্থানে, সকল পরিবেশে মানা অপরিহার্য।

কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার লিখেছেন, যে ব্যক্তি নিজের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা তিব্বে-নববীর মাধ্যমে করতে চায়, তার জন্য প্রথম শর্ত হল, বিশুদ্ধ নিয়ত, ইখলাস ও ভক্তি এবং সঠিক আকীদা-বিশ্বাস। এ শর্ত মেনে তিব্বি-নববী দ্বারা চিকিৎসা করালে নিঃসন্দেহে চমৎকার ফল পাবে। যেমন, পবিত্র কুরআন আত্মিক ব্যাধিসমূহ নিরাময়ের জন্য সর্বোত্তম এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র। তাই যে ব্যক্তি ইখলাস ও জযবা নিয়ে পূর্ণ কুরআন মজীদ শিক্ষা করে এবং কুরআনি শিক্ষার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে আ'মল করে, সে নিশ্চিতভাবে যাবতীয় আত্মিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন মজীদকে উক্ত পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে চায় না, তার জন্য কুরআন কোন সুফল বয়ে আনে না। (তাকমিলাহ, মুযাহেরে হক)

তাওয়াক্কুলপ্রসঙ্গ

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হতে পারে না –এ বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ। যেহেতু তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হতে পারে না, তাই শরী'আতের নিয়মমাফিক যে কোন চেষ্টা-তদবীর গ্রহণ করার পর সফলতার জন্য মনে মনে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। এরূপ ভরসা বা নির্ভরশীলতাকে বলা হয় 'তাওয়াক্কুল'।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, তাওয়াক্কুল তিনটি আ'মলের সমষ্টির নাম। (১) মা'রেফত(২) আ'মল (৩) হাল (অবস্থা)।

এ তিনটি বিষয়কে তাওয়াক্কুলের 'রূকন' বলা হয়। অর্থাৎ আল্লার তা'আলা সমস্ত গুণাবলীর মালিক, সমস্ত কাজ তাঁরই উপর নির্ভর করে, জগতের কোন কাজ তিনি ছাড়া হতে পারে না– এই কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করে নিজে আ'মল তথা চেষ্টা-তদবীর করতঃ কাজের হাল তথা সমস্ত ফলাফল আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা।

ইমাম গায্যালী রহ. আরও বলেন, মুর্খ লোকেরা মনে করে, তাওয়াক্কুলের অর্থ আ'মল তথা কাজকর্ম ও চেষ্টা-তদবীর ছেড়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা। রোগ হলে চিকিৎসা না করা। নিশ্চিন্তে যা ইচ্ছা তা খাওয়া। মনে চাইলে আগুনে প্রবেশ করা প্রভৃতি সম্ভব হলেই তাওয়াক্কুল অর্জন হয়েছে। অজ্ঞদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। এরকম করা ইসলাম ধর্মের নিয়মনীতি পরিপন্থী। নিজে নিজেকে অনর্থক বিপদের সম্মুখীন করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। অথচ শরী'আতে তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং বুঝা যায়, উপরিউক্ত অর্থ নিশ্চয় তাওয়াক্কুলের নয়। (আল-আরবাঈন)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحِمْيَةِ صـ٢٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১. রক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِىُّ نَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ اَبِى يَعْقُوبَ عَنْ اُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِىٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ وَمَعَهُ عَلِىٌّ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِىٍّ مَهْ مَهْ يَا عَلِىُّ فَاِنَّكَ نَاقِرٌ قَالَ فَجَلَسَ عَلِىٌّ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَأْكُلُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سَلْقًا وَشَعِيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا عَلِىُّ مِنْ هٰذَا فَاَصِبْ فَاِنَّهُ اَوْفَقُ لَكَ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَيُرْوٰى هٰذَا عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

১. আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ আদ–দূরী রহ......... উম্মুল মুনযির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলী রাযি.ও ছিলেন। আমাদের ঘরে কিছু খেজুর ছড়া লটকানো ছিল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা খেতে লাগলেন আর আলী রাযি. ও

তাঁর সঙ্গে খেতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযি. কে বললেন, হে আলী! থাম, থাম! তুমি তো অসুস্থজনিত দুর্বল। আলী রাযি. বসে পড়লেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেতে থাকলেন। উম্মুল মুনযির রাযি. বলেন, আমি তাদের জন্য কিছু গাজর ও যব (দিয়ে খাদ্য) বানালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আলী! এ থেকে তুমি গ্রহণ করতে পার। কারণ, এটা তোমার জন্য অধিক উপযোগী।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। ফুলায়হ ইবনে সুলায়মান রহ. এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ফুলায়হ ইবনে সুলায়মান – আইয়ূব ইবনে আবদুর রহমান রহ. সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَامِرٍ وَاَبُوْ دَاؤُدَ قَالَا نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُّوْ بَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنْ اُمِّ الْمُنْذِرِ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ اَنْفَعُ لَكَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِىْ حَدِيْثِهٖ حَدَّثَنِيْهِ اَيُّوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا حَدِيْثٌ جَيِّدٌ غَرِيْبٌ

২. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ........ উম্মুল মুনযির আনসারিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। এরপর তিনি ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ – ফুলায়হ ইবনে সুলায়মান সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে اَوْفَقُ لَكَ এর স্থলে اَنْفَعُ لَكَ রয়েছে।
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ রিওয়ায়াতটি জায়্যিদ গরীব।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى نَا اِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُزَيَّةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ اَحَدُكُمْ يَحْمِىْ سَقِيْمَهُ الْمَاءَ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ صُهَيْبٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلًا

৩. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ......... কাতাদা ইবনে নু'মান রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি তাকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা তোমাদের রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ। এ বিষয়ে সুহায়ব ও উম্মুল–মুনযির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ হাদীসটি মাহমূদ ইবনে লাবীদ রহ.... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَقَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الظُّفَرِىُّ هُوَ اَخُوْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ لِاُمِّهٖ وَمَحْمُوْدُ بْنُ لَبِيْدٍ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ وَرَاٰهُ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيْرٌ

৪. আলী ইবনে হুজর রহ....... মাহমূদ ইবনে লাবীদ রহ. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ সূত্রে কাতাদা ইবনে নু'মান রাযি. থেকে বর্ণিত উল্লেখ নেই। কাতাদা ইবনে নু'মান যাফরী রাযি. হলেন আবূ সাঈদ খুদরী রাযি.-এর বৈপিত্রেয় ভাই। মাহমূদ ইবনে লাবীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়েছেন এবং তাঁকে দেখেছেন। তিনি তখন ছোট বাচ্চা ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْحِمْيَةُ ঃ (হা বর্ণে যের) বিরত রাখা। কামূস গ্রন্থে রয়েছে حَمَى (ض، حِمْيَةً) اَلْمَرِيْضَ مَا يَضُرُّهُ রোগীকে ক্ষতিকর খাদ্য থেকে বিরত রাখল। حَمِيٌّ যে রোগীর জন্য বিশেষ কোনও খাবার নিষিদ্ধ।
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "اِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ" এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রোগীর জন্য পানির পরিবর্তে মাটির মাধ্যমে পবিত্র অর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন। উদ্দেশ্য রোগীকে ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত রাখা। (বযলুল মাযহূদ)

مَهْ مَهْ يَا عَلِيُّ فَاِنَّكَ نَاقِهٌ ঃ এখানে مَهْ مَهْ এটি اِسْم فِعْل بِمَعْنَى اَمْر অর্থাৎ اُكْفُفْ অর্থ বিরত থাক। (س.) نَقَهَ (ف، نُقُوْهًا) وَنَقِهَ (نَقْهًا) দুর্বলতার সাথে রোগ থেকে সুস্থতা ফিরে এল অর্থাৎ পূর্ণ সুস্থতা ফিরে আসে নি। (বযলুল মাযহূদ)

"হে আলী, থাম! থাম! তুমি তো অসুস্থজনিত দুর্বল।" হযরত আলী রাযি. এর এ রোগ-ব্যাধির কারণ ছিল, তাপ। বস্তুত খেজুরের প্রকৃতি হল গরম। বিধায় তাঁর ক্ষতি হত। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে খেতে বললেন। সম্ভবত ঐ যুগে চোকান্দার এবং যব উভয়টি একসাথে মিলিয়ে পাকানো হত। অথবা যব দ্বারা রুটি আর চোকান্দর দ্বারা তরকারী হত। চোকান্দর শালগমের মত একপ্রকারের তরকারী, যা টাটকা লাল হয়ে থাকে।

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সতর্কভাবে চলা সুন্নাত। রোগের পরেও কয়েকদিন পর্যন্ত বেছে চলা এবং পরিবেশের প্রতি স্ববিশেষ খেয়াল রাখা সুন্নাত। যেন দ্বিতীয়বার রোগাক্রান্ত হতে না হয়। তাছাড়া আরেকটা জিনিস প্রতিয়মান হল, যদি আলামত দ্বারা মেজবানের অনুমতি জানা যায়, তাহলে মেজবানের ঘরে রক্ষিত জিনিস অনুমতি ছাড়া খেতে পারবে। এ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে খেলেন, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে খাবার গ্রহণের বৈধতা বুঝিয়েছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাধারণ অভ্যাস ছিলে বসে খাবার গ্রহণ করা। আর এটা সুন্নাত।

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا.....الخ ঃ তাকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা ও ঝগড়া-ফ্যাসাদ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

كَمَا يَظَلُّ اَحَدُكُمْ يَحْمِىْ الخ ঃ রোগীকে পানি থেকে রক্ষা করা, যখন পানি রোগীর জন্য ক্ষতিকর হয়। এখানে প্রশ্ন হয়, আল্লাহর প্রিয় অনেক নবী ও অলীও তো সম্পদশালী ছিলেন ? এর উত্তর হল, এটা মূলনীতি নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে মহব্বত করেন, তাকে দুনিয়া থেকে দূরে রাখেন বরং এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যার পক্ষে দুনিয়া ক্ষতিকর বলে আল্লাহ তা'আলা يَوْمِ اَزَلْ তথা অনাদি থেকে জানেন। তখন আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে দূরে রাখেন। সুতরাং আর প্রশ্ন সৃষ্টি হবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الدَّوَاءِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ صـ٢٤

অনুচ্ছেদ ঃ ২. ঔষধ ও চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করা

حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ مُعَاذٍ الْعُقَدِىُّ الْبَصْرِىُّ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ قَالَتِ الْاَعْرَابُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا نَتَدَاوٰى قَالَ نَعَمْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ تَدَاوَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلَّاوَضَعَ لَهٗ شِفَاءً اَوْ قَالَ دَوَاءً اِلَّا دَاءً وَاحِدًا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُوَ قَالَ اَلْهَرَمُ.

وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ خُزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৫. বিশর ইবনে মুআয উকাদী বাসরী রহ........ উসামা ইবনে শারীক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেদুঈন আরবরা একবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা করব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা (গ্রহণ) করবে। আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার কোন প্রতিষেধক তিনি রাখেননি। কিন্তু একটি রোগের কোন প্রতিষেধক নেই। তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেটি কি? তিনি বললেন, বার্ধক্য। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, আবূ হুরায়রা, আবূ খুযামা তার পিতা এবং ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

চিকিৎসার বিধান এবং মতবিরোধ

চিকিৎসার বিধান কি ? এ ব্যাপারে উম্মতের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। যথা–

✪ কোনও কোনও কট্টরপন্থী সূফী বলেন, চিকিৎসাগ্রহণ জায়েয নয়।

✪ চার ইমাম, অধিকাংশ সলফ এবং পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের অভিমত হল, চিকিৎসাগ্রহণ মুস্তাহাব।

সুফিগণের দলীল

(১) রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি হল, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা এবং তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং চিকিৎসা করা তাকদীর পরিপন্থী। বিধায় চিকিৎসা না করা উচিত।

(২) তাদের দ্বিতীয় দলীল নিম্নোক্ত হাদীস–

اَلَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حِسَابٌ لَايَرْقُوْنَ وَلَا يَسْتَرِقُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (الحديث)

জমহূরের দলীল

(১) বুখারী শরীফে আবু হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلَّا لَهٗ شِفَاءً

(২) মুসলিম শরীফে আছে–

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاِذَا اُصِيْبَ دَوَاءُ دَاءٍ بَرِئَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

(৩) মুসনাদে আহমদে রয়েছে–

تَدَاوَوْا يَاعِبَادَ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلَّا وَضَعَ لَهٗ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ اَلْهَرَم

(৪) আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস, যেটি মুসনাদে আহমাদ এর হাদীসের সাথে অনেকটা মিলে যায়–

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ قَالَتِ الْاَعْرَابُ ....الخ

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

কট্টরপন্থী সূফীদের ক্বিয়াসী দলীল অর্থাৎ প্রথম দলীলের জবাব হল, চিকিৎসা করা তাকদীর পরিপন্থী নয় বরং চিকিৎসা করাও তাকদীরে ছিল। যেমন, তিরমিযীর অন্য এক বর্ণনাতে এসেছে, আবু খুযামা বর্ণনা করেন, আবু খুযামার পিতা বলেন–

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ.

আর তাদের দ্বিতীয় দলীলের জবাব বিভিন্নভাবে দেওয়া যেতে পারে। যথা–

(১) তাদের পেশকৃত হাদীসে ঐ সমস্ত লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে বলা হয়েছে, যারা হারাম চিকিৎসা থেকে কিংবা দুর্বোধ্য অর্থপূর্ণ তাবিজ থেকে অথবা কুফরি তাবিজ থেকে দূরে ছিল এবং অবস্থায় মারা গেল। আর যেসব হাদীসে চিকিৎসার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, সেসব হাদীসে চিকিৎসা দ্বারা উদ্দেশ্য হালাল পদ্ধতিতে চিকিৎসা; কুফরি পদ্ধতিতে চিকিৎসা উদ্দেশ্য নয়। অতএব তাদের পেশকৃত হাদীস দ্বারা সব ধরনের চিকিৎসা নাজায়েয সাব্যস্ত করা উচিত হবে না।

(২) তাদের পেশকৃত হাদীসটি أَفْضَلِيَّتْ তথা উত্তমতা প্রকাশের জন্য আর যেসব হাদীসে চিকিৎসার কথা আছে, সেগুলো দ্বারা বৈধতা সাব্যস্ত হবে।

(৩) তাদের পেশকৃত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য আনাড়ি চিকিৎসা থেকে যারা বেঁচে থেকেছে। কেননা অজ্ঞতাপূর্ণ চিকিৎসা উপকারের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

يَاعِبَادَ اللّٰهِ تَدَاوَوْا **:** হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.বলেন, এখানে أَمَر এসেছে إِبَاحَتْ কিংবা تَخْيِيْر এর জন্য। অর্থাৎ চিকিৎসা না করে তাওয়াক্কুল করারও ইখতিয়ার আছে। এর ব্যাখ্যা হল, তাওয়াক্কুল তিন প্রকার।

এক. নিম্নস্তরের তাওয়াক্কুল, যা হারাম। যেমন, কোন ব্যক্তি বিষ পান করে তাওয়াক্কুল করে বসে থাকল। কোন চিকিৎসা করল না। তাহলে এমন তাওয়াক্কুল হারাম। কারণ, এ ধরনের তাওয়াক্কুল কুরআনের আয়াত– وَلَاتُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ এর স্পষ্ট বিরোধী।

দুই. উচ্চমানের তাওয়াক্কুল, যা বিশেষ ব্যক্তির জন্য উত্তম। যেমন, কোন ব্যক্তির প্রবল ধারণা যে, অমুক রোগীর জন্য অমুক ঔষুধ সেবন করলে সে সুস্থ হয়ে যাবে। এ প্রবল ধারণা সত্ত্বেও সে ঔষধ সেবন না করে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করল।

তিন. মধ্যস্তরের তাওয়াক্কুল। যেমন, কারও প্রবল ধারণা নয়, তবে শুধু ধারণা যে, অমুক ঔষধে অমুক রোগের চিকিৎসা রয়েছে। তাহলে সে ইচ্ছা করলে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে, ইচ্ছা করলে তাওয়াক্কুলও করতে পারে। উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীসে যে চিকিৎসার কথা এসেছে তা জায়েয বর্ণনা করার জন্য এসেছে।

(আল-কাওকাব, হাশিয়াতুল কাওকাব, আলমগীরী)

بَابُ مَاجَاءَ مَايُطْعِمُ الْمَرِيْضَ ص٢٤

অনুচ্ছেদ ঃ ৩. রোগীর খাদ্য

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَخَذَ اَهْلَهُ الْوَعْكُ اَمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ اَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَيَرْتُوْفُؤَادَ الْحَزِيْنِ وَيَسْرُوْ عَنْ فُؤَادِ السَّقِيْمِ كَمَا تَسْرُوْا اِحْدَاكُنَّ الْوَسْخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مِنْ هٰذَا

৬. আহমাদ ইবনে মানী' রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিবারের কারও জ্বর হলে তিনি হিসা (ময়দা, ঘি/তেল ও পানি মিশিয়ে এক প্রকার তরল খাদ্য) বানাতে নির্দেশ দেন। অনন্তর তা প্রস্তুত করা হয়। পরে তিনি তা থেকে কিছু করে (রোগীকে) পান করাতে পরিবারের অন্যান্যদের নির্দেশ দেন। তিনি বলতেন, এটি বিষণ্ন মনকে দৃঢ় এবং অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয় থেকে কষ্ট দূর করে দেয়। যেমন, তোমাদের কেউ পানি দিয়ে তার চেহারা থেকে ময়লা দূর করে থাক। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। যহ্‌বী রহ. ও এ প্রসঙ্গে উরওয়া– আয়েশা রাযি. নবী কারীম সা. সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُرَيْرِيِّ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الطَّالَقَانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اَبُوْ اِسْحَاقَ -

৭ হুসাইন ইবনে জারীর রহ...... আয়েশা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উক্ত মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক রহ.ও ইবনে মুবারক থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْوَعْكُ ঃ এটি اَخَذَ এর فَاعِل হওয়ার কারণে মারফূ'। অর্থ জ্বর। وَعَكَتْهُ الْحُمّٰى ভীষণ জ্বর আসল। وَعْكَةُ الْحُمّٰى জ্বরের তীব্রতা।

اَلْحِسَاءُ ঃ এক জাতীয় খাবার। আটা-পানি ঘি মিশ্রিত করে বানানো হয়। কখনও মিষ্টি দ্রব্যও দেওয়া হয়। যা ঝোল জাতীয় হয়ে থাকে। এটিকে হারীরাও বলা হয়।

بَابُ مَاجَاءَ لَا تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ص٢٤

অনুচ্ছেদ ঃ ৪. রোগীকে পানাহারের ক্ষেত্রে জোর জবরদস্তী করবে না

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ نَا بَكْرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يُطْعِمُهُمْ وَيُسْقِيْهِمْ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

৮. আবু কুরাইব রহ...... উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা রোগীদেরকে আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের আহার করান এবং পান করান।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَاتُكْرِهُوْامَرْضَاكُمْ ঃ অসুস্থ ব্যক্তি যদি পানাহারের প্রতি বেশি অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে জোরপূর্বক পানাহার করানোর চেষ্টা করো না। কেননা অধিক অনাগ্রহ সত্ত্বেও পানাহার করালে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى الخ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অসুস্থ ব্যক্তি এমন জিনিস দ্বারা সাহায্য করেন, যা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায় এবং তিনি ক্ষুৎ-পিপাসার উপর ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি দান করেন। যে শক্তি পানাহারের মধ্যমে প্রকাশ পায়। তিনি ইচ্ছা করলে পানাহার ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমেও এ শক্তি দিতে পারেন। অতএব শক্তি অর্জনের বিষয়টি পানাহারের ভেতর সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি আল্লাহর কুদরতের উপর নির্ভরশীল।

মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেন–

اَلْمُرَدُ بِه إِقَامَةُ الشَّيْئِ مَقَامَ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ لَا نَفْسُ الطَّعَامِ وَالْقَيِّ (كوكب)

بَابُ مَاجَاءَفِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ ص٢٤

অনুচ্ছেদ ঃ ৫. কালিজিরা

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَفِى الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৯. ইবনে আবূ আমর সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা এ কালিজিরা ব্যবহার করবে। কেননা এতে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। اَلسَّامُ অর্থ মৃত্যু। এ বিষয়ে বুরায়দা, ইবনে উমর ও আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ঃ এর অর্থ এটা নয় যে, যে কোন অসুস্থতার জন্য যে কোনোভাবে ব্যবহার করা হলে সুস্থ হয়ে যাবে বরং এর অর্থ হল, প্রত্যেক রোগের জন্য কালিজিরা তখন ঔষধ হবে যখন অভিজ্ঞজন যেভাবে ব্যবহার করতে বলবেন, সেভাবে ব্যবহার করা হবে। কখনও তার সাথে অন্য ঔষধ মিশ্রিত করে কিংবা কখনও অন্যভাবে ব্যবহার করে এর থেকে ফায়দা নেওয়া যাবে। তবে ব্যবহারবিধি জেনে নিতে হবে, যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছ থেকেই। (আল কাওকাব)

আল্লামা খাত্তাবী ও ইবনে আরাবী রহ. এর মতে হাদীসটি আম। তবে তার থেকে কিছু জিনিস খাছ করা হয়েছে অর্থাৎ কালিজরা সেসব রোগের প্রতিষেধ যেগুলো কফ ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট। কেননা কালিজিরা শুষ্ক দানা। তাই সেসব রোগ নিরাময় করে, যেগুলো এর পপরিপন্থী। কারও কারও অভিমত হল, হাদীসটি সম্পূর্ণ আম। আল্লামা ইবনে আবু জামরা রহ. বলেন, লোকজন হাদীসটিকে আম থেকে খাছ করে নিয়েছে এবং হাদীসটিকে চিকিৎসক ও অভিজ্ঞজনদের কথার উপর নির্ভর করেছেন –এটা মূলতঃ সঠিত নয়। কেননা চিকিৎসকরা কথা বলে অভিজ্ঞতা ও ধারণার ভিত্তিতে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন অহীর আলোকে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উক্তিই প্রাধান্য পাবে। প্রকৃতপক্ষে হাদীসে উভয় সম্ভাবনা আছে। كُلُّ

শব্দটি অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আরবী ভাষায় এর বহু প্রচলন রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ এখানে كُلِّ শব্দটি অধিকাংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীসের বাহ্যিক অর্থও নেওয়া যেতে পারে। হতে পারে চিকিৎসকদের নিকট কালিজিরার সমস্ত উপকারীতা এ পর্যন্ত ধরা পড়েনি।

কালিজিরা সব রোগের ঔষধ

ফার্সিতে 'শোনিজ'। আরবী নাম 'আল-হাব্বাতুস-সাওদা'। ইংরেজী নাম (Black cumin) ব্লাক কিউমিন। বাংলায় বলা হয়, কালিজিরা। কালিজিরা সম্পর্কে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি অবিস্মরণীয়। এ হাদীস হুবহু এভাবে বুখারী ও মুসলিম শরীফেও এসেছে। তাছাড়া অন্য বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَقُوْلُ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ اَلسَّامُ اَلْمَوْتُ

'আবু সালামা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, কালিজিরা একমাত্র সাম বা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের মহৌষধ। ইবনে শিহাব রহ. বলেন, এখানে 'সাম' দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। (মিশকাত)

চিকিৎসক ও গবেষকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বাণীর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন–"কালিজিরা একটি বিস্ময়কর রোগ নিরাময়কারী বস্তু। সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় এটি রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় ব্যবহার হয়ে আসছে। তাই একে 'হাব্বাতুল বারাকাহ'-ও বলা হয়। ঔষধ হিসাবে কালিজিরার ব্যবহার বিভিন্নভাবে করা হয়। এ্যাজমা, হাঁপানি, আর্থ্রাইটিস ও ডায়েবেটিস রোগের চিকিৎসায় এটি অত্যন্ত কার্যকর। শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা প্রশমনে, পাকস্থলীর রোগ নিরাময়ে, কিডনির প্রদাহ নিরাময়ে, লিভারের কার্যক্রম ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সচল রাখতে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখে। প্রসূতি মায়ের প্রসবের ব্যথা প্রশমন, বুকের দুধ বৃদ্ধি, অনিয়মিত মাসিকের ব্যথা, জ্বর, সর্দি, কাশি, যৌনশক্তি বৃদ্ধি, প্রসাব ও ধাতু সংক্রান্ত রোগেরও প্রতিষেধক এ কালিজিরা।" (কিতাবুল মুফরাদাত, খাওয়াসসুল আদবিয়া, ২৭৯)

হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন রোগ-যন্ত্রনা খুব বেশী কষ্টদায়ক হয়, তখন এক চিমটি পরিমাণ কালিজিরা নিয়ে খাবে। তারপর পানি ও মধু সেবন করবে। (তাবরানী)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ شُرْبِ اَبْوَالِ الْاِبِلِ ص٢٤

অনুচ্ছেদ ঃ ৬. উটের পেশাব পান করা

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ نَا عَفَّانُ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ وَقَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اِشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১০. হাসান ইবনে মুহাম্মদ যা'ফরানী রহ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনায় আসে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হয়নি। (ফলে তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সদকার উট রক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা এর দুধ এবং পেশাব পান কর। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ এর بَابُ مَنْ شَرِبَ أَبْوَالَ الْإِبِلِ এর অধীনে করা হয়েছে। প্রয়োজনে সেখানে দ্রষ্টব্য।

بَابُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمٍّ أَوْغَيْرِهِ صـ٢٤

অনুচ্ছেদ ঃ ৭. বিষ বা অন্য কিছু প্রয়োগে আত্মহত্যা করা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا بَطْنَهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمٍّ فَسَمُّهُ فِى يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا

১১. আহমদ ইবনে মানী' রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে মরফূরূপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার হাতে থাকবে সেই লৌহ। জাহান্নামের আগুনে থেকে সবসময় সে তা দিয়ে তার পেটে ঘা মারতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে সে বিষ তার হাতে থাকবে আর জাহান্নামের আগুনে থেকে সব সময় সে তা গলঃধকরণ করতে থাকবে।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمٍّ فَسَمُّهُ فِى يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

১২. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ........ আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করে, সেই লৌহ তার হাতে থাকবে আর জাহান্নামের আগুনে থেকে সবসময়ের জন্য সে তা দিয়ে তার পেটে ঘা মারতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে, সেই বিষ তার হাতে থাকবে আর জাহান্নামের আগুনে থেকে সব সময়ের জন্য সে তা গলঃধকরণ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে সব সময়ের জন্য জাহান্নামে গড়িয়ে পড়তে থাকবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ، حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ هٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمٍّ عُذِّبَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَهٰكَذَا

رَوَاهُ اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَهٰذَا اَصَحُّ لِاَنَّ الرِّوَايَاتِ اِنَّمَا تَجِيْئُ بِاَنَّ اَهْلَ التَّوْحِيْدِ يُعَذَّبُوْنَ فِى النَّارِ ثُمَّ يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا يُذْكَرُ اَنَّهُمْ يُخَلَّدُوْنَ فِيْهَا

১৩. মুহাম্মদ ইবনে আ'লা রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শু'বা – আ'মাশ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি প্রথমোক্ত হাদীসটি থেকে অধিক সহীহ। এ হাদীসটি একাধিক ব্যক্তি আ'মাশ – আবূ সালিহ – আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইবনে আজলান রহ. সাঈদ মাকবুরী – আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে জাহান্নামের আগুনে তাকে আযাব দেওয়া হবে। এতে خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا (সব সময়ের জন্য সে তাতে অবস্থান করবে) এ কথার উল্লেখ নেই। আবূ যিনাদ রহ. এটিকে আ'রাজ – আবূ হুরাইরা রাযি.–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এটি অধিকতর সহীহ। কেননা বহু রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি (আমলের ত্রুটির কারণে) জাহান্নামে আযাব প্রদান করা হবে বটে কিন্তু পরে তাকে তা থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে। তাদের সেখানে সদা সর্বদার জন্য রাখা হবে বলে কোন উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ يَعْنِى السَّمَّ ۔

১৪. সুয়াইদ বিন নছর....হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবীস ওষধ খেতে নিষেধ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا ঃ বিষ ইত্যাদির মাধ্যমে স্বয়ং নিজেকে হত্যা করাকে বলা হয় আত্মহত্যা। আত্মহত্যার হুকুম কি ? এ ব্যাপারে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে।

✪ মু'তাযিলা এবং খারেজী সম্প্রদায়ের মতে আত্মহত্যাকারী চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে।

✪ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে যে কোন কালিমাধারী মুসলমান চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে না। চাই সে মুসলমান আত্মহত্যা করুক কিংবা অন্য কোন কবীরা গুণাহ করুক। তবে বেহেশতে যাওয়ার পূর্বে গুনাহর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

বিপক্ষের দলীল

মু'তাযিলা এবং খারেজী সম্প্রদায় দলীল হিসাবে পেশ করে আলোচ্য পরিচ্ছেদের উল্লেখিত হাদীসকে এবং সেসব হাদীসকে যেগুলোর বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, কবীরা গুণাহকারী চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের দলীল

১. কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

২. নিম্নোক্ত হাদীস এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস, যেসব হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কবীরা গুনাহকারী চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না বরং একদিন না হয় একদিন জান্নাতে যাবে। হাদীসটি নিম্নরূপ।

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا

বিপক্ষের দলীলের জবাব

মু'তাযিলা এবং খারেজী সম্প্রদায়ের প্রদত্ত দলীলের বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

(১) আল্লামা গঙ্গুহী রহ. বলেন– অবস্থাভেদে خلود এর অর্থেও পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন, خُلُوْدُ الدُّنْيَا এর সীমা মৃত্যু পর্যন্ত। خُلُوْد عَالَم এর সীমা বরযখ ও হাশর পর্যন্ত। সুতরাং এখানে خُلُوْد এর অর্থ হবে, আযাবের নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। (আল-কাওকাব)

(২) হাদীসে বর্ণিত خَالِدًا مُخَلَّدًا কথাটি সে সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা কবীরা গুনাহকে হালাল মনে করে।

(৩) خُلُوْد এর অর্থ, চিরকাল নয় বরং দীর্ঘদিন।

(৪) এটি সতর্কতাস্বরূপ কিংবা ধমকিস্বরূপ বলা হয়েছে।

(৫) এমন কর্মসম্পাদনকারী চিরকাল জাহান্নামে থাকার উপযোগী। তাওহীদের বিশ্বাসী হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের উপর রহমতের বিশেষ নজর দিবেন। বিধায় তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না।

(৬) সবচেয়ে সুন্দর উত্তর দিয়েছেন ইমাম তিরমিযী রহ. যা রেওয়ায়েতের শেষে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করা উচিৎ।

বিষের প্রকারভেদ এবং আহকাম

বিষ চার প্রকার ঃ

(১) কম-বেশি উভয়ই প্রাণনাশক। এটি সম্পূর্ণ হারাম। ঔষধ হিসাবেও সেবন করা যাবে না। কেননা কুরআন মজীদে এসেছে– وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

(২) যার আধিক্য প্রাণনাশক, স্বল্পমাত্রা প্রাণনাশক নয়। তাহলে হুকুম হল, বেশিমাত্রা হারাম। আর স্বল্পমাত্রায় যদি প্রাণনাশের সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে প্রয়োজনের মুহূর্তে হালাল।

(৩) যার মধ্যে প্রাণনাশের সম্ভাবনার দিক প্রবল। তবে প্রাণনাশ না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। তাহলে এটাও হারাম।

(৪) যাতে প্রাণনাশের সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ, তবে কখনো প্রাণনাশও করে। তাহলে এমন বিষ ঔষধ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। এছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী)

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِي بِالْمُسْكِرِ ص ٢٤

অনুচ্ছেদ ঃ ৮. নেশা জাতীয় বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা করা মাকরূহ

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ وَسَأَلَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ أَوْ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا لَنَتَدَاوَى بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

১৫. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ...... আলকামা ইবনে ওয়াইল এর পিতা ওয়াইল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন সুওয়াইদ ইবনে তারিক (বর্ণনান্তরে তারিক ইবনে সুওয়াইদ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি তাকে এ থেকে নিষেধ করেছেন।

সুওয়াইদ রাযি. বললেন, আমরা তো এর মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ঔষধ নয় বরং এটা একটি রোগ।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ نَا النَّضْرُ وَشَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ النَّضْرُ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ وَقَالَ شَبَابَةُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৬. মাহমূদ রহ...... শু'বা রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মাহমূদ বলেন, রাবী নাযর তারিক ইবনে সুওয়াইদ বলে উল্লেখ করেছেন। আর শাবাব রহ. উল্লেখ করেছেন সুওয়াইদ ইবনে তারিক রূপে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ ঃ তাহযীবুত-তাহযীব গ্রন্থে আছে, তারিক ইবনে সুওয়াইদ রাযি.। তাঁকে সুওয়াইদ ইবনে তারিক আল-হাযরামীও বলা হয়। আবার জু'ফীও বলা হয়। তিনি একজন সাহাবী।

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلٰكِنَّهَا دَاءٌ ঃ হারামবস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা যাবে কিনা –এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আইয়াম্মায়ে কিরামের মতভেদসহ পেছনে করে এসেছি। ইমাম নববী রহ. মদের ব্যাপারে বলেন, আলোচ্য হাদীসটিতে একথা স্পষ্ট যে, মদ ঔষধ নয়। সুতরাং মদ যখন ঔষধ নয় এবং এর মধ্যে আরোগ্যতা নেই, বিধায় বিনা কারণে মদ পান করা হারাম। তবে কারও গলার ভেতর যদি এমনভাবে খাবার আটকে যায় যে, মদ পান ছাড়া তা নিচে নামবে না এবং এ মুহূর্তে মদ না হলে তার প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে, তাহলে তখন মদ পান করা জায়েয। কেননা তখন মদের মাধ্যমে প্রাণ বেঁচে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। চিকিৎসার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা মদের মাধ্যমে চিকিৎসা করলে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকলেও নিশ্চয়তা নেই। অতএব ঔষধ হিসাবে মদ ব্যবহার করা জায়েয হবে না। আর প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে হলে ঐ পরিমাণ পান করা যাবে, যতটুকুতে প্রাণ বাঁচে। কেননা উসূলে ফিক্‌হের নীতি হল– اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (قواعد الفقه ص ١٨٩) প্রয়োজন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّعُوْطِ وَغَيْرِهِ صـ٢٥

অনুচ্ছেদ ঃ ৯. নাক দিয়ে ঔষধ দেওয়া ইত্যাদি

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيَةَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَمَّادٍ نَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ خَيْرَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ اَلسَّعُوْطُ وَاللَّدُوْدُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَدَّهُ اَصْحَابُهُ فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ لَدُّوْهُمْ قَالَ فَلُدُّوْا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْعَبَّاسِ

১৭. মুহাম্মদ ইবনে মাদদুওয়াহ রহ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি হল নাক দিয়ে ঔষধ দেওয়া, মুখ দিয়ে ঔষধ দেওয়, রক্ত মোক্ষন এবং জুলাপ ব্যবহার জাতীয় ঔষধ। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন সাহাবীগণ তাঁকে মুখ দিয়ে ঔষধ খাওয়ান। তাদের কাজ শেষ হলে তিনি বললেন, এদেরকেও মুখ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ কর। বর্ণনাকারী বলেন, আব্বাস রাযি. ছাড়া (সংশ্লিষ্ট) সকলকেই মুখ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ نَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اَللَّدُوْدُ وَالسَّعُوْطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرَ

مَاكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِى كُلِّ عَيْنٍ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِيثُ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ

১৮. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ....... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি হল, মুখ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করা, নাক দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করা, রক্ত মোক্ষন এবং জুলাপ ব্যবহার জাতীয় ঔষধ আর যে সব বস্তু দিয়ে তোমরা সুরমা ব্যবহার কর, সেগুলোর মধ্যে উত্তম হল, 'ইছমিদ'। কেননা ইছমিদ সুরমা চোখের জ্যোতি তীক্ষ্ণ করে এবং পাপড়ির চুল উদগম করে। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর একটি সুরমাদানী ছিল। নিদ্রা যাওয়ার সময় প্রতিটি চক্ষুতে তা থেকে তিনি তিনবার করে সুরমা লাগাতেন। আব্বাস ইবনে মানসূর রহ.-এর এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسَّعُوطُ (بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّ الْعَيْنِ) ঃ অর্থ নাকে প্রবেশ করানোর ঔষধ। যেমন, বলা হয়, اِسْتَعَطَ الدَّوَاءَ ঔষধ নাকে প্রবেশ করাল। আরও বলা হয় سَعَطَهُ (ف، ن، سَعْطًا) وَسَعَطَهُ وَاَسْعَطَهُ তার নাকে ঔষধ প্রবেশ করাল। হাফেয ইবনু হাযার বলেনঃ سَعْط বা سَعُوطٌ এর পদ্ধতি হল, রোগী নিজের পিঠের উপর শোয়া। তারপর তার দুই কাঁধের মাঝখানে কোন কিছু রাখা, যাতে সে কিছুটা উঁচু হয় এবং মাথা নিচু হয়ে যায়। অতঃপর তার নাকে ফোঁটা ফোঁটা ঔষধ দেওয়া, যেন মস্তিষ্ক পর্যন্ত ঔষধ পৌঁছে যায় এবং হাঁচি আসে। এভাবে সে যেন সুস্থ হয়ে যায়।

لَدُوْدٌ (بِفَتْحِ اللَّامِ) ঃ রোগীর মুখের কোন এক পার্শ্ব দিয়ে যে ঔষধ সেবন করানো হয়। لَدُوْدٌ (بِضَمِّ اللَّامِ) অর্থ, লাদূদ করা বা মুখে ঔষধ দেওয়া। اَلْحِجَامَةُ শিঙ্গা লাগানো। اَلْمَشِيُّ সে ঔষধ যা খেলে অথবা পান করলে পেটপরিস্কার হয়। এটি দাস্ত আনয়নকারী ঔষধ। যেহেতু এ ঔষধ খেলে বা পান করলে বাথরূমে যেতে হয়, তাই তাকে اَلْمَشِيُّ বলে।

قَالَ لُدُّوهُمْ ঃ মৃত্যুশয্যায় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পবিত্র মুখে ঔষধ দিয়ে লাদূদ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইংগিতে লাদূদ করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন, এ রোগের কারণে তিনি বারণ করছেন। যেমন, অধিকাংশ রোগী এরকম করেই থাকে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বেহুঁশ অবস্থায় ছিলেন, তখনও সাহাবায়ে কেরাম লাদূদ করলেন। তারপর ফযল তাঁর হুঁশ আসলো। তিনি সাহাবাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরাও 'লাদূদ' কর। তারপর সাহাবায়ে কেরামও নিজেরা 'লাদূদ' করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' লাদূদ' থেকে বারণ করেছিলেন, যেহেতু তিনি জানতেন, এ ব্যাধিতেই তাঁর মৃত্যু হবে। অতএব 'লাদূদ' দ্বারা কোন কাজ হবে না। তবে বিশুদ্ধ মতে লাদূদ থেকে তাঁর বারণ করার কারণ ছিল, 'লাদূদ' তাঁর রোগ উপযোগী ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম মনে করেছেন, তাঁর পার্শ্বদেশে ব্যথার রোগ হয়েছিল, যেই রোগের জন্য 'লাদূদ' উপযোগী ছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এ ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'লাদূদ' করতে বললেন কেন ?

(১) কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা কিসাস এবং প্রতিশোধ নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। যেমন, আল্লাহ বলেছেন–

مَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُمْ তবে এ উত্তর সঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতেন না বরং তিনি মাফ করে দিতেন।

(২) কারও কারও অভিমত হল, এ নির্দেশটি ছিল, তাঁর পূর্ণ স্নেহের বহিঃপ্রকাশ। কেননা হতে পারে উপস্থিত সাহাবাগণ এ কাজের জন্য আখেরাতে পাকড়াও হবেন। তাই দুনিয়াতেই তাদেরকে নিস্কৃতি দিয়ে দিলেন।

(৩) বিশুদ্ধ মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। যেন সাহাবায়ে কেরাম আর এমন না করেন।

প্রশ্ন হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্বাস রাযি. কে উক্ত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত করলেন না কেন ? এর উত্তর যেহেতু হযরত আব্বাস রাযি. তখন ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। যেমন, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাতে এসেছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ এ জন্য তাঁকে 'লাদূদ' করা হয়নি। কেউ কেউ বলেন, হযরত আব্বাস রাযি. রোযাদার ছিলেন। বিধায় তাঁকে নির্দেশভুক্ত করা হয়নি। কারও কারও মতে, আব্বাস রাযি. যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা ছিলেন। আর চাচা পিতৃতুল্য বিধায় সম্মানার্থে তাঁকে উক্ত নির্দেশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। (আল-কাওকাব, তুহফাহ, তাকমিলাহ)

إِثْمِدْ ঃ হামযা ও মীমে যের। এক জাতীয় সুরমার নাম। যা লালচে কালো রং বিশিষ্ট হয়ে থাকে। প্রাচ্যে এর জন্ম। কোনও কোনও আকাবির এর দ্বারা ইস্পাহানী সুরমা উদ্দেশ্য নেন। উলামায়ে কেরাম বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সুরমা, যা সুস্থ চোখের জ্যেতি বাড়ায়। আর অসুস্থ চোখে ব্যথা সৃষ্টি করে। শব্দটির আলিপকে পেশ দিয়েও কেউ কেউ পড়েছেন।

উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসের আলোকে লিখেন, সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত। বিশেষ করে 'ইসমিদ' সুরমা উত্তম। ঘুমানোর পূর্বে সুরমা অধিক ফলপ্রসূ।

সুরমা কয় শলাকা দিতে হবে ?

কেউ কেউ বলেন, উভয় চোখে তিনবার তিনবার দিবে। কারও কারও অভিমত হল, ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে দু'বার। হাফেয ইবনু হাযার এবং মোল্লা আলী ক্বারী রহ. প্রথম পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যদিও অবস্থাভেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় পদ্ধতিতেই ব্যবহার করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে প্রথম পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা অধিক। তাই উত্তম এটিই। (খাসায়েলে নববী)

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِى بِالْكَيِّ ص۲٥

অনুচ্ছেদ ঃ ১০. দাগ দেওয়া মাকরূহ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْكَيِّ قَالَ فَابْتُلِيْنَا فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ........ ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাগ দেওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন, কিন্তু আমরা রোগ-বালাইয়ে নিপতিত হয়ে দাগ দিয়েছি। তবে আমাদের কোন ফল হয়নি এবং আমরা তাতে সফলতাও লাভ করিনি। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ نُهِيْنَا عَنِ الْكَيِّ وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২০. আব্দুল কুদ্দুস ইবনে মুহাম্মদ রহ...... ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে দাগ দেওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, উকবা ইবনে আমের ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْكَيُّ ঃ মিসবাহুল লুগাতে রয়েছে, كَوٰى يَكْوِىْ (ض، كَيًّا) فُلَانًا তপ্ত লোহা ইত্যাদি দ্বারা দাগ দেওয়া হল। اِكْتَوٰى فُلَانًا দগ্ধ হল। গরম লোহায় দাগানো হল। সেঁকা হল। اِسْتَكْوٰى فُلَانًا অমুককে সেঁকা দিতে বলল। লোকটিকে সেঁকা দেওয়ার সময় হল। اَلْكَيَّةُ সেঁকা দেওয়ার স্থান। اَلْمِكْوَاةُ সেঁকা দেওয়ার লোহা, ইস্ত্রি।

দাগ লাগানো এবং নিষেধ সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন

কোনও কোনও হাদীসে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কোন কোন সাহাবা যেমন সা'দ ইবনে মু'আয, আস'আদ ইবনে যারারাহ রাযি. প্রমুখ দাগ দিয়েছেন। অথচ আলোচ্য হাদীসে কাজটি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

(১) হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, نَهْى عَنِ الْكَيِّ এর বর্ণনা মানসূখ হয়ে গেছে। উক্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল ইসলামের প্রথম দিকে। যখন মানুষের অন্ধবিশ্বাস ছিল যে, চিকিৎসা শুধু দাগ দেওয়া বা সেঁকা দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে। দাগ দেওয়াকে তারা সুস্থতার জন্য উসীলা মনে করার পরিবর্তে সুস্থতাদানকারী মনে করত। তারপর যখন মানুষের অন্তরে ইসলামী আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন পুনরায় দাগ-চিকিৎসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

(২) নিষেধ করা হয়েছে পরামর্শ হিসাবে। কেননা এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে অনিষ্টতার সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা শরীরে সেঁকার দাগ রয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের বিধান হিসাবে এ 'নিষেধাজ্ঞা' আরোপ করা হয়নি।

(৩) নিষেধাজ্ঞা আরোপের বর্ণনা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন মানুষের কাছে এছাড়াও অন্য ঔষধ থাকবে।

(৪) كَيٌّ فَاحِشٌ তথা অতিরিক্ত দাগ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যথায় স্বাভাবিকভাবে দাগ দেওয়া জায়িয।

(৫) নিষেধাজ্ঞার হাদীস হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. এর সঙ্গে বিশেষিত। কেননা এ চিকিৎসা তার জন্য সমীচীন ছিল না।

(৬) হযরত মাওলানা মুফতী শফী রহ. বলতেন, শরী'আতের দৃষ্টিতে দাগ লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসা করা পছন্দনীয় নয়। কেননা দাগ লাগানোর দ্বারা রোগী নিশ্চিত ব্যথা-যন্ত্রনা পাবে। তাছাড়া রোগ নিরাময়ের বিষয়টিও নিশ্চিত নয়। তবে সত্ত্াগতভাবে এ চিকিৎসা জায়েয আছে- এতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য এটা উত্তম নয়। যেসব রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে দাগলাগানোর চিকিৎসার অনুমতি দিয়েছেন, সেগুলো সব বৈধতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হতে পারে অন্যান্য চিকিৎসায় কাজ না হওয়ার কারণে শুধু অপারগতার ক্ষেত্রে চিৎিসার এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

মোটকথা, দাগ লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসা থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা ভালো। বর্তমান যুগে অপরেশন দাগের মাধ্যমে চিকিৎসার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং একান্ত প্রয়োজন না হলে তা না করা উচিত।

(দরসে তিরমিযী ১, আল-কাওকাব খণ্ড ৩,)

মাসআলা ঃ আমাদের বর্তমান যুগে অপারেশনের হুকুম দাগ-চিকিৎসার হুকুমের অনুরূপ। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে এ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না। (দরসে তিরমিযী, আল-কাওকাব)

بَابُ مَاجَاءَفِى الرُّخْصَةِ فِى ذَالِكَ صـ٢٥

অনুচ্ছেদ ঃ ১১. এ বিষয়ে অবকাশ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَوٰى سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ اُبَىٍّ وَجَابِرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২১. হুমাইদ ইবনে মাসআদা রহ....... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "শাওকা" রোগে আসআদ ইবনে যুরারা রাযি.-এর দাগ লাগিয়েছিলেন। এ বিষয়ে উবাই ও জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

شَوْكَةٌ ঃ আল মুনজিদ-এ এসেছে–

اَلشَّوْكَةُ حمرة تَعْلُوا الْجَسَدَ وَرِيْحُ الشَّوْكَةِ خِرَاجٌ يَحْدُثُ غَالِبًا فِى اِبْهَامِ الْيَدِ وَلُؤْلُمِ

অর্থাৎ شَوْكَة অর্থ শরীরে উদীয়মান লালচে ফুসকুরি বা ব্রণবিশেষ। আর رِيْحُ الشَّوْكَة অর্থ বুড়ো আঙ্গুলে যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়াবিশেষ।

كَوٰى ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে দাগ দিয়েছেন অথবা কাউকে দাগাতে বলেছেন, এটা স্পষ্ট হয়নি যে, উল্লেখিত ব্যাধির চিকিৎসার জন্য হযরত আসআদ রাযি. এর শরীরের কোন অংশে দাগ দেওয়া হয়েছিল।

সেঁকা দেওয়া দাগানোর ব্যাপারে চার ধরনের বর্ণনা

১. কোন কোন হাদীস দ্বারা জায়েয প্রমাণিত হয়। যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়।

২. কোন কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, দাগ লাগানো নিম্নে প্রমাণিত হয়।

৩. কোন কোন হাদীস থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাগানো পছন্দ করতেন না।

৪. কোন কোন হাদীসে দাগানোর ব্যাপারে প্রশংসা করা হয়েছে।

বিরোধ অবসান

উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, যেসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাগানোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলো মূলতঃ দাগানোর বৈধতা প্রমাণ করে। আর যেসব হাদীসে অপছন্দনীয়তার কথা বুঝা যায়, সেগুলো বৈধতার পরিপন্থী নয়। কেননা অপছন্দনীয়তা অবৈধতা বুঝায় না। বহু জিনিস আছে এরকম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করতেন না, কিন্তু অন্যদেরকে নিষেধও করতেন না। অনুপভাবে যেসব হাদীসে না দাগানোর প্রশংসা এসেছে, সেগুলোও অবৈধতা বুঝায় না। কেননা প্রশংসার উদ্দেশ্যে ছিল, শুধু একথা প্রকাশ করা যে, না দাগানো উত্তম। অবৈধতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয়। আর যেসব হাদীসে সুস্পষ্টভাবে দাগানো থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সে নিষিদ্ধতা মূলতঃ তখনকার জন্য যখন রোগের চিকিৎসার জন্য দাগানো ছাড়া অন্য পদ্ধতি করার সুযোগ থাকে। দাগানোর মূলতঃ প্রয়োজন না থাকে।

بَابُ مَاجَاءَفِى الْحِجَامَةِ ص۲٥

অনুচ্ছেদ ঃ ১২. রক্তমোক্ষণ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ نَا هَمَّامٌ وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَا نَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَحْتَجِمُ فِى الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَمَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২২. আবদুল কুদ্দুস ইবনে মুহাম্মদ রহ....... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘাড়ের দুই পাশের রগে এবং কাঁধে রক্তমোক্ষণ করাতেন। আর তিনি মাসের সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখ রক্ত মোক্ষণ করাতেন। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস ও মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشٍ الْيَامِىُّ الْكُوْفِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ اِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةٍ اُسْرِىَ بِهِ اَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلٰى مَلَأٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ اِلَّا اَمَرُوْهُ اَنْ مُرْ اُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ

২৩. আহমদ ইবনে বুদাইল ইবনে কুরাইশ ইয়াসী কূফী রহ......... ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মিরাজ-এর ঘটনা বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি তখন ফিরিশতাগণের যে দলের পাশ দিয়েই গেছেন, সে দলই তাঁকে বলেছে, আপনি আপনার উম্মতকে রক্তমোক্ষণের নির্দেশ দিবেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. **বলেন,** ইবনে মাসউদ রাযি.-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান ও গরীব।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ نَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ كَانَ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ غِلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَّامُوْنَ فَكَانَ اِثْنَانِ يُغِلَّانِ وَوَاحِدٌ يَحْجُمُهُ وَيَحْجُمُ اَهْلَهُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يُذْهِبُ بِالدَّمِ وَيُخِفُّ الصُّلْبَ وَيَجْلُوْ عَنِ الْبَصَرِ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلٰى مَلَأٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ اِلَّا قَالُوْا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ وَقَالَ اِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُوْنَ فِيْهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَقَالَ اِنَّ خَيْرَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوْطُ وَاللَّدُوْدُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِىُّ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَدَّهُ الْعَبَّاسُ وَاَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَدَّ فِى فَكُلُّهُمْ اَمْسَكُوْا فَقَالَ لَا

يَبْقَى اَحَدٌ مِمَّنْ فِى الْبَيْتِ اِلاَّ لُدَّ غَيْرَ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ قَالَ النَّضْرُ اَللَّدُوْدُ الْوَجُوْرُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ

২৪. আবদ ইবনে হুমাইদ রহ....... ইকরিমা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি.-এর তিনজন রক্ত মোক্ষণকারী গোলাম ছিল। দুজন তো তাঁর ও তাঁর পরিবারের আয়ের জন্য মজুরীর বিনিময়ে কাজ করত আর একজন তাঁকে এবং তার পরিবার-পরিজনের রক্তমোক্ষণ করত।

ইকরিমা বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রক্ত মোক্ষণ অভিজ্ঞ গোলাম কতইনা ভাল। সে (দূষিত) রক্ত বিদূরীত করে, (উপার্জন করে) পিঠের বোঝা লাঘব করে এবং চোখের ময়লা দূর করে। ইবনে আব্বাস রাযি. আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মি'রাজে গমন করেন তখন ফিরিশতাগণের যে দলের পাশ দিয়েই তিনি গিয়েছেন, সে দলই তাঁকে বলেছেন, আপনি অবশ্যই রক্ত মোক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। তিনি বলেন– সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখে রক্ত মোক্ষণ উত্তম। তোমাদের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে উত্তম হল, নাক দিয়ে ঔষধ দেওয়া, মুখ দিয়ে ঔষধ দেওয়া, রক্ত মোক্ষণ এবং জুলাপ ব্যবহার করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আব্বাস রাযি. ও তাঁর সঙ্গীগণ মুখ দিয়ে ঔষধ প্রদান করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কে আমার মুখ দিয়ে ঔষধ দিয়েছে? সকলেই চুপ করে রইলেন। তিনি বললেন যে, তাঁর চাচা আব্বাস ব্যতীত এ ঘরে যারা আছে, সবাইকে মুখ দিয়ে ঔষধ প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আব্বাস ইবনে মানসূর রহ.-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يَحْتَجِمُ ঃ শব্দটি حَجَمَ থেকে। اِحْتَجَمَ অর্থ সিঙ্গা লাগানো, রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, রক্তমোক্ষণ চিকিৎসা গ্রহণ করা।

اَلْاَخْدَعَيْنِ ঃ ঘাড়ের ধমনীদ্বয়কে اَخْدَعَانِ বলা হয়। যেখানে সাধারণতঃ শিঙ্গা বা রক্তমোক্ষণ চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়।

اَلْكَاهِلُ ঃ এর বহুবচন كَوَاهِلُ অর্থ ঘাড় সংলগ্ন পিঠের উপরের অংশ, কাঁধ।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবেশ কয়েকবার এ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যার কারণ ছিল, ইয়াহুদীরা খায়বরে তাঁকে প্রাণনাশক বিষ পান করিয়ে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করে দিয়ে তাদের ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করা। যদিও তাদের বিষমিশ্রিত গোশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরোপুরি ভক্ষণ করেন নি। কিন্তু যতটুকু খেয়েছেন, তারই প্রতিক্রিয়াতে মাঝে মাঝে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে তিনি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতেন।

যে দিকটায় তিনি ব্যথা অনুভব করতেন, সে দিকটায় শিঙ্গা লাগানোর প্রয়োজন হত। আর যেহেতু বিষের প্রতিক্রিয়া রক্তের সঙ্গে মিশে যায় বিধায় পুরো শরীরে তা ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য ব্যথাটা এক সময় এক জায়গায় দেখা দিত। যেখানে দেখা দিত, সেখানে তিনি শিঙ্গা দিতেন। এ কারণে এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম অবস্থায়ও শিঙ্গা দিয়েছেন।

وَكَانَ يَحْتَجِمُ ..... الخ ঃ আল্লামা সাহারানপুরী রহ. বযলুল মাযহূদে ফতহুল ওদূদ-এর বরাতে উল্লেখ

করেছেন, উল্লেখিত তারিখগুলোতে শিঙ্গা লাগানোর পেছনে হেকমত ছিল, মাসের শুরুতে রক্ত চলাচল তীব্র থাকে। আর মাসের শেষে এসে ঝিমিয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে মাসের মাঝামাঝি সময়ে রক্ত স্বাভাবিক থাকে। আর তাই মাসের মধ্য তারিখগুলো এ চিকিৎসার জন্য অধিক উপযোগী।

مُرُاُمَّتَكَ ঃ এখানে 'উম্মত' দ্বারা উদ্দেশ্য, তৎকালীন আরববাসী অথবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্প্রদায়ের লোকজন কিংবা উম্মতের সকল সদস্যই উদ্দেশ্য হতে পারে। যার জন্য উল্লেখিত রক্তমোক্ষণ চিকিৎসা গ্রহণ করা জরুরী। আল্লামা তাবারী রহ. সহীহ সনদসহ ইবনে সীরীন রহ. থেকে নকল করে বলেন, চল্লিশোর্ধ মানুষের জন্য উক্ত চিকিৎসা উপযোগী নয়।

শিঙ্গার এ গুরুত্ব ও ফযীলতের কারণ হল, রক্ত খারাপ হয়ে গেলে অনেক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়। এ ধরনের রোগের চূড়ান্ত চিকিৎসা হল, ঐ খারাপ রক্ত বের করে ফেলা। রক্ত বের করার অন্য পদ্ধতির তুলনায় শিঙ্গা অধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হল, হিজায একটি উষ্ণ অঞ্চল। আর উষ্ণ অঞ্চলের মানুষের জন্য শিঙ্গা লাগানো অধিক উপযোগী। কেননা মৌসুমের তাপদাহ ও শৈতপ্রবাহের কারণে মানুষের মেজায ও স্বভাবেও পার্থক্য চলে আসে। গরম এলাকায় গ্রীস্মকালে উষ্ণতা দেখা দেয় দেহের বাহ্যিক অংশে। আর অভ্যন্তরাংশে থাকে ঠাণ্ডার প্রভাব। তাই গরমকালে উষ্ণতা দেয় দেহের বাহ্যিক অংশে। আর অভ্যন্তরাংশে থাকে ঠাণ্ডার প্রভাব। তাই গরমকালে অধিক ঘাম আসে। আর অভ্যান্তরীণ অবস্থা ঠাণ্ডা থাকার কারণে হজম সহজে হয় না। এভাবে রোগ-ব্যাধী সৃষ্টি হয়। এর বিপরীতে শীতপ্রধান দেশগুলোতে মানুষের দৈহিক উষ্ণতা শীতের কারণে দেহের অভ্যন্তরে চলে যায়। যার ফলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। পেশাবে বাষ্প বের হয়। রোগ-ব্যাধি কম হয়। শিঙ্গায় যেহেতু শরীরের উপরাংশ থেকে রক্ত বের হয় আর হেজাযে দেহের উপরাংশে উষ্ণতা অধিক থাকে। তাই শিঙ্গা সেখানকার লোকদের জন্য অধিক উপযোগী ও সঙ্গত। (মাজাহেরে হক)

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّدَاوِىْ بِالْحِنَّاءِ ص ٢٥

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩. মেহেদী দ্বারা চিকিৎসা করা

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَاحَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ نَا فَائِدٌ مَوْلًى لِآلِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدَّتِهٖ وَكَانَتْ تَخْدِمُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ مَاكَانَ يَكُوْنُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُرْحَةٌ وَلَا نُكْبَةٌ اِلَّا اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِنَّمَا نَعْرِفُهٗ مِنْ حَدِيْثِ فَائِدٍ وَرَوٰى بَعْضُهُمْ عَنْ فَائِدٍ فَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدَّتِهٖ سَلْمٰى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَلِيٍّ اَصَحُّ

২৫. আহমদ ইবনে মানী রহ...... আলী ইবনে উবায়দুল্লাহ তাঁর পিতা সালমা উম্মু রাফি' রাযি. থেকে বর্ণিত। সালমা রাযি. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমত করতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই তরবারী বা কাঁটা ইত্যাদি দ্বারা আহত হয়েছেন, আমাকে তাতে মেহদী লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ফাইদ রহ.-এর সূত্রেই আমরা এটি সম্পর্কে জানি। কোনও কোনও রাবী ফাইদ থেকে এটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে আলী তাঁর পিতামহী সালমা রাযি. বর্ণিত......। সূত্রে উবায়দুল্লাহ ইবনে আলী উল্লেখ করাই অধিক সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عَنْ جَدَّتِهٖ ঃ তিনি হলেন হযরত আবু রাফি' রাযি এর স্ত্রী উম্মে রাফি' সালামা। তিনি সাহাবী।

قَوْلُهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْحَةٌ ঃ ق এর উপর যবর, আবার পেশও দেওয়া যায়। তলোয়ার বা ছুরি ইত্যাদির আঘাত। وَلَا نُكْبَةٌ ঃ ن এর উপর যবর। পাথর বা কাঁটার আঘাত। (তুহফাহ)

মেহদীর ক্রিয়া শীতল বিধায় এর আর্দ্রতা জখমের জ্বালা-পোড়া কমিয়ে দেয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الرُّقْيَةِ ص ٢٥

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪. ঝাড়-ফুঁক অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا سُفْيٰنُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اِكْتَوٰى أَوِ اسْتَرْقٰى فَهُوَ بَرِئٌ مِنَ التَّوَكُّلِ، وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৬. ইবুনদার রহ........আফ্‌ফান ইবনে মুগীরা ইবনে শু'বা তাঁর পিতা মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন, যে ব্যক্তি দাগ নেয় বা ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করে, সে তাওয়াক্‌কুল থেকে মুক্ত। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে দু'ধরনের হাদীস ও বিরোধ নিরসন

ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে দু'ধরনের হাদীস পাওয়া যায়। এক ধরনের হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ঝাড়-ফুঁক সম্পূর্ণ নিষেধ। আবার কিছু হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ঝাড়-ফুঁক করা ইসলামে অবৈধ নয় বরং জায়িয। উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সাম স্য বিধান করা হয় এভাবে যে, নিষেধের হাদীস এসেছে, জাহিলিয়্যাত যুগের ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে। কেননা জাহিলিয়্যাত যুগের মানুষ ঝাড়-ফুঁকে শিরকী বাক্য বলা হত এবং তাদের ধারণা ছিল, এসব ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে বিপদ-আপদও রোগ-ব্যাধি, কুনজর প্রভৃতি হতে রক্ষা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে জায়িযের হাদীস এসেছে, শিরক ও কুফরিমুক্ত শরী'আতসম্মত ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেছেন, তিনটি শর্তে উলামায়ে কিরাম ঝাড়-ফুঁক জায়িয বলেন। (১) আল্লাহর কালাম, তাঁর নাম এবং গুণাবলীর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। (২) আরবী ভাষায় হতে হবে এবং সুবোধ্য উচ্চারণে হতে হবে। মন্ত্রের মত দুর্বোধ্য উচ্চারণে হলে চলবে না। (৩) বিশ্বাস থাকতে হবে, ঝাড়-ফুঁক কিছুই করতে পারে না। সবকিছু আল্লাহ করেন। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে ঝাড়-ফুঁক হল, দু'আ এবং রোগমুক্তির প্রার্থনা।

فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ ঃ ঝাড়-ফুঁক কিংবা দাগ-চিকিৎসা প্রকৃতপক্ষে মূল তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। হ্যাঁ, উচ্চতর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী অবশ্যই। যা ওলীদের শান। আর এ হদীস দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

مَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى ذَالِكَ ص ٢٥

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫. ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ نَا مُعٰوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَّةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ

২৭. আবদা ইবনে আবদুল্লাহ খুযাঈ রহ....... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামজ্বর, বদ নজর এবং কার বংকলের ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ وَاَبُو نُعَيْمٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ ، وَهٰذَا عِنْدِىْ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُعْوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ وَفِى الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَاَبِىْ خُزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ

২৮. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ........ আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জ্বর এবং কারাংলারের ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, মুআবিয়া ইবনে হিশাম সুফিয়ান রহ. সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির তুলনায় আমার মতে এ রিওয়ায়াতটি অধিক সহীহ। এ বিষয়ে বুরায়দতা, ইমারান ইবনে হুসাইন, জাবির, আয়েশা, তালক ইবনে আলী, আমর ইবনে হাযম রাযি. আবূ খিযামা তৎ পিতার বরাতে হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ نَا سُفْيٰنُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا رُقْيَةَ اِلَّا مِنْ عَيْنٍ اَوْ حُمَةٍ وَرَوٰى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ بُرَيْدَةَ

২৯. ইবনে আবূ উমর রহ........ ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বদ নযর অথবা জ্বর ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক নেই। শু'বা রহ. এ হাদীসটিকে শা'বী – বুরায়দা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مِنَ الْحُمَةِ : (بِضَمِّ الْحَاءِ) حُمَةٌ বহুবচন حُمَاتٌ ও حُمًى অর্থ হল, হুল বা দংশনকারী প্রাণীদের বিষ। কোন ব্যক্তিকে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে, তার জন্য উত্তম চিকিৎসা হল, শরী'আতসম্মত ঝাড়-ফুঁক। উলামায়ে কিরাম বলেন, এ হাদীসের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁকের বৈধতা সাব্যস্ত হয়।

مِنَ الْعَيْنِ : বদনজর একটি বাস্তবতা। কেউ কেউ এটাকে বলেন, বিষনজর। যেমনিভাবে সাপ-বিচ্ছুর হুল বা দংশনে বিষ রাখা হয়েছে, অনুরূপভাবে কিছু মানুষের চোখেও বিষ রাখা হয়েছে। এ চোখ যেখানে পড়বে, সেটা ধ্বংস করে ছাড়বে। তাই এর প্রতিকারের জন্য ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ শরী'আতের গণ্ডির ভেতরে হলে শুধু জায়িযই নয় বরং এ উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন।

نَمْلَةٌ : অর্থ, পিপিলিকা। পার্শ্বদেশের ক্ষত বা ঘাসমূহ। এখানে দ্বিতীয় অর্থটিই উদ্দেশ্য। খুঁজ-পাঁচড়া দেখতে অনেকটা পিপিলিকার মত কিংবা পিপিলিকার মত খুঁজলি-পাচড়াও কুটকুট করে কামড়ায় বিধায় একেও نَمْلَةٌ বলা হয়।

لَا رُقْيَةَ اِلَّا مِنْ عَيْنٍ اَوْ حُمَةٍ : এখানে ঝাড়-ফুঁক এ তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নেওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং ঝাড়-ফুঁক এ দু'টির ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ –একথা বলাই উদ্দেশ্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّقْيَةِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ ص۲٦

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬. সূরা নাস ও ফালাক -এর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ نَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْاِنْسَانِ حَتّٰى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا اَخَذَبِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا ، وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

৩০. হিশাম ইবনে ইউনুস কূফী রহ..... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআওওয়াযাতাইন নাযিল না হওয়া পর্যন্ত জিন্নাত এবং বদ নজর থেকে পানাহ চাইতেন। পরে সূরাদ্বয় নাযিল হওয়ার পর এ দুটিকেই গ্রহণ করেন এবং তাছাড়া অন্য সব ছেড়ে দেন। এ বিষয়ে আনাস রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাফেয ইবনে কায়্যিম রহ. এ সূরাদ্বয় সম্পর্কে বলেন, এ সূরাদ্বয়ের উপকার ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্য এ দুটি সূরার প্রয়োজন অত্যাধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। বলতে গেলে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয় এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে এসেছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন রোগে আক্রান্ত হলে এ সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এ সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না, তাই আমি এরূপ করতাম। (ইবনে কাসীর)

وَتَرَكَ مَا سِوَاهَا ঃ হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন–

وَتَرَكَ مَا سِوَاهَا اَىْ تَرَكَ الْاِكْثَارَ مِنْ غَيْرِهِمَا فِى التَّعَوُّذِ لِغَيْرِهٖ ﷺ (اَلْكَوْكَبُ)

অর্থাৎ বেশির ভাগ সময় অন্য তায়াওউয সেড়ে এ দুটি পড়তেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ ص۲٦

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭. বদ নযরের ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক করা

حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِى عُمَرَ نَا سُفْيٰنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ وَهُوَ ابْنُ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِىِّ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ اِلَيْهِمُ الْعَيْنُ اَفَاَسْتَرْقِىْ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَاِنَّهٗ لَوْكَانَ شَيْئٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَ بُرَيْدَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

৩১. ইবনে আবী উমর রহ........ উবাইদ ইবনে রিফাআ আয-যুরাকী রাযি. থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে উমাইস রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জা'ফরের সন্তানদের খুব তাড়াতাড়ি নজর লাগে। আমি কি তাদের ঝাড়-ফুঁক করাতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কোন জিনিস যতি তাকদীরকে অতিক্রম করার মত হত তবে বদ নযর তা অবশ্যই অতিক্রম করতে পারত। এ বিষয়ে ইমরান ইবনে হুসাইন ও বুরাইদা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আইয়ূব– আমর ইবনে দীনার উরওয়া ইবনে আমির– উবাইদা ইবনে রিফা'আ– আসমা বিনতে উমাইস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا

৩২. হাসান ইবনে আলী খাল্লাল রহ. এটিকে আবদুর রায্যাক..... মা'মার আইয়ুব রহ. থেকে আমাদের বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ مِنْهُ . صـ ٢٦

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ এরই অংশবিশেষ

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَيَعْلٰى عَنْ سُفْيٰنَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُوْلُ اُعِيْذُكُمَا كَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يُعَوِّذُ اِسْحٰقَ وَاِسْمٰعِيْلَ

৩৩. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ........ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। বলতেন, আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ যাত ও সিফাতের ওসীলায় আমি তোমারদের উভয়ের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক শয়তান, প্রাণনাশক বিষ, এবং প্রত্যেক ধরনের আপতিত বদনযর থেকে। ইবরাহীম আ.ও (তাঁর পুত্রদ্বয়) ইসহাক ও ইসমাঈলের জন্য অনুরূপ আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيٰنَ عَنْ مَنْصُوْرٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৪. হাসান ইবনে আলী খাল্লাল রহ......... মানসূর রহ. সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

تَسْرِعُ ঃ শব্দটি بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبِفَتْحٍ اَىْ تُعَجِّلُ অর্থাৎ সুন্দর হওয়ার কারণে নজর অতি তাড়াতাড়ি প্রভাব ফেলত।

بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ঃ কেউ কেউ বলেন, কালিমাতুল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন মজীদ। কারও কারও অভিমত হল, আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী। আল্লামা জাযারী রহ. বলেন, كَلِمَاتُ اللّٰهِ এর সিফাত اَلتَّامَّةُ আনার কারণ হল, আল্লাহ তা'আলার কালাম মানুষের কালামের মত দোষ-ত্রুটিযুক্ত নয় বরং তার কালাম পরিপূর্ণ তথা যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ وَالْغُسْلُ لَهَا صـ٢٦

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯. বদনযর সত্য এবং এজন্য গোসল করা

حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيٰى بْنُ كَثِيْرٍ نَا اَبُوْ غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنِىْ حَيَّةُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ ثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا شَئَ فِى الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقٌّ

৩৫. আবূ হাফস আমর ইবনে আলী রহ....... হাইয়া ইবনে হাবিস তামীমী তার পিতা হাবিস তামীমী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন, হাম বলতে কিছু নাই। বদ নযর সত্য।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ نَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْحَضْرَمِيُّ نَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْكَانَ شَئٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَاِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا . وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَحَدِيْثُ حَيَّةَ بْنِ حَابِسٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَرَوٰى شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ حَيَّةَ بْنِ حَابِسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ لَا يَذْكُرَانِ فِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

৩৬. আহমদ ইবনে হাসান ইবনে খিরাশ আল-বাগদাদী রহ........ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন জিনিস যদি তাকদীরকে পরাভূত করতে পারত তবে অবশ্যই বদ নযর তা পরাভূত করত। এ বিষয়ে যদি কেউ তোমাদের গোসল করাতে চায় তবে তোমরা গোসল করতে রাযী হয়ে যেও। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। হাইয়্যা ইবনে হাবিস বর্ণিত রিওয়ায়াতটি গরীব। ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাছীর– হাইয়া ইবনে হাবিস – তার পিতা হাবিস – আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে শায়বান রহ.ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলী ইবনে মুবারক এবং হারব ইবনে শাদ্দাদ এতে আবূ হুরাইরা রাযি.-এর উল্লেখ করেননি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَا شَئَ فِى الْهَامِ ঃ কেউ কেউ বলেন, এখানে هَامٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পেঁচা। প্রাচীন আরবদের আকীদা ছিল, এটি যখন কোন ঘরের উপর বসে সে ঘর ওজাড় হয়ে যায়, অথবা এ ঘরের কোন লোক মারা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর মাধ্যমে এ আদীকা বাতিল সাব্যস্ত করলেন এবং অশুভ লক্ষণ -এর অন্ধ বিশ্বসকে নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন।

বদনজর ঃ

হাদীসের বর্ণনানুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, নজর লাগার বিষয়টি সত্য। জান-মাল ইত্যাদির প্রতি বদনজর লেগে তার ক্ষতি সাধন হতে পারে। আপনজনের প্রতিও আপনজনের বদনজর লাগতে পারে। এমনকি সন্তানের প্রতিও পিতা-মাতার বদনজর লাগতে পারে। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, জিন-ভূতেরও বদনজর লাগতে পারে। আমাদের দেশে কোথাও কোথাও একে বলা হয় 'বাতাস লাগা'।

বদনজর সত্য –এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের সর্বস্বীকৃত অভিমত। কিন্তু মু'তাযিলারা বদনজরকে

অস্বীকার করে। তবে তাদের এ ধরনের বিশ্বাস ভ্রান্ত। তাদের ভ্রান্ততা প্রমাণের জন্য উপরিউক্ত হাদীসই যথেষ্ট।

لَوْكَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ ঃ অর্থাৎ এ বিশ্বজগতে ছোট-বড় প্রতিটি জিনিসের কেন্দ্র হল, আল্লাহ তা'আলার তাকদীর। কোন জিনিসই তাকদীরের বৃত্ত থেকে মুক্ত হতে পারে না। যদি মেনে নেই, তাকদীরের বৃত্ত অতিক্রম করার মতও জিনিস আছে, তাহলে সেটা হত, বদনজর। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বদনজর কুপ্রভাব ভালভাবে বর্ণনা করা।

বদনজরের অযূর পদ্ধতি

اِذَاسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا ঃ আরবদের অভ্যাস ছিল, কারও উপর কারও বদনজর লেগে গেলে যার উপর লেগেছে তার হাত, মুখ, পা এবং নিম্নাঙ্গ ধুয়ে সেই পানি যার উপর নজর লেগেছে তার উপর ঢেলে দেওয়া হত। এর মাধ্যমে সবচেয়ে নিম্ন ফায়দা এই হত যে, নজরাক্রান্ত ব্যক্তির সন্দেহ দূর হয়ে যেত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও এটি নিষেধ করেননি।

ইমাম নববী রহ. লিখেন, উলামায়ে কিরাম বলেছেন, যার নজর লেগেছে, তার গোসল করার পদ্ধতি হল, একটি পাত্রে করে তার সামনে পানি আনা হবে। পাত্রটিকে যমীনের উপর রাখা যাবে না। তারপর সে পাত্রটি থেকে এক কোশ পানি নিয়ে কুলি করবে। কুলির পানি পাত্রের মধ্যে ফেলবে। অতঃপর পাত্র থেকে পানি নিয়ে মুখমণ্ডল ধৌত করবে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম কনুই এবং বাম হাতে পানি নিয়ে ডান কনুই ধোবে। হাতের তালু এবং কনুইয়ের মধ্যখানের স্থান ধৌত করা যাবে না। তারপর ডান পা ধৌত করবে। তারপর বাম পা ধৌত করবে। তারপর অনুরূপভাবে সর্বপ্রথম ডান কব্জি ধোবে এবং বাম কব্জি ধোবে। সর্বশেষে কাপড়ের নিচে ইসতেঞ্জার জায়গা ধোবে। এসব অঙ্গকে ঐ পাত্রেই ধোবে। ধোয়া শেষ হওয়ার পর, ঐ পানি নজরাক্রান্ত ব্যক্তির পেছনের দিক থেকে মাথার উপর ঢেলে দিবে।

বলা বাহুল্য যে, নজর দানকারীকে এরূপ ধৌত করার জন্য বাধ্য করা যাবে কি না –এ ব্যাপারে কোন কোন উলামা বলেন, বাধ্য করা যাবে না। মাযরী রহ. বলেন, এটা বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই বিধান পালন করা ওয়াজিব। অতএব নজর লাগা নিশ্চিত হলে যার নজর লেগেছে তাকে এরূপ ধৌত করার জন্য বাধ্য করা যাবে। তিনি বলেন, এ বিধান লংঘন করা মানবতা বিরোধী বলে বিবেচিত হবে। বিশেষ করে বদনজরের কারণে যদি মৃত্যুর আশংকা সৃষ্টি হয়।

আল্লামা ইবনে কায়্যিম বলেন, কেউ কারও কোন ভাল কিছু দেখলে যদি مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে কিংবা সংক্ষেপে শুধু مَاشَاءَ اللّٰهُ বলে, তাহলে বদনজর লাগে না।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, নযর লাগা ব্যক্তির গায়ে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পড়ে ফুঁ দিলে নযর লাগার অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়।

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ.

وَمَاهُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (سورة القلم)

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ اَخْذِ الْاَجْرِ عَلَى التَّعْوِيْذِ ص٢٦

অনুচ্ছেদ ঃ ২০. তা'বীযের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمُ الْقِرٰى فَلَمْ يَقْرُوْنَا فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَاَتَوْنَا فَقَالُوْا هَلْ فِيْكُمْ مَنْ يَرْقِيْ مِنَ الْعَقْرَبِ قُلْتُ نَعَمْ اَنَا وَلٰكِنْ لَا اَرْقِيْهِ حَتّٰى تُعْطُوْنَا غَنَمًا قَالُوْا فَاَنَا نُعْطِيْكُمْ ثَلَاثِيْنَ شَاةً فَقَبِلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ قَالَ فَعَرَضَ فِيْ اَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا تَعْجَلُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِيْ صَنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِمْتَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اِقْبِضُوا الْغَنَمَ وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاَبُوْ نَضْرَةَ اِسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطْعَةَ وَرَخَّصَ الشَّافِعِيُّ لِلْمُعَلِّمِ اَنْ يَاْخُذَ عَلٰى تَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ اَجْرًا وَيَرٰى لَهُ اَنْ يَشْتَرِطَ عَلٰى ذٰلِكَ وَاحْتَجَّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَرَوٰى شُعْبَةُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ هٰذَ الْحَدِيْثَ

৩৭. হান্নাদ রহ......... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। অনন্তর আমরা এক সম্প্রদায়ের নিকট অবস্থান করলাম এবং তাদের নিকট আতিথেয়তা প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তারা আমাদের মেহমানদারী করল না। পরে তাদের সর্দারকে বিচ্ছু দংশন করে। তখন তারা আমাদের কাছে এসে বলল, তোমাদের কেউ কি বিচ্ছু কাটার মন্ত্র জান? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি জানি। কিন্তু আমাদেরকে অনেক বকরী না দেওয়া পর্যন্ত আমি ঝাড়ব না। তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে ত্রিশটি বকরী দিব। অনন্তর আমরা রাযী হয়ে গেলাম। সাতবার আলহামদু লিল্লাহ.... সূরাটি পড়ে তাকে ঝাড়লাম। ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল এবং বকরীগুলোও আমাদের করায়ত্তে নিয়ে এলাম।

আবূ সাঈদ রাযি. বলেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাই আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা কেউ এগুলোর বিষয়ে তাড়াহুড়া করবে না। পরে আমরা যখন তাঁর কাছে আসলাম তখন আমি যা করেছিলাম, সব কিছু তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, তুমি কেমন করে জানলে যে এটিও ঝাড়-ফুঁকের বিষয়? বকরীগুলো নিয়ে নাও। আর তোমাদের সাথে আমাকেও একটি অংশ দিও।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। রাবী আবূ নাযরা রহ.-এর নাম হল, মুনযির ইবনে মালিক ইবনে কাতা'আ। কুরআনের তা'লীম দিয়ে শিক্ষক পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন বলে ইমাম শাফিঈ রহ, অনুমতি দিয়েছেন। শিক্ষক এ ক্ষেত্রে শর্তও করতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন। এ হাদীসকে তিনি দলীল হিসেবে পেশ করেন। শু'বা, আবূ আওয়ানা প্রমুখ হাদীসটিকে আবূল মুতাওয়াকিল– আবূ সাঈদ রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا اَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا شُعْبَةُ نَا اَبُو بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْمُتَوَكِّلِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مَرُّوا بِحَىٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ وَلَمْ يُضَيِّفُوْهُمْ فَاشْتَكَى سَيِّدُهُمْ فَاَتَوْنَا فَقَالُوْا هَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ قُلْنَا نَعَمْ وَلٰكِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُوْنَا وَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَلَا نَفْعَلُ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوْا عَلٰى ذٰلِكَ قَطِيْعًا مِنْ غَنَمٍ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا يَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَلَمَّا اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ نَهْيًا مِنْهُ وَقَالَ كُلُوْا وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ وَهٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِى بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى وَحْشِيَّةَ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ اِيَاسٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ اَبِى وَحْشِيَّةَ

৩৮. আবূ মূসা মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না রহ....... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের এক দল এক আরব কবীলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা তাদের কোনরূপ মেহমানদারী বা আতিথেয়তা করল না। পরে তাদের সর্দার অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাবী বলেন, তখন তারা আমাদের কাছে এসে বলল, তোমাদের কাছে কোন প্রতিষেধক আছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ আছে। কিন্তু তোমরা কোনরূপ মেহামানদারী বা আতিথ্য করনি। সুতরাং আমাদেরকে পারিশ্রমিক না দিলে আমরা চিকিৎসা করব না। তারা একপাল বকরী এর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করল। তখন আমাদের একজন সূরা ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়ল। ফলে লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। পরে আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ফিরে এলাম, তখন তাঁর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এ দিয়ে যে ঝাড়-ফুঁক করা যায়, তা কি করে জানলে? কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে তিনি এ বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করেননি বরং বললেন, তোমরা তা ভাগ কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রেখ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আ'মাশ – জা'ফর ইবনে ইয়াস বর্ণিত রিওয়ায়াতটি থেকে এটি অধিক সহীহ। একাধিক রাবী হাদীসটি আবূ বিশর জা'ফর ইবনে আবূ ওয়াহশিয়া – আবুল মুতাওয়াককিল – আবূ সাঈদ রাযি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জা'ফর ইবনে ইয়াস রহ.-ই হলেন জা'ফর ইবনে আবী ওয়াহশিয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَرِيَّةٍ ঃ দারাকুতনীর বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সাঈদ রাযি. এর নেতৃত্বে একটি দলকে যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়েছিলেন। তিরমিযী ছাড়া অন্যান্যদের বর্ণনায় আমাশ থেকে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ত্রিশজনকে পাঠিয়েছিলেন। আমরা রাতে এক সম্প্রদায়ের নিকট মেহমান হলাম। এখানে সারিয়্যায় কতজন ছিলেন, তাদের সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। আর দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, সারিয়্যার আমীর কে ছিলেন।

তাবিজ-তুমার প্রসঙ্গে

জাহিলীযুগে আরবরা গলায় ছোট দানা, পুঁতি, তাবিজ-তুমার ইত্যাদি ঝুলাত। বিশেষতঃ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের ধারণা ছিল কুদৃষ্টি, জ্বীনের প্রভাব প্রভৃতি হতে এসব তাদেরকে রক্ষা করবে। ইসলাম এসে এসব কুসংস্কার বিলুপ্ত করেছে। মানবজাতিকে শিখিয়েছে لَا مَانِعَ اِلَّا اللّٰهُ তথা অনিষ্ট হতে আল্লাহ ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلَا اَتَمَّ اللّٰهُ 'যে ব্যক্তি তুমার ঝুলাল, সে সফল হবে না।' (মুসনাদে আহমদ)

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. বলেন, একবার দশজনের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসে। তিনি নয়জনকে বাই'আত করলেন। একজনকে বাইআত করানো হতে বিরত থাকলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, তার হাতে তাবিজ আছে। লোকটি তাবিজ ছিন্ন করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাই'আত করালেন এবং বললেন, مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ اَشْرَكَ 'যে তা ঝুলাল, সে শিরক করল।' (আহমদ, হাকিম)

এ জাতীয় বর্ণনার ভিত্তিতে প্রশ্ন হয়, কুরআনের আয়াত লিখে বা আল্লাহর নাম লিখে তাবিঝ ঝুলানো কি শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয? উত্তরে বলা হবে, হ্যাঁ জায়িয। তবে শর্ত হল, এসব তাবিজ বিপদমুক্ত করবে বা আরোগ্য করবে বলে বিশ্বাস রাখা যাবে না। কারণ, আরোগ্য এবং বিপদ হতে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ দিতে পারেন। তবে তাবিজ জায়িয, তার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ ঘুম পেলে বলবে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَسُوْءِ عَقْبِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদেরকে দু'আটি শিখিয়েছিলেন আর অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য লিখে তাদের শরীরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। (মুসান্নাফে ইবনে শাইবা, আবু দাউদ)

আল্লামা হাফেয ইবনে তাইমিয়াহ তার ফতওয়াতে লিখেছেন, অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর কালাম বা যিক্র পবিত্র কালি দ্বারা লিখে তারপর তা ধুয়ে পান করানো যাবে। তিনি এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রাযি. এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, মহিলাদের যখন প্রসব বেদনা শুরু হবে তখন নিম্নের দু'আটি লিখে রোগীর বাহুতে বেঁধে দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا، كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا سَاعَةً مِنْ نَّهَارٍ، بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ،

অন্য বর্ণনায় আছে, তারপর একটি পবিত্র পাত্রে তা লিখে পান করাতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর এ বক্তব্য বর্ণনাকারী আলী ইবনে হাসান ইবনে শাকীক বলেন, তিনি আরও বলেছেন, বিষয়টি বারবার পরীক্ষা করে আমরা দেখেছি। এর চমৎকার ফলও পেয়েছি। প্রসবের পর সাথে সাথে তা খুলে নিতে হবে। অনন্তর তা কোন কাপরের টুকরায় রেখে জ্বালিয়ে দিতে হবে। -ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১৯/৬৪

আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন-

وَالْمُرَادُ مِنَ التَّمِيْمَةِ مَاكَانَ تَمَائِمُ الْجَاهِلِيَّةِ ...... وَاَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ وَالْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالدَّعْوَاتِ الْمَاثُوْرَاتِ النَّبَوِيَّةِ فَلَا بَاْسَ بَلْ يُسْتَحِبُّ سَوَاءٌ كَانَ تَعْوِيْذًا اَوْ رُقْيَةً (المرقاة ج ٨)

"হারাম তাবীজ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ তাবিজ, যা জাহেলীযুগে ছিল। আর কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম ও সিফাত এবং হাদীসে উল্লেখিত দু'আসমূহের মাধ্যমে তাবিজ ব্যবহার কিংবা ঝাড়-ফুঁক করলে কোন অসুবিধা নেই রবং মুস্তাহাব।

মোটকথা, তিনটি শর্তে তাবিজ জায়িয। অর্থাৎ আয়াত অথবা দু'আ মাছুরা সম্বলিত হতে হবে। (১) অর্থ বুঝে আসে এমন কালাম দ্বারা হতে হবে। (২) কুরআন ও হাদীসে তাবিজের ঐ লেখা উল্লেখ থাকতে হবে। (৩) তাবিজ

কোন আরোগ্য বা উপকার করতে পারে না বরং আরোগ্য দান কিংবা উপকার প্রদান করেন আল্লাহ তা'আলা –এ বিশ্বাস রাখতে হবে।

সালাফীদের দলীল ও তার উত্তর

বর্তমানে গাইরে মুকাল্লিদরা তথা সালাফীরা যে কোনও তাবিজকে নিষেধ ও শিরক সাব্যস্ত করেন। তারা সাধারণ নিম্নোক্ত চারটি দলীল পেশ করে থাকে।

১. কুরআনের যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, বালা-মুসিবত ও দুঃখ-বেদনা দূরকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। যেমন, কুরআন মজীদে রয়েছে–

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

২. সেসকল আয়াত যেগুলোতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাওয়াক্কুল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন–

وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (المائدة) وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (ابراهيم)

৩. যেসব আয়াতে শিরকের নিন্দাবাদ করা হয়েছে। যেমন,

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ مِنْ مَكَانٍ سَحِيقٍ (الحج)

বস্তুতঃ কুরআনের আয়াত ও দু'আ মাছুরা সম্বলিত তাবিজসমূহকে হারাম বলা মোটেই সঠিক নয়। বিশেষভাবে যেখানে হারাম হওয়ার 'কারণ' অনুপুস্থিত এবং এগুলোকে কেবল বাহ্যিক ওসীলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অন্যথায় সকল চিকিৎসাই নাজায়িয হয়ে যাবে। সুতরাং এ ধরনের তাবীযকে নাজায়েয বলা স্পষ্ট মুর্খতা।

৪. তারা দলীল হিসেবে সেসব হাদীসকেও পেশ করে থাকে, যেগুলোতে তাবিজকে শিরক বলা হয়েছে। যেমন–

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ (رواه احمد ولحاكم) وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ (احمد ابن ماجه، الحاكم)

মূলতঃ এসব হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করা সঠিক নয়। কেননা এসব হাদীসে শিরকী কালাম সম্বলিত তাবিজ উদ্দেশ্য। অথবা তাবীজকে مُؤَثِّر حَقِيقِي বা প্রকৃত ক্রিয়াশীল মনে করলে তখন এসব হাদীসের প্রতিপাদ্য হবে।

মাসআলা ঃ حِسَاب أَبْجَدِي তথা বর্ণীয় হিসাবের মান দ্বারা তাবিজ লেখা যাবে। কেননা এটা দুর্বোধ্য ভাষা নয়। (আহসানুল ফাতাওয়া ঃ ৮/২৫৫)

তাবিজ ও ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে গ্রহণ

সুস্থতার জন্য কিংবা পার্থিব কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাবিজ দিয়ে কিংবা ঝাড়-ফুঁক করে প্রতিদান নেওয়া জায়িয। এ ব্যাপারে কারও কোন মতবিরোধ নেই। পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস তার প্রমাণ। তবে বুযুর্গানে দীন বলেছেন, প্রতিদান না নেওয়াই উত্তম। কারণ, প্রতিদান নিলে নিজের ইজ্জতহানী হয়। যা পরবর্তীতে দ্বীনি কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

নেক কাজ করে মজুরি গ্রহণ

☆ ইমাম শাফিঈ রহ. এবং ইমাম মালেক রহ.-এর মতে أُجْرَة عَلَى الطَّاعَةِ তথা নেক কাজ করে মজুরি গ্রহণ করা জায়িয।

☆ ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মতে নাজায়িয।

জায়িযের পক্ষে দলীলসমূহ

(১) ইমাম শাফিঈ রহ. এবং ইমাম মালেক রহ. দলীল হিসাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি উল্লেখ করেন। এখানে

বলা হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রহ. দংশিত ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা পড়ে চিকিৎসা করেছেন। বিনিময়ে মজুরি হিসাবে একপাল বকরি গ্রহণ করেছেন।

(২) তাঁরা হযরত সাহ্‌ল ইবনে সাঈদ-এর মশহূর হাদীসের মাধ্যমেও দলীল পেশ করেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন- زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ তাঁদের বক্তব্য হল, এ হাদীসে কুরআন শিক্ষাকে বিনিময়ে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা মজুরিও সাব্যস্ত হবে।

নাজায়িযের পক্ষে দলীলসমূহ

প্রথম দলীল ঃ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ اَلْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَاَهْدٰى اِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَ اَرْمِيْ عَنْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَاَسْأَلَنَّهُ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! رَجُلٌ اَهْدٰى اِلَيَّ قَوْسًا مِمَّا كُنْتُ اُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَاَرْمِيْ عَنْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا (رواه ابو داؤد و ابن ماجه)

দ্বিতীয় দলীল ঃ

عَنْ اِبْنِ كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَاَهْدٰى اِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنْ اَخَذْتَهَا اَخَذْتَهَا قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُهَا (رواه ابن ماجه)

তৃতীয় দলীল ঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوْا بِهِ (مسند احمد)

চতুর্থ দলীলঃ

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ قَوْسًا عَلٰى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ قَلَّدَ اللّٰهُ مِنْ نَارٍ (نصب الراية)

পঞ্চম দলীল ঃ

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ اِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا تَأْخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا، (رواه الترمذى)

ষষ্ঠ দলীল ঃ

কোনও কোনও হানাফী কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলীল পেশ করেন-

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

প্রথম হাদীস তাবিজের মজুরির সাথে সম্পৃক্ত। আর তা জায়িয। اُجْرَةٌ عَلَى الطَّاعَةِ এর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাপারে বলা হবে زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ এর মধ্যে اَلْبَاءُ لِلْعِوَضِ এর জন্য নয় বরং اَلْبَاءُ لِلسَّبَبِ এর জন্য। সুতরাং অর্থ দাঁড়ায়, কুরআন শিক্ষার কারণে তাকে তোমার বিয়েতে দিলাম। অবশ্য মহর পৃথকভাবে দিতে হবে।

বর্তমান ফতওয়া

এ তো গেল, হানাফিয়্যাহ এবং হানাবেলার মূল মাযহাব। কিন্তু পরবর্তী হানাফীগণ জরুরতের উপর ভিত্তি করে জায়িয ফাতওয়া দিয়েছেন। জরুরতের ব্যাখ্যা হল, পূর্ববর্তী যামানায় যেহেতু ইমাম, মুয়াযযিন, মু'আল্লিম, মুফতি

প্রমুখের বেতন বাইতুল মাল কর্তৃক দেওয়া হত, তাই তাদের জন্য মজুরি ছাড়া খেদমত করাতে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তাদের পক্ষে বিনা পয়সায় দ্বীনী খেদমত করা সহজ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন এ নিয়ম বন্ধ হয়ে গেল, তখন ইমামতি, আযান, ফাতওয়া প্রদান এবং দ্বীনী শিক্ষা দানে লোকের সঙ্কট শুরু হল। ফলে পরবর্তী উলামায়ে আহনাফ সবদিক বিবেচনা করে, দ্বীনী খেদমত করে মজুরি গ্রহণ করাকে জায়িয আখ্যা দিয়েছেন।

(তাকমিলাহ, দরসে তিরযিমী, শামী ঃ ১০)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّقِىِّ وَالْاَدْوِيَةِ صـ٢٧

অনুচ্ছেদ ঃ ২১. ঝাড়-ফুঁক এবং ঔষধপথ্য ব্যবহার

حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِى عُمَرَ نَا سُفْيٰنُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى خُزَامَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سَالْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৯. ইবনে আবী উমর রহ....... আবূ খিযামা তার পিতা ইয়া'মুর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে আমরা ঝাড়-ফুঁক করি, ঔষধপথ্য দিয়ে চিকিৎসা করি এবং বিভিন্ন প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি, এ গুলো কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে প্রতিহত করতে পারে? তিনি বললেন, এগুলোও আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَا سُفْيٰنُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اِبْنِ اَبِى خُزَامَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهٗ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ اَبِى خُزَامَةَ عَنْ اَبِيهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ اَبِى خُزَامَةَ عَنْ اَبِيهِ وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ اِبْنِ عُيَيْنَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى خُزَامَةَ عَنْ اَبِيهِ وَهٰذَا اَصَحُّ وَلَا نَعْرِفُ لِاَبِى خُزَامَةَ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ

৪০. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান রহ.......... ইবনে আবূ খিযামা তার পিতা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইবনে উয়াইনা রহ. বরাতে উভয় রিওয়ায়াতই বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী আবূ খিযামা তার পিতা কথাটি উল্লেখ করেছেন আর কেউ কেউ ইবনে আবূ খিযামা তৎ পিতা কথাটির উল্লেখ করেছেন। ইবনে উয়াইনা রহ. ব্যতীত অন্যান্য রাবী হাদীসটি যুহরী আবূ খিযামা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটিই অধিক সহীহ। এটি ছাড়া আবূ খিযামার কোন হাদীস রিওয়ায়াতে আছে বলে আমরা জানি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ঔষধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। ঔষধের কারণে যা হবে, তাও তাকদীর অনুযায়ীই হবে। অতএব চেষ্টা-তদবীরও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ ص ٢٧

অনুচ্ছেদ ঃ ২২. মাসরুম ও আজওয়া খেজুর

حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ اَبِى السَّفَرِ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيْهَا شِفَاءٌ مِّنَ السَّمِّ وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ

৪১. আবূ উবায়দা ইবনে আবূ সাফার ও মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ......... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আজওয়া হল জান্নাতী খেজুর। এতে আছে বিষের প্রতিষেধক। মাসরুম হল মান্নের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি হল চক্ষু রোগের প্রতিষেধক।

. এ বিষয়ে সাইদ ইবনে যায়েদ, আবূ সাঈদ ও জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি এই সূত্রে হাসান ও গরীব। সাঈদ ইবনে আমির রহ.-এর সূত্র ছাড়া মুহাম্মদ ইবনে আমরের রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৪২. আবূ কুরাইব ও মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না রহ....... সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মাসরুম মান্নের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি চক্ষু রোগের প্রতিষেধক। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوْا اَلْكَمْأَةُ جُدَرِىُّ الْاَرْضِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِىَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

৪৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ....... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। কতক সাহাবী বললেন, মাসরুম হল যমীনের গুটি বসন্ত স্বরূপ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মাসরুম মান্নের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি চক্ষু রোগের প্রতিষেধক। আজওয়া হল জান্নাতী খেজুর। আর এতে আছে বিষ প্রতিষেধক।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُعَاذٌ ثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُؤٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهُنَّ فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ فَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي فَبَرَأَتْ

৪৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ......... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি তিনটি বা পাঁচটি বা সাতটি মাসরুম নিলাম এবং এগুলো চিপে একটি বোতলে এর নির্যাস রাখলাম। পরে আমার জনৈকা দাসীর চোখে তা ব্যবহার করলাম। ফলে তার চোখ ভাল হয়ে গেল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَانٍ ثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الشُّونِيزُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ حَبَّةً فَيَجْعَلُهُنَّ فِي خِرْقَةٍ فَيَنْقَعُهُ فَيَسْتَعِطُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِي مَنْخِرِهِ الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الْأَيْسَرِ قَطْرَةً وَالثَّانِي فِي الْأَيْسَرِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الْأَيْمَنِ قَطْرَةً وَالثَّالِثُ فِي الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَالْأَيْسَرِ قَطْرَةً

৪৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ....... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কালজিরা হল মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ঔষধ। কাতাদা রহ. বলেন, প্রতিদিন একুশটি কাল জিরার দানা নিবে। একটি কাপড়ের টুকরায় তা রেখে পানিতে ভিজাবে এবং প্রত্যেক দিন নাকের ছিদ্র পথ দিয়ে তা ব্যবহার করবে। প্রথম দিন নাকের ডান ছিদ্রে দুই ফোঁটা এবং বাম ছিদ্রে এক ফোঁটা। দ্বিতীয় দিন বাম ছিদ্রে দুই ফোঁটা এবং ডান ছিদ্রে এক ফোঁটা, তৃতীয় দিন ডান ছিদ্রে দুই আর বাম ছিদ্রে এক ফোঁটা করে ব্যবহার করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْكَمْأَةُ ঃ আল-মুনজিদে (পৃ. ৬৯৭) রয়েছে-

اَلْكَمْءُ جَمْعُهُ أَكْمُؤٌ وَكَمْأَةٌ جنس فطر مِنْ فَصِيلَةِ الْكَمْئِيَاتِ يَعِيشُ تَحْتَ الْأَرْضِ لَوْنُهُ يَمِيلُ إِلَى الْغُبْرَةِ يُهَيَّأُ مِنْ طَعَامٍ لَذِيذٍ

অর্থাৎ اَلْكَمْءُ এর বহুবচন أَكْمُؤٌ، كَمْأَةٌ উদ্ভিদবিশেষ, যা যমীনের মধ্যে হয়। রঙ অনেকটা বালির মত। (এর দ্বারা সুস্বাদু খাবার তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে এটাকে ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম বলা হয়।

اَلْعَجْوَةُ ঃ عَجْوَةٌ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

اَلْعَجْوَةُ هِيَ نَوْعٌ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ يَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ مِنْ غَرْسِ النَّبِيِّ ﷺ

অর্থাৎ মদীনার একপ্রকার সুস্বাদু খেজুর। অনেকটা কালচে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিজ হাতে রোপনকৃত।

اَلْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ ঃ (১) এখানে مِنْ তাশবীহ তথা সাদৃশ্যতা বর্ণনা করার জন্য। সুতরাং মর্মার্থ দাঁড়াল, আজওয়া জান্নাতের খেজুরের মত। আল্লামা মানাবী বলেন, আজওয়া দেখতে শুনতে বা আকারে এবং নামের দিক থেকে জান্নাতের খেজুরের মত। অন্যথায় স্বাদ ও মজার দিক থেকে তো জান্নাতের খেজুর আরও বেশি সুস্বাদু। উদ্দেশ্য হল, অন্যান্য খেজুরের তুলনায় আজওয়ার বিশেষ উৎকৃষ্টতা বর্ণনা করা।

(২) আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, এখানে مِنْ তাশবীহ্‌র জন্য নয় বরং تَبْعِيض এর জন্য। অর্থাৎ হযরত আদম আ. জান্নাত থেকে দুনিয়াতে আসার সময় তাঁর সাঙ্গে এক হাজার জাতের বীজ ছিল। তন্মধ্যে আজওয়াও একটি। (৩) কেউ কেউ বলেন, اَلْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ এর অর্থ হল, عَجْوَةٌ জান্নাতের নেয়ামতরাজির একটি।

اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ঃ আল্লামা গঙ্গুহী রহ. বলেন, كَمْأَةٌ তথা মাশরুম হল, মান্নার একটি প্রকার। অর্থাৎ যেমনিভাবে বনী-ইসরাঈলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত মান্না লাভে কোন কষ্ট করতে হত না, অনুরূপভাবে মাশরুমও বিনাচাষে হয়। বিধায় তার জন্য কোন কষ্ট করতে হয় না। উপরন্তু এর মধ্যে ঔষধি গুণও রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে মান্না-সালওয়া নামক যে নেয়ামত দান করেছিলেন, তা বিভিন্ন পদ্ধতির ছিল। কিছু স্বয়ং যমীন থেকে উৎপন্ন হত। আর কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হত। মাশরুম সেই মান্নার মত বিনাচাষে যমীন থেকে উৎপন্ন হয়। বিধায় মাশরুমকে মান্নার প্রকার হিসাবে বলা হয়েছে।

اَلْكَمْأَةُ جُدَرِى الْاَرْضِ ঃ অর্থাৎ যেমনিভাবে গুটিবসন্ত শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত জিনিস, যেগুলো উঠা শুরু করলে তাড়াতাড়ি উঠে যায়। অনুরূপভাবে মাশরুমও যমীনের মধ্যে অতিরিক্ত বস্তু। কেননা মাশরুম চাষ করতে হয় না বরং এমনিতেই উঠে। সাহাবায়ে কিরাম কথাটি যেন কুৎসা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য বলেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করে দিলেন।

اَلشُّونِيزُ ঃ অর্থ কাল জিরা। কয়েকভাবে শব্দটির ব্যবহৃত হয়। যেমন–

الشُّونِيزُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُوْنِ الْوَاوِ وَكَسْرِ النُّوْنِ وَسُكُوْنِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا زَاءٌ وَقَالَ فِى الْقَامُوْسِ الشِّينِيزُ وَالشُّونُوزُ وَالشُّونِيزُ وَالشَّهْنِيزُ مَعْنَاهُ اَلْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ

قَالَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ الخ ঃ কালিজিরা ব্যবহারের এ পদ্ধতি হযরত কাতাদাহ রাযি. এর পরীক্ষিত পদ্ধতি। হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন, অন্যথায় ব্যবহারের পদ্ধতি কেবল এতেই সীমাবদ্ধ নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اَجْرِ الْكَاهِنِ صـ٢٧

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩. গণকের পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৪৬. কুতাইবা .... আবূ মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, ব্যভিচারীণীর উপার্জন এবং গণকের কামাই নিষিদ্ধ করেছেন। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ثَمَنُ الْكَلْبِ ঃ ইমাম শাফেঈ রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে প্রশিক্ষিত কিংবা অপ্রশিক্ষিত যে কোন কুকুর বিক্রি করা জায়িয নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে যে কুকুর পালন করার অনুমতি শরী'আত দিয়েছে, সেই কুকুর বিক্রি করা জায়িয। ইমাম মালিক রহ. থেকে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়। এক মতে জায়িয; আরেক মতে জায়িয নেই।

ইমাম শাফিঈ রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ. উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য হল, প্রথম প্রথম তো সকল কুকুরকেই মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে কিছু কিছু প্রতিপালন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর যে কুকুর প্রতিপালন করা যাবে, সে কুকুর বিক্রিও করা যাবে। এর সমর্থনে

নিম্নোক্ত হাদীসও পাওয়া যায়– । إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

مَهْرُ الْبَغِيِّ : উদ্দেশ্য ব্যভিচারের মজুরি। একে مَهْر শব্দ দ্বারা রূপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যথায় এরূপ মজুরি সকলের মতেই হারাম।

حُلْوَانُ الْكَاهِنِ : এখানে حُلْوَان শব্দটি عُقْرَان এর মতে মাসদার। অর্থাৎ সুস্বাদু। উদ্দেশ্য, জ্যোতিষীর পারিশ্রমিক। حُلْوَان শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যাদুর পারিশ্রমিক বিনাকষ্টে লাভ হয়। এ শব্দটি ঘুষ অর্থেও আসে। জ্যোতিষী ও গণকের পারিশ্রমিক হারাম।

গণক ও জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করা

এদেরকে বিশ্বাস করা কবীরা গুনাহ। কারণ, ইসলাম শুধু গণক ও জ্যোতির্বিদদের ব্যাপারেই কঠোরতা অবলম্বন করেনি বরং যারা তাদের কাছে যাবে, তাদের কথা শুনবে এবং বিশ্বাস করবে, তাদের বিরুদ্ধেও ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন–

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (رواه البزار باسناد قوى)

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে আসবে এবং তার কথায় বিশ্বাস করবে, সে যেন মুহাম্মদের উপর নাযিলকৃত ধর্মকে অস্বীকার করল।

মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, এমন ব্যক্তির চল্লিশ দিনের নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

গণক ও জ্যোতিষী সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এখন প্রশ্ন হতে পারে, মাঝে মাঝে তো জ্যোতিষী ও গণকের কথা সত্যও প্রমাণিত হয়। এর উত্তর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর একটি হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায়। একবার রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সংখ্যক সাহাবাকে সাথে নিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন, একটি তারকা নিক্ষিপ্ত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তারকা নিক্ষিপ্ত হলে জাহিলীযুগে তোমরা কি মনে করতে ? তাঁরা বলল, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল জানেন। তবে আমরা এরূপ হলে বলতাম, আজ রাতে কোন মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে কিংবা মৃত্যু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কারও জন্মে বা মৃত্যুতে এরূপ হয় না। মহান আল্লাহ যখন কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, আরশ বহনে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন। তারপর আরশের নিকটবর্তী আসমানের ফিরিশতা পর্যন্ত তাসবীহ পাঠ চলতে থাকে। তারপর একদল অন্য দল হতে জেনে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা কি সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেছেন। সে সময় পৃথিবীর নিকটতম আসমানে জ্বীনেরা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে। তাদেরকে তারকা নিক্ষেপ করে তাড়ানো হয়। জ্বিনেরা যা শুনে আসে, তা তারা তাদের শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করে। যতটুকু শুনেছে তা সত্য প্রমাণিত হয়। আর যা কিছু যোগ-বিয়োগ করেছে, তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيْقِ ص ٢٧

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪. তাবীয লটকানো মাকরূহ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيَهَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عِيْسٰى أَخِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَبِىْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ أَعُوْدُهُ وَبِهِ حُمْرَةٌ، فَقُلْنَا : أَلاَ تُعَلِّقُ شَيْئًا ؟ قَالَ: اَلْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُكَيْمٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ فِىْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৪৭. মুহাম্মদ ইবনে মাদদুওয়াহ .... ঈসা তিনি হলেন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উকায়ম আবু মা'বাদ জুহানী রহ. কে দেখতে গেলাম। তিনি বিষফোঁড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। বললাম, কোন তাবীয ঝুলিয়ে নিলেন না ? তিনি বললেন, মৃত্যু তো এর চেয়েও নিকটে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি কিছু ঝুলায়, তবে তাকে সে দিকেই সোপর্দ করে দেওয়া হয়। **ইমাম তিরমিযী রহ.** বলেন, ইবনে আবূ লায়লা রহ. এর বরাতেই কেবল আবদুল্লাহ ইবনে উকায়মের এ রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে আমরা জানি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ لَيْلٰى نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .

৪৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার .... ইবনে আবূ লায়লা রহ. থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে উকবা ইবনে আমির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লামা তাবী রহ. হযরত আবদুল্লাহ রাযি. তাবীয বাঁধতে অস্বীকার করেছেন। তিনি তাবীজকে তাওয়াক্কুল পরিপন্থী মনে করেছেন। অবশ্য অন্যদের জন্য এটি জায়েয। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত পেছনে দ্রষ্টব্য।)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ تَبْرِيْدِ الْحُمّٰى بِالْمَاءِ صـ٢٧

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫. পানি দিয়ে জ্বর ঠাণ্ডা করা

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْحُمّٰى فَوْرٌ مِنَ النَّارِ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَامْرَأَةِ الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

৪৯. হান্নাদ .... রাফি ইবনে খাদীজ রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জ্বর হল জাহান্নামের আগুনের হুলকা। সুতরাং তা পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ বিষয়ে আসমা বিরতে আবূ বাকর, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস যুবাইরের স্ত্রী এবং আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ .

حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِىْ حَدِيْثِ أَسْمَاءَ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هٰذَا ، وَكِلَا الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ .

৫০. হারূন ইবনে ইসহাক হামদানী .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জ্বর হল জাহান্নামের আগুনের হুলকা। সুতরাং পানি দিয়ে তা শীতল কর।

৫১. হারূন ইবনে ইসহাক .... আসমা বিনতে আবূ বাকর রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, আসমা রাযি. বর্ণিত এ হাদীসটিতে আরও কথা আছে। এ দু'টি হাদীসই সহীহ।

بَابٌ صـ٢٧

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬. .... ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ . حَدَّثَنَا إِبْرٰهِيْمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمّٰى وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَّقُوْلَ: بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبَةَ ، وَإِبْرَاهِيْمُ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ وَيُرْوٰى عِرْقٌ يَعَّارٌ .

৫২. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম জ্বর এবং সব ধরনের বেদনার ক্ষেত্রে এই বলতে শিখিয়েছেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ ـ

(আল্লাহর নামে যিনি মহান; আমি মহামহিম আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি রক্ত চাপের আক্রমণ থেকে এবং জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ থেকে।)

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবূ হাবীবা এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। ইবরাহীম হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। عِرْقٍ نَعَّارٍ এর স্থলে عِرْقٍ يَعَّارٍ ও বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জ্বর জাহান্নামের আগুনের টুকরা

اَلْحُمّٰى فَوْرٌ مِنَ النَّارِ ঃ

(১) কেউ কেউ বলেন, হাদীসকে তার প্রকৃত অর্থে নেওয়া হবে। অর্থাৎ জ্বরের উত্তাপ মূলতঃ জাহান্নামের উত্তাপের ছাপ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের কথা স্মরণ করাতে চান।

(২) কেউ কেউ বলেন, এখানে উদ্দেশ্য 'তাশবীহ' দেওয়া। অর্থাৎ জ্বরের তাপ জাহান্নামের তাপের মত।

(৩) কোনও কোনও আলিম বলেন, জ্বর এক হিসাবে গুনাহর শাস্তি। এর দ্বারা মুমিনকে পার্থিব জীবনকে গুনাহর শাস্তি দেওয়া হয়। যেন সে আখিরাতের আযাব থেকে বেঁচে যায়। এ দিক থেকেই জ্বর জাহান্নামের আযাবের একটি টুকরা। হযরত আয়েশা রাযি. এর নিম্নোক্ত হাদীস এ ব্যাখ্যাকে আরও শক্তিশালী করে। তিনি বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوْعًا اَلْحُمّٰى حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ ـ عَنْ اَبِىْ رَيْحَانَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَهِىَ نَصِيْبُ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ ـ كَمَا فِىْ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (تكمله ـ ج٤٠)

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির পানি ব্যবহার

فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ ঃ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য পানি ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে। যথা, পানিতে ডুব দেওয়া, শরীরে পানি প্রবাহিত করা, পানি ছিটিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এর মধ্য থেকে বিশেষভাবে কোন এক পদ্ধতিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিহ্নিত করেন নি। এটা অভিজ্ঞতা কিংবা ডাক্তারদের পরামর্শের আলোকে ঠিক করা যাবে। বর্তমান ও সনাতন চিকিৎসকরা এ ব্যাপারে একমত যে, কিছু কিছু জ্বরের জন্য ঠাণ্ডা পানি খুব ফলপ্রসূ। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা তো বলেছেন, যে কোন জ্বরের চিকিৎসায় ঠাণ্ডা পানি খুব উপকারী। তারা জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির কপালে ভেজা পট্টি রাখা, মাথায় পানি দেওয়া, ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মোছা, বুকে পানি দেওয়ার জন্য স্ববিশেষ পরামর্শ দেন। জ্ব দূর করার জন্য এসব পদ্ধতি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাই সত্য। যা বর্তমানের চিকিৎসকরাও মনে করেন। কোন ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ঠাণ্ডা পানি মাথায় দিলে তার জ্বর পড়ে যায়।

এ হাদীসের কোনও কোনও সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, فَابْرُدُوْهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ তাই কতক আলিম আ'ম রেওয়ায়াতটিকে শর্তযুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তবে এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। হাফিয ইবনে হাযার আসকালানী রহ. বলেছেন, যে হাদীসে জমজমের পানির শর্ত এসেছে, সে হাদীসের সম্বোধন বিশেষ করে মক্কাবাসীর জন্য। কেননা তাদের জন্য জমজমের পানি সহজলভ্য। তাছাড়া জমজমের পানি বরকতপূর্ণ। পক্ষান্তরে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস সবার জন্য ব্যাপক। (তাকমিলাহ ঃ ৪)

আল্লামা মাযেনী রহ. বলেন, স্থান, কাল ও পরিবেশ ভেদে চিকিৎসাপদ্ধতিতেও পরিবর্তন আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুগের অনুকূলে জ্বরের জন্য উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেছেন। বর্তমানে তার পরিবর্তন হলেও কোন দোষ নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْغِيلَةِ ص-٢٧

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭. দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا بْنُ إِسْحَاقَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ بِنْتِ وَهْبٍ وَهِيَ جُدَامَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ . هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَالْغِيَالُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ .

৫৩. আহমাদ ইবনে মানী .... বিনতে ওয়াহব, তিনি হলেন জুদামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমি দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হওয়া থেকে নিষেধ করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ফারেস ও রোমবাসীরা (তা) করে থাকে। অথচ তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ বিষয়ে আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ। মালিক রহ. এটিকে আবুল আসওয়াদ – উরওয়া – আয়েশা – জুদামা বিনতে ওয়াহব সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালিক রহ. বলেন, اَلْغِيَالُ অর্থ হল, দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذٰلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ،

قَالَ مَالِكٌ : وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ . قَالَ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ : وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৫৪. ঈসা ইবনে আহমাদ . ... জুদামা বিনতে ওয়াহব আসাদিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, আমি মুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ করতে ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, ইরান ও রোমবাসীরা তা করে। অথচ তা তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। মালিক রহ. বলেন, اَلْغِيلَةُ হল, দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হওয়া।

ঈসা ইবনে আহমদ– ইসহাক ইবনে ঈসা– মালিক –আবুল আসওয়াদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ–গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عَنْ اِبْنَةِ وَهْبٍ وَهِىَ جُدَامَةُ ঃ জুদামাহ বিনতে ওয়াহব রাযি.। আসাদ গোত্রীয় ওয়াহাবের কন্যা। মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বাইআত করেন। স্বীয় কওম হতে হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। জুদামাহ্ জীমে পেশ, এর পর দাল। কোন কোন বর্ণনায় যাল উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইমাম দারাকুতনীর মতে একথা সঠিক নয়।

اَلْغِيْلَةُ ঃ (গাইনে যের) আসমাঈ, অন্যান্য ভাষাবিদ এবং ইমাম মালেক রহ. বলেন, غِيْلَةٌ বলা হয়, স্তন্যদান অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা। আল্লামা সাহারানপুরী রহ. বলেন, غِيْلَةٌ অর্থ, শিশুর দুগ্ধপানকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা, স্ত্রী গর্ভবতী হোক কিংবা না হোক। –বযলুল মাযহূদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ থেকে বারণ করার ইচ্ছা করেছেন এজন্য যে, আরবরা এ থেকে বেঁচে থাকত। তারা মনে করত, এ অবস্থায় সহবাস দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য ক্ষতিকর। কেননা এতে মাতৃদুধ খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এ সহবাসের কারণে যদি গর্ভবতী হয়ে যায়, তাহলে দুধ শুকিয়ে যায়। তখন শিশু দুধ কম পায়। বিধায় দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন, পারস্যের লোকেরা غِيْلَةٌ করে। অথচ তাদের বাচ্চাদের কোন ক্ষতি হয় না, তখন তিনি নিজের ইচ্ছা থেকে ফিরে আসেন। এর দ্বারা বোঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ ইচ্ছাটা অহীনির্ভর ছিল না বরং ইজতিহা নির্ভর ছিল। এজন্যই তিনি পারস্যবাসী ও রোমবাসীর উপর কিয়াস করে ইচ্ছা ত্যাগ করলেন।

এ হাদীসটির আলোকে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম বলেন, غِيْلَةٌ জায়িয। ইবনুস্ সাকীত বলেন, غِيْلَةٌ বলা হয়, গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা। এটাও জায়িয। কিন্তু এ সময়ে স্ত্রী সহবাস করা বিশেষ করে প্রসবের নিকটবর্তী সময়ে সহবাস করা মা-শিশু উভয়ের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিধায় সহবাস না করাই উত্তম।

নবীর ইজতিহাদ

উক্ত হাদীসের মাধ্যমে এটাও সাব্যস্ত হল যে, নবীর জন্য ইজতেহাদ করা জায়িয। এটাই জমহূর এবং উসূলবিদগণের মাযহাব। একদল লোক অবশ্য এটাকে অস্বীকার করেন। কিন্তু তাদের এ অস্বীকার সঠিক নয়। (বযলুল মাযহূদ)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ صـ٢٨

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮. নিউমোনিয়ার ওষুধ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ـ

قَالَ : قَتَادَةُ : يَلُدُّهُ وَيَلُدُّهُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِىْ يَشْتَكِيْهِ ـ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ وَأَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ إِسْمُهُ مَيْمُوْنٌ : هُوَ شَيْخٌ بَصْرِىٌّ ـ

৫৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার .... যায়দ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিউমেনিয়ার ক্ষেত্রে যায়তুন এবং ওয়ারস (এক জাতীয় ঘাস) এর মাধ্যমে চিকিৎসার প্রশংসা করতেন।

কাতাদা রহ. বলেন, এর যে পার্শ্বে ব্যথা সে পার্শ্বের মুখের ফাঁক দিয়ে ঔষধ প্রদান করা হবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। রাবী আবূ আবদুল্লাহ রহ. এর নাম হল মায়মূন। তিনি হলেন বসরী শায়খ।

حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ . حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ – وَقَدْ رَوَى عَنْ مَيْمُونٍ غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيثَ .

৫৬. রাজা ইবনে মুহাম্মদ আদবী বাসরী .... যায়দ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিউমোনিয়াতে চন্দন কাঠ এবং যয়তুনের মাধ্যমে চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মায়মূন – যায়দ ইবনে আরকাম রাযি. সূত্রে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। মায়মূন রহ. থেকে একাধিক হাদীস বিশেষজ্ঞ এ হাদীসটি বর্ণনা করছেন।

بَابٌ ص ٢٨

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯. ....।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ . أَتَانِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَانَ يُهْلِكُنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : اِمْسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِي ، فَلَمْ أَزَلْ أٰمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ . قَالَ أَبُوعِيسٰى : وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৫৭. ইসহাক ইবনে মূসা আনসারী .... উসমান ইবনে আবুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। আমার তখন এমন ব্যথা ছিল, যেন তা আমাকে হালাক করে দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ডান হাত দিয়ে (ব্যথার স্থানটি) সাতবার মোছা দাও এবং বলঃ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ . "আল্লাহর মহাপরাক্রম, কুদরত ও আধিপত্যের ওয়াসীলায় আমি আমার এই কষ্ট থেকে পানাহ চাই।"

রাবী উসমান ইবনে আবুল আস রাযি. বলেন, আমি তাই করলাম। আল্লাহ তা'আলা আমার যে কষ্ট ছিল, তা দূর করে দিলেন। তখন থেকেই আমি আমার পরিজন ও অন্যান্য লোকদের এ নির্দেশ দিয়ে থাকি। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ذَاتُ الْجَنْبِ ঃ এটি পার্শ্বদেশে বেদনাবোধকারী একপ্রকার রোগ। হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, ذَاتُ الْجَنْبِ দুই প্রকার। (১) হাক্বীকী। (২) গাইরে হাক্বীকী। হাক্বীকী হল, যার কারণে বক্ষ ফুলে যায় কিংবা ফোসকা পড়ে। যদিও এটি প্রথমে শরীরের অভ্যন্তরে অনুভূত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশমান হয়ে যায়।

হাক্বীকী যাতুল-যান্‌ব খুব মারাত্মক রোগ। কাহ্‌হাল ইবনে ত্বারখান বলেন, হাক্বীকী যাতুল-যান্‌ব মূলতঃ একপ্রকার ব্যথা, যা ঝিল্লির প্রদাহে স্ফীত হয়। ইউনানী ভাষায় যাতুল-যান্‌ব ব্যথা ও ফোলাকে বলে। কেউ কেউ বলেন, এ রোগের লক্ষণ হল, শরীরে ফোসকা সৃষ্টি হওয়া ও পানি জমে যাওয়া।

পক্ষান্তরে যাতুল-যান্‌ব গাইরে হাক্বীকী হল, পাদ-বায়ু বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে পার্শ্বদেশে ব্যথা সৃষ্টি হওয়া। হিন্দী উদ এ দ্বিতীয় প্রকারের রোগকে নিরাময় করে।

اَلْـوَرْسُ ঃ শব্দটি فَلْسٌ এর ওজনে। হলুদ রঙের উদ্ভিদবিশেষ। ইয়ামানে হয়ে থাকে। এর দ্বারা চেহারায় প্রলেপ দেওয়া হয়। এর রেশাগুলো জাফরানের মত হয়। জাফরানের মতই এর দ্বারা রঙ করার কাজ নেওয়া হয়। বাহ্যতঃ মনে হয়, ذَاتُ الْجَنْبِ চিকিৎসার জন্য এ দু'টি জিনিস মুখের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করে দেওয়া হয়। (মাজাহিরে হক)

قُسْطٌ بَحْرِى ঃ এক প্রকারের উদ্ভিদের জড় থেকে তৈরী লাকড়ি। এটি হিন্দুস্তানে বিশেষতঃ কাশ্মিরে জন্মে। এটি দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটির রঙ হয় সাদা, অপরটি কালো রঙ্গের। আগেরকার যুগে ব্যবসায়ীরা সমুদ্রপথে এগুলো আরবে নিয়ে যেত। তাই একে قُسْط بَحْرِى বলা হয়। একে قُسْط هِنْدِى বা عُوْد هِنْدِىْ ও বলা হয়। এ লাকড়ি খুব সুগন্ধিযুক্ত হয়ে থাকে। এর ইংরেজী নাম Costus ডাক্তারগণ قُسْط بَحْرِى এর অনেক উপকারিতা লিখেন। বিশেষত বক্ষব্যাধি, কফজনিত ও বায়ুজনিত রোগ-ব্যাধিতে খুবই ফলদায়ক।

উল্লেখ্য, ইমাম তিরমিযী রহ. ذَاتُ الْجَنْبِ এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, এ সম্পর্কে তুহফাতুল আহওয়াযীতে বলা হয়েছে, সংজ্ঞাটি শুধু ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। অন্য কারও থেকে ذَاتُ الْجَنْبِ এর এরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায় না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّنَا ص۲۸

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০. সানা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنِى عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلَهَا بِمَ تَسْتَمْشِيْنَ ؟ قَالَتْ : بِالشُّبْرُمِ ، قَالَ : حَارٌّ ، جَارٌّ قَالَتْ : ثُمَّ اِسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ . لَوْ اَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيْهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِى السَّنَا . قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ يَعْنِى دَوَاءَ الْمَشِىِّ .

৫৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার .... আসমা বিনতে উমায়স রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ তোমরা কি দিয়ে দাস্ত করাও। তিনি বললেন, শুবরুম দিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এতো সাংঘাতিক গরম ঔষধ। আসমা বলেন, পরবর্তীতে আমি দাস্তের জন্য সানা ব্যবহার করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন বস্তুতে যদি মৃত্যুর ঔষধ থাকত তবে তা থাকত সানায়। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

شُبْرُم ঃ একপ্রকার ঘাস। যা দ্বারা জোলাপ নেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেন, ঐ ঘাসের দানাকে 'শবরুম' বলা হয়। দানাগুলো মশুরির ডালের সমান। জোলাপের জন্য এসব দানা পানিতে জ্বাল দেওয়া হয় এবং সেবন করা হয়। অনেকে বলেন, দানাগুলো চনাবুট সমপরিমাণ হয়। চিকিৎসার সার্থে এর রস পান করা হয়। ডাক্তাররা এটি

ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন। কেননা এতে বিপদ আশঙ্কা আছে; দাস্ত বেড়ে যায়। ডাক্তাররা আরও বলেন, শুবরমের গরম ৪ ডিগ্রি।

قَالَ حَارٌّ جَارٌّ ঃ উভয় শব্দে ح এর উপর যবর। ر এর উপর তাশদীদ। কিন্তু কেউ কেউ দ্বিতীয় শব্দটি ج সহকারে বর্ণনা করেছেন এবং প্রথম শব্দের تَابِع مُهْمَل সাব্যস্ত করেছেন। কোন শব্দের অধিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে হলে আসল শব্দটির সাথে তার সমওযনে আরেকটি শব্দ আনা হয়। যেমন, পানি-টানি। অর্থাৎ শুবরক ভীষণ গরম।

اَلسَّنَا ঃ একপ্রকার গুল্ম বা লতা। এ সম্পর্কে হাদীসের বাক্যটি আতিশয্যরূপে বলা হয়েছে। এ লতা দাস্ত আনয়ণকারী ঔষধ হিসাবে ভিজিয়ে তার পানি কিংবা অন্যভাবে সেবন করা হয়। আমরা এটিকে সোনামুখী বা স্বর্ণলতা বলি। বিশেষত মক্কী সূর্যমুখী বড়ই বিস্ময়কর ঔষধ। খুব দাস্ত আনয়নকারী। এটি মধ্যম ধরনের পন্থা। গরম-শুকনো। কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতির আশঙ্কা নেই। এটা পাকস্থলি ঠাণ্ডা রাখে। (হাশিয়ায়ে ইবনে মাযাহ,)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْعَسَلِ صـ٢٨

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ মধু প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ أَخِى اِسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ ، فقال : إن أخى استطلق بطنه ، فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ : فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ اِلَّا اِسْتِطْلَاقًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اِسْتِطْلَاقًا ، قَالَ " فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ : صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ، أَسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ عَسَلًا فَبَرَأَ .

قَالَ أَبُوعِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৫৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার .... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আমার ভাইয়ের খুব দাস্ত হচ্ছে। তিনি বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। লোকটি তাকে মধু পান করাল। পরে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাকে তো মধু পান করালাম। কিন্তু তাতে দাস্ত ছাড়া আর কিছু বাড়েনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে মধু পান করাও। লোকটি তাকে মধু পান করিয়ে আবার এল। বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো তাকে মধু পান করালাম। কিন্তু তাতে দাস্ত ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি পায়নি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ সঠিক কথা বলেছেন। কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেটই ভুল করছে। তাকে মধুই পান করাও। অনন্তর লোকটি তাকে মধু পান করাল। ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

بَـابٌ صـ٢٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২. .... ।

حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ إِلَّا عُوْفِيَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو .

৬০. মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না .... ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন মুসলিম বান্দা যদি কোন রোগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসেনি, তখন সে যদি সাতবার এ দু'আটি পড়ে তবে অবশ্যই তার রোগ মুক্তি হবে।

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

"আরশে আযীমের রব মহামহিম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে শিফা দান করেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। মিনহাল ইবনে আমর রহ. এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَـابٌ صـ٢٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩. .... ।

حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَشْقَرُ الرِّبَاطِيُّ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا مَرْزُوْقٌ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّامِيُّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ . أَخْبَرَنَا ثَوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ الْحُمَّى فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهْرًا جَارِيًا لِيَسْتَقْبِلَ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَيَقُوْلُ : بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَلْيَغْتَمِسْ فِيْهِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ ثَلَاثٍ فَخَمْسٍ، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ خَمْسٍ فَسَبْعٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

৬১. আহমাদ ইবনে সাঈদ আশকার মুরাবিতী .... সাওবান রাযি. সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,তোমাদের কেউ যদি জ্বরে আক্রান্ত হয়। আর জ্বর তো হল জাহান্নামের অংশ বিশেষ। তবে তা পানি দিয়ে নিভাবে। ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রবাহিত নহরে নেমে পড়বে এবং এর স্রোতের গতি সামনে রেখে বলবেঃ بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ

"বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ, তোমার বান্দাকে শিফা দাও। তোমার রাসূলকে তুমি সত্যবাদী সাব্যস্ত কর।"

পরে তাতে তিনটি ডুব দিবে। এরূপ তিনদিন করবে। তিনদিনে যদি জ্বর না সারে তবে পাঁচদিন। পাঁচদিনে ভাল না হলে সাতদিন। সাতদিনে ভাল না হলে নয় দিন এরূপ করবে। আল্লাহর হুকুমে নয় দিনের বেশী তা অতিক্রম করবে না। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মধুর ব্যাপারে সংশয় ও তার উত্তর

কোন কোন সংশয়বাদী সংশয় প্রকাশ করে বলে থাকে, মধু জোলাপ বিশেষ। যা দাস্ত কমায় না বরং বাড়ায়। সুতরাং দাস্তের জন্য মধু সেবনের নির্দেশ দেওয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিপন্থী।

এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হল–

(১) প্রশ্নটি সম্পূর্ণ মুর্খতানির্ভর। সকল চিকিৎসকের ঐকমত্যে বয়স, মেযায, কাল, পরিবেশ ও হজমশক্তি অনুপাতে একই রোগের চিকিৎসা ও ঔষধ বিভিন্ন হতে পারে। সুতরাং যদি মেনে নেওয়া হয়, মধু পেটের পাতলা মলকে আরও বাড়িয়ে দেয় তাহলে এটা হাদীসের বক্তব্য পরিপন্থী নয়।

(২) মধু সেবনের এ নির্দেশ চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিপন্থী নয়। কারণ, পাতলা পায়খানা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। ধরনের মধ্যেও পার্থক্য থাকতে পারে। সুতরাং একেক ধরনের দাস্তের ঔষধ একেক রকম। বর্তমানের এবং পূর্বের সকল চিকিৎসক একমত যে, দাস্ত সাধারণতঃ বদহজম এবং নাড়ির দুর্বলতার কারণে হয়। আর নাড়িকে শক্তিশালী করার জন্য এবং বদহজম দূর করার জন্য মধু অত্যন্ত উপকারী। সুতরাং যে দাস্ত নাড়ির জমাটবাঁধা আবর্জনার কারণে হয়, সে দাস্তের জন্য মধু নিঃসন্দেহে উপকারী। এতে নাড়ি পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যক্তির বারবার মধু সেবন করার নির্দেশ দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, পেটের সকল জীবাণু ও আবর্জনা বের করে তার দীর্ঘমেয়াদী পীড়াকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা পদ্ধতি মোটেই শাস্ত্রবিরোধী নয় বরং চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুকূলে।

(৩) কেউ কেউ এর উত্তর দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, এ ব্যক্তির চিকিৎসা মধুর মধ্যেই রয়েছে। তাই তিনি বারবার মধু সেবনের নির্দেশ দিয়েছেন।

(৪) কেউ কেউ বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মু'জিযা ছিল। তাঁর দু'আর বরকতে এ ব্যক্তি সুস্থতা ফিরে পেয়েছে।

صَدَقَ اللّٰهُ ঃ এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

(১) আল্লাহ তা'আলা মধুর ব্যাপারে যে বলেছেন, فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ এ বাণীটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

(২) আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জানিয়েছিলেন, এ ব্যক্তির চিকিৎসা রয়েছে মধুর মধ্যে –এটা প্রমাণিত সত্য।

كَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ ঃ এর অর্থ اَخْطَأَ بَطْنُ اَخِيْكَ অর্থাৎ সুস্থ না হওয়া ঔষধের দোষে নয় বরং তোমার ভাইয়ের পেটের দোষে। কেননা তার পেটে জীবাণু বাসা বেঁধেছে। তাই অল্প মধুতে কাজ হচ্ছে না। ব্যাধি মারাত্মক, তাই মধু আরও বেশি সেবন করাতে হবে। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার মধু সেবনের নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য তার নিয়ত শুদ্ধ ছিল না। ইমাম রাযী রহ. বলেন, এখানে মূলতঃ صِدْقٌ শব্দের বিপরীতে كِذْبٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

بَابُ التَّدَاوِىْ بِالرَّمَادِ ص۲۹

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪. ছাই দিয়ে চিকিৎসা করা

حَدَّثَنَا بْنُ أَبِىْ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ قَالَ: سُئِلَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ بِأَىِّ شَيْءٍ دُوْوِىَ جُرْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ : مَا بَقِىَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ، كَانَ عَلِىٌّ يَأْتِىْ بِالْمَاءِ فِىْ تُرْسِهِ وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ، وَأُحْرِقَ لَهُ حَصِيْرٌ فَحَشٰى بِهِ جُرْحَهُ۔ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۔

৬২. ইবনে আবু উমার .... আবূ হাযিম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনে সা'দ রাযি. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জখম কি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল ? এ সময় আমিও তা শুনছিলাম। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জানে এমন কেউ আর নেই। আলী তাঁর ঢালে করে পানি নিয়ে আসছিলেন আর ফাতিমা সেই রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। একটি চাটাই জ্বালিয়ে এর ছাই তাঁর জখমে ভরে দেওয়া হয়েছিল। **ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী রহ. বলেন,** হাদীসটি হাসান সহীহ।

بَابٌ ص۲۹

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫. .... ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُوْنِىُّ عَنْ مُوْسٰى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِىْ أَجَلِهِ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ۔ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ۔

৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আশাজ্জ রহ. .... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কোন রোগীর কাছে গেলে তাকে তার জীবন সম্পর্কে আশার বাণী শোনাবে। এতে অবশ্য তকদীরে যা আছে, তার কিছুই প্রতিহত হবে না। কিন্তু তার মন প্রফুল্ল হবে। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়।

(১) অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা করা জায়িয।

(২) চিকিৎসা করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়।

(৩) নবীগণও শারীরিকভাবে অসুস্থ হতেন। দুঃখ-ব্যথা পেতেন। যেন তাঁদের মাকাম উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়।

(৪) আম্বিয়ায়ে কিরাম অসুস্থ হন, ব্যথা পান, কষ্ট অনুভব করেন। এর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীরা যেন এ শিক্ষা লাভ করতে পারে যে, নবী কখনও খোদা হতে পারেন না। আল্লাহর বড়ত্বের সামনে একজন নবী নিতান্তই মুখাপেক্ষি। অমুখাপেক্ষি সত্ত্বা শুধুই আল্লাহ তা'আলা।

(৫) হযরত সাহ্‌ল রাযি. এর বক্তব্য مَابَقِىَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ দ্বারা বুঝা যায়, অন্তরে অহংকার সৃষ্টি না হলে প্রয়োজনের সময় নিজের ইল্‌ম ও যোগ্যতা প্রকাশ করা যায়।

اَبْوَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صـ۲۹

فَرَائِض এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থঃ

فَرَائِضُ ঃ শব্দটি فَرِيْضَةٌ এর বহুবচন। যথা حَدَائِقُ শব্দ حَدِيْقَةٌ এর বহুবচন। শব্দটি فَرْض থেকে উৎকলিত। فَرْض এর শাব্দিক অর্থ একাধিক। যথা–

(১) বিনিময় ছাড়া কোন কিছু দান করা। (২) تَقْدِيْر অর্থাৎ নির্ধারণ করা। (৩) অবতীর্ণ করা। যেমন اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ (اَنْزَل) عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ (৪) বয়ান করা। যেমন قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ (৫) হালাল করা বা বিধিবদ্ধ করা। যেমন مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ (৬) শরহুস সুন্নাহতে রয়েছে اَلْفَرْضُ اَيِ الْقَطْعُ অর্থাৎ নির্ধারিত অংশ পৃথক করা। মীরাস তথা মৃতের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির বন্টনবিদ্যা কে فَرَائِض বলার কারণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে– সা.

وَخُصَّتِ الْمَوَارِيْثُ بِاِسْمِ الْفَرَائِضِ مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا اَىْ مُقَدَّرًا اَوْ مَعْلُوْمًا اَوْمَقْطُوْعًا عَنْ غَيْرِهِمْ (كَمَا فِى التَّعْلِيْقِ ج ۳ ص ۳۸۸)

অর্থাৎ মীরাস তথা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টনকে فَرَائِض বলা হয়, আল্লাহর তা'আলার বাণী– نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا থেকে চয়ন করে। যার অর্থ অন্যদের থেকে নির্ধারিত অথবা জ্ঞাত কিংবা অপরিহার্য অংশ।

ইসলামী পরিভাষায় ইলমুল ফারায়েজ এর সংজ্ঞা ঃ

هُوَعِلْمٌ بِاُصُوْلٍ مِنْ فِقْهٍ وَحِسَابٍ تُعْرَفُ بِهٖ كَيْفِيَّةُ تَقْسِيْمِ التَّرِكَةِ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ

অর্থাৎ ইলমুল ফারায়েয এমন কিছু ফিকহী ও গাণিতিক নীতিমালাকে বলা হয়, যেগুলোর মাধ্যমে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে কিভাবে বণ্টন করতে হয় তার পদ্ধতি জানা যায়।

عِلْمُ الْفَرَائِض এর আলোচ্য বিষয় হল, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও ওয়ারিসগণ। আর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল, শরী'আত মতে প্রত্যেক হকদারকে হক বুঝিয়ে দেওয়া এবং কিয়ামতের দিন বান্দার হক নষ্ট করার শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ।

ইলমুল ফারায়েয এর গুরুত্ব

ফারায়েয দ্বীনী ইলমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মূলতঃ এটি ইলমে ফিক্বহের এক বিশেষ অংশ। অর্থনৈতিকজীবন ও সামাজিক জীবনের একটি বিশাল অংশ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য ইসলাম এর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআন মজীদ যেখানে অন্যান্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেছে। কুরআন মজীদ যেখানে অন্যান্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেছে। কুরআন মজীদে যেখানে অন্যান্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেছে। সেখানে ফারায়েযের ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখার মত বিষয়গুলোকেও সবিস্তারে আলোচনা করেছে। প্রত্যেক হকদারের নির্ধারিত অংশ পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করেছে। রাসূল ﷺ ও ইলমুল ফারায়েয পঠন-পাঠনের বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন– تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ

উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব লাভের বিধি

(১) মৃত ব্যক্তির সকল পরিত্যক্ত 'মীরাস' এর অন্তর্ভুক্ত। তথা মৃতব্যক্তির জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তি, ধন-সম্পদ, ধন-দৌলত, মিল-কারখানা, দোকান-পাট, গার্মেন্টিস-ফ্যাক্টরী, গাড়ি-বাড়ি, সোনা-গহনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাউজিং-সোসাইটিসহ সবকিছু 'মীরাস' এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এসব সম্পদ اَصْحَابُ الْفَرَائِض তথা সে সকল উত্তরাধিকারীর সম্পদ নির্ধারিত, তাদের মাঝে ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

(২) আত্মীয়তার যে কোনও সম্পর্কই ওয়ারিস হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বরং নিকটতম আত্মীয় হওয়া শর্ত। কেননা নিকটতম হওয়াকে যদি মাপকাঠি করা না হয়, তবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিই সমগ্র ভূপৃষ্ঠের মানুষের মধ্যে বণ্টন করা জরুরী হয়ে পড়বে। কেননা সব মানুষই এক পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান। মূল রক্তের দিয়ে দিয়ে কিছু না কিছু সম্পর্ক সবার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এর বাস্তবায়ন প্রথমতঃ সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কোনওরূপ চেষ্টা করে এর ব্যবস্থা করেও নেওয়া যায়, তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করতে অবিভাজ্য অংশ পর্যন্ত পর্যন্ত পৌঁছাবে, যা কারো কাজে আসবে না। তাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যখন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল। তখন এরূপ নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া জরুরী ছিল, যার ফলে নিকট ও দূরের বিভিন্ন সম্পর্ক একত্রিত হলে নিকটের আত্মীয়কে দূরের আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী সাব্যস্ত হয়, যদিও নিকটতম হওয়ার কারণ বিভিন্ন, তবে সবাই ওয়ারিস হবে। যেমন সন্তানদের সাথে পিতা-মাতা কিংবা স্ত্রী থাকা; এরা সবাই নকিটতম ওয়ারিস, যদিও নৈকট্যের কারণ বিভিন্ন।

(৩) মীরাস -এর ক্ষেত্রে তৃতীয় ইসলামী বিধি হল, পুরুষদেরকে যেমনিভাবে উত্তরাধিকারের হকদার মনে করা হয়, তেমনি নারী ও শিশুদেরকেও এ হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেননা সন্তানের সম্পর্ক হোক কিংবা পিতা-মাতার সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোন সম্পর্ক হোক। প্রত্যেকটি সম্পর্কের মর্যাদা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমান। ছেলে যেমন পিতা-মাতা থেকে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি মেয়েও পিতা-মাতারই সন্তান। উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। কাজেই ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে বঞ্চিত করার কোনও কারণই থাকতে পারে না।

(৪) উত্তরাধিকার সত্ত্বে চতুর্থ ইসলামী বিধি হল, পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয় বরং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে হবে। তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ, তাকে বেশি হকদার মনে করা জরুরী নয় বরং সম্পকে যে ব্যক্তি মৃতের অধিক নিকটবর্তী হবে, সে দূরবর্তীর তুলনায় অধিক হকদার হবে। যদিও প্রয়োজন ও অভাব দূরবর্তীর বেশি হয়। আর যদি নিকটতম আত্মীয়তার মাপকাঠি পরিবর্তে কোন কোন আত্মীয় অভাবগ্রস্থ ও উপকারী হওয়াকে মাপকাঠি করে নেওয়া হয়, তবে তা কোন বিধানই হতে পারে না কিংবা একটি সুনির্দিষ্ট অকাট্য আইনের আকার ধারণ করতে পারে না। কেননা নিকটতম আত্মীয়তা ছাড়া অন্য যে কোন মাপকাঠি সাময়িক চিন্তাপ্রসূত হবে। কারণ, দরিদ্র ও অভাব চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্তর সবসময় পরিবর্তিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় হকে দাবীদার অনেক বেরিয়ে আসবে এবং ফয়সালাকারীদের পক্ষে এর ফয়সালা করা কঠিন হবে।

(৫) মীরাসের ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পঞ্চম বিধান হল, উত্তরাধিকারী সূত্রে ওয়ারিসরা যে মালিকানা লাভ করে, তা বাধ্যতামূলক। এতে ওয়ারিসের কবুল করা এবং সম্মত হওয়া জরুরী ও শত নয় বরং সে যদি মুখে স্পষ্টত বলে যে, সে তার অংশ নিবে না, তবুও আইনতঃ সে নিজের অংশের মালিক হয়ে যায়। এটা ভিন্ন কথা যে, মালিক হওয়ার পর শরী'আতের বিধি অনুযায়ী অন্য কাউকে দান, বিক্রি অথবা বণ্টন করে দিতে পারবে।

(মা'আরিফুল কুরআন ঃ ২, তাকমিলাহ ঃ ২,)

بَابُ مَاجَاءَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ص۲۹

অনুচ্ছেদ ঃ ১. কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা হবে তার ওয়ারিছানের জন্য।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَطْوَلَ مِنْ هٰذَا وَأَتَمَّ - مَعْنٰى ضَيَاعًا ضَائِعًا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فَأَنَا أَعُوْلُهُ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِ -

১. সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ উমাবী রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা হবে তার ওয়ারিছানের আর কেউ সহায়-সম্পদহীন পরিবার-পরিজন রেখে গেলে তাদের দায়িত্ব আমর ওপর।

এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। যুহরী রহ. এটাকে আবু সালমা– আবূ হুরাইরা রাযি, সূত্রে নবী কারীম ﷺ থেকে আরো বিস্তারিত এবং অধিকতর পূর্ণাঙ্গভাবে রিওয়ায়েত করেছেন।

এ বিষয়ে জাবির এবং আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। مَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا কথাটির মর্ম হল, এমন পরিবার-পরিজন রেখে গেল, যারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তাদের কিছুই নাই। فَإِلَيَّ অর্থ হল, আমি তাদের দেখাশোনা করব এবং ভরণ-পোষণ করব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاءُهُ বাক্যটিও অতিরিক্ত এসেছে। অর্থাৎ যে মুসলমান ঋণ রেখে মারা যায় এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করারও ব্যবস্থা না থাকে তখন তার ঋণ আদায় করার দদায়িত্ব রাসূল ﷺ নিয়েছেন। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি মারা গেলে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে পরিশোধ করার ব্যবস্থা না থাকলে, ইসলামের প্রথম যমানায় রাসূল ﷺ ঐ ব্যক্তির জানাযা পড়তেন না। তারপর মুসলমানদের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে, তখন তিনি নিজে ঐ ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে দিতেন। কেউ কেউ বলেন, রাসূল ﷺ নিজের সম্পদ থেকে এ ঋণ পরিশোধ করতেন। আবার কেউ কেউ বলেন, বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করতেন।

মৃত মুসলমানের ঋণ পরিশোধ করা– যদি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হয়– রাসূল ﷺ এর উপর ওয়াজিব না অনুগ্রহ স্বরূপ দান –এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, ওয়াজিব। কেউ বলেন, এটা নবীজীর শফকত তথা উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ।

উম্মতের প্রতি প্রিয়নবীজী ﷺ এর অগাধ ভালোবাসা

এ হাদীসটির মাধ্যমে উম্মতের প্রতি রাসূল ﷺ এর কি পরিমাণ ভালোবাসা– তার কিঞ্চিত নমুনা ফুটে উঠেছে। আসলে একজন মুমিনের সঙ্গে রাসূল ﷺ যে সম্পর্ক তার প্রকৃতিই ভিন্ন, মাহাত্মই আলাদা, এ সম্পর্কের সঙ্গে পার্থিব কোনও সম্পর্কের তুলনাই হতে পারে না। রাসূল ﷺ ঈমানদারের জন্য তার পিতা-মাতার চেয়েও অধিক মেহেরবান, এমনকি তার নিজের চেয়েও অধিক কল্যাণকামী। উম্মতের ঈমানী ও রূহানী অস্তিত্ব নবীর রূহানিয়াতেরই অবদান। যে মমতা ও প্রতিপালন নবীর পক্ষ থেকে উম্মত লাভ করেছে, এর কোন নমুনা গোটা সৃষ্টিজগতের মধ্যেও পাওয়া যাবে না। পিতা-মাতা এর দৃষ্টান্ত হতে পারেন না। পিতার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন ক্ষণস্থায়ী জীবন। আর নবীর মাধ্যমে হাসিল হয় চিরস্থায়ী জীবন। নবীজী ﷺ আমাদের এরূপ সহানুভূতি ও কল্যাণকামীতার সঙ্গে প্রতিপালন করে থাকেন, যে সহানুভূতি ও কল্যাণকামিতা আমাদের নিজ সত্তার পক্ষেও সম্ভব নয়।

এজন্য আমাদের জান-মাল সম্পর্কে নবীজী ﷺ এর এরূপ অদিকার রয়েছে, যা পৃথিবীতে আর কারও নেই। শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী রহ. এর ভাষায়ঃ নবী আল্লাহর নায়েব। কোন ব্যক্তির জান-মালের উপর তার নিজেরও ততখানি কর্তৃত্ব নেই, যা নবীজীর রয়েছে।

ضَيَاعًا এ প্রসঙ্গে اَلدُّرُّ الْمَنْضُوْدُ এ বলা হয়েছে–

بِفَتْحِ الضَّادِ مَصْدَرٌ مِنْ ضَاعَ يَضِيعُ بِمَعْنَى الْهَلَاكِ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ مَاهُوَ بِصَدَدِ أَنْ يَضِيعَ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَيَالٍ لَاقِيمَ بِأَمْرِهِمْ ـ

অর্থাৎ ضَاعَ يَضِيعُ এর মাসদার। অর্থ নষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া। অতঃপর সন্তান, পরিবার যেগুলো তত্ত্বাবধায়ন না করলে নষ্ট হয়ে যায়, সেগুলোকেও ضَاعَ শব্দে ব্যক্ত করা হয়।

ইমাম নববী রহ. বলেন, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি জীবিকা উপার্জনে অক্ষম, তার দায়-দায়িত্ব নেওয়ার মত কোন নিকটাত্মীয়ও নেই, তাহলে বাইতুলমাল তার হাজত পূরণ করার জন্য জিম্মাদার হবে। রাষ্ট্রপ্রধান যাকাত ফাণ্ড থেকে তার প্রতিপালন করবেন। যাকাত খাত দ্বারা সম্ভব না হলে রাজস্ব খাত থেকে তার প্রয়োজন মেটানো হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ ص۲۹

অনুচ্ছেদ ঃ ২. ফারাইয বা দায় ভাগ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ ـ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ ـ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ ـ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ فِيهِ اِضْطِرَابٌ، وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ بِهٰذَا بِمَعْنَاهُ ـ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ـ

২. আবদুল আ'লা ইবনে ওয়াসিল রহ. .... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ফারাইয এবং কুরআন শিক্ষা করবে এবং মানুষকেও তা শিখাবে। আমাকে তো কবয করে নেওয়া হবে। এ হাদীসে ইযতিরাব বিদ্যমান। আবূ উসামা হাদীসটিকে আওফ জনৈক ব্যক্তি সুলাইমান ইবনে জাবির ইবনে মাসউদ রাযি. সূত্রে নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

হুসাইন ইবনে হুরায়স ... আবূ উসামা রহ. সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমকে আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহ. যঈফ বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আলোচ্য হাদীসটি ফারায়েজ শিক্ষার ফযীলত সংক্রান্ত। অপর হাদীসে এসেছে– تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ "নিসফুল ইলম" তথা ইলমের অর্ধেক অর্থ হল, মানুষের দুই অবস্থা। এক. জীবিত অবস্থা। **দুই.** মৃত অবস্থা। ফারায়েয এর সম্পর্কে মৃত অবস্থার সাথে। তাই তাকে نِصْفُ الْعِلْمِ বলা হয়েছে।

কোন কোন আলিম বলেন, এ হাদীসে ফারায়েয দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণ ফরযসমূহ যেগুলো আল্লাহ বান্দার উপর আবশ্যক করেছেন। অবশ্য এ উক্তি সঠিক নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى مِيرَاثِ الْبَنَاتِ صـ٢٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৩. কন্যার মীরাস

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِى زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : جَاءَتْ اِمْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ ، قَالَ يَقْضِى اللّٰهُ فِى ذَالِكَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا ، فَقَالَ : أَعْطِ لِبِنْتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ، قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ -

৩. আবদ ইবনে হুমায়দ রহ. .... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনুর রাবী এর স্ত্রী সা'দের ঔরসজাত দুই কন্যা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা সা'দ ইবনুর রাবী এর দুই কন্যা। এদের পিতা আপনার সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হিসাবে নিহত হন। এদের চাচা তাদের সম্পদ দখল করে নিয়েছে। এদের জন্য কোন সম্পদই অবশিষ্ট রাখেনি। অর্থ সম্পদ না থাকলে এদের বিবাহও তো হবে না।

তিনি বললেন, এ বিষয়ে আল্লাহই ফায়সালা দিবেন। অনন্তর মীরাস সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের চাচার কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, সা'দ এর দুই কন্যাকে দুই তৃতীয়াংশ, তাদের মাকে এক অষ্টমাংশ দিয়ে দাও; বাদবাকী সম্পদ হল তোমার। এ হাসীসটি হাসান ও সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল রহ. এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। শারীক রহ. ও এটিকে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল রহ. এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

'মীরাস' সংক্রান্ত আয়াতের শানে নুযূল ঃ

ইসলাম পূর্বকালে আরব-অনারব জাতিসমূহের মধ্যে অবলা নারী চিরকালই জুলুম-নির্যাতনের শিকার ছিল। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার নারী পাবে– এ কল্পনাই মানুষ করত না। ভাবা হত– নারী দুর্বল। ঘোড়ার পিঠে চাবুক হেনে ঝড়ের গতিতে অগ্রসর হওয়ার শক্তি তার নেই। শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সে অমিততেজ বিক্রম তার কোমলাঙ্গে অনুপুস্থিত। যুদ্ধ-বিজয়লব্ধ ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করতেও সে ছিল অক্ষম। এ কারণেই ইসলাম পূর্ব যুগে তারা নারীকে মীরাস বা উত্তরাধিকার বঞ্চিত করে রাখত। এক্ষেত্রে তারা কেবল পুরুষদেরকেই উত্তরাধিকার লাভে যোগ্য মনে করত। কারণ, পুরুষরা যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার পিঠে আরোহন করে শত্রুর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম, যা নারীরা পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলে এমনি একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যে, আউস ইবনে সাবেত রাযি. স্ত্রী, তিন কন্যা (এক বর্ণনা মতে, দুই কন্যা ও এক নাবালেগ শিশু) রেখে মত্যুমুখে পতিত হন। প্রাচীন আরবীয় পদ্ধতি অনুযায়ী দুই চাচাত ভাই এসে তাঁর সম্পত্তি দখল করে নিল এবং স্ত্রী ও সন্তানদেরকে কিছুই দিল না।

আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এ অবস্থার বর্ণনা করে সন্তানদের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনার অভিযোগ করলেন। তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত ছিলেন যে, অহীর মাধ্যমে এই নিষ্ঠুর আইনের অবশ্যই পরিবর্তন সাধন করা হবে। সে মতে সবপ্রথম উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়–

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত।" সূরা নিসা আয়াত ঃ ৬

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে জাহেলী যুগের যাবতীয় অন্যায় অবিচার আর শোষণ-বঞ্চনার করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে নারী জাতি উত্তরাধিকার সর্বপ্রথম স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আয়াতটির বিধান ছিল সংক্ষিপ্ত। নারী-পুরুষের মধ্যে কার উত্তরাধিকার কতটুকু, এর বিস্তারিত বিবরণ এতে ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আউসের স্ত্রী সন্তানদের নিকট এ মর্মে সংবাদ পাঠান যে, আল্লাহ তা'আলা দীর্ঘ দিনের জুলুমের অবসান ঘটিয়েছেন। তবে কার উত্তরাধিকার কতটুকু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তিনি অবশ্যই পাঠাবেন। এর পূর্বে তোমরা আউসের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হেফাজত করে রাখবে।

উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরই অনুরূপ আরেকটি ঘটনা সংঘটিত হয়। যা আলোচ্য অনুচ্ছেদের বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তৃতীয় হিজরীতে যখন উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন সেই যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে রবী বারটি জখম খেয়ে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত সা'দ ছিলেন বনু খাযরাজ গোত্রের একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সা'দ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি তাঁর দু'জন বিবাহযোগ্য কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি এ দু' কন্যার চাচা অর্থাৎ সা'দের ভাই দখল করে নিয়েছে। এখন তাদের বিয়ের সমস্যা দেখা দিয়েছে। যার সমাধান সম্পদ ছাড়া সম্ভব নয়।

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। তারপরই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত চূড়ান্ত আইনসম্বলিত আয়াত নাযিল হয়,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (إلى آخر الركوع)

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান, অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু' এর অধিক, তবে তাদের জন্য ওই সম্পদের তিন ভাগের দু'ভাগ যা ত্যাগ করে মরে...। (সূরা নিসা ১১, ১২)

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক উক্ত বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দুই মেয়ের চাচাকে ডেকে বললেন, সা'দের দুই মেয়েকে দুই তৃতীয়াংশ এবং কন্যাদ্বয়ের মাকে অষ্টমাংশ দিয়ে দাও। তারপর অবশিষ্ট যা থাকবে তা হবে তোমার। (মা'আরিফুল কুরআন খণ্ড ২, এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদ অবলম্বনে)

মাস'আলা ঃ

✪ স্ত্রীর অংশ ঃ তার দু' অবস্থা। (ক) স্বামীর সন্তানাদি না থাকলে স্ত্রী একজন হোক কিংবা একাধিক, তারা চারভাগের এক ভাগ পাবে। (খ) যদি সন্তান সন্তুতি থাকে তাহলে স্ত্রী পাবে আট ভাগের এক ভাগ।

✪ প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর 'মহর' পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতই মোট পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে 'মহর' পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

'মহর' দেওয়ার পর স্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে অংশীদার হওয়ার দরুন সে অংশ ও নিবে। 'মহর' পরিশোধ করতে

গিয়ে যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি 'মহর' বাবদ স্ত্রীকে সম্পূর্ণ করা হবে এবং কোনও ওয়ারিসই কিছুই পাবে না। (মা'আরিফুল কুরআন- ২.)

কন্যার তিন অংশ ঃ কন্যার তিন অবস্থা। (ক) একজন হলে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। (খ) একের অধিক হলে তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে। (গ) কন্যার সাথে পুত্র থাকলে কন্যা পাবে পুত্রের অর্ধেক। (সিরাজী)

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْاِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ص۲۹

অনুচ্ছেদ ঃ ৪. ঔরসজাত কন্যার সাথে পৌত্রীর মীরাস

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيْ قَيْسٍ الْاَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى أَبِيْ مُوْسٰى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْاِبْنَةِ وَابْنَةِ الْاِبْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؟ فَقَالَ : لِلْاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ وَقَالَا لَهُ : اِنْطَلِقْ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ، فَأَتٰى عَبْدَ اللّٰهِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ، قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ، وَلٰكِنْ اَقْضِيْ فِيْهِمَا كَمَا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ ـ قَالَ أَبُوْعِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَأَبُوْ قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ اِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَرْوَانَ الْكُوْفِيُّ- وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ قَيْسٍ ـ

৪. হাসান ইবনে আরাফা রহ...... হুযাইল ইবনে শুরাহবীল রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবূ মূসা ও সালমান ইবনে রাবী'আ রাযি. এর নিকট এল এবং তাঁদেরকে কন্যা, পৌত্রী এবং আপন ভগ্নীর মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তারা বললেন, কন্যার হল অর্ধেক আর অবশিষ্টাংশ হল আপন ভগ্নির। তাঁরা তাকে আরও বললেন, আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-এর নিকট যাও এবং তাকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনিও আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। লোকটি আব্দুল্লাহ রাযি. এর নিকট গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করল এবং তারা যে উত্তর দিয়েছিলেন, তাও তাঁকে অবহিত করল।

আব্দুল্লাহ রাযি. বললেন, তাঁদের মতানুসারে মত দিলে আমিও তো পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারব না। তবে এ বিষয়ে আমি সেরূপ সিদ্ধান্তই দিব, যেরূপ সিদ্ধান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে কন্যা পাবে অর্ধেক আর দুই তৃতীয়াংশের পরিমান পূরনার্থে পৌত্রী পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, অবশিষ্টাংশ হল ভগ্নির।এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। রাবী আবু কায়স আওদী রহ. এর নাম হল আবদুর রহমান ইবনে সারওয়ান কূফী। শু'বা রহ. ও হাদীসটি আবূ কায়স রহ. এর বরাতে রিওয়ায়েত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের বিষয়বস্তু ঃ হযরত আবু মূসা আল আশ'আরী রাযি. (তখন তিনি উসমান রাযি, এর পক্ষ থেকে কূফার আমীর ছিলেন) এর নিকট এবং সুলাইমান ইবনু বারী'আ (তখন তিনি কূফার বিচারক ছিলেন) এর নিকট এক ব্যক্তি আসল। তারপর তাঁদের উভয়ের নিকট ফারায়েযের একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল, মাসআলাটি হল, এক ব্যক্তি মারা গেল। মৃত ব্যক্তির রয়েছে একটি কন্যা সন্তান ছেলের ঘরের একটি নাতনি এবং একজন হাকীকী (সহোদরা) বোন। এখন এদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করা হবে ? তারা উভয়ে ফয়সালা

করে দিলেন ঃ 'কন্যা সন্তান পাবে إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ الاية এর আলোকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর অবশিষ্ট অর্ধেক হাকীকী বোন পাবে। ছেলের ঘরের নাতনি কিছুই পাবে না।' সাথে সাথে তাঁরা ঐ ব্যক্তিকে বললেন, প্রয়োজনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রাযি. কাছে যেতে পারো, তিনিও এই ফয়সালাই করবেন। ঐ ব্যক্তি তাঁদের কথা মতো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর নিকট গেলেন এবং তাদের দুজনার প্রদানকৃত ফয়সালা শুনালেন। এ শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বললেন– قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ অর্থাৎ 'আমিও যদি আবু মূসা ও সুলাইমানের মত ফতওয়া দেই, তাহলে আমি গোমরাহ হয়ে যাবে।' একথা বলে তিনি ফতওয়া দিলেন, অর্ধেক সম্পত্তি পাবে কন্যা সন্তান এবং ছয় ভাগের এক ভাগ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ হিসাবে নাতনি পাবে। অবশিষ্ট তিনভাগের এক ভাগ পাবে বোন।

تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ এর মর্ম কি ? এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ 'কন্যা একজন হলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পায় আর একের অধিক হল। তিন ভাগের দু'ভাগ পায়।' উক্ত মাসআলাতে যেহেতু কন্যা ছিল একজন, তাই তাকে অর্ধেক দেওয়া হল। পক্ষান্তরে ছেলের ঘরের নাতনিও কন্যা হিসাবেই বিবেচ্য, তবে একটু দূরতম। তাই কন্যাকে অর্ধেক দেওয়ার পর তিনভাগের দু' ভাগের মধ্যে যে ছয় ভাগের এক ভাগ রয়ে গেছে, সেটা দূরতম কন্যা অর্থাৎ নাতনিকে দেওয়া হয়েছে। যেন সব ধরনের মেয়েদের অংশ তিনভাগের দু'ভাগ পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং উভয় প্রকার আয়াতের উপর আমল হয়ে যায়। এটা تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ এর মর্মার্থ। (আদ দুরুসুল মানযূদ)

মাসআলা ঃ

নাতনীর অংশ ঃ তার ছয় অবস্থা। (ক) যদি মৃতের কন্যা কেউ না থাকে, শুধু এক নাতনি থাকে, তাহলে নাতনি পাবে সম্পত্তির অর্ধেক। (খ) যদি পুত্রকন্যা না থাকে আর একাধিক নাতনি থাকে, তবে তারা সকলে মিলে তিনভাগের দু'ভাগ পাবে। (গ) যদি মৃত ব্যক্তির একটি কন্যা থাকে, তাহলে নাতনি একজন থাকুক বা একাধিক, তারা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। (ঘ) যদি মৃতের একাধিক কন্যা থাকে, তাহলে নাতনি কিছুই পাবে না। (ঙ) তবে যদি মৃতের কোন পৌত্র (নাতি) বা প্রপৌত্র (নাতির ছেলে) অধঃস্তন পুরুষ থাকে, তাহলে নাতিরা তাদের সাথে আছাবা হবে এবং পৌত্র পৌত্রি এরা সকলে মিলে কন্যাদের তিন ভাগের দু'ভাগ দেওয়ার পর যে এক তৃতীয়াংশ থাকবে, তা পাবে। আর নাতনি নাতির অর্ধেক পাবে উপরোল্লিখিত কারণে। (চ) মৃত ব্যক্তির পুত্র থাকলে নাতনিরা কিছুই পাবে না, তার কন্যারা পাবে। (সিরাজী)

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ص۲۹

অনুচ্ছেদ ঃ ৫. সহোদর ভ্রাতাদের মীরাস

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ اَلرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهٖ دُوْنَ أَخِيْهِ لِأَبِيْهِ .

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهٖ .

৫. বুনদার রহ. .... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে থাক যে, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (এই বণ্টনের বিধান হল) তোমরা যা ওয়াসিয়ত করবে তা প্রদানের পর বা ঋণ পরিশোধের পর। (সূরা নিসা ৪ঃ ১২) রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াসীয়ত প্রদানের পূর্বে ঋণ পরিশোধের ফায়সালা দিয়েছেন। কেবল বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভ্রাতাগণের আগে সহোদর ভ্রাতাগণ মীরাস পাবে। একজন সহোদর ভাই বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পূর্বে ওয়ারিস হয়।

৬. বুনদার রহ. .... আলী রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَضٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ. قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحٰرِثِ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

৭. ইবনে আবূ উমর রাযি. .... আলী রাযি. থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা দিয়েছেন যে, বাপ শরীক বা মা শরীক ভাইরা নয় বরং বাপ ও মা শরীক আপন ভাইরা ওয়ারিস হবে।

আবূ ইসহাক – হারিস– আলী রাযি. সূত্র ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবহিত নই। হারিছের ব্যাপারে কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ সমালোচনা করেছেন। এ হাদীস অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اَلْمُرَادُ مِنْ أَعْيَانِ بَنِي الْأُمِّ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَاحِدٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنِ الشَّيْءِ وَهُوَ النَّفِيسُ مِنْهُ.

অর্থাৎ أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ দ্বারা উদ্দেশ্য একই পিতা এবং একই মাতার ঔরসজাত ভাই-বোন। عَيْنُ الشَّيْءِ বস্তুর উৎকৃষ্ট অংশকে বলা হয়। সেখান থেকে উক্ত শব্দ উৎকলিত তথা আপন ভাই বোন।

بَنُو الْعَلَّاتِ ঃ অর্থাৎ একই পিতার ঔরসজাত বিভিন্ন মায়ের সন্তান। তথা সৎ ভাই বোন।

اَلرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ الخ ঃ এই বাক্যটি তার পূর্ববর্তী বাক্য وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ الخ এর تَاكِيد হিসাবে এসেছে।

হাদীসে উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থ ঃ

আলোচ্য হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থ হল, মৃত ব্যক্তির অছিয়ত এবং ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি শরী'আত সম্মত ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। বাহ্যতঃ আয়াতের মধ্যে অসিয়তের বিষয়টি ঋণ আদায় এর পূর্বে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম ঋণ আদায়ের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং অসিয়তের বিধানকে তার পরে রেখেছেন। হযরত আলী রাযি. মূলতঃ মানুষকে এর প্রতি ইংগিত করেই প্রশ্ন করেছেন, তোমরা আয়াতটি তো তিলাওয়াত কর, কিন্তু তার মর্মার্থ বুঝেছ কিনা ? অর্থাৎ এ প্রশ্নের মাধ্যমে আলী রাযি. বুঝাতে চেয়েছেন, শব্দ হিসাবে যদিও অসিয়তের বিধান ঋণ আদায়ের বিধানের পূর্বে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নবীজী ﷺ এর আমল থেকে বুঝা যায়, সর্বপ্রথম ঋণ আদায় করতে হবে এবং তারপর অবশিষ্ট অংশে অছিয়ত কার্যকর হবে। সর্বশেষ ওয়ারিসদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা হবে। বাকি কথা হল, আয়াতে অসিয়তের কথা আগে আনা হয়েছে মানুষকে সতর্ক করার জন্য। কেননা, মানুষ সাধারণতঃ অছিয়ত কার্যকর করতে চায় না। মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব দিলেও তার অসীয়তের গুরুত্ব সাধারণতঃ দেওয়া হয় না। তাই অসিয়তের কথা আগে বলা হয়েছে, যেন মানুষ সতর্ক হয়ে যায়।

সম্পদ বণ্টনের পূর্বে করণীয়

শরী'আতের নীতি হল, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরী'আত অনুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপনতা উভয়টিই নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ সম্পত্তির সমপরিমাণ কিংবা তারও বেশী হয়, তবে কেউ ওয়ারিসী স্বত্ত্ব পাবে না। কোনও অছিয়তও কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন অছিয়ত করে থাকলে এবং তার গুনাহর অছিয়ত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি অছিয়ত করে যায় তবুও একতৃতীয়াংশের অধিক কার্যকর হবে না। এমনটি কর সমীচীন নয় এবং ওয়ারিসদের বঞ্চিত করার নিয়তে অছিয়ত করা গুনাহও বটে।

ঋণ পরিশোধের পর একতৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে অছিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরী'আত সম্মত ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। অছিয়ত না থাকলে ঋণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। (মা'আরিফুল কুরআন ঃ ২)

بَابُ مِيرَاثِ الْبَنِينَ مَعَ الْبَنَاتِ صـ٢٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৬. মেয়েদের সাথে ছেলেদের মীরাস

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِى قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: جَاءَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِى وَأَنَا مَرِيْضٌ فِى بَنِى سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا نَبِىَّ اللّٰهِ كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِى بَيْنَ وَلَدِى ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا فَنَزَلَتْ : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِى أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) اَلْآيَةَ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ـ

৮. আবদ ইবনে হুমায়দ রহ. .... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। আমি তখন অসুস্থ অবস্থায় বানূ সালমা গোত্রে ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার সন্তানদের মাঝে আমার সম্পদ কিভাবে বণ্টন করব ?

তিনি কোন জবাব দিলেন না। তখন আয়াত নাযিল হল,

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِى أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .....

আল্লাহ তোমার সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান (৪ঃ১১)।

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনে উবায়দা প্রমুখ রহ. এটিকে মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির–জাবির রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِى أَوْلَادِكُمْ الخ ঃ এ হাদীসটির সাথে সামনের হাদীসটির বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জাবির রাযি. উক্ত ঘটনা পরিপেক্ষিতে يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِى أَوْلَادِكُمْ الخ নাযিল হয়েছে। অথচ পরবর্তী অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ الخ নাযিল হয়।

এর উত্তরে আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রহ. বলেনঃ মূলতঃ হযরত জাবির রাযি. শুধুমাত্র এতটুকু বলেছিলেন যে, حَتّٰى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ তিনি মীরাসের আয়াত কোনটি অবতীর্ণ হয়েছে, সেটা বলেননি। পরবর্তীতে বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ এবং আমর ইবনে আবী কায়েস মন্তব্য করেন যে, ঐ আয়াতটি হল–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ أَوْلَادِكُمْ الخ পক্ষান্তরে সুফিয়ান 'উয়াইনা মন্তব্য করেন,

উক্ত আয়াতটি হল– يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ الخ সুতরাং এ বিরোধ হযরত জাবির রাযি. এর পক্ষ থেকে হয় নি বরং বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে হয়েছে।

হযরত তাকী উসমানী বলেন, আমার নিকট এটা স্পষ্ট যে, হযরত জাবির রাযি. এর ঘটনায় يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ الخ এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। প্রথমোক্ত আয়াতের বর্ণনা সম্ভাব্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে। অথবা বলা হবে, এ ঘটনাতে প্রথমোক্ত আয়াত تَوَسُّعًا তথা ব্যাপকতার আলোকে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এ আয়াতেও كَلَالَةً এর কথা এসেছে। (তাকমিলাহ ঃ ২)

পুরুষের তুলনায় নারীর অংশ অর্ধেক হওয়ার কারণ

وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ঃ এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, পুরুষের তুলনায় নারীর অংশ কম করে ইসলাম নারীর প্রতি সাম্যের ব্যবহার করেনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি এমন নয়। কারণ, ইসলামী বিধান মতে পরিবার চালানোর দায়িত্ব পুরুষের, নারীর নয়। নারীকে এ কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। পারিবারিক ব্যয়ভারের যাবতীয় দায়িত্ব যেহেতু পুরুষের জিম্মায়, তাই পুরুষকে নারীর তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া একজন নারীকে মোট চারটি দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করা যায়– মা, কন্যা, বোন ও স্ত্রী। মা হলে মায়ের খেদমতের দায়িত্ব সন্তানের ওপর। কন্যা হলে তাকে শিক্ষা-দীক্ষাসহ বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত যাবতীয় দায়িত্ব পিতার ওপর। বোন হলে তাকে প্রতিপালন ও দেখা-শুনার দায়িত্ব ভাইয়ের ওপর। স্ত্রী হলে তার যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর। সুতরাং একজন নারীর সম্পদের প্রয়োজনই বা কিসের ? তবুও ইসলাম নারীকে এ পরিমাণ অংশ দিয়েছে, যাতে সে দান-সদকা বা তার ইচ্ছা মত ব্যয়ের ব্যাপারে কারও মুখাপেক্ষী হতে না হয় এবং নিজ হাত খরচের জন্য মিল-কারখানা, অফিস-আদালত ও গার্মেন্টসে গিয়ে চরিত্র নষ্ট করতে না হয়।

উপরন্তু অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, নারীদের অংশ পুরুষদের তুলনায় কম নয়। যেমন নারী কন্যা হওয়ার কারণে পিতার সম্পত্তি থেকে পাবে এক ভাগ। আর তার স্বামী থেকে পাবে দু'ভাগ। এখন নিজের এক ভাগ এবং স্বামীর দু'ভাগ মোট তিন ভাগের মালিক। কেননা স্বামীর সম্পত্তি তো স্ত্রীর সম্পত্তিও বটে। আবার স্বামী থেকে সে তার নিজস্ব 'মহর' পায়। মোটকথা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কম দেখা গেলেও নারীর অংশ পুরুষের তুলনায় কম নয়।

بَابُ مِيْرَاثِ الْأَخَوَاتِ صـ٢٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৭. বোনদের মীরাস

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : مَرِضْتُ فَأَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ فَوَجَدَنِيْ قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَأَتٰى وَمَعَهُ أَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ ؟ أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِيْ مَالِيْ ؟ فَلَمْ يُجِبْنِيْ شَيْئًا وَكَانَ لَهُ تِسْعُ أَخَوَاتٍ حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ: (يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) اَلْاٰيَةُ قَالَ جَابِرٌ فِيَّ نَزَلَتْ ـ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

৯. ফাযল ইবনে সাববাহ বাগদাদী রহ. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। তিনি এসে আমাকে বেহুঁশ অবস্থায় পেলেন। তাঁর সঙ্গে আবু বকরও এসেছিলেন। তাঁরা উভয়ে পায়ে হেঁটেই এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অযূ করলেন এবং তাঁর অযূর পানি আমার উপর ঢেলে দিলেন। আমার হুঁশ ফিরে এল। বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সম্পদ আমি কি করব ? তিনি কোন জবাব দিলেন না। জাবির রাযি. এর নয় বোন ছিল। শেষে মীরাসের এ আয়াত নাযিল হল–

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلْ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ...... الخ

লোকজন তোমার কাছে ব্যবস্থা জানতে চায়। বল পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে .... (৪/১৭৬)।

জাবির রাযি. বলেন, এ আয়াতটি আমার বিষয়েই নাযিল হয়েছিল। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কালালা –এর পরিচয়

فَأُغْمِيَ عَلَيَّ ঃ ء এর উপর পেশ, মাজহূল। বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। আল্লামা আ'ইনী রহ. إِغْمَاء এবং غَشْي এর মাঝে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন, غَشْي হল, এমন একটি ব্যাধি যা দীর্ঘ ক্লান্তির পর হয়ে থাকে। এটি إِغْمَاء এর তুলনায় আরো লঘু ধরনের। إِغْمَاء ও جُنُوْن ও نَوْم এর মধ্যেও পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে বিবেক পরাস্ত হয়ে থাকে। তৃতীয়টিতে বিবেক সম্পূর্ণ তুলে নেওয়া হয়। আর দ্বিতীয়টিতে বিবেক লুকানো থাকে।

فَصَبَّ عَلَيَّ ঃ এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেককারদের নিদর্শনাবলী দ্বারা বরকত লাভ করা এবং তার দ্বারা শেফা কামনা করা জায়েয আছে

مِنْ وَضُوْءِهٖ ঃ وَاو এর উপর যবর। হতে পারে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে পানি দ্বারা অযূ করেছেন, তার কিছু অংশ আমার প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। অথবা অযূর পর যে পানি অবশিষ্ট ছিল, তার কিছু অংশ আমার প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। হাফিজ আসকালানী রহ. মতে এখানে প্রথমটি উদ্দেশ্য। (তুহফা ঃ ৬/২২৮)

كَلَالَه এর অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী এগুলো স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। যথা–

১. প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হল– مَنْ لَا وَالِدَ لَهٗ وَلَا وَلَدَ অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কেউ নেই, সে-ই 'কালালা'।

২. কেউ কেউ বলেন, مَنْ لَاوَالِدَ لَهُ فَقَطْ অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন কেউ নেই। এই ধরনের উক্তি হযরত উমর রাযি. থেকেও পাওয়া যায়।

৩. কারও কারও অভিমত হল مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ فَقَطْ অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র অধঃস্তন কেউ নেই।

৪. রুহুল মা'আনীর গ্রন্থকার লিখেন, كَلَالَهُ শব্দটি মূলতঃ মাসদার। এর অর্থ পরিশ্রান্ত হওয়া, যা দুর্বলতার পরিচায়ক. পিতা-পুত্রের আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য আত্মীয়তাকে كَلَالَهُ বলা হয়েছে। কেননা এ আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল। এখানে كَلَالَهُ এর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাটিই উদ্দেশ্য।

সারকথা হল, বাপ-দাদা ও সন্তান ছাড়া যে ব্যক্তি (মহিলা কিংবা পুরুষ) মারা যায় এবং ওয়ারিস হিসাবে ভাই কিংবা বোন অথবা উভয়কেই রেখে যায়, সেই كَلَالَهُ। (রুহুল মা'আনী, ফাওয়ায়েদে উসমানী)

كَلَالَهُ এর মীরাছ বণ্টন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

كَلَالَةً এর ভাই বোন দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। ১. أَخْيَافِى তথা শুধু মা-শরীক (বৈপিতৃয়) ভাই-বোন আছে। ২. حَقِيْقِىُّ তথা সহোদর ভাই-বোন অথবা عَلَّاتِىْ তথা বাপ-শরীক (বৈপিতৃয় ভাই-বোন আছে।

প্রথম প্রকার তথা বৈপিতৃয় ভাই-বোন একজন হলে যেমন দুই ভাই-বোন অথবা দুই ভাই কিংবা দুই বোন হলে মৃতব্যক্তির যাবতীয় সম্পদের ثُلُثُ অর্থাৎ তিন ভাগের একভাগ পাবে। এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সমান। আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, শুধু একটি স্থান ছাড়া পুরুষ ও নারী মীরাছের ক্ষেত্রে সমান অংশীদার হয় না। সেটি হল, كَلَالَهُ এর ক্ষেত্রে বৈপিতৃয় ভাই-বোন।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, সহোদর অথবা বৈমাতৃয় ভাই-বোনের হুকুম হল, ভাই হলে সমুদয় অর্থের মালিক হবে আর বোন কলে অর্ধেক সম্পদের মালিক হবে। দুই অথবা দুইয়ের অধিক বোন হলে ثُلُثَانِ তথঅ দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক হবে। ভাই-বোন একাধিক হলে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ এর নিয়ম অনুযায়ী ভাই বোনের দ্বিগুণ মীরাছ পাবে। (তাকমিলাহ)

بَابٌ فِى مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ ص ٣٠

অনুচ্ছেদ ঃ ৮. আসাবার মীরাস

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوٰى بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ـ

১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত নবী কারীম ﷺ বলেছেন, যাদের ফারাইয আছে তা তাদেরকে দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতর পুরুষ আত্মীয়গণ পাবে। আবদ ইবনে হুমায়দ রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি হাসান। কেউ কেউ এটিকে ইবনে তাউস তার পিতা তাউস নবী কারীম ﷺ সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْعَصَبَةُ ঃ শব্দটি عَصَبٌ এর বহুবচন। এর আরেকটি বহুবচন হল, عَصَبَاتٌ এর ক্রিয়ামূল হল, عَصُوبَةٌ এর অর্থ হল, মেরুদন্ড, মাংশপেশী। ইসলামী পরিভাষায় মৃতের রক্তসম্পর্কীয় সেসব আত্মীয়-স্বজন যারা ذَوِى الْفُرُوْضِ এর অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশের হকদার হয়। عَصَبَة চার প্রকার। ১. আসাবা বিনাফসিহী। ২. আসাবা বিগাইরিহী। ৩. আসাবা সাবাবিয়্যাহ। ৪. আসাবা মা'গাইরিহী।

বলা বাহুল্য যে, ওয়ারিসদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন হবে নিম্ন পদ্ধতিতে অর্থাৎ সর্বপ্রথম ذَوِى الْفُرُوْضِ অর্থাৎ, যাদের অংশ কুরআনে নির্ধারিত আছে তাদের কে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের হকদার হল اَلْعَصَبَاتُ অর্থাৎ, মাইয়্যেতের নর-আত্মীয়গণ, যাদের অংশ কুরআনে নির্ধারিত নেই এবং ذَوِى الْاَرْحَام তথা নিকটাত্মীয়-স্বজন। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি শরী'আতসম্মতভাবে ذَوِى الْفُرُوْضِ যারা তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এরপর যদি সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তাহলে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় দুই শ্রেণীকে দেওয়া হবে।

আ'সাবার উত্তরাধির সত্ত্বের ব্যাপারে মৌলিক হাদীস ঃ

এ হাদীসটি আ'সবার উত্তরধিকারী হওয়ার ব্যাপারে মৌলিক হাদীসটির উদ্দেশ্যে হল, ذَوِى الْفُرُوْضِ এর নির্ধারিত অংশ নেওয়ার পর যা অবিশিষ্ট থাকবে সেগুলো عَصَبَة হিসাবে ঐ পুরুষের ভাগে পড়বে যে মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী। হাদীসে اَوْلٰى শব্দের মূল হল, وَلْى (بِسُكُوْنِ اللَّامِ) اَىِ الْقُرْب সুতরাং اَوْلٰى এর অর্থ اَقْرَبُ অর্থাৎ, অধিক নিকটবর্তী। আর ফারায়েযের নিয়মানুযায়ী اَقْرَبُ থাকা অবস্থায় اَبْعَدُ মীরাছ পায় না। এদেরকে عَصَبَه بِنَفْسِه বলা হয়। অর্থাৎ ঐ পুরুষ যাকে মৃতব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে কোন মহিলার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এভাবে যে, মৃতব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তির মাঝখানে কোন وَاسِطَه বা মাধ্যম নেই। যেমন পিতাপুত্র। অথবা মাধ্যম আছে, তবে মাধ্যমটি মহিলা না। যেমন اِبْنُ الْاِبْنِ তথা ছেলের ঘরের নাতি।

উল্লেখ্য, عَصَبَه بِنَفْسِه হওয়ার اَسْبَاب চারটি।

১. بِلَا وَاسِطَة بُنُوَّت অর্থাৎ সন্তানের মাধ্যম ছাড়া। যেমন ছেলে অথবা بِوَاسِطَة بُنُوَّت সন্তানের মাধ্যমে যেমন নাতি।

২. بِلَاوَاسِطَة اُبُوَّت তথা পিতৃত্বের মাধ্যম ছাড়া عَصَبَة যেমন পিতা অথবা بِوَاسِطَه اُبُوَّت তথা পিতৃত্বের মাধ্যমে عَصَبَه যেমন দাদা, পর দাদা।

৩. ভাই-বেরাদার এবং তাদের শাখা।

৪. চাচা এবং তাদের শাখা।

উল্লেখিত চার প্রকার اَسْبَاب এর মধ্যে সর্বাগ্রে بُنُوَّت তথা ছেলে। অতঃপর اُبُوَّت তথা পিতৃত্ব, অতঃপর اُخُوَّت তথা ভাই-বেরাদার এবং সর্বশেষ عُمُوْمَت তথা চাচা ও তাদের শাখা عَصَبَه হিসাবে স্থান পাবে। কেননা عَصَبَه এর মধ্যে যারা মৃতব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী তারা অন্যের উপর প্রাধান্য পায় এবং নিকটবর্তীতের উপস্থিতিতে দূরবর্তী আ'সবারা মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়।

যেমন, ছেলে মৃতব্যক্তির সবচেয়ে নিকটে। সুতরাং ছেলে জীবিত থাকলে মৃতব্যক্তির নাতি, পরনাতি, ভাই, চাচা, বাপ, দাদা কেউই আ'সাবা হতে পারবে না। ছেলে জীবিত না থাকলে নাতি, নাতি না থাকলে পরনাতি আ'সবা হবে। এভাবে নিচের দিকে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। মৃতব্যক্তির ঔরসজাত কেউই না থাকলে পিতা আ'সাবা হবে। এভাবে উপরে দিকে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে।

মৃতব্যক্তির বাপ-দাদা অথবা উপরের কেউ জীবিত না থাকলে ভাই আ'সাবা হবে। ভাই না থাকলে ভাইয়ের পুত্রসন্তান (ভাতিজা) আ'সাবা হবে। ভাতিজা না থাকলে চাচা এবং চাচা না থাকলে চাচাত ভাই আ'সাবা হবে।

সারকথা মৃতব্যক্তির যে যত নিকটবর্তী হবে মীরাছ পাওয়ার ক্ষেত্রে সে তত হকদার হবে। হাদীসে উল্লেখিত- فَمَابَقِىَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ঃ رَجُلٌ তো পুরুষই হয়, এদসত্ত্বেও ذَكَرٍ শব্দকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হল কেন ?

উত্তর ঃ رَجُل শব্দ কোন সময় شَخْص (ব্যক্তি) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই শামিল তাই স্পষ্টতা দূর করার জন্য ذَكَر শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এর দ্বারা সুক্ষ্মভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে হকদার হওয়ার কারণ হল, مُذَكَّر হওয়া। অতএব কোন মহিলা عَصَبَه بِنَفْسِه হতে পারবে না।

মনে রাখতে হবে যে, আ'সাবার আরো দুটি শ্রেণী রয়েছে। (১) . عَصَبَه بِغَيْرِه (২) عَصَبَه مَعَ غَيْرِه এরা সাধারণত মেয়েদের থেকেই হয়ে থাকে।

عَصَبَه بِغَيْرِه বলা হয় ঐ মহিলাকে যে নিজে আ'সাবা হওয়ার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী এবং সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেও আ'সাবা হয়ে ঐ মহিলার সঙ্গে শরীক হবে।

চার শ্রেণীর মহিলা এরূপ আ]সাবা হয়ে থাকে।(১) মৃতব্যক্তির কন্যা, (২) নাতনি,(৩) সহোদর বোন। (৪) عَلَّاتِى (বৈমাতৃয়) বোন। এরা নিজেদের ভাইয়ের সাথে মিলে আ'সাবা হয় এবং لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ হিসাবে মীরাছ পায়।

عَصَبَه مَعَ غَيْرِه হল, ঐ মহিলা যে নিজে আ'সাবা হওয়ার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখাপেক্ষী কিন্তু ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি এই মহিলার সাথে আ'সাবা হিসাবে শরীক হবে না। এরা জহল, মৃতব্যক্তির حَقِيْقِى (সহোদর) এবং عَلَّاتِى (বৈমাতৃয়) বোন। এদের সঙ্গে ভাই না থাকা অবস্থায় মৃতব্যক্তির কন্যা অথবা নাতনির সহায়তায় আ'সাবা হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, اِجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً অর্থাৎ মৃতব্যক্তির কন্যা-সন্তানের উপস্থিতিতে বোনদেরকে আ'সাবা বানাও। কিন্তু এক্ষেত্রে কন্যা অথবা নাতনিরা আ'সাবা হবে না বরং اَصْحَابُ الْفَرَائِض হিসাবে নিজেদের অংশ পাবে। অবশিষ্ট সম্পদ বোনেরা পাবে। সুতরাং হাদীসের মধ্যে যে عَصَبَه بِنَفْسِه বুঝানোর জন্য ذَكَر শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, এরাই প্রকৃত আ'সাবা। আর রাফি দুই প্রকার আ'সাবা রূপক অর্থে, হাকীকী অর্থে নয়। এরা অন্যান্য نَص দ্বারা মীরাছ লাভ করে, উক্ত نَص (হাদীস) দ্বারা নয়।

ইয়াতিম নাতির মিরাছ

হাদীসে বর্ণিত فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "যে মৃতব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী সে তত বেশী হকদার।" তথা اَقْرَب থাকাকালে اَبْعَد মীরাছ পাবে না। (اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ) নির্দেশটি একথার সুস্পষ্ট দলীল যে, পিতা জীবিত থাকে তাহলে ইয়াতিম নাতি-নাতনি মীরাছ পাবে না। কেননা অন্যান্য ছেলেরা اَوْلَى رَجُل তথা اَقْرَبُ সুতরাং তারা সমুদয় সম্পদ নিয়ে নিবে। আর নাতি-নাতনি اَبْعَدُ হওয়ার কারণে সম্পূর্ণভাবে মাহরূম হবে।

এ মাস'আলার ব্যাপারে সবাই একমত, কোন ইখতিলাফ নেই। কিন্তু এখানে একটি সন্দেহ জাগে যে, শরী'আত নাতিকে ধন-সম্পদ থেকে এভাবে বঞ্চিত করতে পারল কিভাবে ? অথচ এ শুশুই অর্থাৎ নাতি অনুগ্রহ পাওয়ার বেশী হকদার ?

এ সন্দেহ নিরসনে আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. 'আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল' নামক কিতাবে লিখেছেন, এখানে দু'টি নীতিমালা মনে রাখতে হবে।

(১) মীরাছের ভিত্তি قَرَابَت এর উপর। কোন ওয়ারিস মালদার হওয়া না হওয়া কিংবা অনুগ্রহের পাত্র হওয়া না হওয়ার উপর ভিত্তি নয়।

(২) শরঈ ও আকলী দৃষ্টিকোণে মীরাছের ক্ষেত্রে اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ এর বিধান প্রযোজ্য। যার অর্থ হচ্ছে, মৃতব্যক্তির নিকটবর্তী আত্মীয় থাকাকালীন দূরাত্মীয় মীরাছ পাবে না।

এ দু'টি উসূলকে সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন ব্যক্তির যদি চারজন পুত্র সন্তান থাকে এবং প্রত্যেকের আবার চারজন করে ছেলে থাকে তাহলে মীরাছ ঐ ছেলেরাই পাবে, নাতিরা পাবে না। আমার ধারণা এই মাসআলায় কেউ মতানৈক্য করবেন না। এর দ্বারা বুঝা গেল, ছেলের উপস্থিতিতে নাতি-নাতনি মীরাছ পাবে না। এখন ধরে নেওয়া যাক, পিতা জীবিত থাকা অবস্থাতেই চার ছেলের একজন মারা গেল। উসূল মতে তথা اَلْاَقْرَبُ হিসাবে দাদার দৃষ্টিতে এ ছেলের চার সন্তান এবং অপর তিন ছেলের বার সন্তানের অবস্থান একই, কমবেশী হওয়ার কথা নয়। আর اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ এর উসূল মতে যেহেতু অপর নাতিরা দাদার মীরাছ পাবে না। সুতরাং মরহুম এই ছেলের পুত্ররাও মীরাছ না পাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত বিধান। একথা বলা ঠিক হবে না যে, মৃত এই ছেলে যদি জীবিত থাকত তাহলে তো এক চতুর্থাংশ মীরাছ লাভ করত। এই এক চদুর্থাংশ নাতিদের দিলে দোষ কি? একথা বলা ঠিক হবে না এজন্য যে, এক্ষেত্রে পিতার জীবদ্দশায় মৃত এই ছেলেকে পিতার মৃত্যুর পূর্বেই ওয়ারিস বানানো আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথবা যুক্তি ও শরী'আত তথা যে কোন আইন অনুযায়ীই مورث মারা যাওয়ার পূর্বে মীরাছ জারি হয় না।

সারকথা, যদি নাতিদেরকে (যাদের বাপ মারা গেছে) নাতি হওয়ার কারণে মীরাছ দেওয়া হয়। তবে তা এ কারণে ভুল যে, নাতিরা এমতাবস্থায় দাদার মীরাছ পাচ্ছে যে অবস্থায় মাইয়্যেতের সন্তান জীবিত নেই। তাছাড়া যদি তাদেরকে মীরাছ দেওয়া হয়, তাহলে অন্যান্য নাতিদেরকে ও দিতে হবে।

আর যদি তাদেরকে তাদের পিতার অংশ হিসাবে মীরাছ প্রদান করা হয়, তাহলে তা এ কারণে ভুল যে, তাদের পিতা মৃত্যুর আগে তো মীরাছের অধিকারীই হয়নি। (কারণ ঐ সময় তার পিতা জীবিত ছিল।) সুতরাং পিতা যে জিনিসের মালিক হয়নি, তারা কি করে সে জিনিসের মালিক হবে?

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, ইয়াতিম এই নাতি-নাতনিরা অনুগ্রহের পাত্র নয় কি? দাদার পরিত্যক্ত সম্পদ তা তাদের কিছু পাওয়া উচিত নয় কি?

আবেগমিশ্রিত এসব কথা বাতিল যে, মীরাছের ক্ষেত্রে কে অনুগ্রহের পাত্র। কে অনুগ্রহের পাত্র নয়– এ দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করা হয়না। মীরাছের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, قَرَابَتْ সুতরাং এর ভিত্তিতে মীরাছ লাভ হবে।

অন্যথায় ধনাঢ্য কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পোষ্য সন্তানাদি ওয়ারিস না হওয়ার কথা বরং গরীব নিঃস্ব পাড়া-প্রতিবেশীর ওয়ারিস হওয়ার কথা। কেননা তারাই যে অনুগ্রহ লাভের বেশী হকদার।

এছাড়া কোন ব্যক্তি ইয়াতিম নাতি-নাতনিকে যদি অনুগ্রহ করতে চায় তাহলে শরী'আত তো এর অনুমতি দিয়েই রেখেছে। মালের এক তৃতীয়াংশ ওদের জন্য অছিয়ত করে যাবে। এভাবে তাদের দুঃখ ঘোচানোর একটি সুন্দর ব্যবস্থা অবলম্বন করে যাবে। এভাবে তাদের দুঃখ ঘোচানোর একটি সুন্দর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। পিতা জীবিত থাকলে এরা এক চতুর্থাংশ লাভ করত, কিন্তু এই পন্থায় তো এক তৃতীয়াংশ চাচাগণের নৈতিক দায়িত্ব হল, ভাতিজা-ভাতিজীদেরকে অনুগ্রহ করে নিজেদের সঙ্গে শরীক করে নেওয়া।

নিষ্ঠুর দাদা যদি অছিয়ত না করে এবং আত্মপূজারী চাচারাও যদি অনুগ্রহ করে যদি না করে তাহলে বলুন, এখানে শরী'আতের কি করার আছে? শুধু আবেগের কথা দিয়ে তো শরী'আত চলে না।

আল্লামা লুধিয়ানভী উক্ত কিতাবের অন্যত্র (খণ্ড ঃ ৬,পৃষ্ঠা ৩৩৪) লিখেছেন, দাদা যদি নাতি-নাতনির উপর দয়া দেখতে চায় এবং নিজের সম্পদে তাদের অংশীদার করতে চায় তাহলে তার জন্য শরী'আত দু'টি পন্থা খোলা রেখেছে।

১. মৃত্যুর অপেক্ষা না করে সুস্থ থাকা অবস্থাতেই তাকে যতটুকু দেওয়ার ইচ্ছা করেছে, তা দিয়ে দিবে এবং নিজের জীবদ্দশাতেই তাদের দখলে দিয়ে দিবে।

২. মৃত্যুর আগে অছিয়ত করে যাবে, যাতে করে ইয়াতিম নাতিদেরকে নিজের রেখে যাওয়া এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ তাদেরকে দেওয়া হয়।

দাদা যদি ইয়াতিম নাতি-নাতনির উপর এতটুকু দয়া না দেখায়,, তাহলে কার দোষ? শরী'আতের বিধানের নাকি নিষ্ঠুর দাদার? এটাতো দাদার নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাবে। শরী'আতের অদূর দর্শিতা নয়।

(তাকমিলাহ, ইয়াহুল মুসলিম, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল)

بَابُ مَاجَاءَفِى مِيْرَاثِ الْجَدِّ ص ٣٠

অনুচ্ছেদ ঃ ৯. পিতামহের মীরাস

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْىٰ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ اِبْنِىَ مَاتَ فَمَالِىْ فِىْ مِيْرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ سُدُسٌ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ اُخَرُ ، فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ قَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ ـ

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ـ

১১. হাসান ইবনে আরাফা রহ. .... ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ এর কাছে এসে বলল, আমার এক পৌত্র মারা গেছে। তার মীরাস থেকে আমার কি কোন অংশ আছে ? তিনি বললেনঃ ছয় ভাগের এক ভাগ তোমার জন্য আছে। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমার আরও এক ষষ্ঠমাংশ রয়েছে। লোকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তিনি তাকে আবার ডাকলেন। বললেন, অপর ষষ্ঠমাংশটি হল তোমার জন্য অতিরিক্ত রিয্ক স্বরূপ। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এ বিষয়ে মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মূলতঃ দাদার প্রাপ্য অংশ হল, ছয় ভাগের এক ভাগ। আর এখানে পরবর্তী এক ষষ্টমাংশ আসাবা হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তাহলে সূরতে মাসআলা হবে, এক ব্যক্তি তার দাদা ও দুই মেয়ে রেখে মারা গেল। তাহলে দুই মেয়ে পাবে তিন ভাগের দু'ভাগ। আর অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশের এক ষষ্ঠমাংশ পাবে দাদা। সেই অংশ প্রথমে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যে একষষ্ঠমাংশ রয়ে গেছে সেটাও দ্বিতীয়বার তাকেই দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই এক তৃতীয়াংশ দেওয়া হয়নি এই জন্য যে, ঐ ব্যক্তি বুঝতে পারে, দাদার প্রাপ্য হল, একষষ্ঠমাংশ। এক তৃতীয়াংশ দাদার প্রাপ্য নয়।

بَابُ مَاجَاءَفِى مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ ص ٣٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১০. পিতামহীর মীরাস

حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ مَرَّةً : قَالَ قَبِيْصَةُ، وَقَالَ مَرَّةً رَجُلٌ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ أُمُّ الاُمِّ اُمُّ الأَبِ أَبِىْ بَكْرٍ، فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ اِبْنِىْ أَوْ اِبْنَ بِنْتِىْ مَاتَ وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِىْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقًّا ، فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ فِى الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ وَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى لَكِ بِشَيْئٍ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ: فَسَأَلَ فَشَهِدَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرٰى الَّتِىْ تُخَالِفُهَا إِلٰى عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ : وَزَادَنِىْ فِيْهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنِ

الزُّهْرِيِّ وَلٰكِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا ـ

১২. ইবনে আবূ উমর রহ. .... কাবীসা ইবনে যু'আয়ব রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জাদদা অর্থাৎ মাতামহী বা পিতামহী আবূ বাকর রাযি. এর কাছে এসে বললঃ আমার পৌত্র বআ দৌহিত্র মারা গেছে। আমি শুনেছি যে, আল্লাহর কিতাবে আমার জন্য তাতে হক দেওয়া হয়েছে।

আবূ বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর কিতাবে এ বিষয়ে তোমার কোন হক পাচ্ছি না আর তোমার পক্ষে কোন ফায়সালা দিতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু আমি শুনিনি। তবে আমি শীঘ্র সাহাবীগণের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। পরে মুগীরা ইবনে শু'বা সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ক্ষেত্রে এক ষষ্ঠমাংশ দিয়েছেন। আবূ বকর রাযি. বললেনঃ তোমার সঙ্গে আর কে এ বিষয়টি শুনেছেন ? মুগীরা রাযি. বললেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা। তখন আবু বকর রাযি. তাকে এক ষষ্ঠমাংশ প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এরপর এর বিপরীত অন্য এক জাদ্‌দা উমার রাযি. এর কাছে এল। তিনি তাকে বললেন, তোমরা যদি দুইজনও (একাধিক জন) এতে একত্রিত হও তবে ঐ পরিমাণই তোমাদের হবে। আর যদি একজন হয় তবু ঐ পরিমাণই তার হবে।

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ. حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا قَالَ: فَقَالَ لَهَا : مَالَكِ فِي كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ وَمَالَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتّٰى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرٰى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ: مَالَكِ فِي كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ وَلٰكِنْ هُوَذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا ـ

قَالَ أَبُو عِيسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَهٰذَا أَحْسَنُ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ـ

১৩. আনসারী রহ. .... কাবীসা ইবনে যু'আয়ব রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা জাদদা (পিতামহী বা মাতামহী) আবূ বকর রাযি. এর কাছে এসে তার মীরাস সম্পর্ক প্রশ্ন করল। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহর কিতাবে তোমার ব্যাপারে কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহে ও তোমার সম্পর্কে কিছু নেই, তুমি ফিরে যাও। আমি এ বিষয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করে নিব। এরপর তিনি এ বিষয়ে সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন। মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিসি তাকে এক ষষ্ঠমাংশ দিয়েছেন। আবূ বকর রাযি. বললেন, তোমার সঙ্গে আরও কেউ ছিল কি ?

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. উঠে দাঁড়ালেন এবং মুগীরা যেরূপ বললেন, তিনিও সেরূপ বক্তব্য রাখলেন। তখন আবু বকর রাযি. জাদ্‌দার ক্ষেত্রে এ বিধান জারী করে দিলেন। পরবর্তীতে অপর এক জাদ্‌দা 'উমার ইবনে খাত্তাব রাযি. এর কাছে এসে স্বীয় মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তখন বললেন, তোমার জন্য আল্লাহর কিতাবে কিছুই

নেই। তবে ঐ ষষ্ঠমাংশ রয়েছে, যদি তোমরা দুইজন একত্র হও তবে ততটুকুই তোমাদের দুই জনের মাঝে বণ্টিত হবে আর কেউ একা হলে তার জন্যও ঐ পরিমাণই হবে।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এটি ইবনে উয়ায়না রহ. এর রিওয়ায়াত থেকে অধিক সহীহ। এ বিষয়ে বুরায়দা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে جَدَّةٌ শব্দ দ্বারা দাদি এবং নানি উভয়ই উদ্দেশ্য। উভয়েরই উত্তরাধিকার এক ষষ্ঠমাংশ। যদি উভয়ের মধ্যে একজন জীবিত থাকে, তাহলে তিনি একাই এক ষষ্ঠমাংশ পাবেন। আর যদি উভয় জীবিত থাকেন, তাহলে একষষ্ঠমাংশ উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। আলোচ্য হাদীস দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয়।

উল্লেখ্য ذَوِى الْفُرُوْضِ তথা যাদের জন্য নির্ধারিত অংশ রয়েছে তারা দু' প্রকার। প্রথমতঃ সে সকল ذَوِى الْفُرُوْضِ যাদের উত্তরাধিকার অংশ কুরআন মজীদ কর্তৃক নির্ধারিত। দ্বিতীয়তঃ সে সকল ذَوِى الْفُرُوْضِ যাদের উত্তরাধিকার স্বত্ব কুরআন মজীদ কর্তৃক নির্ধারিত নয়। বরং হাদীস শরীফের মাধ্যমে সাব্যস্ত। দাদি এবং নানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ذَوِى الْفُرُوْضِ অন্তর্ভুক্ত। যা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে বুঝা যায়। কেননা এখানে বলা হয়েছে, কোন মৃত ব্যক্তির দাদি অথবা নানি হযরত আবু বকর রাযি. এর নিকট এসে নিজের মীরাসের দাবী করলে তিনি তখন উত্তর দিয়েছিলেন, مَالَكِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْئٌ অর্থাৎ কুরআন মজীদে তোমার উত্তরাধিকার অংশ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তবে কোনও হাদীসে তোমার অংশের কথা উল্লেখ আছে কিনা জানা নেই। আমি এ ব্যাপারে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখব। তারপর তিনি হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাযি. কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন, 'আমার সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম جَدَّة কে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন।' মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাও তার একথার সমর্থন জানালেন। এ দুই সাহাবীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে হযরত আবু বকর রাযি. جَدَّةٌ কে এক ষষ্ঠমাংশ তথা ছয়ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিলেন। তারপর হযরত উমর রাযি. এর যামানায় ঐ মৃত ব্যক্তির দ্বিতীয় جَدَّةٌ এসে উত্তরাধিকার দাবি করলেন। তখন হযরত উমর রাযি. ফয়সালা দিলেন, جَدَّة এর জন্য ছয়ভাগের এক ভাগ নির্ধারিত। যদি جَدَّةٌ একজন থাকে তাহলে একজনই পুরা এক ষষ্ঠমাংশ নিয়ে নিবে। একের অধিক থাকলে উক্ত এক ষষ্ঠমাংশ উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।

বলা বাহুল্য جَدَّة শব্দটি যেহেতু দাদি এবং নানি উভয়কেই বুঝায়, তাই হযরত আবু বকর রাযি. এর নিকট যে جَدَّة এসেছে, তিনি যদি নানি হন, তাহলে হযরত উমর রাযি. এর নিকট যে جدة এসেছেন, তিনি হবেন দাদি অথবা এর উল্টাটাও হতে পারে।

দাদির অংশ ঃ দাদির দু' অবস্থা। (ক) দাদি ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। যদি মৃতের মা-বাপ না থাকে। (খ) যদি মৃতের মা কিংবা বাপ থাকে, তাহলে দাদি কিছুই পাবে না।

নানির অংশ ঃ নানির দু অবস্থা। (ক) যদি মৃতের মা না থাকে, তাহলে নানি ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। নানি ও দাদি উভয়ে একসাথে থাকলে উভয়েই উক্ত ছয় ভাগের একভাগ পাবে এবং আপোষে ভাগ করে নিবে। (খ) মৃতের মা থাকলে নানি পাবে না। কিন্তু বাপ কিংবা দাদা থাকলে পাবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ مَعَ اِبْنِهَا ص ٣٠

অনুচ্ছেদ : ১১. পুত্র (মৃতের পিতা) থাকা অবস্থায় জাদ্দা (পিতামহী/মাতামহী) এর মীরাস

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ فِى الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا : اِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُدُسًا مَعَ اِبْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَانَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ وَرَّثَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الْجَدَّةَ مَعَ اِبْنِهَا وَلَمْ يُوَرِّثْهَا بَعْضُهُمْ .

১৪. হাসান ইবনে আরাফা রহ. .... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি পিতামহী/মাতামহী ও তার পুত্রের মীরাস সম্পর্কে বলেন, পিতামহী/মাতামহী ও তার পুত্রের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মহিলাকেই প্রথম এক ষষ্ঠমাংশ মীরাস ভোগ করতে দেন। অথচ ঐ মহিলার পুত্রও তখন জীবিত ছিল।

এ সূত্র ছাড়া হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণিত আছে বলে আমরা অবহিত নই। কতক সাহাবী পিতামহী/মাতামহীকে তার পুত্র থাকা অবস্থায়ও মীরাসের অংশ দিয়েছেন। অপর কতক সাহাবী এমতাবস্থায় তাকে মীরাস প্রদান করেন নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সূরতে মাসআলা হল, এক ব্যক্তি দাদি এবং পিতা রেখে মারা গেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ছয় ভাগের একভাগ দাদিকে দিলেন। অথচ উলামায়ে কিরাম বলেন, মৃতের বাপ থাকলে দাদি কিছুই পাবে না। আলোচ্য হাদীসের উপর উলামায়ে কিরাম আমল করেননি। কেননা হাদীসটি যঈফ। কিংবা বলা হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত বন্টন মীরাস হিসাবে করেন নি বরং করুণা হিসাবে করেছেন। (তুফাতুল আহওয়াযী)

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْخَالِ ص ٣٠

অনুচ্ছেদ : ১২. মামার মীরাস

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلٰى أَبِىْ عُبَيْدَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلٰى مَنْ لَا مَوْلٰى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

১৫. বুনদার রহ. .... আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনায়ফ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনে খাত্তাব রাযি. আমার সাথে আবু উবায়দা রাযি. এর নিকট এ মর্মে একটি চিঠি লিখে দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার কোন অভিভাবক নেই, আল্লাহ ও তার রাসূল হল তার অভিভাবক। আর যার (অন্য কোন) ওয়ারিস নেই মামা হল তার ওয়ারিস। এ বিষয়ে আয়েশা, মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُوْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ ـ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ـ وَقَدْ أَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ـ وَاخْتَلَفَ فِيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَوَرَّثَ بَعْضُهُمُ الْخَالَ وَالْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ وَإِلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ تَوْرِيْثِ ذَوِى الْأَرْحَامِ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَلَمْ يُوَرِّثْهُمْ وَجَعَلَ الْمِيْرَاثَ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ ـ

১৬. ইসহাক ইবনে মানসূর রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার (অন্য কোন) ওয়ারিস নেই, মামা হল তার ওয়ারিস।

এ হাদীসটি হাসান গারীব। কেউ কেউ এটিকে মুরসালরূপে রিওয়ায়াত করেছেন। তারা এতে আয়েশা রাযি. এর উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে সাহাবীগণের মত পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ মামা, খালা এবং ফুফুকে ওয়ারিস হিসাবে গণ্য করেছেন। যাবীল আরহাম দের ওয়ারিস হিসাবে গণ্য করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলিম এ হাদীস অনুসারে মত গ্রহণ করেছেন। তবে যায়দ ইবনে সাবিত রাযি. তাদেরকে ওয়ারিস হিসাবে গণ্য করেন না। এমতাবস্থায় তিনি বায়তুল মালে মীরাস জমা প্রদানের মত দেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

حَكِيْمُ بْنُ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ ঃ ح এর উপর পেশ, ن এর উপর যবর। তিনি আনসারী আওসী। তিনি সত্যবাদী, পঞ্চম শ্রেণীর রাবী।

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ঃ ইনি আবু উমামা সা'আদ ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ আনসারী রাযি.। আউস গোত্রীয়। আবু উমামা কুনিয়াতেই প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর নাম ছিল সা'আদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নানার নাম ও কুনিয়ত অনুসারে তাঁর নাম ও কুনিয়ত রেখেছেন। বয়স কম ছিল বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিছু শুনতে পারেননি। তাই মুহাদ্দিসরা অনেকেই সাহাবীদের পরবর্তী শ্রেণীতে তাঁর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে আব্দুল বার তাঁকে সাহাবীদের তালিকাভুক্ত রেখেছেন। তিনি স্বীয় পিতা আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। তাঁর নিকট হতে বহুসংখ্যক লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১০০ হিজরীতেম ৯২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

মামা নিজ ভাগিনার উত্তরাধিকার পায়। কেননা মামা ذَوِى الْأَرْحَامِ তথা নিকটাত্মীয় থেকে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখের মতে ذَوِالْفُرُوْض এবং عَصَبَه যদি না থাকে তাহলে ذَوِى لْأَرْحَام মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে। ذَوِى الْفُرُوْض এবং عَصَبَه থাকলে ذَوِى الْأَرْحَام কিছুই পাবে না। হযরত উমর রাযি., আলী রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., আবু উবাইদাহ ইবনুল যাররাহ রাযি., মু'আয ইবনে জাবাল রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এবং আবু দারদা রাযি. সহ অধিকাংশ সাহাবীর এটাই অভিমত। তাবেঈদের মধ্য থেকে আলকামা, ইবরাহীম ইবনে নাখঈ, ইবনে সীরিন, আ'তা ইবনে আবি রাবাহ প্রমুখও এ মত পোষণ করেন। আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদীসটি তাদের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম মালেক রহ. এর মতে ذَوِى الْأَرْحَام কোন সূরতেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার হয় না। মৃত ব্যক্তির ذَوِى الْفُرُوْض এবং عَصَبَه না থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাইতুল মালে জমা দিয়ে দিবে। হযরত যায়দ ইবনে সাবেত রাযি. থেকেও এরূপ মত পাওয়া যায়। তাঁদের দলীল হল নিম্নোক্ত হাদীসটি–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ . قَالَ: سَأَلْتُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ عَنْ مِيْرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَسَارَنِيْ أَنْ لَا مِيْرَاثَ لَهُمَا (أخرجه ابوداؤد فى المراسيل)

ইমাম শাফিঈ প্রমুখের উক্ত দলীলের জবাবে বলা হবে যে, হাদীসটি 'মুরসাল'। আর মুরসাল হাদীস দলীলের উপযোগী নয়। তথাপি যদি দলীলের উপযুক্ত হিসাবে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও বলা হবে, لَامِيْرَاثَ لَهُمَا এর আলোকে ذَوِى الْاَرْحَام এর 'মীরাস' বাতিল হয়ে যাওয়া জরুরী নয় বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ذَوِى الْفُرُوْضِ এবং عَصَبَه এর উপস্থিতিতে ذَوِى الْاَرْحَام কোন মীরাস পাবে না। (তোহফাতুল আহওয়াযী)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الَّذِىْ يَمُوْتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ص ـ ٣٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩. কোন ওয়ারিস না থাকা অবস্থায় যদি কেউ মারা যায়

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ وَهُوَ ابْنُ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُنْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ ؟ قَالُوا : لَا. قَالَ فَادْفَعُوْهُ إِلٰى بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৭. বুনদার রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জনৈক আযাদকৃত দাস খেজুর গাছের মাথা থেকে পড়ে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা দেখ, এর কেউ ওয়ারিস আছে কিনা। লোকেরা বলল, কেউ নেই। তিনি বললেন, তবে গ্রামবাসীদের কাউকে তা (মীরাস) দিয়ে দাও। এ বিষয়ে বুরায়দা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عَنْ عُرْوَةَ ঃ উরওয়া ইবনে যুবাইর ইবনে আওয়াম ইবনে খুয়ালিদ আসাদী কুরাইশী রহ. কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ। সেকাহ তাবিঈ। মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহ। আপন পিতা যুবাইর, মাতা আসমা, খালা হযরত আয়েশা রাযি. এবং অন্যান্য সাহাবাদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর নিকট থেকে তাঁর পুত্র হিশাম ও ইমাম যুহরী প্রমুখগণ রেওয়ায়াত করেন। তিনি ছিলেন তাবিঈদের মধ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। মদীনায় খ্যাতনামা যে সাতজন ফকীহ ছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। আবুয যিনাদ বলেন, মদীনায় আমাদের ফকীহদের মধ্যে যাঁর রায় চূড়ান্ত বলে মনে করা হত, তাঁদের মধ্যে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব ও উরওয়া ছিলেন। তিনি ২২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

আযাদকৃত গোলামটি যেহেতু কোন উত্তরাধিকার রেখে যায়নি, তাই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে বাইতুল মাল। আর বাইতুল মালের ব্যয়ক্ষেত্র হল, ফকীর, মিসকীন প্রমুখ। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি মহল্লার গরীব, মিসকীন অথবা অভাবগ্রস্থকে দিয়ে দেওয়া সমীচীন মনে করলেন। অথবা অন্য কানও কারণেও হয়ত মহল্লাবাসীকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন।

আযাদকৃত গোলামের ব্যাপারে বিধি হল, যদি তার عَصَبَات نَسَبِيَّة না থাকে, তাহলে তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে ঐ ব্যক্তি যে তাকে আযাদ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আযাদকৃত গোলাম যখন মারা গেল এবং তার কোন 'আছাবা'ও ছিল না, তখন উল্লেখিত বিধি মতে এ গোলামের উত্তরাধিকার স্বত্ত্বে মালিক হন রাসূলুল্লাহ ﷺ। কিন্তু নবীগণের বেলায় যেহেতু উত্তরাধিকার স্বত্ব নেই, তাই উক্ত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাইতুল মালের ব্যয়ক্ষেত্রে ব্যয় করে দেওয়া হয়েছে।

بَابٌ فِى مِيرَاثِ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ صـ٣٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪. সর্বনিম্ন আযাদকৃত দাসের মীরাস

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ عِلْمٍ فِى هٰذَا الْبَابِ ، إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .

১৮. ইবনে আবূ উমার রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে জনৈক ব্যক্তি মারা যায়। তার এক আযাদকৃত গোলাম ছাড়া কোন ওয়ারিস ছিল না। নবী কারীম ﷺ তাকেই ঐ ব্যক্তির মীরাস দিয়ে দেন। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান।

এ বিষয়ে আলিমগণের আমল রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় আর তার কোন আসাবা না থাকে তবে বাইতুল মালে তার মীরাস জমা করা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কোন ব্যক্তির আযাদকৃত গোলাম যদি মারা যায় এবং তার মালিক ব্যতিত তার অন্য কোন ওয়ারিস না থাকে, তাহলে ঐ গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় তার মনিব, যে তাকে আযাদ করেছে। একে বলা হয় " حَقِّ وَلَاء "। এ حَقِّ وَلَاء সম্পর্কে তাউস এবং শুরাইহ ব্যতীত অন্য কারও কোন দ্বিমত নেই। কেননা হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে এসেছে– "اَلْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ" অর্থাৎ حَقِّ وَلَاء ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তাকে আযাদ করেছে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে যে সূরত দেখা যায়, সেটা সর্বজনবিধিত। حَقِّ وَلَاء এর বিপরীত। কেননা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটিতে আমরা দেখতে পাই যে, মালিকের মীরাস দেওয়া হয়েছে তার আযাদকৃত গোলামকে। তাই আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের উপর ভিত্তি করেই তাউস এবং শুরাইহ বলেছেন, حَقِّ وَلَاء যেমনিভাবে আযাদকারী মালিক আযাদকৃত গোলামের সূত্রে পায়, তেমনিভাবে আযাদকৃত গোলামও আযাদকারী মালিকের সূত্রে পাবে।

জমহূরের পক্ষ থেকে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির জবাবে বলা হয়, এটা প্রাপ্য 'হক' হিসাবে ছিল না বরং 'সদকা' বা 'মাছরাফ' হিসাবে ছিল।

بَابُ مَاجَاءَ فِى إِبْطَالِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ صـ٣١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫. মুসলিম ও কাফিরের মাঝে মীরাস স্বত্ব বাতিল

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ رح . وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

صَحِيحٌ ، هٰكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَ هٰذَا ، وَرَوٰى مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ وَهَمٌ وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَالُوا عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ وُلْدِ عُثْمَانَ، وَلَا يُعْرَفُ عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاخْتَلَفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ فَجَعَلَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ الْمَالَ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

১৯. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযুমী প্রমুখ এবং আলী ইবনে হুজর রহ. .... উসামা ইবনে যায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিম কোন কাফিরের এবং কাফির কোন মুসলিমের ওয়ারিস হবে না।

ইবনে আবূ উমার রহ. .... যুহরী রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে জাবির এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মা'মার রহ. প্রমুখ ও এটিকে যুহরী রাযি. এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালিক রহ. এটিকে যুহরী আলী ইবনে হুসাইন 'উমার ইবনে উসমান উসামা ইবনে যায়দ নবী কারীম ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালিক রহ. এর রিওয়ায়াত বিভ্রান্তিপূর্ণ। এতে মালিকেরই বিভ্রান্তি হয়েছে। কোন কোন রাবী মালিক রহ. এর বরাতে এটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং রাবীর নাম (উমার এর স্থলে) আমর ইবনে উসমান বলে উল্লেখ করেছেন। মালিক রহ. এর অধিকাংশ শাগিরদ বলেছেন, মালিক উমার ইবনে উসমান। উসমান রাযি. এর সন্তানের মাঝে প্রসিদ্ধ হল, আমর ইবনে উসমান ইবনে আফফান। উমার ইবনে উসমান বলে আমরা কাউকে চিনি না।

এ হাদীস অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। আলিমগণ মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) এর মীরাস সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর বিশেষজ্ঞ আলিম (ইমাম আবূ হানীফাসহ) তার সম্পদ তার মুসলিম ওয়ারিসদের প্রাপ্য বলে মত দিয়েছেন। আর কতক আলিম বলেন, তার কোন মুসলিম ওয়ারিস তার মীরাসের ওয়ারিস হবে না। তারা দলীল হিসাবে নবী কারীম ﷺ এর এ হাদীসটি পেশ করেন যে, মুসলিমরা কাফিরদের ওয়ারিস হবে না। এ হল ইমাম শাফিঈ রহ. এর অভিমত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লামা নববী রহ. লিখেছেন, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম এক মত যে, কাফির মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারবে না। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় আর ওয়ারিস যদি কাফির হয়, তাহলে পরস্পরের মধ্যে যে কোন ধরনের বংশগত সম্পর্কই থাক না কেন, কোন অবস্থাতে কাফির ওয়ারিস মুসলমানের ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না। অনুরূপভাবে মুসলমানও কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ অপর হাদীসে এসেছে– لَا يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ (উভয় হাদীস আলোচ্য অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।)

কিন্তু কোন কোন সাহাবা যেমন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. এবং কোন কোন তাবেঈ যেমন হযরত সাঈদ ইবনে মাছাইয়াব রহ. বলেন মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকার পায়। তাদের দলীল হল, হাদীস শরীফে এসেছে– اَلْإِسْلَامُ يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ এবং আরেক হাদীসে এসেছে اَلْإِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى (ابوداؤد)

তাঁদের দলীলদ্বয়ের জবাবে উলামায়ে কেরাম বলেন, اَلْمُرَادُ فِىْ هٰذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ فَضْلُ الْاِسْلَامِ عَلٰى غَيْرِهٖ অর্থাৎ উক্ত হাদীসদ্বয়ের উদ্দেশ্য হল, অন্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা। এখানে মীরাসের বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

অনুরূপভাবে এ ব্যাপারেও সকলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, কাফিরের মত কোন মুরতাদও কোন মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না। তবে কোন মুসলমান কোন মুরতাদের ওয়ারিস হতে পারে কিনা –এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ, রাবী'আহ, আবু রাইলা প্রমুখের মতে কোন মুসলমান কোন মুরতাদের ওয়ারিস হতে পারে না বরং মুরতাদ মারা গেলে তার সম্পদ বাইতুল মালে জমা হয়ে যাবে।। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর অভিমত হল, কেউ যদি পূর্বে মুসলমান থাকে, তারপর মুরতাদ হয়ে যায়, তবে এরূপ ব্যক্তি মারা গেলে তার মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে। আর মুরতাদ অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ বাইতুল মালে জমা হবে। আর কোন স্ত্রীলোক মুরতাদ হয়ে মারা গেলে তার উভয় অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ মুসলমানরা পাবে। (মা'আরিফঃ ২, আল-কাওকাব)

مَوَانِعُ الْاِرْثِ ঃ তথা মীরাছের প্রতিবন্ধক

মীরাছের প্রতিবন্ধক চারটি। যথা–

১. দাসত্ব ঃ কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন গোলামের ওয়ারিছ হয় না। কেননা, শরী'আতের দৃষ্টিকোণে গোলাম কোন জিনিসের মালিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তার মালিকানায় ও কোন জিনিস হয় না।

২. হত্যা ঃ ওয়ারিছ যদি مورث তথা যার ওয়ারিছ হয় তাকে হত্যা করে, তাহলে সে ওয়ারিছ মীরাছ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যাবে। অবশ্য নাবালেগ বা পাগল এরূপ করলে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা, শরঈভাবে তাদের অধিকাংশ কাজের প্রতিক্রিয়ায় কোন শাস্তি ওয়াজিব হয় না।

৩. ধর্মীয় বিভিন্নতা ঃ যার বিবরণ একটু পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

৪. দেশের বিভিন্নতা ঃ মৃতব্যক্তি এবং ওয়ারিছের দেশ যদি আলাদা হয়, তাহলে মীরাছ পাবে না। যেমন একজন থাকে ইসলামী রাষ্ট্রে, অপরজন থাকে দারুল হরবে, তাহলে একজন অপরজন থেকে পারস্পরিক মীরাছ পাবে না। অবশ্যই এই হুকুম অমুসলিমদের জন্য। মুসলমান যদি দুইজন দুই দেশে থাকে, তাহলেও একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী সত্ত্ব পাবে।

بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ صـ٣١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬. দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরস্পর ওয়ারিস হবে না

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ لَيْلٰى عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِىْ لَيْلٰى .

২০. হুমায়দ ইবনে মাসআদা রহ. .... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেছেন, দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরস্পর ওয়ারিস হবে না। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি গারীব। ইবনে আবূ লাইলা রহ. এর সূত্র ছাড়া জাবির রাযি. এর রিওয়ায়াত হিসাবে আমরা অবহিত নই।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اِبْطَالِ مِيْرَاثِ الْقَاتِلِ صــ٣١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭. হত্যাকারীর মীরাস বাতিল

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَإِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ فَرْوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .

২১. কুতায়বা রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে অন্য কিছু জানা যায় নেই। আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. সহ কতক আলিম ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবূ ফারওয়াকে পরিত্যক্ত বলে মত দিয়েছেন।

আলিমগণের (ইমাম আবূ হানীফাসহ) এতদনুসারে আমল রয়েছে। হত্যা স্বেচ্ছা ও স্বজ্ঞানেই হোক বা ভুলক্রমে হোক, কোন অবস্থায়ই হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না। কোন কোন আলিম বলেনঃ যদি ভুলক্রমে সংঘটিত হয় তবে হত্যাকারী মীরাস পাবে। এ হল ইমাম মালিক রহ. এর অভিমত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোক এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে সে স্বত্ত্বাধিকারী ছিল, তবে এ হত্যাকারী তার ওয়ারিসী স্বত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। এটাই জমহূরের মত। তাদের দলীল হল আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাষায় বলেছেন, اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ অর্থাৎ হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না। তাছাড়া বাইহাকী শরীফে এসেছে, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত জাবির রাযি, প্রমুখ এবং কাজী শুরাইহ অনুরূপ ফতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম মালেক রহ. বলেন, قَتْل خَطَا তথা ভুলবশতঃ হত্যার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে। অর্থাৎ ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী ওয়ারিসী স্বত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হবে না। অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, হত্যাকারী যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা পাগল হয়, তাহলে ওয়ারিসী স্বত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হবে না। (মিরকাত তোহফাহ)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مِيْرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا صــ٣١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮. স্বামীর দিয়াত থেকে স্ত্রীর মীরাস

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ : اَلدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِىِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২. কুতায়বা, আহমাদ ইবনে মানী প্রমুখ রহ. .... সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব রহ. থেকে বর্ণিত। উমার রাযি. বলেছেন, দিয়াত আকিলার (হত্যাকারীর পৈতৃক আত্মীয়দের) উপর বর্তায়। স্ত্রী তার স্বামীর দিয়াত থেকে কিছুরই ওয়ারিস হবে না। তখন যাহ্হাক ইবনে সুফয়ান কিলাবী রাযি. তাঁকে অবহিত করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লিখেছিল, আশয়াম যিবাবী এর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াত থেকে মীরাস দিবে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِىُّ ঃ যাহহাক ইবনে সুফয়ান কিলাবী আ'মেরী রাযি.। তিনি নজ্দ এলাকায় বাস করতেন বটে, তবে তাঁকে মদীনাবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁর কুনিয়্যাত আবু সাঈদ। মশহুর সাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহরক্ষী হিসাবে খোলা তরবারি নিয়ে পাহারায় নিয়োজিত থাকতেন। তাঁর কওমের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাদের উপর শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। কথিত আছে যে, বীরত্বে তাকে একশত সওয়ারীর সমকক্ষ গণ্য করা হত। (আসমাউর রিজাল)

اَنْ وَرِّثْ اِمْرَاَةَ اَشْيَمَ الضَّبَابِى ঃ ض এর নীচে যের। তিনি যিবাব ইবনে কিলাব এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। ভুলক্রমে নবী কারীম ﷺ এর জীবদ্দশাতেই হত্যা করা হয়েছিল। (তুহফা ৬/২৪৩) যে লোক ভুলক্রমে হত্যা করেছিল, তার উপর রক্ত পন ওয়াজিব হয়েছিল। যখন সে রক্তপণ আদায় করে তখন নবী কারীম ﷺ যাহহাককে লিখলেন, নিহত অর্থাৎ আশয়াম যিবাবীর রক্তপণে যে সম্পদ লাভ হয়েছে তা থেকে যেন তার স্ত্রীকে মীরাস দেওয়া হয়।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রক্তপণ প্রথমে নিহতের জন্য ওয়াজিব হয়। অতঃপর এ রক্তপণে যে সম্পদ লাভ হয়েছে তা থেকে যেন তার স্ত্রীকে মীরাস দেওয়া হয়।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়,রক্তপণ প্রথমে নিহতের জন্য ওয়াজিব হয়। অতঃপর এ রক্তপণে অর্জিত সম্পদ নিহতের অন্যান্য সম্পদের ন্যায় তার ওয়ারিছদের দিতে স্থানান্তরিত হয়। জমহূরের মত এটাই।

কিন্তু প্রথম দিকে হযরত উমর রাযি. এর মত ছিল, নিহত ব্যক্তির দিয়্যাত (রক্তপণ) নিহত ব্যক্তির 'আছাবারা' পাবে। স্ত্রী তার স্বামীর দিয়্যাতের ওয়ারিস হবে না। অতঃপর হযরত যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান রাযি. যখন উমর রাযি. কে জানালেন, 'আশয়াম আয-যিবাবী যখন নিহত হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ মর্মে পত্র লিখেছেন যে, وَرِّثْ اِمْرَاَةَ اَشْيَمَ الضَّبَابِى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا অর্থাৎ আশয়ামের দিয়্যাতের উত্তরাধিকার তার স্ত্রীকেও বানাবে।' হযরত উমর রাযি. একথা শুনে তাঁর পূর্বোক্ত মত প্রত্যাহার করেন।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْمِيْرَاثَ لِلْوَرَثَةِ وَالْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ ص ـ ٣١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯. মীরাস হল ওয়ারিসানের আর আসাবাদের উপর হল দিয়াত

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى جَنِيْنِ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِى لِحَيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى قُضِىَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ عَقْلَهَا عَلٰى عَصَبَتِهَا ـ

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى يُونُسُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ.

২৩. কুতায়বা রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ লিহইয়ানের জনৈকা মহিলার গর্ভস্থ বাচ্চা (অন্য এক মহিলার আঘাতে) মরে গর্ভপাত ঘটলে (দিয়াত হিসাবে) "গুররা" অর্থাৎ গোলাম বা দাসী ধার্য করেন। পরে যে মহিলার জন্য গুররা ধার্য হয়েছিল, সে মরা যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা দেন, তার মীরাস পাবে তার পুত্র ও স্বামী। আর ধার্যকৃত দিয়াত বর্তাবে তার (অপরাধী) আসাবাদের ওপর।

ইউনুস রহ. এ হাদীসটিকে যুহরী .... সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব ও আবূ সালামা ... আবূ হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে নবী কারীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালিক রহ. এটিকে যুহরী ... আবূ সালামা... আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মালিক ... যুহরী ... সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব ... নবী কারীম ﷺ সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْغُرَّةُ এর বহুবচন غُرَرٌ। অর্থ, ঘোড়ার ললাটের শুভ্রতা। বস্তুর উত্তমাংশ। আর গোলাম বাঁদি যেহেতু উত্তম সম্পদ, তাই তাদের ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহার হয়।

إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ ঃ হাদীসের এই অংশ দ্বারা বুঝা যায়, আঘাতকারী ঐ মহিলা মারা গিয়েছিল, অথচ অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, বাচ্চার মাকেও সে হত্যা করেছিল। রেওয়ায়াতটি এমন فَقَتَلَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا অতএব আঘাতকারী নয় বরং আঘাতপ্রাপ্তা মহিলা মারা যায়।

কাজী ইয়ায রহ. ও ইমাম নববী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেছেন قُضِيَ عَلَيْهَا এর অর্থ لَهَا অর্থাৎ, যে মহিলার পক্ষে ফয়সালা দেওয়া হয়েছিল সে মারা যায়। আর সে আঘাতকারীনী নয় বরং আঘাতপ্রাপ্তা। এভাবে সকল রেওয়ায়াত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্য এ অর্থেরও সম্ভাবনা আছে যে, আঘাতপ্রাপ্তা মহিলা মারা যাওয়ার পর আঘাতকারী মহিলা নিজেও মারা যায়।

আর এটা জরুরী নয় যে, আঘাত প্রাপ্তার মৃত্যু আর غُرَّة এর ফয়সালার সঙ্গে সঙ্গে ঐ আঘাতকারিনীকেও মৃত্যু ঘটেছে। বরং এ অর্থের সম্ভাবনা আছে যে, পরবর্তীতে যখন আঘাতকারী মহিলা মারা যায় তখন তার অভিভাবকরা মীরাছের দাবী করে এবং বলে যেহেতু আমরা দিয়্যাত করেছি সুতরাং আমরা মীরাছের হকদার।

তাদের পক্ষ থেকে এ দাবী উঠার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দেন, মীরাছ পাবে শুধু ওয়ারিসরা (সন্তান-স্বামী)। যদিও দিয়্যাত আদায় করেছে পুরো অভিভাবকরা (عَاقِلَه)। হযরত মাওলানা সাহরানপূরী এ ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (বযলুল মাযহূদ ৫/১৮৪)

সারকথা, হাদীসের ইবারতে উভয় সম্ভাবনা আছে। মহিলা দ্বারা অপরাধকারিনী গর্ভপাতকারিনী উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার যার গর্ভপাত করা হয়েছিল সে মহিলাও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মীরাস তার ওয়ারিসদের দিতে বলেছেন, রক্তপণ ওয়াজিব করেছেন আকিলার উপর।

عَاقِلَة কারা ?

عَاقِلَة বলা হয় هِيَ الَّتِي تَحْمِلُ الْعَقْلَ অর্থাৎ যারা দিয়্যাতের বোঝা গ্রহণ করে। দিয়্যাতকে عَقْل বলা এটা মানুষকে রক্তপ্রবাহিত করা থেকে বিরত রাখে বলে। আর عَقْل এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, যেহেতু عَقْل মানুষকে পাপ কাজ তেকে বেঁধে (রিবত) রাখে এজন্য একে عَقْل বলে নামকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, قَتْل خَطَأ এবং قَتْل شِبْه عَمَد এর ক্ষেত্রে عَاقِلَه এর উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হয়। হ্যাঁ, যদি قَتْل عَمَد

হয় এবং পরস্পর চুক্তির বিনিময়ে দিয়্যাত আসে তাহলে এক্ষেত্রে হত্যাকারীকেই দিয়্যাত বহন করতে হয় عَاقِلَه এর উপর এ দিয়্যাত বর্তাবেনা, عَاقِلَه কারা ? এ ব্যপারে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে যারা সর্বদা বিপদ-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদেরকে عَاقِلَع বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে খান্দানি অভিজাত্যের ভিত্তি ছিল, সাহায্য-সহযোগিতার উপর। তারা পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করত। তাই এদেরকেউ عَاقِلَه হিসাবে গণ্য করা হয়।

পরবর্তীতে উমর রাযি. এর খেলাফতকালে প্রতিরক্ষা সচিব (أَهْل دِيْوَان) পরস্পরে সাহায্য-সহযোগিতাকারী (أَهْل تَنَاصُر) হিসাবে গণ্য করা হয়। ঐ সময় সকল সাহাবী এটা সর্বান্তকরণে মেনে নেন। হযরত উমর রাযি. এর এ প্রক্রিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতের পরিপন্থি নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নির্দেশ দিয়েছিলেন মূলতঃ পরস্পরে সাহায্য-সহযোগীতার ভিত্তিতে। আর সে সময়ে এটা আঞ্জাম দিত আসাবা। উমর রাযি. এর খিলাফতকালে أَهْل دِيْوَان তথা প্রতিরক্ষা-সচিবরা এ দায়িত্ব পালন করে।

মোটকথা, সাহায্য-সহযোগীতার এই ভিত্তি আত্মীয়তা, সুসম্পর্ক, পেশা, দল, জাতি-গোষ্ঠি ইত্যাদি সম্পর্কের উপর। যদি এ সব সম্পর্কে না পাওয়া যায় তাহলে কবীলা ও নিজস্ব বংশের লোকেরা عَاقِلَه হিসাবে গণ্য হবে। হজত্যাকারীর যদি উল্লেখিত কোন সম্পর্ক না থাকে যে, যাদের কাছ থেকে সে সাহায্য পেতে পারে, তাহলে বাইতুলমাল থেকে দিয়্যাত আদায় করতে হবে। তবে বাইতুলমাল যদি দিয়্যাত প্রদানে ব্যর্থ হয়, তাহলে হত্যাকারীর মাল থেকে তা পরিশোধ করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার)

আর যার কোন প্রকারের عَاقِلَه না থাকে যেমন এমন জিম্মী বা হরবী যে মুসলমান হয়েছে, তাহলে তাদের আকেলা বাইতুল মাল।

২. ইমাম শাফিঈ রহ. ও আহমদ রহ. এর মতে হত্যাকারীর আসাবাই عَاقِلَه হিসাবে গন্য হবে। ইমামদ্বয় হাদীসে বর্ণিত ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা বর্ণিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসাবাকে দিয়্যাত আদায়ের নির্দেশ দেন। আহনাফের পক্ষ থেকে এর উত্তর দেওয়া হয় যে, ঐ সময় আসাবারই عَاقِلَه হিসাবে গণ্য হত, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ নির্দেশ দেন। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, আ'সাবাই সর্বদা আ'কেলা হিসাবে গণ্য হবে বরং হযরত উমর রাযি. এর যুগে এর পট পরিবর্তন হওয়া এবং أَهْل دِيْوَان কে عَاقِلَه হিসাবে গণ্য করা –একথা প্রমাণ করে যে, এর ভিত্তি মূলতঃ تَنَاصُر তথা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার উপর। (ইলাউস-সুনান, তাকমিলাহ, ইযাহুল মুসলিম)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَيِ الرَّجُلِ ص ـ ٣١

অনুচ্ছেদ ঃ ২০. কোন ব্যক্তি অপর এক জনের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলে

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهِبٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا السُّنَّةُ فِى الرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَىْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ، وَيُقَالُ ابْنُ مَوْهِبٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ وَبَيْنَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ

قَبِيْصَةَ بْنُ ذُؤَيْبٍ وَلَايَصِحُّ، رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِيْهِ : قَبِيْصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ عِنْدِى لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُجْعَلُ مِيْرَاثُهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ۔

২৪. আবূ কুরায়ব রহ. .... তামীম দারী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোন মুশরিক যদি কোন মুসলিমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এ ক্ষেত্রে বিধান কি ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার জীবনে ও তার মরণে এ ব্যক্তিই হবে মানুষের মাঝে সবচেয়ে তার নিকটবর্তী।

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহব রহ. এর সূত্র ছাড়া এ হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। আবদুল্লাহ ইবনে মাওহিব তামীম দারী রাযি. ও বলা হয়ে থাকে।

কেউ কেউ এ সনদে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহিব এবং তামীম দারী রাযি. এর মাঝে কাবীসা ইবনে যুআয়ব রহ. এর নাম বৃদ্ধি করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে হামযা রহ. এটিকে আবদুল আযীয ইবনে উমার রহ. এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি কাবীসা ইবনে যুআয়ব এর নাম অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। আমার মতে এ সনদ মুত্তাসিল নয়।

কোন কোন আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন, তার মীরাস বাইতুল মালে জমা হবে। এ হল ইমাম শাফিঈ রহ.এর মত। নবী কারীম ﷺ এর নিম্নোক্ত হাদীসটি তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।"যে আযাদ করবে সেই হবে আযাদকৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলে সে নও মুসলিমের 'মাওলা' ঐ মুসলমান হয়, যার হাতে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এটা মূলতঃ ইসলামের শুরু যামানার বিধান ছিল। পরবর্তীতে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। আর রহিতকারী হাদীস হল– "اَلْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ" তাছাড়া এ হাদীসটি দুর্বলও বটে। এ হাদীসের মাধ্যমে حَقِّ وَلَاء সাব্যস্ত করা যায় না। ইমাম তিরমিযী রহ. সহ অনেকেই হাদীসটির রাবী আব্দুল আযীয ইবনে আমর এবং ইবনে ওয়াহাবকে দুর্বল ও অজ্ঞাত বলেছেন।

কেউ কেউ হাদীসটির মর্মার্থ قطر ذضلخ বলেছেন যে, হাদীসটির মাধ্যমে حَقِّ وَلَاء সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল একথা বর্ণনা করা যে, যে ব্যক্তি মুসলমান করিয়েছে সে ব্যক্তি নওমুসলিমের সহযোগীতা ও কল্যাণকামীতার ব্যাপারে এবং মৃত্যুর পর জানাযার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশি হকদার।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اِبْطَالِ وَلَدِ الزِّنَا صـ٣١

অনুচ্ছেদ ঃ ২১. অবৈধ সন্তান মীরাস থেকে বাতিল

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ۔ حَدَّثَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَايَرِثُ وَلَايُوْرَثُ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ ابْنِ لَهِيْعَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَايَرِثُ مِنْ أَبِيْهِ ۔

২৫. কুতাইবা রহ. .... আমর ইবনে শু'আয়ব তার পিতা তার পিতামহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি আযাদ মহিলা বা কোন বাঁদীর সাথে যিনা করে, তবে সন্তান যিনাজনিত সন্তান বলে বিবেচ্য হবে। সেও ওয়ারিস হবে না এবং তার থেকেও সে সন্তান ওয়ারিস হবে না।

ইবনে লাহীআ ছাড়া অন্য রাবীও এ হাদীসটিকে 'আমর ইবনে শু'আইব সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আলিমগণের এ হাদীস অনুসারে আমল রয়েছে যে, যিনার সন্তান তার পিতার ওয়ারিস হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যভিচারের কারণে ভূমিষ্ট সন্তান ব্যভিচারীর মীরাস পায় না। অনুরূপভাবে ব্যভিচারীও তার হারামজাদা সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে না। কেননা মীরাস সাব্যস্ত হয় আত্মীয়তার মানদণ্ডে, আর ব্যভিচারের কারণে 'আত্মীয়তা' সাব্যস্ত হয় না। তবে ব্যভিচারীনী তার ব্যাভিচারের মাধ্যমে প্রসূত সন্তানের মীরাস পাবে, অনুরূপভাবে সন্তানও তার ব্যাভিচারীনী মায়ের ওয়ারিস হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ صـ ٣٢

অনুচ্ছেদ ঃ ২২. আযাদকৃতের সম্পদের ওয়ারিস কে হবে ?

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَّرِثُ الْمَالَ ـ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهٗ بِالْقَوِيِّ ـ

২৬. কুতায়বা রহ. .... আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা তার পিতামহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সম্পদের ওয়ারিস হয় সেই হবে ওয়ালা স্বত্ত্বের ওয়ারিস। এ হাদীসটির সনদ শক্তিশালী নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আযাদকৃত ক্রীতদাসের সম্পদকে وَلَاء বলা হয়। আর আযাদ করার কারণে যে উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব লাভ হয়, তাকে حَقِّ وَلَاء বলা হয়। হাদীসের মর্মার্থ হল, এক ব্যক্তি যেমন যায়েদের পিতা মারা গেল। তারপর তার পিতা কর্তৃক আযাদকৃত গোলাম মারা গেলো কিংবা তার পিতার আজাদকৃত গোলামেরও আজাদকৃত গোলাম মারা গেলো। তখন এ ব্যক্তি অর্থাৎ যায়েদ حَقِّ وَلَاء এর ভিত্তিতে আযাদকৃত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব লাভ করবে। কেননা যায়েদ যেমনিভাবে তার পিতার অন্যান্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেয়েছে, অনুরূপভাবে حَقِّ وَلَاء এরও উত্তরাধিকার পাবে। তবে এ হুকুমটি কেবল 'আছাবার সঙ্গে নির্ধারিত।

بَابُ مَاجَاءَ مَايَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ صـ ٣٢

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩. মহিলা যেসব মীরাস পাবে

حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ أَبُوْ مُوْسٰى الْمُسْتَمْلِىُّ الْبَغْدَادِيُّ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلَبِىُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْأَةُ تَحُوْزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيْثَ : عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِىْ لَا عَنَتْ عَلَيْهِ ـ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ ـ

২৭. হারূন আবূ মূসা মুসতামলী বাগদাদী রহ. .... ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন মহিলা তিন প্রকারের মীরাস পেতে পারে, যাকে সে আযাদ করল তার, যাকে সে কুড়িয়ে নিয়ে লালন-পালন করল তার এবং সে সন্তানের জন্য লিআন করেছিল সে সন্তানের।

এ হাদীসটি হাসান-গরীব। এ সনদে মুহাম্মদ ইবনে হারব -এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সহজ তাহকীক ও তা'শরীহ

এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, মহিলারা তিন ধরনের মীরাস পায়। (এক) নিজের আজাদকৃত ক্রীতদাসের) (দুই) নিজের 'লাক্বীত' এর। 'লাক্বীত' বলা হয়, ঐ নবজাতককে যাকে, ফেলে দেওয়া হয়েছে। 'নিজের লাক্বীত' এর অর্থ হল, ফেলে দেওয়া নবজাতককে কুড়িয়ে এনে লালন-পালন করে বড় করে তোলা। মহিলা এ 'লাক্বীত' এর উত্তরাধিকার পাবে। তবে এটা শুধু ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এর অভিমত। পক্ষান্তরে অন্যান্য সকল ইমামের অভিমত হল, 'লাক্বীত' এর মীরাস বাইতুল মালের জন্য নির্ধারিত। তবে হ্যাঁ, যে মহিলা 'লাক্বীত'কে কুড়িয়ে এনে লালন-পালন করে বড় করে তুলেছে, সেই মহিলা যদি গরীব হয়, তাহলে অন্য মুসলমানের তুলনায় এ মহিলাই অধিক হকদার হিসাবে বাইতুল মালের নৈতিক দায়িত্ব হল, একেই দিয়ে দেওয়া। (তিন) মহিলা নিজের ঐ সন্তানের মীরাস পাবে, যার কারণে লি'আন' হয়েছে অর্থাৎ যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে 'লি'আন হয়েছে। সে সন্তানের বংশধারা পিতা থেকে সাব্যস্ত হয় না এবং সে সন্তানও পিতা পরস্পরের থেকে উত্তরাধিকার স্বত্ব পায় না। যেহেতু উত্তরাধিকার স্বত্ব সাব্যস্ত হয় 'নসব' তথা পৈত্রিকসূত্রে আত্মীয়তার ভিত্তিতে, আর এখানে তো সেটা নেই। তবে উক্ত সন্তানের বংশধারা যেহেতু 'মা' থেকে সাব্যস্ত হয়, তাই সে সন্তান এবং মা পরস্পরের উত্তরাধিকার স্বত্ব পায়।

اَبْوَابُ الْوَصَايَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صـ٣٣

وَصَايَا শব্দটি وَصِيَّةٌ শব্দের বহুবচন। যেমন, هَدَايَا শব্দটি هَدَايَةٌ শব্দের বহুবচন। বলা হয়ে থাকে وَصَيْتُ لَهٗ اَوْصَى اِيْصَاءً بِكَذَا আমার মৃত্যুর পর তাকে অমুক বিষয়ের মালিক নির্ধারন করলাম বা তার জন্য উইল করলাম। اَوْصَى لَهٗ بِكَذَا فُلَانٌ بِكَذَا অমুক ব্যক্তি অমুক জিনিসের অয়াছিয়াত করল, উপদেশ বা নির্দেশ দিল। তার জন্য অমুক বিষয়ের অয়াছিয়াত বা উইল করল। وَصِيَّة শব্দটি اِيْصَاء তথা অয়াছিয়াত করার অর্থেও ব্যবহার হয় এবং مَا يُوْصَى بِهٖ তথা যে জিনিসের অয়াছিয়াত করা হয়েছে ,সে জিনিসের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

(মিসবাহুল লুগাত ও বযলুল মাযহূদ)

ইসলামী শরীয়তে 'অয়াছিয়াত' বলা হয়- هُوَ عَهْدٌ خَاصٌّ مُضَافٌ اِلَى بَعْدَ الْمَوْتِ অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ অঙ্গীকারকে 'অয়াছিয়াত' বলা হয়। (বযলুল মাযহূদ)

উলামায়ে যাওয়াহেরের মতে অয়াছিয়াত করা ওয়াজিব। অন্যান্য সকল ইমামের মতে অয়াছিয়াত কর মুস্তাহাব। মূলতঃ মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ওসিয়ত ওয়াজিব ছিল। অর্থাৎ নিজের ধন-সম্পদ নিজের পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য স্বেচ্ছায় উইল করে যাওয়া ওয়াজিব ছিল। অতঃপর যখন মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন সেখানে প্রত্যেকের নির্ধারিত অংশের বিবরণ স্পষ্ট হয়ে গেলো, তাই অয়াছিয়াত ওয়াজিব হওয়ার বিধানটি রহিত করা হল। তবে হ্যাঁ, এরপরেও 'মুসতাহাব' হিসেবে কোন ব্যক্তি যদি চায় জীবন সায়াহ্নে এসে সে কিছু ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে কিংবা নিজের একান্ত কোন প্রিয়জনকে দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে সুতরাং অয়াছিয়াতের সে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে অয়াছিয়াত করতে পারবে।

জাহিলিয়াতযুগে অয়াছিয়াত করার কোন নিয়মনীতি ছিল না। অয়াছিয়াতকারী ওয়াসিয়াত পরিমাণ এবং যার জন্য অয়াছিয়াত করল তার নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। অয়াছিয়াতকারী যার জন্য ইচ্ছা অয়াছিয়াত করত, যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করত। সম্পূর্ণ সম্পদ একজনের জন্যও অয়াছিয়াত করার স্বাধীনতা তার ছিল। ইসলাম এ জাহিলী পন্থাকে বাতিল করেছে এবং অয়াছিয়াতের জন্য শর্ত ও মূলনীতি ছিক করেছে। অসিয়তকারীর জন্য এসব মূলনীতি ও শর্ত লংঘন করা জায়েয নেই। (তুহফা, মাজাহিরে হক)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ صـ٣٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১. অয়াছিয়ত হয় এক তৃতীয়াংশে

حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِى عُمَرَ ـ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَاَتَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِى، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِى مَالًا كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِى اِلَّا ابْنَتِى اَفَاُوْصِى بِمَالِى كُلِّهٖ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَثُلُثَى مَالِى ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : فَالشَّطْرُ قَالَ: لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، اِنَّكَ اِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً اِلَّا اُجِرْتَ فِيْهَا حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا اِلَى فِى اِمْرَأَتِكَ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِى ؟ قَالَ : اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِى

فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ . اَللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

قَالَ أَبُوعِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ .

১. ইবনে আবূ উমার রহ. .... আমির ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তার পিতা সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর এমন অসুস্থ হয়ে পড়ি যে, মৃত্যুর সন্নিকটে হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার তো অনেক ধন-সম্পদ অথচ আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ আমার ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার সমুদয় সম্পদ অয়াছিয়ত করে যাব ? তিনি বললেন , না। আমি বললাম, তবে কি দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ করব ? তিনি বললেন, না। ইম বললাম, অর্ধেক সম্পদ অয়াছিয়ত করব ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অয়াছিয়াত করব ? তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ ও পার। এক তৃতীয়াংশও অনেক। মানুষের সা মনে হাত পাতবে ওয়ারিআনকে এমন দরিদ্র ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম হল, তুমি তাদেরকে স্বচ্ছল রেখে যাবে। তুমি ভরণ-পোষণে যা কিছুই ব্যয় করবে, এর প্রতিফল অবশ্যই পাবে। এমন কি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লুকমা তুলে দিবে, তাতেও তোমার জন্য সওয়াব আছে।

সা'দ রাযি. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার হিজরতের পরেও থাকব ? তিনি বললেন, তুমি আমার পরেও যখন থাকবে তখন যে আমলই আল্লাহর উদ্দেশ্য করবে, তার বিনিময়ে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। হয়ত তুমি পরে আরও বাঁচবে। এমনকি তোমার দ্বারা বহু জাতি উপকৃত হবে এবং অপর বহুজন ক্ষতিগ্রস্থ হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাহাবীদের হিজরত পরিপূর্ণ কর তাদের পিছনে ফিরিয়ে নিও না। তবে আফসোস! সাদ ইবনে খাওলার জন্য ।সাদ ইবনে খাওলা মক্কায়ই মারা যান বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুঃখ প্রকাশ করছিল। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. থেকে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এক তৃতীয়াংশের অধিক অয়াছিয়াত করা কারও জন্য বৈধ নয়। এক তৃতীয়াংশ থেকেও কিছু কম করা মুস্তাহাব বলে কোন কোন আলিম মত দিয়েছেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– এক তৃতীয়াংশও তো অনেক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বিরোধ ও সমাধান

مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ الخ : বুখারী, মুসলিমের বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে দশম হিজরীর শেষভাগে বিদায়ী হজ্বের সফরে। আর ইমাম তিরমিযী রহ. এর উক্ত বর্ণনা মতে বুঝা যায়, ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের সফরে ঘটেছে। সুতরাং উভয় প্রকার বর্ণনায় বিদ্যমান পরস্পর বিরোধের সমাধান কি ? এর সমাধানকল্পে কোন কোন আলেম বলেন, উক্ত ঘটনা দু'বার সংগটিত হয়েছে। প্রথমবার ফতহে মক্কার সফরে এবং দ্বিতীয়বার বিদায় হজ্বের সফরে। প্রথমবার হযরত সা'দ রাযি. এর কোন সন্তান ছিল না। দ্বিতীয়বার তাঁর শুধু একটি কন্যা সন্তান ছিল। কিন্তু এ উত্তরটি পুরোপুরি মনঃপূত নয়। কারণ, হযরত সা'দ যখন মক্কা বিজয়ের সফরে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অসিয়তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার উত্তরও দিয়েছেন। তার মাত্র দু' বছরের মাথায় কিভাবে তিনি গেলেন যে, উক্ত প্রশ্নই পুনরাবৃত্তি করলেন। প্রকৃতপক্ষে তিরমিযীর বর্ণনায় ইবনু উয়াইনা সন্দেহযুক্ত রাবী। অন্যথায় ইমাম যুহরীর অধিকাংশ শাগরিদের বর্ণনা হল, ঘটনাটি বিদায় হজ্বের সময়ের ঘটেছে। –তাকমিলাহ

لَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي الخ ঃ হযরত সা'দ রাযি. এর একথার উদ্দেশ্য হল, ذَوِي الْفُرُوْضِ এর মধ্যে আমার একটি কন্যা ছাড়া অন্য কোন নিকটাত্মীয় নেই। কারণ, অন্যান্য আত্মীয় এবং 'আছাবা' তো হযরত সা'দের অনেকই ছিল। সা'দ রাযি. এর মেয়ের নাম অনেকের মতানুযায়ী 'আয়েশা' ছিল। (তুহফাহ)

اَلثُّلُثُ كَثِيْرٌ ঃ এর দ্বারা বুঝা যায়, অয়াছিয়াত বেশির চেয়ে বেশি এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে করা যাবে। তাই ইমাম বুখারী রহ. শিরোনাম দিয়েছেন بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ। হাফেয ইবনে হাযার রহ. লিখেন, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম এক মত যে, এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদে অয়াছিয়াত করা যাবে না। যদি কেউ সমস্ত সম্পত্তিরও অয়াছিয়াত করে, তবুও এক তৃতীয়াংশের অধিক অয়াছিয়াত কার্যকর হবে না। উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির যদি ওয়ারিস না থাকে তাহলে এটাই সর্বজনবিদিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস থাকে তাহলে এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ অয়াছিয়াত করা যাবে কিনা– এ ব্যাপারে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। জমহূর উলামায়ে কিরাম বলেন, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস থাকাকালীনও এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ অয়াছিয়াত করা যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, ইসহাক এবং আহমদ ইবনে রহ. এর এক বর্ণনা মতে এমতাবস্থায় এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ অয়াছিয়াত করা যাবে। তবে শর্ত হল ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে এর অনুমতি থাকতে হবে। যেমন, 'হেদায়াহ'গ্রন্থে রয়েছে–

ثُمَّ تَصِحُّ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَلَا تَجُوْزُ بِمَازَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ تُجِيْزَهَا الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُمْ كِبَارٌ لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّهِمْ وَهُمْ أَسْقَطُوْهُ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِإِجَازَتِهِمْ فِي حَالِ حَيَاتِهِ .

"কোন ব্যক্তির জন্য এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওয়ারিসদের অনুমতি ব্যতীত অয়াছিয়াত করা জায়েয আছে। আর এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদে অয়াছিয়াত জায়েয নেই। তবে এ ব্যক্তির মৃত্যুর পর যদি তার প্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিসরা অনুমতি দেয়, তাহলে এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদেও অয়াছিয়াত জায়েয হবে। কারণ, এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদে অকার্যকর ছিল ওয়ারিসদের হকের কারণে। সে হক তো তারা সেচ্ছায় প্রত্যাহার করল। আর এ ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় ওয়ারিসদের অনুমতি বিবেচ্য নয়।"

বলা বাহুল্য যে, وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ এ থেকে উলামায়ে কিরাম বলেছেন, এক তৃতীয়াংশের কম সম্পদে অয়াছিয়াত করা মুস্তাহাব। যেমন, হিদায়া গ্রন্থে এসেছে–

وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يُوْصِيَ الْإِنْسَانُ بِدُوْنِ الثُّلُثِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْوَرَثَةُ أَغْنِيَاءَ أَوْ فُقَرَاءَ .

ওয়ারিসরা ধনী হোক কিংবা ফকীর, কোন ব্যক্তির জন্য এক তৃতীয়াংশের কম সম্পদে অয়াছিয়াত করা মুস্তাহাব।

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ঃ বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করা এবং ওয়ারিসদের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়াও আল্লাহ পাকের নিকট সদকা বলে গণ্য। শর্ত হল, সাওয়াবের নিয়ত করতে হবে।

لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ঃ এ ছিল হযরত সা'দ রাযি. এর জন্য এমন এক সুসংবাদ, যার কল্পনাও কেউ করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একথার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলা তোমার থেকে আরও অনেক কাজ নিবেন। তুমি 'ইনশাআল্লাহ' এ অসুস্থতা থেকে পরিত্রান পেয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাকে আরও হায়াত দান করবেন, তোমাকে আরও সম্মানিত করবেন। তোমার হাতে জাতির ভাগ্য রচিত হবে, পরিবর্তন হবে। একথাটি নবীজী হযরত সা'দকে উদ্দেশ্য করে দশম হিজরীতে বলেছিল। যখন হযরত সা'দ একেবারে মৃত্যুর দুয়ারে চলে গিয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।

দেখা গেছে, হযরত সা'দ রাযি. এর পরেও প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত জীবিত ছিল। "অনেক লোক তোমার দ্বারা উপকৃত হবে আবার কেউ কেউ তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে" –এর দ্বারা উদ্দেশ্য কাফেররা তোমার দ্বারা পদদলিত হবে। এ ভবিষ্যতবাণীটি বিশেষ করে কাদিসিয়ার যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়া পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা বিজিত হয় হযরত সা'দ রাযি. এর হাতেই। অতঃপর তিনি ইরাকের গভর্ণরও হয়ে ছিলেন। সা'দ রাযি. সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যদ্বানী নিঃসন্দেহে রাসূলের একটি অন্যতম মু'জিযা। (তাকমিলাহ)

وَلٰكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَه ঃ একথার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ আফসোস প্রকাশ করেছেন যে, সে হিজরত করে পুনরায় মক্কাতে এসে মারা গেল। কথাটি রাসূল ﷺ দয়া প্রকাশপূর্বক বলেছেন যে, তার একান্ত বাসনা ছিল দারুল হিজরত তথা মদীনাতে ইনতেকাল করার, কিন্তু তার আশা পূর্ণ হল না। অধিকাংশ উলামা রাসূল ﷺ এর কথাটির ব্যাখ্যা এভাবেই দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তার নিন্দাবাদ করা যে, সে হিজরত না করার কারণে মক্কাতেই মারা গেল। কিন্তু এ ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, ইমাম বুখারী এবং ইবনে হিশাম প্রমুখের মতে তিনি মক্কা থেকে হিজরত করেছিল, এমনকি বদর যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। অতঃপর বিদায় হজ্বের বছর মক্কাতেই ইনতেকাল করেছেন। –তাকমিলাহ, তোহফাহ

উল্লেখ্য, উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন যে, যদি কোন মুহাজিরের মৃত্যু মক্কাতে হয় তাহলে দারুল হিজরত তথা মদীনায় ইনতেকাল করার সওয়াব বাদ হয়ে যাবে কিনা ? কেউ কেউ বলেন, এরূপ কোন কিছু যদি স্বেচ্ছায় হয়, তাহলে দারুল হিজরতে ইনতেকাল করার সাওয়াব পাবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, সর্বাবস্থাতেই মুহাজির দারুল হিজরতে ইনতেকাল করার সাওয়াব পাবে।

মাসায়েল ঃ এই হাদীস থেকে কয়েকটি জিনিস জানা গেল।

(ক) নিজের সম্পদ অন্যদেরকে দেওয়ার তুলনায় নিজের আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে খরচ করা ভালো।

(খ) নিজের পরিবার-পরিজনের পেছনে ব্যয় করার দ্বারা সাওয়াব লাভ হয়, তবে শর্ত হল, আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত থাকতে হবে।

(গ) যদি কোন বৈধ কাজও সাওয়াবের নিয়তে করা হয়, তাহলে সে মুবাহ কাজও সাওয়াবের বিষয় হয়ে যায়।

بَابٌ فِى الضِّرَارِ فِى الْوَصِيَّةِ ص٣٣

অনুচ্ছেদ ঃ ২. অয়াছিয়্যতের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ব্যবস্থা নেওয়া।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ جَدُّ هٰذَا النَّصْرِ ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ـ ثُمَّ قَرَأَ عَلَىَّ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ إِلٰى قَوْلِهِ : ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ـ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الَّذِىْ رَوٰى عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ جَابِرٍ هُوَ جَدُّ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ ـ

২. নাসর ইবনে আলী রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পুরুষ ও মহিলা ষাট বছর আল্লাহর ফরমাবরদারীতে আমল করে যায় কিন্তু মওত যখন তাদের হাযির হয় তখন অয়াছিয়তের ক্ষেত্রে তারা ক্ষতিকর ব্যবস্থা নিয়ে বসে। ফলে তাদের জন্য জাহান্নাম হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। এরপর আবূ হুরাইরা রাযি. আমার সামনে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ : ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

(এই বণ্টন বিধান) যা অছিয়ত করা হয়, তা প্রদান এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। এ আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।....

এসব আল্লাহর নির্দ্ধারিত সীমা যে আল্লাহর ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে দাখেল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; যেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এতো মহা সাফল্য। (সূরা নিসা ঃ ৪/১২. ১৩)

এ সূত্রে হাদীসটি হাসান গরীব। আশআছ ইবনে জাবির রহ. থেকে যে নাসর ইবনে আলী হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি হল প্রসিদ্ধ রাবী নাসর ইবনে আলী জাহযামী রহ. এর দাদা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের মাধ্যমে ইসলামে বান্দার হক্বের গুরুত্ব প্রকাশ পায়। ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে অয়াছিয়াত করা কিংবা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করার নিয়তে অয়াছিয়াত করা কিংবা অসিয়তের মাধ্যমে ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করে ওয়ারিসদের উপর নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করা মানে বান্দার হক নষ্ট করা। যা নিঃসন্দেহে অমানবিক কাজ এবং গুণাহও

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ صـ٣٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৩. অয়াছিয়াত করতে উৎসাহ দান।

حَدَّثَنَا بْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَايُوصَى فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِىَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৩. ইবনে আবূ উমার রহ. .... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির হক নেই তার কাছে অয়াছিয়াত করার মত কিছু থাকলে অয়াছিয়াতনামা না লিখে দুটি রাত অতিবাহিত করবে।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। যুহরী-সালিম-ইবনে উমার রাযি. নবী কারীম ﷺ সনদেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আহল যাওয়াহের, আ'তা ইবনে জারীর এবং ইমাম শাফিঈ রহ. এর সর্বপ্রথম অভিমত হল, অয়াছিয়াত সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। আর জমহূরের অভিমত হল, যে ব্যক্তির দায়িত্বে ঋণ অথবা হুকুকুল ইবাদ আছে, তার জন্য উক্ত ঋণ পরিশোধ এবং হুকুকুল ইবাদ আদায়ের অয়াছিয়াত লিখে যাওয়া ওয়াজিব।

আল্লামা শামী রহ. লিখেছেন, অয়াছিয়াত চার প্রকার।

(১) ওয়াজিব। যেমন আমানত এবং অজ্ঞাত ঋণ পরিশোধ করার অয়াছিয়াত।

(২) মুসতাহাব অয়াছিয়াত। যেমন, কাফ্‌ফারা ও নামাযের ফিদ্‌য়া ইত্যাদির অয়াছিয়াত।

(৩) মুবাহ অয়াছিয়াত। যেমন, ধনী দূরাত্মীয় কিংবা নিকটাত্মীয়ের জন্য কোন কিছু অয়াছিয়াত।

(৪) মাকরূহ অয়াছিয়াত। যেমন, ফাসেক ও গুণাহগারের জন্য কোন কিছুর অয়াছিয়াত করা।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُوصِ ص ۳۳

অনুচ্ছেদ ঃ ৪. নবী কারীম ﷺ অয়াছিয়াত করেন নাই।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَتِ الْوَصِيَّةُ وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ

৪. আহমাদ ইবনে মানী‘ রহ. .... তালহা ইবনে মুসাররিফ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবূ আওফা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি অয়াছিয়াত করেছেন ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তা হলে অয়াছিয়াতের বিধান কেমন্‌ করে হল এবং মানুষকেও এর নির্দেশ কেমন করে দিলেন ? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে তিনি অয়াছিয়াত করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান–সহীহ। মালিক ইবনে মিগওয়াল রহ. এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তালহা ইবনে মুসাররিফ রাযি. এর প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, শী‘আরা হযরত আলী রাযি. এর ব্যাপারে খেলাফতের অয়াছিয়াত সম্পর্কীয় বিভিন্ন জাল হাদীস রচনা করে। সাহাবায়ে কিরাম এমনকি স্বয়ং আলী রাযি. তা প্রতিহত করেছেন। এরই সূত্র ধরে কিছু মানুষের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হয় যে, হয়ত রাসূল ﷺ নিজের কোন নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে সম্পদের অয়াছিয়াত করেছেন। অনুরূপ প্রশ্ন তালহা ইবনে মুছাররিফের অন্তরেও সৃষ্টি হলে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাযি. এর কাছে জানতে চান। আব্দুল্লাহ রাযি. স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছেন, খেলাফত এবং সম্পদের ব্যাপারে নবীজী ﷺ এ কোন অসিয়তেই ছিল না।

فَقَالَ لَا ঃ প্রশ্ন হয়, হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. ‘রাসূল ﷺ থেকে কোন অয়াছিয়াত নেই’ এভাবে বললেন কেন ? অথচ অনেক বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে অয়াছিয়াত বিদ্যমান একথা প্রমাণিত। যেমন, তিনি অয়াছিয়াত করেছিল, জাযীরাতুল আরবে যেন কোন মুশরিক বসবাস করতে না পারে।

এর উত্তরে বলা হবে, হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. প্রশ্নকারীর বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বুঝে নিয়েছেন যে, প্রশ্নটি ছিল। রাসূল ﷺ এর ত্যাজ্য সম্পত্তি এবং খেলাফতের ব্যাপারে। তাই তিনি প্রশ্নের মত করে উত্তর দিয়েছেন।

أَوْصَى بِكِتَابِ اللّٰهِ ঃ সম্ভবতঃ হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. একথা দ্বারা প্রসিদ্ধ হাদীস تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابُ اللّٰهِ এর দিকে ইংগিত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ صـ٣٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৫. ওয়ারিসানের জন্য অয়াছিয়াত নাই।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعْطٰى لِكُلِّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ ، اِدَّعٰى إِلٰى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انْتَمٰى إِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ التَّابِعَةُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ لَاتُنْفِقُ إِمْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ ذَالِكَ اَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ : اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ ـ

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ وَأَنَسٍ وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ وَرِوَايَةُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ لَيْسَ بِذَالِكَ فِيْمَا تَفَرَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ رَوٰى عَنْهُمْ مَنَا كِيْرَ وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ هٰكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ حَدِيْثًا مِنْ بَقِيَّةَ وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيْثُ مَنَا كِيْرُ عَنِ الثِّقَاتِ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ يَقُوْلُ قَالَ أَبُوْ إِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ خُذُوْا عَنْ بَقِيَّةَ مَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ وَلَا تَأْخُذُوْا عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ وَلَا عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ ـ

৫. হান্নাদ ও আলী ইবনে হুজর রহ. .... আবূ উমামা বাহিলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে খুতবায় বলতে শুনেছি ঃ "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হক ওয়ালার হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ারিসানের জন্য কোন অয়াছিয়াত নেই, সন্তান হল বৈধ শয্যার আর ব্যাভিচারীর জন্য হল পাথর। আর তাদের আসল হিসাব-নিকাশ হল আল্লাহর যিম্মায়।

কেউ যদি পিতা ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে পিতা বলে পরিচয় দেয় বা প্রকৃত মাওলা বা আযাদ কর্তা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি মাওলা বলে নিসবত করে তবে অব্যাহত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর লানত পড়বে।

স্বামীর অনুমতি ব্যতিত কোন মহিলা স্বামীর ঘরের কিছু ব্যয় করতে পারবে না। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদ্য সামগ্রীও নয় ? তিনি বললেন, এতো আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। তিনি আরও বলেন, আরিয়াত অবশ্যই আদায়যোগ্য। দুধের জন্য দানকৃত পশু ফেরৎযোগ্য। ঋণ অবশ্যই পরিশোধনীয়। যামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে।

এ বিষয়ে আমর ইবনে খারিজা, আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি হাসান। এ সূত্র ছাড়াও আবূ উমামা রাযি. এর বরাতে নবী কারীম ﷺ থেকে তা বর্ণিত আছে। ইসমাঈল ইবনে আয়্যাশের যেসব রিওয়ায়াত ইরাক ও হিজাযবাসী থেকে এককভাবে বর্ণিত, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

কারণ, তিনি এদের থেকে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে শামবাসীদের বরাতে তাঁর রিওয়ায়াতসমূহ অধিক সহীহ। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) রহ. বলেছেন, আহমাদ ইবনে হাসান রহ কে বলতে শুনেছি যে, আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহ. বলেছেন, বাকিয়্যার তুলনায় ইসমাঈল ইবনে আয়্যাশের হাল ভাল। নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকেও বাকিয়্যার বহু মুনকার রিওয়ায়াত রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রহ. বলেছেন, যাকারিয়্যা ইবনে আদীকে বলতে শুনেছি যে, আবু ইসহাক ফাযারী রহ. বলেছেন, নির্ভরযোগ্য রাবীদের কাছ থেকে বাকিয়্যা যা বর্ণনা করেন, তা তোমরা গ্রহণ কর আর ইসমাঈল ইবনে আয়্যাশ নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য যাদের বরাতেই বর্ণনা করুন না কেন তা গ্রহণ করবে না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَلٰى نَاقَتِهٖ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيْلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ أَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَمَنِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انْتَمٰى إِلٰى غَيْرِ رَغْبَةٍ عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ـ قَالَ : وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا أُبَالِيْ بِحَدِيْثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَوَثَّقَهُ وَقَالَ : إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِيْهِ ابْنُ عَوْنٍ ثُمَّ رَوٰى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِيْ زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ـ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

৬. কুতায়বা রহ. .... আমর ইবনে খারিজা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ তাঁর উটের উপর আরোহী অবস্থায় ভাষণ দিয়েছিল। আমি একটির গলার নিচে দাঁড়ানো ছিলাম। এটি জাবর কাটছিল আর এর লালা বেয়ে পড়ছিল আমার কাঁধের মাঝ দিয়ে তাঁকে তখন বলতে শুনেছিলামঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পাওনাদারের পাওনা দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ারিসের জন্য অয়াছিয়াত নেই, সন্তান হল বৈধ শয্যার আর ব্যভিচারীর জন্য হল পাথর। কেউ যদি অনীহাবশত পিতা ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে পিতা বলে পরিচয় দেয় বা প্রকৃত মাওলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি মাওলা বলে নিসবত করে, তবে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত পড়বে। আল্লাহ তার ফরয বা নফল কোন ইবাদাতই কবুল করবেন না।আহমাদ ইবনে হাম্মল রহ. বলেন, রাবী শাহর ইবনে হাওশাব এর হাদীস সম্পর্কে আমি পরোয়া করি না। **ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী রহ. বলেন,** আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী রহ.) কে শাহর ইবনে হাওশাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, শুধুমাত্র ইবনে আওনই তার সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ইবনে আওনই আবার হিলাল ইবনে আবূ যায়নাব সূত্রে শাহর ইবনে হাওশাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ঃ অর্থাৎ সন্তান বিছানাওয়ালার জন্য। মহিলাকে বিছানা বলা হয়, যেহেতু পুরুষ তাকে বিছানার মত ব্যবহার করে। বাক্যের উদ্দেশ্য হল, মহিলার মালিক। সুতরাং মর্মার্থ দাঁড়াল যে, কেউ যদি কোন মহিলার সঙ্গে যিনা করে এবং এর কারণে বাচ্ছা জন্ম নেয় তবে এ বাচ্চার বংশ যিনাকারী থেকে সাব্যস্ত হবে না। বরং বাচ্চার বংশ মহিলার মালিকের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে। মহিলার মালিক স্বামী হোক অথবা মনিব। অবশ্য স্বামী বাচ্চা অস্বীকার করলে লি'আনের মত পরিস্থিতি এসে যাবে। মোটকথা, স্বাধীনা মহিলা বিয়ের সুবাদে স্বামীর ফিরাশ বা বিছানা বিধায় সন্তান-সন্তুতি শুধু স্বামীর দিকেই সম্বন্ধযুক্ত হবে। এ ব্যাপারে কারো কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যদি লি'আনের পরিস্থিতি চলে আসে, সেটা ভিন্ন কথা।

وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ঃ এর প্রকৃত অর্থ এল, ব্যাভিচারীর জন্য বাঞ্চনা। যেমন, আমরা সাধারণ কথাবার্তায় এ ধরনের লোকের বেলায় বলি থাকি, 'যে কিছুই পায় না, সে পাবে মাটি আর পাথর'। অতএব যিনার কারণে নসব তথা ধ্বংস সাব্যস্ত হয় না, সেহেতু আরজ সন্তানের মীরাসের অধিকার কিছুই হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত বাক্যের অর্থ হল, ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তারাঘাতে হত্যা। কিন্তু এ ব্যাখ্যা প্রশ্নসাপেক্ষ। কেননা সব ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তারাঘাতে হত্যা নয়।

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ঃ নিজের পিতাকে অস্বীকার করে অন্য কাউকে পিতা সাব্যস্ত জঘন্যতম হীনমানসিকতা। এতে নিজের বংশ সম্পর্কেও মিথ্যাচার হয় এবং আল্লাহ হীনমানসিকতা। এতে নিজের বংশ সম্পর্কেও মিথ্যাচার হয় এবং আল্লাহ তা'আলাও না শোকরি হয়।

لَاتُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ঃ স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে অথবা ইঙ্গিতে কিংবা প্রচলনের দিক থেকে অনুমতি লাভ করে, তাহলে তার জন্য স্বামীর ঘর থেকে ব্যয় করা জায়েয আছে, বরং এ ব্যয় দ্বারাও সে সাওয়াব পাবে। অনুমতি না থাকলে জায়েয নেই। তখন এ ব্যয় তার জন্য আখিরাতে বিপদজনক হয়ে প্রকাশ পাবে।

وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ঃ কারো কোন জিনিস ধার নিলে তা মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। কেননা এ মাল আমানদ হিসাবে গন্য।

اَلْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ ঃ اَلْمِنْحَةُ অর্থ হল, কেউ কাউকে নিজের জন্তু দুধ পানের জন্য প্রদান করা অথবা বাগান-বাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য অনুমতি প্রদান করা। সুতরাং اَلْمِنْحَةُ তে যেহেতু শুধু উপকারের মালিক বানানো হয়, তাই সেই উপকৃত হওয়ার পর সে জিনিস তার মালিককে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব।

اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ঃ ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব।

اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ ঃ জামিন জামানত পূর্ণ করার জন্য বাধ্য। অর্থাৎ কেউ যদি কারো ঋণ ইত্যাদির জামিন হয়, তাহলে তা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব।

بَابُ مَاجَاءَ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ص۳۳

অনুচ্ছেদ ঃ ৬. অয়াছিয়াতের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে

حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي عُمَرَ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُوْنَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ - قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

৭. ইবনে আবূ উমার রহ. .... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ অয়াছিয়াতের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তোমরা আয়াতে ঋণের পূর্বে অয়াছিয়াত এর কথা পড়ে থাক। (সূরা নিসা ঃ ৪/১২)

এতদনুসারে সকল আলিমের আমল রয়েছে যে, অয়াছিয়াতের পূর্বে প্রথমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের ব্যাখ্যা بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْاِخْوَةِ مِنَ الْاَبِ وَالْاُمِّ এর অধীনে করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ أَوْيُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ ص-٣٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৭. মৃত্যুর সময় কেউ সাদকা করলে বা গোলাম আযাদ করলে

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ـ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ أَبِى حَبِيَّةَ الطَّائِيِّ قَالَ : أَوْصٰى إِلَىَّ أَخِى بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ إِنَّ أَخِى أَوْصٰى إِلَىَّ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ فَأَيْنَ تَرٰى لِى وَضْعَهُ فِى الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَسَاكِيْنِ أَوِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِيْنَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَثَلُ الَّذِى يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِى يُهْدِى إِذَا شَبِعَ ـ قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

৮. বুনদার রহ .... আবূ হাবীবা তাঈ রহ. বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভাই আমার জন্য তার সম্পদের এক অংশ অয়াছিয়াত করেছিল। তারপর আবূ দারদা রাযি. এর সঙ্গে আমি সাক্ষাত করে বললাম, আমার ভাই তার সম্পদের এক অংশ আমার জন্য অয়াছিয়াত করেছে। আপনি আমার জন্য এ সম্পদ কোথায় ব্যয় করা ভাল মনে করেন ? ফকীরদের জন্য না মিসকীনদের জন্য না আল্লাহর পথের মুজাহিদীনের জন্য ? তিনি বললেন, আমি হলে মুজাহিদীনের সমপর্যায়ের কাউকে মনে করতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় গোলাম আযাদ করে, সে হল ঐ ব্যক্তির মত, যে পেট ভরে খাওয়ার পর হাদিয়া দেয়। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মৃত্যুর সময় আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা অথবা গোলাম আযাদ করা সাওয়াবের কাজ। যেমনিভাবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দেওয়া, তার সাথে উদারতা দেখানো সাওয়াবের কাজ।

بَابٌ ص-٣٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৮. .... ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : اِرْجِعِىْ إِلٰى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا اَنْ اَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنُ لِى وَلَاؤُكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوْا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ وَيَكُوْنُ لَنَا وَلَاؤُكِ فَلْتَفْعَلْ فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ابْتَاعِى فَاعْتِقِى فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ ـ

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ـ

৯. কুতায়বা .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, বারীরা রাযি. তার কিতাবাত চুক্তির (অর্থের বিনিময় বিষয়ে সাহায্যের জন্য আয়েশা রাযি. এর কাছে এসেছিল। আর তিনি তার কিতাবাত চুক্তির কোন কিছুই আদায় করেননি। আয়েশা রাযি. তাকে বললেন, তোমার মালিকের কাছে যাও। তারা যদি পছন্দ করে যে তোমার পক্ষ থেকে আমি কিতাবাত চুক্তির অর্থ আদায় করে দিব আর ওয়ালা স্বত্ব হবে আমার, তবে আমি তা করতে প্রস্তুত আছি। বারীরা রাযি. তার মালিকের নিকট এ কথা আলোচনা করেন। কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, তিনি (আয়েশা রাযি.) ইচ্ছা করলে সাওয়াবের আশায় তোমাকে সাহায্য করতে পারেন কিন্তু তোমার ওয়ালা স্বত্ব থাকবে আমাদের।

আয়েশা রাযি. বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উত্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করবে তারই হবে ওয়ালা স্বত্ব। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, কি হল সম্প্রদায়গুলোর, এমন সব শর্ত তারা করে যেগুলোর কোন উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে নেই। কেউ যদি এমন শর্তারোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই তবে একশ শর্ত করলেও কিছু হবে না।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আয়েশা রাযি. থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আযাদ করবে তারই হবে ওয়ালা স্বত্ব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

গোলাম এবং তার মালিকের মধ্যকার এক প্রকারের চুক্তিকে مُكَاتَب বলা হয়। যার সূরত হল, গোলামের মালিক গোলামকে এ শর্তে আযাদ করল যে, এত টাকা আমাকে এত দিনের মধ্যে পরিশোধ করবে, তাহলে তুমি আযাদ। আর গোলামও এ শর্তকে মেনে নেয়। তারপর গোলাম নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিনিময় পূরণ করলে সে আযাদ হয়ে যায়। আর পূরণ করতে না পারলে গোলাম গোলামই থেকে যায়।

حَقِّ وَلَاء ঃ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা করে এসেছি। সংক্ষেপে বলা যায়, মুক্ত ক্রীতদাসের ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারকে حَقِّ وَلَاء বলা হয়। ذَوِى الْفُرُوض এবং عَصَبَه না থাকলে যে ব্যক্তি গোলাম মুক্ত করেছে। সে এ ওয়ারিসী স্বত্ব লাভ করে।

বারীরা হযরত আয়েশা রাযি. এর ক্রীতদাসী। এর পূর্বে যে ছিল একজন ইয়াহুদীর ক্রীতদাসী। বারীরা তার ইয়াহুদী মালিকের সঙ্গে নয় আওকিয়ার (প্রতি আওকিয়া সমান চল্লিশ দিরহাম) বিনিময়ে 'মুকাতাবাত চুক্তি' করেছিল। প্রতি বছর এক আওক্বিয়া করে দিতে হবে। বারীরা হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট এসে চুক্তির বৃত্তান্ত জানাল এবং তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করল। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, যদি তোমার মালিক রাজি হয়, তাহলে আমি এক সঙ্গে তোমার চুক্তি বিনিময় আদায় করে দিতে পারি এবং তোমাকে তার কাছ থেকে ক্রয় করে আযাদ করে দিতে পারি। বলা বাহুল্য যে, তখন তোমার حَقِّ وَلَاء এর মালিক আমি হব। ইয়াহুদী মালিক এ প্রস্তাব শুনে বলল, আমি এক শর্তে এভাবে বিক্রি করতে পারি, তাহল حَقِّ وَلَاء আমার থাকবে। ইয়াহুদীর এই শর্ত যেহেতু সম্পূর্ণ শরী'আত পরিপন্থী ছিল, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত কথা বলেছেন।

ابواب الولاء والهبة

عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ صـ٣٣

ওয়ালা এবং হেবা অধ্যায়

بابُ ماجاءَ أنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أعْتَقَ صـ٣٣

অনুচ্ছেদ ঃ ১. যে ব্যক্তি আযাদ করবে তার হবে ওয়ালা স্বত্ব

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ـ حدثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ ـ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبراهيم عَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا أرَادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الوَلاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَلْوَلاءُ لِمَنْ أعْطَى الثَّمَنَ أوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ـ

قَالَ أبُو عِيسَى : وَفِي البَابِ عَنْ إبْنِ عُمَرَ وَأبِي هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ ـ

১. বুন্দার .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরা রাযি. কে কিনতে চাইলেন। কিন্তু তার মালিক পক্ষ নিজেদের জন্য ওয়ালা স্বত্বের শর্তারোপ করে। তখন নবী কারীম ﷺ বললেন, যে মূল্য দিবে তারই হবে ওয়ালা স্বত্ব (অথবা বলেছেন) যে আযাদ করার নিয়ামতের অভিভাবক হবে তারই হবে ওয়ালা স্বত্ব। এ বিষয়ে ইবনে উমার ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

(بالفتح والمدّ) اَلْوَلاءُ শব্দটি (بفتح الواو وسكون اللام) وَلِيَ থেকে উৎকলিত। অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, সাহায্য করা, ভালো বাসা, বসন্তের প্রথম বৃষ্টির পরবর্তী বৃষ্টি। যেমন, বলা হয়ে থাকে فلانا (ض، س وَلْيًا) وَلِيَ অমুক অমুকের নিকটবর্তী হল। ولي الرّجل লোকটিকে ভালোবাসলো। الرّجل (مُوالان) وَالَى লোকটির সাথে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব করল। وفي المكان বসন্তের বৃষ্টিতে স্নাত বা সিক্ত হল।

পরিভাষায় ولاء বলা হয়। (بالفتح) من المعتق (بالكسر) ميراث المعتق حَقُّ অর্থাৎ ক্রীতদাসকে মুক্ত করার কারণে মুক্তকারীর যে উত্তরাধিকার মুক্তকৃত ক্রীতদাস থেকে অর্জিত হয়। وَلاء দু' প্রকার।

(১) ولاء مُوالات যেমন, একদল মানুষ পরস্পর এমর্মে বন্ধুত্ব স্থাপন করল যে, আমরা পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি এবং কসম করছি যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের ভাল-মন্দ দেখব। জীবনের প্রতিটি স্তরে একে অপরের সহযোগিতা করব। আমাদের একজনের দুশমনকে সকলেই দুশমন করব আর বন্ধুকে মনে করব বন্ধু। অজ্ঞতার যুগে এই وَلاء مُوالات এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাদের মাঝে গোত্রভিত্তিক পারস্পরিক মৈত্রিচুক্তির ব্যাপক প্রচলন ছিল। এতে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করা হত না। ইসলাম আসার পর এ ধরনের মৈত্রিচুক্তি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং ইসলাম শুধু এতটুকুর অনুমোদন প্রদান করে যে, এই وَلاء مُوَالات ন্যায়ের ভিত্তিতে হতে পারবে, অন্যায় ও অবিচারের ভিত্তিতে হতে পারবে না।

(২) ولاء عتاقة, যেমন কোন ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিল। তখন এ মুক্তিদানের কারণে মুক্ত ক্রীতদাস থেকে মুক্তদানকারী এই উত্তরাধিকার পায় যে, ক্রীতদাসের 'আছাবা' (ছেলে-নাতি প্রমুখ) না থাকলে মুক্তকারী তার ওয়ারিসী স্বত্বের অধিকারী হবে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে এ দ্বিতীয় প্রকার وَلاء ই উদ্দেশ্য।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ صـ٢٣

অনুচ্ছেদ ঃ ২. ওয়ালা স্বত্ব বিক্রি করা বা হেবা করা নিষেধ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ وَيُرْوٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ دِيْنَارٍ حِيْنَ حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَذِنَ لِيْ حَتّٰى كُنْتُ أَقُوْمُ إِلَيْهِ فَأُقَبِّلُ رَأْسَهُ وَرَوٰى يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ وَهْمٌ وَهِمَ فِيْهِ يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمٍ، وَالصَّحِيْحُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هٰكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَتَفَرَّدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

২. ইবনে আবূ উমার .... আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বত্ব বিক্রি করা ও হেবা করা নিষেধ করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমর নবী কারীম ﷺ এ সনদ ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবিহিত নই। শু'বা রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রহ. এর বরাতে রিওয়ায়াত করছেন। শু'বা রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রহ. যখন এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করছিলেন, তখন আমার মন চাচ্ছিল তিনি যদি অনুমতি দিতেন তবে তাঁর কাছে উঠে গিয়ে তার মাথায় চুমু খেতাম। ইয়াহইয়া ইবনে সালীম এ হাদীসটি উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার নাফি ইবনে উমার রাযি.– নবী কারীম ﷺ সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে বিভ্রান্তি রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে সালীম এতে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। সহীহ সনদ হল, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমার রাযি. নবী কারীম ﷺ। একধিক রাবী উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার এ হাদীসটির রিওয়ায়াত ক্ষেত্রে একা ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যেমন, এক ব্যক্তি নিজের গোলাম আযাদ করে দেওয়ার কারণে حَقِّ وَلَاء এর মালিক হল। এখন সে এই حَقِّ وَلَاء অন্য কারও কাছে বিক্রি করতে চাইলে কিংবা কাউকে 'হেবা' করতে চাইলে তা করতে পারবে না। এটা জায়িয হবে না। কেননা حَقِّ وَلَاء এমন কোন সম্পদ নয়, যা ক্রয়-বিক্রয় কিংবা 'হেবা' করা যায়। মাসআলাটি সর্বজনবিদিত।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ اَوِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِهٖ صـ٣٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৩. প্রকৃত আযাদকারী ছাড়া অন্য কারো প্রতি ওয়ালার সম্পর্ক করা বা পিতা ছাড়া অন্য কারও প্রতি পিতৃত্বের দাবী করা

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهٗ إِلَّا كِتَابَ اللّٰهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةَ صَحِيْفَةٌ فِيْهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ وَقَالَ فِيْهَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلٰى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمَنِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا أَدْنَاهُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَرَوٰى بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهٗ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩. হান্নাদ .... ইবরাহীম তায়মী তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাযি. আমাদের ভাষণ দিয়েছিল। তিনি বলেছিল, আল্লাহর কিতাব এবং উটের বয়স বিবরনী ও জখম সম্পর্কিত বিভিন্ন আহকাম সম্বলিত এই পুস্তিকাটি ছাড়া আরও কিছু আমার কাছে আছে, যা আমি পাঠ করি, এমন কথা যদি কেউ বলে, তবে সে অবশ্যই মিথ্যা বলছে।

তিনি আরও বলেন, এতে (পুস্তিকাটিতে) আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আয়র ও ছাওর এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু মদীনার হারাম (স্থান) হিসাবে গণ্য। এখানে যে ব্যক্তি কোন বিদাআত কর্ম সংঘটিত করবে বা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও সকল মানুষের লানত। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। কেউ যদি পিতা ছাড়া অন্য কারও দিকে পিতৃত্বের দাবী করে বা স্বীয় মাওলা ছাড়া অন্য কারও প্রতি ওয়ালার সম্পর্ক আরোপ করে তবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও সকল মানুষের লানত। তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না। সকল মুসলিমের নিরাপত্তাদান এক বরাবর। সবচেয়ে নিকৃষ্ট জনের প্রদত্ত নিরাপত্তা রক্ষায়ও প্রয়াস চালানো হবে।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। কতক রাবী এটিকে আমাশ ইবরাহীম তায়মী – হারিছ ইবনে সুওয়ায়দ আলী রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আলী রাযি. থেকে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَنْ زَعَمَ اَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا ঃ একথার মাধ্যমে হযরত আলী রাযি. শী'আ এবং রাফেযীদের কঠোর বিরোধীতা করলেন। যাদের দাবী হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী রাযি. কে কুরআন মজীদ ছাড়া এমন কিছু দিয়েছেন, অন্য কেউ জানে না। তাদের এ দাবী ডাহা মিথ্যা। কেননা আলী রাযি. স্পষ্টভাবে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করেছি এবং কিছু বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ করেছি, যা এই সাহীফাতে আছে। এছাড়া

আমি তাঁর থেকে অন্য কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করেনি এবং তিনি আমাকে কুরআন মজীদ ছাড়া বিশেষ কোন কিতাব দানও করেননি।

هٰذِهِ الصَّحِيْفَة ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ পৃষ্ঠা। যেখানে আলী রাযি. দিয়্যাত, মা'আক্বিল, ফিদয়াহ, ক্বিসাস, আহলে যিম্মার বিধিবিধান, যাকাতের নেসাব এবং মদীনার হারাম সম্পর্কে কিছু নবুবী বাণী লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল। আর এটি তিনি তরবারীর খাপের ভেতরে রাখতেন।

اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلٰى ثَوْر ঃ মদীনা শরীফ এবং 'আইব' পাহাড় ও 'ছাওর' পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান বরকতপূর্ণ ও সম্মানিত। এর মধ্যে এমন কোন কথা আচরণ প্রকাশ করা উচিত নয়, যদ্বারা মদীনা শরীফের মর্যাদাহানী হয়। এটা হল হানাফী মাযহাবের অনুকূলীয় ব্যাখ্যা। কিন্তু ইমাম শাফেঈ রহ. 'হারাম' বলতে মক্কার হারামের মত মদীনার হারামকে 'হারাম' মনে করেন। (বিস্তারিত কিতাবুল হজ্ব এ দ্রষ্টব্য)

لَايُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَاعَدْلٌ ঃ এখানে صرف শব্দ দ্বারা 'ফরয' কিংবা 'নফল' অথবা 'তাওবা' কিংবা 'শাফা'আত' উদ্দেশ্য। তেমনিবাবে عدل শব্দের অর্থ 'ফরয' অথবা 'ফিদ্য়াহ' কিংবা 'তাওবা' বা 'শাফা'আত' ও করা যেতে পারে। প্রসিদ্ধ হল, صرف শব্দের অর্থ ফরয আর عدل শব্দের অর্থ নফল।

من ادعى إلى غير ابيه الخ ঃ জেনে শুনে নিজের পিতাকে ছেড়ে অপর কাউকে নিজের পিতা অভিহিত করা কবীরা গুণাহ। অনুরূপভাবে কোন মুক্ত ক্রীতদাস যদি নিজের 'মুক্তি'কে প্রকৃত ব্যক্তির সঙ্গে সর্ম্পযুক্ত না করে অন্য কারও দিকে তাহলে সেও লা'নতের উপযুক্ত।

ذمة المسلمين واحدة ঃ মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্য, ধনী কিংবা গরীব প্রত্যেকের সঙ্গে এর সম্পর্ক। যেমনিভাবে একজন উঁচু শ্রেণীর মুসলমানের এই অধিকার আছে যে, সে ইচ্ছা করলে কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারবে। তেমনিভাবে একজন নিম্নস্তরের মুসলমানেরও এই অধিকার আছে যে, সে ইচ্ছা করলে যে কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে। আর এই 'নিরাপত্তাচুক্তি'র প্রতি সম্মানজনক লক্ষ্য রাখা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। সুতরাং একজন অতিসাধারণ মুসলমান যদি কোন অমুসলিমকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে কোন মুসলমানের জন্য এ নিরাপত্তার প্রাচীর ভঙ্গ করা জায়েয হবে না।

باب ماجاء فى الرجل ينتقى من ولده ص ٣٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৪. কেউ যদি স্বীয় সন্তানকে অস্বীকার করে।

حدّثنا عبد الجبّار بن العلاء بن عبد عبد الجبّار العطّار وسعيد بن عبد الرّحمن المخزومى قالا : حدّثنا سفيان عن الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبى هريرة قال : جاء رجلٌ من فزارة إلى النّبىّ ﷺ فقال : يارسول اللّه إنّ امرأتى ولدت غلامًا اسود فقال النّبىّ ﷺ : هل لك من إبل ؟ قال: نعم قال: فما ألوانها ؟ قال : حمر، قال : فهل فيها أورق ؟ قال: نعم إنّ فيها لورقا، قال أنّى أتاها ذلك؟ قال: لعلّ عرقا نزعها، قال: فهذا لعلّ عرقا نزعه ـ قال أبوعيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ـ

৪. আবদুল জাব্বার ইবনুল আলা আত্তার এবং সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সন্তান, ফাযারা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী একটি কাল জন্ম দিয়েছে। নবী কারীম ﷺ বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, এগুলোর রং কি ? সে বলল, লাল। তিনি বললেন, এগুলোর মাঝে কোনটি মেটে কাল মিশ্রিত রঙ্গের আছে কি ? সে বলল, হ্যাঁ। এতে মেটে কাল রঙ্গের তো আছে। তিনি বললেন, কোত্থেকে তা এল ? সে বলল, রগের টানে হয়ত এসেছে। তিনি বললেন, তোমার এ ছেলেটিরও হয়ত রগের টানে এ রঙ্গ এসেছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমাম নববী রহ. বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, 'সন্তান' নিজ পিতার রঙের না হলেও তা সে পিতার সাথেই সম্পর্কযুক্ত হবে। যেমন, পিতা শেতাঙ্গ আর সন্তান কৃষ্ণাঙ্গ হলে, তবুও ধরা হবে যে, এ কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান শেতাঙ্গ পিতারই সন্তান। অথবা হয়ত মাতা-পিতা উভয়ই শেতাঙ্গ আর সন্তান হল কৃষ্ণাঙ্গ, তাহলেও এ কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান এই শেতাঙ্গ পিতার সন্তান হিসাবেই বিবেচ্য হবে।

আল্লামা তীবী বলেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, নিছক কোন কারণে কিংবা দুর্বল কোন আলামতের ভিত্তিতে পিতা 'সন্তান'কে অস্বীকার করতে পারবে না বরং এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজের দাবীকে সাব্যস্ত করার জন্য প্রয়োজন হবে শক্তিশালী কোন প্রমাণসূত্র। যেমন, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করা সত্ত্বেও সন্তান জন্ম নেওয়া। এরূপ প্রেক্ষাপটে সন্তানকে অস্বীকার করা জায়েয। (তুহফাহ)

আলোচ্য হাদীসের লোকটি নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি অপবাদ আরোপ করেনি বরং তার অন্তরে শুধু সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। আর সেই সন্দেহটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট প্রকাশ করেছে। অতঃপর রাসূল ﷺ এর যুক্তিপূর্ণ কথায় তার সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেছে। এর দ্বারা কেউ কেউ দলীল পেশ করেন, تعريض بالقذف তথা অপবাদের উক্তি প্রকাশ করা প্রকৃতপক্ষে قذف তথা অপবাদ নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقَافَةِ صـ٣٤

অনুচ্ছেদ ঃ ৫. লক্ষণ দেখে কিছু বলা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ـ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دخل عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وجْهِه، فَقَالَ : أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ انفا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ : هٰذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ـ

قَالَ أَبُو عِيسَى: هٰذَا حدِيثٌ حسَنٌ صَحِيحٌ ، وقَدْ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُروة عَنْ عَائِشَة وزاد فيه : أَلَمْ ترى أَنَّ مُجَزِّزًا مَرَّعلى زيد بن حارثة وأُسَامَةَ بْنِ زيدٍ قد غطّيا رُئُوسهما وبدت أقدامهما فقال : إِنَّ هذِهِ الأقدَام بعضها مِنْ بعْضٍ، وهكَذَا حَدَّثَنَا سعِيدُ بْنُ عبْدِ الرَّحْمٰنِ وغيرُ واحدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عروة عن عَائِشَة وهٰذا حَدِيثٌ حسَنٌ صَحِيحٌ وَقدِ احْتَجَّ بعْضُ أهْلِ الْعِلْمِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ فِىْ إِقَامَةِ أمرِ الْقَافَةِ ـ

৫. কুতায়বা .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম ﷺ একদিন তাঁর কাছে অত্যন্ত খুশী হয়ে এলেন। আনন্দে তাঁর চেহারার রেখাগুলো ঝল ঝল করছিল। তিনি বললেন, মুজায্যিয এই মাত্র যায়দ ইবনে হারিছা এবং উসামা ইবনে যায়েদ এর দিকে তাঁকিয়ে বলেছে, এই পাগুলো একটি থেকে আরেকটি উদগত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা এই হাদীসটিকে যুহরী .... উরওয়া– আয়েশা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে আরও আছে, তুমি লক্ষ্য করনি, মুজায্যিয যায়দ ইবনে হারিছা এবং উসামা ইবনে যায়েদ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের উভয়ের মাথা ঢাকা ছিল আর পাগুলি খোলা ছিল। সে বলল, এ পাগুলি অবশ্য একটি আরেকটি থেকে এসেছে। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান এবং আরো একাধিক রাবী সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা – যুহরী রহ. এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। লক্ষণ দেখে কোন বিষয় প্রমাণের স্বপক্ষে কতক আলিম এ হাদীসটিকে দলীল হিসাব পেশ করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَافَةٌ শব্দটি قَائِفٌ এর বহুবচন। অর্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে বংশপরিচয় বলতে সক্ষম এমন ব্যক্তি অথবা অনুসরণ করে চিনতে পারে এমন ব্যক্তি। (মিসবাহুল লুগাত)

مُجَزِّزٌ (بِضَمِّ الْمِيْمِ وَكَسْرِ الزَّاءِ الثَّقِيْلَةِ) অর্থ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে বংশপরিচয় বলতে সক্ষম এমন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি। এককথায়, নৃতত্ত্ববিদ। (মিসবাহুল লুগাত)

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি. ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পালক পুত্র। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারর অধিকারী ছিল। তাঁর ছেলের নাম ছিল উসামা রাযি.। কিন্তু উসামা ছিল তার মায়ের মত কাল। উসামার মায়ের নাম ছিল উম্মে আইমান, যিনি এক কালো ক্রীতদাসী ছিল। যায়েদ আর উসামা উভয় পিতা-পুত্র। অথচ তাদের রঙ্গের মাঝে এই বৈপরিত্ব। এতে মুনাফিকরা বলে বেড়াতে লাগল যে, এমন সুন্দর পিতার সন্তান এত কাল হয় কিভাবে? অতএব উসামা যায়েদের সন্তান নয়। মুনাফেকদের এসব কথা-বার্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যথিত হতেন। আর ইতোমধ্যে এই ঘটনা ঘটল।

মাদলাজী নামক এক ব্যক্তি আরবে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। যে ছিল একজন 'মুজায্যিয' তথা বংশপরিচয় নির্ণয়ে অত্যন্ত দক্ষ। সে একদিন মসজিদে নববীতে আসল। সে সময় উসামা এবং যায়েদ এমনভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল যে, তাদের উভয়ের মাথা ঢাকা ছিল আর পা খোলা ছিল। তখন সে উভয়ের পা দেখে নিজের দক্ষতার আলোকে দৃঢ়তার সাথে বলে উঠল যে, এ চারটি পা যে দু'জন মানুষের, তারা উভয় অবশ্যই পিতা-পুত্র। নবীজী ﷺ এ ব্যক্তির কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হল। এজন্য খুশি হননি যে, বংশ নির্ণয় বিদ্যা ইসলাম মূল্যায়ন করে বরং তাঁর খুশি হওয়ার কারণ ছিল এই যে, আরববাসী বংশ পরিচয় নির্ণয়ে এ ব্যক্তিকে সবচে' বেশি দক্ষ মনে করে। এ বিষয়ে তার কথা আরববাসীর নিকট প্রমাণতূল্য। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, যায়েদ আর উসামাকে নিয়ে মুনাফেকরা আর উপহাস করার সাহস পাবে না।

উল্লেখ্য যে, ইলমে ক্বিয়াফা তথা বংশ পরিচয় বিদ্যা শরী'আতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য –এ ব্যাপারে ইমাম গণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মত হল, শরী'আতের কোন বিষয় প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এ বিদ্যার কোন ভূমিকা নেই। আর অবশিষ্ট তিন ইমামের অভিমত হল, এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা শরী'আতের ক্ষেত্রবিশেষ গ্রহণযোগ্য। এমনকি তারা বলেন, যেমন এক ক্রীতদাসীর মালিক দুইজন। আর সেই দাসী সন্তান জন্ম দিল। তারপর উভয় মালিক দাবী করল, এ সন্তান আমার। এরূপ পরিস্থিতি উভয়কে যেতে হবে ক্বিয়াফা বিদ্যায় পারদর্শী কোন ব্যক্তির নিকট। এ বিষয়ে পারদর্শী লোক সন্তানটিকে যে মালিকের বলে অভিহিত করবে, সন্তানটি তারই নির্ধারিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, শরী'আতের দৃষ্টিকোণে সন্তান উভয়েই থাকবে। বাস্তবে যদিও সন্তান অবশ্যই তাদের যে কোন একজনের। আর ক্রীতদাসী উভয়েরই 'উম্মেওলাদ' হবে।

(বিস্তারিত কিতাবুল নিকাহতে দ্রষ্টব্য)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ حَثِّ النَّبِىِّ ﷺ عَلَى التَّهَادِىْ صـ٣٤

অনুচ্ছেদ ঃ ৬. নবী কারীম ﷺ কর্তৃক হাদিয়্যা দানে উৎসাহ প্রদান

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِىُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْشِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَأَبُوْ مَعْشَرٍ اِسْمُهُ نَجِيْحٌ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

৬. আযহার ইবনে মারওয়ান বাসরী .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেছেন, তোমরা পরস্পর হাদিয়া দিবে। কেননা হাদিয়া অন্তরের ময়লা বিদূরীত করে। বকরীর খুরের একটি টুকরা হলেও সেটিকে কোন প্রতিবেশীনী তার অপর প্রতিবেশীনীর জন্য হাদিয়া প্রদানে হেয় মনে করবে না।

এ সূত্রে হাদীসটি গারীব। আবূ মা'শারের নাম হল নাজীহ রহ. তিনি বানূ হাশিমের আযাদকৃত দাস ছিল। তাঁর স্মরণ শক্তির ব্যাপারে কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ তাঁর সমালোচনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

تُذْهِبُ وَحَرَ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ হাদিয়া দ্বারা পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রবনতা দূর হয়ে তদস্থলে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা।

لَاتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارِهَا অর্থাৎ প্রতিবেশী কোন জিনিস হাদিয়া দেওয়ার সময় লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। বস্তু যত ছোট ছোটই হোক প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে। আর যাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে তার জন্যও উচিত নয় যে, সে প্রতিবেশীর হাদিয়াকে ছোট করে দেখবে বরং তার উচিত হল, হাঁসি-খুশিসহ হাদিয়া গ্রহণ করে নেওয়া।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الرُّجُوْعِ فِى الْهِبَةِ صـ٣٤

অনুচ্ছেদ ঃ ৭. হেবা করে তা প্রত্যাহার করা মাকরূহ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُكَتِّبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُوْسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الَّذِىْ يُعْطِىْ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتّٰى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِىْ قَيْئِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

৭. আহমাদ ইবনে মানী .... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কিছু দিয়ে তা প্রত্যাহার করে তার উদাহরণ হল কুকুরের মত; সে খায়, যখন পেট ভরে যায় তখন বমি করে, পরে আবার ফিরে আসে এবং পুনরায় নিজের বমিই খায়।

এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا مُحمَّد بنُ بشار ، حدثنا ابن أبى عديّ عن حسين المعلم عن عمرو بن شعَيب، حدَّثنى طَاوُوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال : لا يحل لرجل أن يعطى عَطِيّةً ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ـ ومثل الذى يعطى العطية ثُمَّ يَرجعُ فِيْهَا كمثل الكلب أكل حتّى إذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه ـ قال أبو عِيسى : هٰذا حَدِيثٌ حسنٌ صحِيْحٌ ـ

قَال الشَّافِعِيُّ : لايحلّ لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أَعطى ولدهُ واحتجّ بهذا الحديث ـ

৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার .... ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে মারফূরূপে বর্ণিত আছে যে, পিতা যদি তার সন্তানকে কিছু দেয়, সেক্ষেত্র ছাড়া যদি কেউ কোন কিছু দান করে তা পরে আবার প্রত্যাহার করে সেটা তার জন্য হালাল নয়। যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দিয়ে তা প্রত্যাহার করে সে হল কুকুরের মত; খায়, যখন পেট ভরে যায় বমি করে, পরে আবার সে নিজের বমিই খায়। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, কাউকে কিছু দিয়ে তা প্রত্যাহার করা কারও জন্য হারাল নয়। তবে পিতা তার সন্তানকে কিছু দিলে তা তিনি প্রত্যাহার করা কারও জন্য হালাল নয়। তবে পিতা তার সন্তানকে কিছু দিলে তা তিনি প্রত্যাহার করতে পারেন। এ হাদীসটিকে ইমাম শাফিঈ রহ. প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

الهبة : শব্দটি وهب থেকে উদগত। باب فتح এর মাসদার। ف কালিমা থেকে واو কে ফেলে দিয়ে তার পরিবর্তে শেষে ة যোগ করা হয়েছে। অর্থ, কাউকে উপকারী কোনো বস্তু প্রদান করা।

শরী'আতের পরিভাষায় 'হিবা' হল تمليك الاعيان بغير عوض কোনরূপ বিনিময় ছাড়া কাউকে নিজের কোন জিনিসের মালিক বানিয়ে দেওয়া।'

হিবা, হাদিয়া ও সদকার মধ্যে পার্থক্য

মানুষ কারও প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশার্থে যে জিনিস উপহার দেয়, তা হল 'হাদিয়া' আর নিছক সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্য যদি কাউকে কোন বস্তু দেওয়া হয়, তাহলে তাকে বলা হয় সদকা। আর হিবা হল, কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া কোন বস্তু অন্যের মালিকানায় দেওয়া। সাওয়াবের নিয়ত থাকলে সদকার ন্যায় হাদিয়া ও হিবার মধ্যেও সাওয়াব পাওয়া যাবে।

কোন বস্তু হাদিয়া বা হেবা করে ফেরত নিতে পারবে কি না ?

এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আইয়াম্মায়ে ছালাছাহ বলেন, হাদিয়া বা হেবা করে ফেরত নেওয়া মোটেই জায়েয নেই। ইমাম শাফেঈ বলেন, পিতা সন্তানকে হেবা করে ফেরত নিতে পারবে। আর ইমাম আবু হানীফাহ রহ. বলেন,

গাইরে যী মাহরামের কাউকে হেবা করলে , যাকে হেবা করা হয়েছে তার সম্মতিতে কিংবা কাজীর ফয়সালার ভিত্তিতে হেবা ফেরত নেওয়া আইনতঃ জায়েয, নৈতিক বিচারে এমনটি করা মাকরূহে তাহরীমি। আর যী রেহমে মাহরামের কাউকে হেবা করা হলে যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে ইত্যাদিকে হেবা করা হলে ফেরত নেওয়া জায়েয নেই।

আইম্মায়ে ছালাছাহ দলীল হিসাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসদ্বয় পেশ করে থাকেন। যেখানে বলা হয়েছে,

كالكلب أكل حتى إذا اشبع الخ কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসে যেহেতু الا الولد শব্দ আছে, তাই শাফেঈ রহ. পিতা সন্তানকে হেবা করে ফেরত নিতে পারবেন।

গাইরে যী রেহমে মাহরাম তথা রক্ত সম্পর্কহীন ব্যক্তি থেকে হেবা ফেরত নেওয়া জায়েয- ইমাম আবু হানীফা রহ. এর এ বক্তব্যের দলীলও নিম্নে প্রদত্ত হল-

مارواه الحاكم عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ﷺ قال من وهب هبة فهو احوبها مالم يثب منها وراه ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنه مثله وروى الدار قطنى والطبرانى ايضا عن ابن عباس عن النبى ﷺ قال : من وهب هبة فارتجع بها فهو أحو بها مالم يثب منها ولكنه كالكلب يعود فى قيئه .

এ হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে যে, হেবাকারীকে যতক্ষণ এর বিনিময় দেওয়া না হয়, ততক্ষণ সে তার হেবার ব্যাপারে অধিক হকদার। সুতরাং আজনবী থেকে হেবা ফেরত নেওয়া আইনগত বিচারে জায়েয প্রমাণিত হল। তবে নৈতিক বিচারে মাকরূহে তাহরীমী হওয়া করার কারণ, যেহেতু হাদীসে হেবা ফেরত যে নেয়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে- كالكلب يعود فى قيئه

আর ইমাম শাফেঈ রহ. এর দলীলের জবাব হল, যেমনিভাবে প্রয়োজনের মুহূর্তে পিতা পুত্রের মালের মালিকানা লাভ করতে পারেন, তেমনিভাবে পিতার মালিকানা বস্তু যা সন্তানকে হেবা দিয়েছিল তার মালিকানাও লাভ করতে পারেন। বাকী রইল, যি রেহম মাহরাম থেকে হেবা ফেরত নেওয়া জায়েয নেই- ইমাম আবু হানীফা রহ. এর এ বক্তব্যের দলীল নিম্নোক্ত হাদীসটি-

عن سمرة بن جندب عن النبىّ ﷺ اذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيها . (صحح الحاكم)

সাতটি ক্ষেত্র থেকে হেবা ফেরত নেওয়া যায় না

উল্লেখ্য, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে এমন সাতটি ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে হেবা ফেরত নেওয়া জায়েয নেই। সে সতিটি ক্ষেত্রকে কোন কোন ফিকহের কিতাবে دمع خزقه প্রতীকী শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

(১) دال দ্বারা ইশারা করা হয়েছে الزيادة এর প্রতি। অর্থাৎ হেবা গ্রহীতার হাতে এসে কিছু সংযোজিত হওয়ার কারণে হেবাকৃত দ্রব্যের মূল্য বেড়ে গেলে। যেমন হেবা-সম্পত্তিতে গ্রহীতা গৃহ নির্মাণ বা বৃক্ষ রোপন করলো অথবা জন্তু ছিল, তাকে খাইয়ে মোটা-তাজা করলো।

(২) ميم দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে موت এর প্রতি। অর্থাৎ হেবা-দাতা কিংবা গ্রহীতার কোন একজন মৃত্যুবরণ করলে।

(৩) عين দ্বকারা ইংগিত দেওয়া হয়েছে هبة بالعوض এর প্রতি। অর্থাৎ হেবাদাতা হেবার বিনিময় স্বরূপ কিছু পেয়ে থাকলে।

(৪) خاء দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে خروج عن الملك এর প্রতি। অর্থাৎ দ্রব্য থেকে গ্রহীতার মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে গেলে। যেমন, তা বিক্রি বা কাউকে দান করে দিয়েছে। অবশ্য কিছু অংশ বিক্রি করে থাকলে বাকিটুকু ফেরত নেওয়া যাবে।

(৫) زاء দ্বারা ইংগিত দেওয়া হয়েছে زوجين এর প্রতি। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর একজন অপরজনকে হেবা করলে।

(৬) قاف দ্বারা ইংগিত দেওয়া হয়েছে قرابت مُحَرَّمَة এর প্রতি। অর্থাৎ যী-রেহমে মাহরামের যেমন পিতা কিংবা সন্তানকে হেবা করা হলে।

(৭) هاء দ্বারা ইংগিত দেওয়া হয়েছে هلاك এর প্রতি। অর্থাৎ পুরো দ্রব্য কিংবা দ্রব্যের প্রধানতম ব্যবহারিক দিক বিনাশ হয়ে গেলে। যেমন লুঙ্গি ছিল, এখন ছিড়ে যাওয়ায় তা গামছা হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

اَبْوَابُ الْقَدَرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صـ٣٤

তাকদীর অধ্যায়

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ভূমিকা ঃ (بِفَتْحِ الْقَافِ وَالدَّالِ وَقَدْ تَسْكُنُ الدَّالُ) قَدَر অর্থ অনুমান করা, পরিমান করা, নির্ধারণ করা, ফয়সালা করা, নকশা করা ইত্যাদি।

শরী'আতের পরিভাষায় 'ক্বদর' বলা হয়, যেসব বিষয়ের ফয়সালা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির পূর্বেই করে রেখেছেন। একে قَضَاء ও বলা হয়।

তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ হল, মনেপ্রাণে এই দৃঢ়বিশ্বাস রাখা যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতে ভালো মন্দ যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই জানেন, লাওহে মাহফূযে তা লিখে রেখেছেন এবং তিনি যেমন জানেন তেমনই হয়। তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হয় না। আল্লাহ সবকিছুরই সৃষ্টি কর্তা। তিনি সর্বজ্ঞ। আদি-অন্ত সবকিছুই তিনি সঠিকভাবে জানেন। ভালো-মন্দ উভয়টার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ– এ বিশ্বাস রাখাও অপরিহার্য। এর বিপরীতে কেউ যদি বলে, 'ভালো'র জন্য একজন স্রষ্টা আর 'মন্দে'র জন্য আরেকজন স্রষ্টা আছেন, তাহলে এটা ঈমানের বিপরীতে কুফর ও শিরক হয়ে যাবে। যেমন, হিন্দুরা 'ভালো'র সৃষ্টিকর্তা লক্ষীদেবী এবং 'মন্দে'র সৃষ্টিকর্তা শনিদেবকে মনে করে। এটা সম্পূর্ণ কুফরি।

তাকদীর সম্পর্কে গবেষণা করা নিষেধ

এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, সবই যখন আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারে হয়, তখন আমলের প্রয়োজন কি, যা হওয়ার তা তো হবেই ? এ প্রশ্ন করা যাবে না এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ভালো-মন্দ বুঝার এবং কাজ করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং ইচ্ছাশক্তিও দান করেছেন। তার দ্বারা নিজের ক্ষমতার, নিজ ইচ্ছায় সে নেক ও বদ আমল করে। বদ আমল করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং নেক কাজ করলে তিনি সন্তুষ্ট হন। কাজ করা ভিন্ন কথা, আর সৃষ্টি করা ভিন্ন কথা। সৃষ্টি তো সবকিছু আল্লাহ তা'আলাই করেন। কিন্তু নিজের ইচ্ছানুযায়ী আমল করার ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন। এরপরেও তাকদীর সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর ও ঘাঁটাঘাঁটি করে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছে। কেননা তাকদীরের বিষয়টি এমন জটিল ও রহস্যময় যে, যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা মানুষের আকল দ্বারা সম্ভব নয়। আর এটা উদঘাটনের চেষ্টা করাও নিষেধ। আমরা আল্লাহর গোলাম। সুতরাং আমাদেরকে যে আদেশ করেছেন, তা বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরোধার্য করে নেওয়াই আমাদের দায়িত্ব। তিনি কী লিখে রেখেছেন, সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয় বরং তার হুকুম তামিল করাই আমাদের দায়িত্ব। তার প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করলে কিংবা তার আদেশ লঙ্ঘন করলে, এ নাফরমানির দরুন নিশ্চয় তাঁর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। আর তার প্রদত্ত শক্তির সঠিক ব্যবহার করলে এবং তাঁর আদেশ পালন করলে তিনি তার উত্তম প্রতিদান দিবেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّشْدِيْدِ فِى الْخَوْضِ فِى الْقَدَرِ ص ـ ٣٤

অনুচ্ছেদ ঃ ১. তাকদীর নিয়ে আলোচনায় মত্ত হওয়া সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ ـ حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتّٰى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ: أَبِهٰذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهٰذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوا فِىْ هٰذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِيْهِ ـ

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ صَالِحِ الْمُرِّيِّ وَصَالِحٌ الْمُرِّيُّ لَهُ غَرَائِبُ يَنْفَرِدُ بِهَا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া জুমাহী .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। আমরা তখন তাকদীর বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হল। এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে উঠল। তাঁর দুই কপোলে যেন ডালিম নিংড়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এ বিষয়েই কি তোমরা নির্দেশিত হয়েছ ? আর এ নিয়েই কি আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি ? তোমাদের পূর্ববর্তীরা যখন এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। দৃঢ়ভাবে তোমাদের বলছি, তোমরা যেন এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হও।

এ বিষয়ে উমার আয়েশা ও আনাস রাযি. থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি গারীব। সালিহ মুররী এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই, সালিহ মুররীর বেশ কিছু গারীব রিওয়ায়াত রয়েছে। যেগুলির বিষয়ে তিনি একক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

نَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدَرِ ঃ কিছু সাহাবা অজ্ঞাতবশতঃ তাকদীর সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করছিল। কোন সাহাবা বলছিলেন, সব কিছুই যদি তাকদীর অনুযায়ী হয়, তাহলে পুরস্কার ও শাস্তির যে কথা বলা হয়েছে, তার কী অর্থ ? আবার কোন কোন সাহাবা বলে উঠলেন, কোন রহস্যের কারণে আখেরাতে বেহেশত-দোযখ তৈরী করে রাখা হয়েছে ? কোন কোন সাহাবা বলে উঠলেন, যদিও সবকিছু তাকদীরে আছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো বান্দাকে ভালো-মন্দ করার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে রেখেছেন। পক্ষান্তরে কিছু সাহাবী আবার প্রশ্ন তুললেন, কেমন সে ইচ্ছাশক্তি এবং কোত্থেকে এসেছে সেই ইচ্ছাশক্তি ? মোটকথা, এভাবে পরস্পর বাকবিতণ্ডা চলছিল। ইত্যাবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের এ দলটিকে তাকদীরের মত এমন একটি জটিল বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত দেখলেন।

فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهُ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রচণ্ড গোস্বা হওয়ার পেছনে সম্ভবতঃ 'কারণ' ছিল, যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর সরাসরি ছাত্র। তাঁদের প্রতি একটা গভীর হৃদয়ের টান তাঁর আছে। আজ যখন তাদেরকে এই ভুল কাজটি করতে দেখলেন, তখনই একজন দক্ষ শিক্ষকের মত রাগ দেখালেন। যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তাঁর দরদই ফুটে উঠেছে।

أم بهذا أرسلت إليكم ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য আদিষ্ট করেননি। আর আমাকেও এমন রাসূল হিসাবে পাঠাননি যে, আমি এই রহস্যপূর্ণ মাসআলা অনর্থক ঘাঁটাঘাঁটি করবো। তাকদীরের রহস্য আল্লাহরই কাছে, তোমাদের কাজ হল আমল করা।

انما هلك من كان قبلكم ঃ সম্ভবতঃ এখানে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া। কুরআন ও হাদীসে هلاكت তথা ধ্বংস হওয়া শব্দটি পথভ্রষ্ট হওয়ার অর্থে বহুল ব্যবহৃত। এ হিসাবে এ ইবারতের মর্ম দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী উম্মতদের মাধ্যমে ভ্রষ্টতার সূত্রতা তাকদীরে নিয়ে অতিরিক্ত অনুসন্ধানের ছিদ্রপথেই শুরু হয়েছিল।

باب ماجاء فى حجاج آدم وموسى عليهما السّلام ص٣٤

অনুচ্ছেদ ঃ ২. আদম আ. ও মূসা আ. এর বিতর্ক

حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ . حدّثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حدّثنا أَبِى سليمان الاعمش عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: احتجَّ ادمُ وَمُوسى، فقال موسى: يا ادمُ أنت الّذى خلقكَ اللّهُ بيده ونفخ فيك من روحه ؟ أغويتَ النّاس وأخرجْتهم من الجنّة، قالَ: فَقَالَ ادمُ وأنتَ مُوسى الّذى اصطفاكَ اللّهُ بكلامه أتلُومنى على عمل عملتُهُ كتبهُ اللّهُ عليّ قبل أنْ يَخْلُقَ السّمٰوَاتِ وَالْأَرض قال فحجّ ادمُ مُوسى .

قال أَبُوعيسى : وفى الباب عَنْ عُمَرَ وَجُنْدُبٍ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هذا الْوجهِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ وقد روى بَعْض أَصحاب الاعمش عَنْ ابى صالح عن أَبِى هريرة عن النّبيّ ﷺ نحوهُ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ الاعمش عَنْ أَبِى صالح عَنْ أبى سعيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِى هريرة عن النّبيّ ﷺ .

২. **ইয়াহইয়া** ইবনে হাবীব ইবনে আরাবী .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ বলেন, আদম আ. ও মূসা আ. বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। মূসা আ. বললেন, হে আদম! আপনিই তো তিনি যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মাঝে তিনি তার রূহ ফুঁকেছেন আর আপনিই কারণ ঘটলেন মানুষের গুমরাহীর এবং তাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের।

আদম আ. বললেন, আপনিই তো মূসা, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর সাথে কথোপকথনের জন্য নির্ধারিত করেছেন। আপনি এমন একটি কাজের জন্য আমাকে ভর্ৎসনা করছেন, যা আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বেই তা করা আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য লিখে রেখেছেন ?

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পরিশেষে আদম আ. তর্কে মূসা আ. এর উপর জয়ী হয়ে গেলেন। এ বিষয়ে উমার ও জুন্দুব রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সুলাইমান তাইমী) –আমাশ থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এন সূত্রে উক্ত হাদীসটি হাসান গরীব। আমাশ রহ. এর

কতিপয় শাগিরদ এটিকে আমাশ –আবূ সালিহ– আবূ হুরাইরা রাযি. নবী কারীম ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আমাশ –আবূ সালিহ আবূ সাঈদ রাযি. রূপে সনদের উল্লেখ করেছেন। আব আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اغويت الناس ঃ অর্থাৎ পথভ্রষ্ট লোকদের ভ্রষ্টতার জন্য আপনি কারণ হয়েছেন। এটি দূরবর্তী কারণ, এর কারণ হল, তিনি যদি ফল না খেতেন, জান্নাত থেকে বহিস্কার হতে হতো না। আর বহিস্কার না হলে কু প্রবৃত্তি, যৌনচাহিদা ও শয়তানের মাধ্যমে হিদায়তের পরিপন্থী গোমরাহীও আসত না। غنى শব্দটি মূলত হিদায়াতের পরিপন্থী। এর অর্থ হল, আনুগত্য ছাড়া অন্য কাজে বিভোর থাকা। এটি শুধু ভুল-ভ্রান্তির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

এখানে কয়েকটি প্রতিপাদ্য রয়েছে।

এক. এ বিতর্ক কোথায় সংঘটিত হয়েছিল ? এ ব্যাপারে কারও কারও অভিমত হল, এটি দুনিয়াতেই হয়েছিল। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। হতে পারে হযরত মূসা আ. এর যুগে তিনি আদম আ. কে পুনরজ্জীবিত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, বিতর্কটি রূহের চগতে হয়েছিল। হযরত মূসা আ. এর ইনতেকালের পর উভয় যখন রূহের জগতে একত্রিত হয়েছেন, সেখানে বিতর্কটি ঘটেছিল কিংবা এও সম্ভব নয় যে, মূসা আ. জীবিত থাকাকালীন আল্লাহ তার রূহকে বিশেষ কোন প্রক্রিয়ায় রূহের জগতে নিয়ে গিয়েছেন, তারপর সেখানে উভয়ের মাঝে বিতর্ক করিয়েছেন। আবুল হাসান ক্বারেছী বলেন, উভয়ের রূহ আসমানে একত্রিত হয়েছে। আর সেখানেই বিতর্ক লেগেছে। আবার এই অভিমতও পাওয়া যায় যে, মুহাম্মদ সা. যেদিন মে'রাজে গিয়েছিল, সেদিন সকল নবী একত্রিত হয়েছিল। আর এ বিতর্ক সেখানেই সংঘটিত হয়।

দুই. এ হাদীসে বলা হয়েছে, আদম আ. কর্তৃক সংঘটিত আমলটির কথা আসমান যমীন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তার তাকদীরে লিখে রাখা হয়েছিল। অথচ বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে قدر الله على قبل ان يخلقنى باربعين سنة সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান কিভাবে করা হবে ?

এর উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন, সংক্ষিপ্ত বিবরণ তো আসমান-যমীনের সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই লেখা হয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত বিবরণ লেখা হয়েছে আদম আ. সৃষ্টি হওয়ার চল্লিশ বছর পূর্বে। আবার অনেকে বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার ইলমের সঙ্গে, আর বুখারী শরীফের বর্ণিত হাদীসটির সম্পর্ক বিস্তারিত বিরবণ 'লিপিবদ্ধ' করার সঙ্গে।

তিন. হযরত আদম আ. নিজের ভুলের উযর পেশ করতে গিয়ে তাকদীরকে উপস্থাপন করলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মূসা আ. চুপ হয়ে গিয়েছিল। এর আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা করে দিলেন যে, হযরত আদম আ. প্রমাণ উপস্থাপনের দৃষ্টিকোণে হযরত মূসা আ. এর উপর বিজয়ী হয়েছেন। এতে বুঝা যায়, গুনাহর উযর হিসাবে তাকদীরকে পেশ করা যায়। সুতরাং ওয়ায নসিহত, রাগ-ভৎর্সনা, পুরস্কারশাস্তি ইত্যাদি শোনানোর দরকার কি ? কিংবা নবী রাসূলই বা আসার কি দরকার ছিল ?

এর জবাব হল, দুনিয়া দারুত-তাকলীফ, অর্থাৎ করণীয় কাজ করার এবং বর্জনীয় কাজ বর্জন করার স্থান হল, এই দুনিয়া। হযরত আদম আ. ও মূসা আ. এর মধ্যে উক্ত প্রশ্নোত্তর এই দারুত-তাকলীফে থাকাকালীন তিনি গুনাহর জন্য তাকদীরে উযর হিসাবে পেশ করেন নি বরং এখানে থাকাকালে তিনি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে আল্লাহর নিকট এই বলে তাওবা করেছিল যে, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا لنكونن من الخسرين সুতরাং দারুত-তাকলীফ তথা দুনিয়াতে গুনাহ করে তাকদীরের দোহাই যাবে না বরং গুনাহ করাই যাবে না; গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করতে হবে।

সবচেয়ে সুন্দর জবাব হল, আদম আ. নিজের ত্রুটির জন্য তাওবা করেছেন। তাঁর তাওবা কবুল হয়েছিল। আর তাওবাকারীকে তার কৃত ভুলের জন্য ভৎর্সনা করা অনুচিত। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كمن

لَاذَنْبَ لَهُ সুতরাং হযরত মূসা আ. প্রশ্ন যথাস্থানে হয়নি। কিন্তু এ জবাবের উপরও প্রশ্ন উঠে, হযরত মূসা আ. এর প্রশ্নটি স্থানপযুক্ত হয়নি, একথা হযরত আদম আ. বলেননি কেন? আদম আ. মূসা আ. এর প্রশ্নের উত্তরে এটাও তো বলতে পারতেন যে, আমি তো কৃত ভুল স্বীকার করে তাওবা করে নিয়েছে। আর আমার তাওবা কবুলও হয়েছে। তারপরেও আপনি আমাকে ভৎর্সনা করছেন কেন? আসলে হযরত আদম আ. এমন কোন উত্তর এজন্য দেননি যে, যেহেতু হযরত আদম আ. যে কাজটি করেছেন সেটি যেমনিভাবে ভুল ছিল, তেমনিভাবে তাকদীরেও ছিল। ভুল তাওবার মাধ্যমে মাফ হয়ে গেল। আর বাকি রইল তাকদীর। আর সেই তাকদীরের কথাই বললেন হযরত আদম আ.। কিন্তু তাকদীর নিয়ে তো প্রশ্ন করা যায় না। যেহেতু তাকদীর হল আল্লাহর কাজ। وَلَايُسْاَلُ عَمَّا يَفْعَلُ 'আল্লাহ যা করেন তা নিয়ে প্রশ্ন করা যায় না। সর্বোপরি আদম আ. এর এ উত্তরের মাধ্যমে একটি ফায়দা এও আছে যে, এর মাধ্যমে তাকদীরের বিষয়টি সাব্যস্ত করা হল।

بَابُ مَاجَاءَفِى الشَّقَاءِوَالسَّعَادَةِ ص ٣٥

অনুচ্ছেদ ঃ ৩. দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مُبْتَدَأٌ اَوْ فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ ـ

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ وَأَنَسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ـ

৩. বুন্দার .... সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রাযি. একদিন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মনে করেন আমরা যে কাজ করি, এগুলো নতুন বিষয় না এমন বিষয় যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ পূর্বেই ফায়সালা করে রেখেছেন।

তিনি বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব, এ গুলো হল এমন বিষয়, যেগুলো সম্পর্কে পূর্বই ফায়সালা করে রাখা হয়েছে। আর প্রত্যেকের জন্য তার করণীয় সহজ করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, সে করে সৌভাগ্য জনক আমল আর যে ব্যক্তি হতভাগাদের অন্তর্ভূক্ত সে করে দুর্ভাগ্যজনক আমল।এ বিষয়ে আলী, হুযায়ফা ইবনে উসায়দ, আনাস, আনাসও ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَنْكُتُ فِى الْاَرْضِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ عُلِمَ وَقَالَ وَكِيعٌ: إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، قَالُوا : أَفَلَا نَتَّكِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : لَا: إِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ـ قَالَ أَبُوعِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ـ

৪. হাসান ইবনে আলী হুলওয়ানী .... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি কাঠি দিয়ে যমীনে দাগ কাটছিল। হঠাৎ আকাশের দিকে তাঁর মাথা উঠালেন। এরপর বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যে, কার অবস্থান জাহান্নাম এবং কার অবস্থান জান্নাত লিপিবদ্ধ করে না রাখা হয়েছে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, আমরা কি তবে ভরসা করে বসে থাবক ইয়া রাসূলাল্লাহ ?

তিনি বললেন, না, আমল করে যাও, যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তদনুরূপ আমল সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

أرأيت ما نعمل به أمر مبتدع : হযরত উমর রাযি. এর এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা হল, দুনিয়াতে আমরা যে সব আমর করি, সেগুলো ও কি তাকদীরে পূর্বে থেকেই লিপিবদ্ধ ছিল আর এখন প্রকাশিত হয়েছে ? নাকি তাকদীরে এগুলো লেখা ছিল না বরং পরবর্তীতে তা করা হয়েছে ?

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমরা বাকীউল গারকাদে একটি জানাযায় ছিলাম, রাসূল সা. আমাদের নিকট এসে বললেন। আমরা তার পাশে পাশে বসলাম।

وَهُوَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ : চিন্তিত, চিন্তাশীল ব্যক্তি বসে কাঠি দিয়ে জমিনের উপর যে দাগ কাটে, তাকে বলা হয় نكت

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالْخَوَاتِيْمِ صـ ٣٥

অনুচ্ছেদ ঃ ৪. শেষ অবস্থার উপর ভিত্তি করে আমলের বিচার

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ فِيْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ، فَوَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا . قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ ، وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ : مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِيْ مِثْلَ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوٰى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ نَحْوَهُ -

৫. হান্নাদ .... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনি হচ্ছেন সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলে স্বীকৃত ও তিনি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, মার পেটে তোমাদের কারও সৃষ্টি গঠন সমন্বিত হয় চল্লিশ দিনে। এরপর তত দিনে হয় আলাকা । এরপর ততদিনে হয় মাংশপিণ্ড। এরপর তার কাছে আল্লাহ এক ফিরিশতা পাঠান। তিনি তার মাঝে রূহ ফুঁকেন এবং তাকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ করা হয়। তিনি লিখেন তার রিযক, তার মৃত্যু, তার আমল এবং সে নেক বখত না বদবখত। সেই সত্তার কসম! যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তোমাদের কেউ জান্নাতবাসীর আমল করতে থাকে এমনকি তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান বাকী থাকবে ভাগ্যের লিখন তার পর প্রবল হয়ে উঠে আর জাহান্নামবাসীর আমলে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে, অনন্তর সে জাহান্নামেই দাখেল হয়। আবার তোমাদের কেউ জাহান্নামবাসীর আমল করতে থাকে এমনকি তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান বাকী থাকতে তার উপর ভাগ্যলিপি প্রবল হয়ে উঠে আর জান্নাতবাসীর আমলের মাধ্যমে তার জীবন সমাপ্তি ঘটে। আর সে জান্নাতেই দাখেল হয়। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৭২. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার .... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বর্ণনা করেছেন .... অতঃপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা ও আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আহমাদ ইবনে হাসান রহ. বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কে বলতে শুনেছি, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তানের মত কাউকে আমার দুই চোখে দেখিনি।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। শু'বা এবং ছাওরী রহ. ও এটিকে আ'মাশ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে 'আলা রহ.... যায়েদ রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাকদীরের বিভিন্ন স্তর

তাকদীর সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন স্তর ও চিত্র রয়েছে। আলোচ্য হাদীসে একটি চিত্রের কথা বর্ণিত আছে। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহতে তাকদীর সংঘটিত হওয়ার পাঁচটি স্তর ও চিত্র বর্ণনা করেছেন। আমরা হুজ্জাতুল্লিহিল বালিগাহতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

(১) রোজে আযল তথা আদিতে যখন আল্লাহ ছাড়া কোন কিছু ছিল না (كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْئٌ) আসমান যমীন, আরশ-কুরসি কিছুই ছিল না। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সৃষ্টিজগতকে প্রয়োজন মোতাবেক এমনভাবে সাজানো হবে যে, যাতে সব রকমের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকবে এবং সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টির সময় তাকে যাবতীয় বাড়তি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উপযোগিতাও দেওয়া হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক পরিকল্পনার ভেতর থেকে একটি পরিকল্পনা নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। যেন অন্য কোন পরিকল্পনা সে ক্ষেত্রে ঠাঁই না পায়। তেমনিভাবে সৃষ্টিজগতে কি কি ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হবে তাও পরিকল্পনা করে নিয়েছেন। এভাবেই মহান সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্বে আনার ইচ্ছাটাই তাকদীরের প্রথম স্তর ও প্রথম চিত্র।

(২) আল্লাহ তা'আলার সব কিছুর পরিমাণ রোজে-আযল তথা আদি থেকে জানেন। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সকল সৃষ্টির সংখ্যা ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ, প্রথম পরিকল্পনা অনুসারে তিনি সকল সৃষ্টবস্তুকে আরশের অস্তিত্বের আওতায় সন্নিবেশিত করেছেন। সেখানে সবকিছুর নমুনা বা নকশা সৃষ্টি করেছেন। যেমন, সেখানে তিনি মুহাম্মদ ﷺ এর নমুনা চিত্রিত করে নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তাকে অমুক সময়ে মানবজাতির কাছে পাঠানো হবে এবং তিনি তাদের খোদায়ী বিধান অবহিত করবেন। তাছাড়া আবু লাহাব তাঁকে অস্বীকার করবে এবং তার পাপ তাকে দুনিয়াতেই গ্রেফতার করবে আর আখেরাতে তাকে আগুন ঘিরে রাখবে ইত্যাদি তখনই সেখানে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক এভাবেই পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহের প্রতিটি [illegible] সেখানে নির্ধারিত হয়ে আছে, আর সে কারণেই তা সে ভাবেই ঘটে।

(৩) আল্লাহ তা'আলা আদম আ. কে মানবজাতির পিতা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকেই মানবজাতির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। তাই মেছালী দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা আদমের প্রতিটি বংশধরের নমুনা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের নেক আমল ও বদ আমলের ভিত্তিতে এক দলকে অন্ধকারপূর্ণ ও এক দলকে আলোকময় করে সেখানে পকাশ করেছেন। অতঃপর তাদের সকলকে জবাবদিহিতার উপযোগী করে দায়িত্বশীল করে বানিয়েছেন। তাদের ভেতর তাঁর ইবাদত ও মারেফতের যোগ্যতা দিয়েছেন। কাজেই তারা আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করে এসেছে, তাঁকে প্রভু বলে মেনে চলার। তাদের জবাবদিহির কারণ এটাই। অবশ্য তারা তা ভুলে গেছে। আজকের জগতে যারাই বিদ্যমান, তারা সবাই সেই নমুনা জগতে সৃষ্ট মানুষেরই বাস্তরূপ। সুতরাং সেখানে তাদের যার ভেতর যেটা রাখা হয়েছে, সেটাই সৃষ্টিজগতে এসে বাস্তবায়িত হয়ে চলছে।

(৪) যখন মাতৃগর্ভে বাচ্চার প্রাণ ফুঁকে দেওয়া হয়, সে প্রাণ তার নির্ধারিত ঘটনাপ্রবাহ নিয়েই দেহে প্রবিষ্ট হয়. যে ব্যক্তি কোন বৃক্ষের বীজ বপন করে সে ব্যক্তি বিজ্ঞ হলে বীজ, মাটি ও আবহাওয়া যাচাই করে বলে দিতে পারে যে, গাছটি কিরূপ সতেজ কিংবা শুকনা হবে। তেমনি যে ফেরেশতা বাচ্চার দেহে প্রাণ ফুঁকে দেয়, সে তার পরিস্থিতি পরিবেশ থেকে জানতে পারে যে, এ লোকটি কি ধরনের রুযী-রোযগার করবে আর কি সব কাজ-কারবার করবে। আরও জানতে পারে, তার ভেতরে কি জৈবিক স্বভাব সবল হবে, না ফেরেশতা চরিত্র জয়ী হবে। ফলে এটাও সেই ফেরেশতা বুঝে নেয় যে, সে ব্যক্তি নেককার হবে, না বদকার হবে।

(৫) ঘটনাপ্রবাহ ঘটার আগেই তা নির্ধারিত হয়ে আছে। মূলতঃ পবিত্র দরবারে রক্ষিত নমুনা-জগতে প্রথমে ঘটনাটি চিত্রিত হয়। তারপর পৃথিবীতে তার ব্যবস্থাপনা চালু ঘটনাটি চিত্রিত হয়। তারপর পৃথিবীতে তার ব্যবস্থাপনা চালু হয়ে যায় এবং সে ঘটনাটি প্রকাশ পেয়ে থাকে। এভাবেই আল্লাহ অনস্তিত্বকে অস্তিত্বে এবং অস্তিত্বকে অনস্তিত্বে রূপান্তরিত করে থাকেন। আল্লাহ বলেন– يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰبِ "আল্লাহ যা চান বিলুপ্ত করেন এবং যা চান কায়েম করেন, তাঁর কাছে (সবকিছু লিপিবদ্ধ আকারে) মূল গ্রন্থে রয়েছে।" যেমন, আল্লাহ তা'আলা হয়ত এক ধরনের বিপদ সৃষ্টি করেন। তারপর সেটাকে কোনো বিপদযোগ্য ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করার উপক্রম করেন। তখন যদি তার তরফ থেকে তাওবা কা দু'আ উর্ধ্বজগতে পৌঁছে যায়, সে বিপদ তিনি রহিমত করে দেন।

بَابُ مَاجَاءَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ صـ٣٥

অনুচ্ছেদ ঃ ৫. প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رَبِيْعَةَ الْبَنَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْمِلَّةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ هَلَكَ قَبْلَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ بِهِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ : يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَفِي الْبَابِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ .

৬. মুহাম্মদ ইবনে হয়াহইয়া কুতাঈ .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক সন্তান মিল্লাতে ইসলামিয়ার উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা এবং মুশরিক বানায়। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এর পূর্বেই যদি কেউ মারা যায় ? তিনি বললেন, তারা কি আমল করত সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবহিত আছেন।

আবূ কুরায়ব ও হুসায়ন ইবনে হুরায়ছ রহ .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে এ মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে মিল্লাত এর স্থানে ফিতরাত এর কথা উল্লেখ হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

শু'বা প্রমুখ রহ. এটিকে আ'মাশ– আবূ সালিহ– আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম ﷺ বলেন, জন্মগ্রহণ করে ফিতরাতের ওপর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ الخ ঃ জমহূরের মতে এখানে সকল শিশু দ্বারা উদ্দেশ্য সকল নবজাতক শিশু। যেমন, বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে– مَامِنْ مَوْلُودٍ اِلَّايُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ এখানে نكره এসেছে نفى এর আওতাধীন হয়ে, যা عُمُوم তথা ব্যাপকতা বুঝায়। কারও কারও অভিমত হল, হাদীসে উল্লেখিত كُلُّ مَوْلُودٍ শব্দ দ্বারা সকল নবজাতক শিশু উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল কিছু কিছু নবজাতক ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তারা দলীল পেশ করেন নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে–

ماأخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن ابى سعيد مرفوعا ألا إن بنى آدم خلقوا طبقات، فمنهم من يولد كافرا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا .

তারা বলেন, এ হাদীসটি এবং খিযির আ. এর ঘটনা প্রমাণ করে যে, كلمولود দ্বারা عموم তথা সকল নবজাতক উদ্দেশ্য নয়।

জমহূর এর জবাবে বলেন, সাঈদ ইবনে মানসূরের হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়। কারণ, হাদীসের সনদে ইবনে জাদ'আন নামক একজন রাবী আছেন, যাকে হাদীস বিশারদগণ 'দুর্বল' বলে অভিহিত করেছেন। আর হযরত খিযির আ, এর ঘটনাটি আল্লাহ তা'আলার ইলমের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ফিতরাত দ্বারা কি উদ্দেশ্য ?

يُولَدُ عَلَى الْمِلَّةِ الخ ঃ বুখারী এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনায় يُوْلَدُعَلَى الْفِطْرَةِ শব্দে এসেছে। 'ফিতরাত' এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। অধিকাংশ আলেমের মনেত 'ফিতরাত' অর্থ ইসলাম। আল্লামা তীবী এবং কুরতুবী বলেন, ফিতরাত অর্থ ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতা। হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, ফিতরাত দ্বারা ইসলামের মুকাদ্দমা বা ভূমিকা উদ্দেশ্য। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, যেমনিভাবে পশুজগতের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বুঝ ও অনুধাবন শক্তি দান করা হয়েছে, যেমন মধুপোকাকে এ জ্ঞান দান করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কিছু ফুল থেকে রস আহরণ করে বিশেষ পদ্ধতিতে বাসা বানিয়ে সেখানে মধু রাখবে। তেমনিভাবে মানবজাতিকেও এ বিশেষ জ্ঞান ও অনুভূতি নবজাতক থাকাকালেই দান করা হয়েছে, যে জ্ঞানের মাধ্যমে তারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে। আর এটাই ফিতরাত। (তাকমিলাহ ঃ ৫)

فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ الخ ঃ এর দ্বারা পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মাতা-পিতাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে একজন শিশুর সবচেয়ে নিকটতম এবং সর্বাধিক প্রভাব ও পরিবেশ সৃষ্টিকারী হল, তার মাতা-পিতা।

কাফির-মুশরিকের শিশুদের সম্পর্কে কি হুকুম ?

কোন কাফির মুশরিকের নাবালেগ শিশু মারা গেলে জান্নাতে যাবে কিনা, এ ব্যাপারে একাধিক মত পাওয়া যায় :

(১) মাতা-পিতার অনুগামী হয়ে জাহান্নামে যাবে।

(২) তারা আ'রাফে অবস্থান করবে।

(৩) জান্নাতে যাবে, তবে জান্নাতের অধিকারী হয়ে নয়; বরং জান্নাতীদের খাদেম হিসাবে যাবে।

(৪) তাদের পুরুস্কার কিংবা তিরষ্কার কিছুই করা হবে না।

(৫) তাদের ব্যাপারে নীরব থাকাই শ্রেয়। আল্লাহই ভালো জানেন যে, তাদের কি পরিণতি হবে। ইমাম আবু হানীফারও এটাই অভিমত। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

(৬) আখেরাতে তাদের থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। যেমন, তাদের সামনে আগুন দেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করতে বলা হবে, যদি প্রবেশ করে তাহলে তার জন্য আগুন শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যাবে। আর যদি প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

(৭) মূল ফিতরাতের কারণে জান্নাতে যাবে।

শেষোক্ত মতটিই সহীহ ও অগ্রাধিকার যোগ্য। এটাই জমহূর মুহাক্কিকদের মাযহাব। তাদের এ মতের সমর্থনে একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা–

(১) হযরত সামুরা ইবনে যুনদুর রাযি. বর্ণিত একটি বিশাল হাদীসে পাওয়া যায় যে, মি'রাজের রাতে রাসূল ﷺ এবং ইবরাহীম আ. পরস্পর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তখন ইবরাহীম আ. এর চারপাশে ছিল অনেক নাবালেগ শিশু। তারপর বলা হয়েছে–

وأما الرجل الذى فى الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله ! و أولاد المشركين ؟ فقال رسول الله ﷺ۔ و أولاد المشركين ۔ وهذا اللفظ البخارى آخر كتاب التعبير ۔

এ হাদীসটি মুশরেকদের নাবালেগ সন্তান জান্নাতী হওয়ার জন্য সহীহ এবং স্পষ্ট দলীল।

(২) ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে খান্সা বিনতে মু'আরিয়া সূত্রে বর্ণনা করেন–

عن خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت قلت يا رسول الله ! من فى الجنة ؟ قال النبى ﷺ ۔ النبى فى الجنة والشهيد فى الجنة والمولود فى الجنة ۔ اسناده حسن ۔

(৩) আলোচ্য অনুচ্ছেদের বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমেও দলীল পেশ করা যায়। যেমন, হাদীসে বলা হয়েছে ফিতরাতের উপর একজন শিশু থাকে। ফিতরাত অর্থ যদি ইসলাম হয় তাহলে সে তো সত্য দিনের উপরই আছে। সুতরাং সে জান্নাতে যাবে। (তাকমিলাহ ঃ ৫, তোহফাহ)

بَابُ مَاجَاءَ لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ ص ٣٥

অনুচ্ছেদ ঃ ৬. দু'আ ছাড়া তাকদীর রদ হয় না

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَا نَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ عَنْ اَبِيْ مَوْدُوْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ـ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ اِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ اِلَّا الْبِرُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيْ اَسِيْدٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ وَاَبُوْمَوْدُوْدٍ اثْنَانِ اَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ فِضَّةُ وَالْاٰخَرُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ اَحَدُهُمَا بَصْرِيٌّ وَالْاٰخَرُ مَدِيْنِيٌّ وَكَانَا فِيْ عَصْرٍ وَاحِدٍ وَاَبُوْ مَوْدُوْدٍ الَّذِيْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ اِسْمُهُ فِضَّةُ بَصْرِيٌّ ـ

৭. মুহাম্মদ ইবনে হুমায়দ রাযী ও সাঈদ ইবনে ইয়াকুব রহ. .... সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুআ ছাড়া আর কিছুই তাকদীর রদ করতে পারে না। আর নেক আমল ছাড়া আর কিছুই বয়সে বৃদ্ধি ঘটায় না।

এ বিষয়ে আবু আসীদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি হাসান গরীব। ইয়াহইয়া ইবনে যারায়স– এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্ক আমরা অবহিত নই। আবূ মাওদূদ। একজনকে বলা হয় ফিয্যা। অপরজন হল আবদুল আযীয ইবনে আবু সুলায়মান। একজন বাসরী অপর জন মাদীনী। উভয়েই ছিল সমসাময়িক কালের। যে আবু মাওদূদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর নাম হল, ফিয্যা বসরী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ اِلَّا الدُّعَاءُ ঃ একথার মর্মার্থ উদ্ধারে উলামায়ে কিরাম থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা–

(১) দু'আর প্রভাব প্রতিক্রিয়া হাদীসের মধ্যে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'মুবালাগা' বা আতিশয্য হিসাবে। অর্থাৎ তাকদীর পরিবর্তনকারী কোন কিছু যদি থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে দু'আ।

(২) বাস্তবেও দু'আ দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হতে পারে। তবে তাকদীর দ্বারা 'তাকদীরে মু'আল্লাক' উদ্দেশ্য। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা পরিবর্তন করতে পারেন।

(৩) দু'আও তাকদীরে আছে। অর্থাৎ বান্দাকে দু'আর তাওফীক দেওয়া হবে। ফলে বালা-মুসিবত ইত্যাদি দু'আর বরকতে দূর হয়ে যাবে– একথাও তাকদীরে লেখা আছে।

لَا يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ اِلَّا الْبِرُّ ঃ এর মর্মার্থের ব্যাপারে কয়েক ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা–

(১) বাক্যটি উপমা হিসাবে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন কিছু বয়স বাড়ানোর শক্তি রাখে না, যদি রাখত, তাহলে সেটা ছিল নেক আমল।

(২) বান্দা নেকআমল করলে তার জীবন অযথা বৃথা যায় না। প্রকারান্তরে এর মাধ্যমে তার জীবন বৃদ্ধি পেল।

(৩) বয়স বাড়ার অর্থ হল, বয়সে বরকত হওয়া। অর্থাৎ জীবনে এত বেশি কাজ করবে, যা অধিক জীবন পেলেও করা যায় না।

(৪) দুনিয়াতে তার সুখ্যাতি অবশিষ্ট থাকবে। বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ এটাই।

(৫) কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা ইংগিত দেওয়া হয়েছে যে, জীবনের সময়গুলো তার বৃথা যাবে না।

(৬) কেউ কেউ বলেন, বয়স বাড়বে, বাস্তবেই বাড়বে। কারণ, প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য; রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

باب ماجاء انّ القلوب بين اصبعى الرّحمن ص-٣٥

অনুচ্ছেদ ঃ ৭. অন্তর হল রহমানের দুই আঙ্গুলের মাঝে

حدّثنا هنّادٌ نا ابُو مُعاوية عن الاعمش عن ابى سُفين عن انسٍ قال كان رسول الله ﷺ يُكثِر ان يقول يامقلّب القلوب ثبّت قلبى على دينك فقلت يا نبىّ الله امنابك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم انّ القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلّبها كيف شاء . وفى الباب عن النّوّاس بن سمعان وامّ سلمة وعائشة وابى ذر هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وهذا روى غير واحدٍ عن الاعمش عن ابى سُفيان عن انسٍ وروى بعضهم عن الاعمش عن ابى سفين عن جابرٍ عن النّبىّ ﷺ وحديث ابى سُفيان عن انس اصحّ .

৮. হান্নাদ .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব বেশী বলতেন,

يا مقلّب القلوب ثبّت قلبى على دينك

হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আমার দীনের উপর দৃঢ় রাখ।

আমি বললাম, আপনার এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সব বিষয়ের উপর আমরা ঈমান রাখি, আপনি কি আমাদের সম্পর্কে কোন আশংকা পোষণ করেন ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, অন্তর তো আল্লাহ তা'আলার দুই আঙ্গুলের মাঝে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তিত করেন।

এ বিষয়ে নাওওয়াদ ইবনে সামআন, উম্মু সালামা, আয়েশা ও আবূ যার্‌র রাযি. থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

একাধিক রাবী আ'আশ আবু সুফইয়ান –আনাস রাযি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কতক রাবী আ'মাশ আবূ সুফইয়ান জাবির রাযি. সনদে একটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে আবু সুফইয়ান –আনাস রাযি. সূত্রটি অধিক সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

انّ القلوب بين اصبعى الرّحمن ঃ ভাষ্যটি কেমন যেন এরকম যে, অমুক ব্যক্তি আমার হাতের মুঠোয়। অর্থাৎ কারও উপর পূর্ণ ক্ষমতা থাকলে তখন এ ধরনের কথা বলা হয়। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার দুই আঙ্গুলের মাঝখানে কলবসমূহ এর অর্থ সকল কলব সম্পূর্ণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে।

শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন মূলতঃ বান্দার নিত্য কাজের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা তার করার কিছু থাকে না। কারণ, উদ্দিষ্ট বস্তুর নকশা ও তার ফায়দা অন্তরে জাগরিত হওয়া ও তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার ইচ্ছা পোষণ এ স্বাধীনতার জন্ম নেয়। অথচ তা কিভাবে হল সে খবর বান্দার নেই। তাহলে স্বাধীনতা কোথায় ? রাসূল ﷺ সে দিকে ইংগিত করে বলেছন, অন্তর তো আল্লাহর দু'আঙ্গুলের ফাঁকে অবস্থান করছে।

إِصْبَعَيِ الرَّحْمٰنِ সম্পর্কে আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লোহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর সেভাবেই ঈমান রাখি, যেভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। তার কোন ব্যাখ্যা আমরা করি না। ইমাম তিরমিযী রহ. অপর এক স্থানে বলেন, এটা কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় ব্যাপার নয়। তাই এরূপ বলা যাবে না যে, তার হাত আমাদের হাতের মত, তার আঙ্গুল আমাদের আঙ্গুলের মত। সুফিয়ান সাওরী, ইমাম মালিক, ইবনে উয়াইনা বলেন, এ ধরনের কথা যেভাবে বর্ণিত আছে, সেভাবেই তার উপর ঈমান রাখি। এ প্রশ্ন তোলা যাবে না যে, তাহল কিভাবে ? কারণ, কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ কোন কিছুই আল্লাহর মত নয়।

আল্লাহ তা'আলার সিফাতে মুতাশাবিহা সম্পর্কে মাসআলা

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির মত যেসব হাদীসে স্পষ্টতঃ আল্লাহর দৈহিক গঠনের প্রতি ইংগিত করে সেসব হাদীস নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত বিরোধী দু'টি ভিন্ন মতালম্বী দলের জন্ম হয়। একদিকে মুজাস্‌সিমা (নরাত্মারোপবাদী) এবং মুশাববিহা (সাদৃশ্য প্রতিপাদন কারী) ফিরকার উৎপত্তি হয়, যারা মানুষেরই মত আল্লাহর হাত পা আছে এল স্বীকার করে। অপরদিকে মু'তাযিলা ও কাদরিয়ারা আল্লাহর সিফাত ও গুনাবলীকে অস্বীকার করে বসে। এ শ্রেনীর লোকদেরকে মু'আত্তিলাও বলা হয়।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উলামায়ে কিরাম সকল সাদৃশ্য জ্ঞাপন হাদীসকে 'মুতাশবিহাত' এর পর্যায়ভুক্ত মনে করেন এবং 'মুতাশাবিহাত' এর ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি অনুসারে আল্লাহর পবিত্র সত্তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ব্যতীত এর প্রতি ঈমান রাখেন এবং যেসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা সাদৃশ্য (تَشْبِيه ও تَمْثِيل) এর প্রকাশ ঘটে থাকে তার আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকেন। তাদের বক্তব্য হল, আল্লাহর হাত, আঙ্গুল, মুখ, আরশে সমাসীন হওয়া ইত্যাদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে তার হাকীকত বা প্রকৃত স্বরূপ আমাদের জানা নেই। আল্লাহর মত হাত, মুখ ইত্যাদি আছে, তবে এগুলো আমাদের কারো মত নয়। চার ইমাম এবং যমহূরের মত এটাই। ইমাম আবু হানীফা রহ. ফিক্বহে আকবর গ্রন্থে বলেন–

فما ذكر الله فى القران من ذكر الوجه واليد والنفسه والعين فهو له صفات ولا يقال أن يده قدرة أو نعمة لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفة بلا كيف ـ

"কুরআনে আল্লাহ তা'আলা চেহারা, হাত, মন, চোখ ইত্যাদির যে উল্লেখ করেছেন, এগুলো তার গুনাবলী। 'হাত' দ্বারা শক্তি বা নেয়ামত উদ্দেশ্য– এরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। কেননা এতে তাঁর সিফাতকে অস্বীকার করা হয় যা কাদরিয়া ও মু'তাযিলাদের মতবাদ বরং হাত তাঁর একটি সিফাত, তবে সেই হাতের কাইফিয়াত বা অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।" (বয়ানুল-কুরআন, তাকমিলাহ, ইসলামী আক্বীদা)

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ اللّٰهَ كَتَبَ بِالْاَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ص٣٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৮. আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের জন্য এবং জাহান্নামীদের জন্য একটি কিতাব লিখে রেখেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِىْ قَبِيْلٍ عَنْ شُفَىِّ بْنِ مَاتِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَا الْكِتَابَانِ ؟ فَقُلْنَا : لَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَّا اَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ، اَلَّذِىْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَاءُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِىْ فِىْ شِمَالِهِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَاءُ اَهْلِ النَّارِ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلَايُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا ، فَقَالَ اَصْحَابُهُ : فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ اَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا فَاِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ، وَاِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا، ثُمَّ قَالَ : فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ اَبِىْ قَبِيْلٍ نَحْوَهُ ـ

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ـ وَاَبُوْ قَبِيْلٍ اِسْمُهُ حُيَىُّ بْنُ هَانِئٍ ـ

৯. কুতায়বা ইবনে সাঈদ .... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। তাঁর হাতে ছিল দুটি কিতাব। তিনি বললেন, তোমরা কি জান এ দুটি কি কিতাব ? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে অবহিত করা ছাড়া আমরা পারব না। তিনি যে কিতাবটি তার ডান হাতে ছিল, সেটি সম্পর্কে বললেন, এটি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এক গ্রন্থ। এতে রয়েছে জান্নাতবাসীদের নাম এবং তাদের পিতার ও গোত্রসমূহের নাম। এরপর এর শেষে মোট জমা রয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কখনো বৃদ্ধি করাও হবে না কিংবা কমানোও হবে না।

এরপর তিনি যে কিতাবটি তার বাম হাতে ছিল, সেটি সম্পর্কে বললেনঃ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা একটি গ্রন্থ। এতে রয়েছে জাহান্নামীদের নাম, তাদের পিতাও গোত্রসমূহের নাম। এরপর এর শেষে রয়েছে মোট জমা। তাদের মাঝে কখনো বৃদ্ধিও হবে না বা কমানও হবে না। তাঁর সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বিষয়টি যদি এমন হয় যা সমাধা হয়ে গিয়েছে তবে আমল কিসের জন্য ?

তিনি বললেন, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে সোজা চলতে থাক আর না হয় কাছাকাছি চলতে থাক। কেননা সে যাই কিছু করুক অবশ্যই জান্নাতীর আমলের মাধ্যমেই জান্নাতবাসীর জীবন সমাপ্তি ঘটবে। আর সে যত কিছুই করুক জাহান্নামীর আমলের মাধ্যমেই ঘটবে জাহান্নামবাসীর জীবন সমাপ্তি।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে এ দুটি কিতাব ছুড়ে ফেললেন। এরপর বললেন, তোমাদের

প্রভু বান্দাদের বিষয়ে কাজ শেষ করে ফেলেছেন, একদল তো জান্নাতের আরেক দল জাহান্নামের।

কুতাইবা .... আবূ কাবীল রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে ইবনে উমার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ কাবীলের নাম হল হুবায় ইবনে হানী রহ.।

حدّثنا على بن حجر، حدّثنا إسمعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال : قال رسول الله ﷺإذا أراد الله بعبد خيرا إستعمله فقيل : كيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل : الموت، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

১০. আলী ইবনে হুজর .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তার বান্দা সম্পর্কে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তাকে আমল করতে দেন। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিভাবে তিনি আমল করতে দেন ? তিনি বললেন, মত্যুর পূর্বে তিনি তাকে নেক আমলের তওফীক দিয়ে দেন। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

১. فقال سددوا ঃ সাদাদের অর্থ হল, প্রতিটি কাজে মর্ধপন্থা অবলম্বন করা। মোল্লা আলী কারীর রহ. বলেছেন, তোমরা তোমাদের আমলগুলোকে হকপদ্ধতিতে সহীহ করে নাও। হাফিয ইবনে হাযার রহ. বলেছেন, এর অর্থ হল, সঠিক জিনিসকে আবশ্যক করে নাও। চরমপন্থা কিংবা নিষ্ক্রীয় পন্থা অবলম্বন কর না।

২. সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বাড়াবাড়ি কিংবা কমাকমিকে পরিহার করে চল। হাফিজ রহ. বলেছেন, যদি পরিপূর্ণ জিনিসের উপর আ;মল করতে সক্ষম না হও, তাহলে আমলে কমপক্ষে কাছাকাছি থাক। এখানে দার্শনিকসূলভ উত্তর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা তাকদীর নিয়ে কিসের আলোচনা ও বাদানুবাদ করছ ? তোমাদেরকে তো ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং আমল কর এবং আমলের আপেক্ষায় আমলের কাছাকাছি থাক। সারকথা হল, এর মাধ্যমে জাবরিয়া ও কদরিয়াদের মতবাদ অস্বীকার করে মধ্যপন্থা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

فى يده كتابان ঃ হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, বাস্তবেই সে সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে দুটি রেজিস্ট্রি বুক ছিল, যেগুলো তিনি সাহাবায়ে কিরাম দেখিয়েছেন, তবে খুলে দেখাননি যে, এগুলোর ভেতর কি আছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি রয়েছে। যথা–

১. কোন কোন মুহাদ্দিস বলেন, আসলে বস্তুগতভাবে রেজিস্ট্রি বুকের কোন অস্তিত্ব ছিল না বরং নবীজী ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে বিষয়টি বুঝানোর জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করলেন যে, যদ্বারা মনে হয়েছে কেমন যেন বাস্তবেই তাঁর হাতে রেজিস্ট্রি বুক ছিল। সুতরাং এটা ছিল এক প্রকার উপমা।

২. মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম বলেন, আসলে এগুলো ছিল আলমে গাইবের দুটি কিতাব। কারণ, এটা তো রাসূলের জন্য অসম্ভব কোন কিছু নয়। যেহেতু নবীর সম্পর্ক অদৃশ্য জগতের সঙ্গে এত বেশী হয়ে থাকে তিনি ইচ্ছা করলে জান্নাত থেকে ফল ছিঁড়ে আনতে পারেন এবং উম্মতকে দিতে পারেন। চন্দ্র-দ্বিখণ্ডিত করেছেন। তাঁর আঙ্গুল থেকে ঝরনা চালু হয় ইত্যাদি। সুতরাং এ দু'টি ফিতার বাস্তবেই তিনি দেখিয়েছেন –এটা অসম্ভব কোন কিছু নয়। প্রশ্ন হতে পারে, এত সংখ্যক মাখলুকের জন্য এত সংক্ষিপ্ত রেজিস্ট্রিবুক কিভাবে হতে পারে। দুনিয়ার কম্পিউটারকে উপমা হিসাবে দেখলেই এর সহজ সমাধান হয়ে যাবে।

৩. শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. লিখেন–

والظاهر من السياق كما افادة الوالد المرحوم عند الدرس على سبيل التمثال اى فوتو (الكوكب)

অর্থাৎ হাদীসের পূর্বাপর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, এটি উপমা হিসাবে রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন।

باب ماجاء لاعدوى ولاهامة ولاصفر ص ٣٦

অনুচ্ছেদ ঃ ৯. রোগ সংক্রমন, হামা অর্থাৎ পেঁচকে বিশ্বাস বা সফর মাস সম্পর্কে কুসংস্কার ইসলামে নেই

حدثنا بُندارٌ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سُفيان عن عمارة بن القعقاع ، حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: حدّثنا صاحبٌ لنا عن ابن عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: لايعدى شئ شيئا ، فقال أعرابيّ : يا رسول الله ! البعير الجرب الحشفة بذنبه فتجرب الإبل كلّها فقال رسولُ الله ﷺ - فمن أجرب الاوّل ؟ لا عدوى ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها - قال ابو عيسى : وفي الباب عن أبي هريرة وابن عبّاس وأنس قال : وسمعت محمّد بن عمرو بن صفوان الثّقفيّ البصرىّ قال: سمعت عليّ ابن المدينيّ يقول: لو حلفت بين الرّكن والمقام لحلفت أنّي لم ار أحدا أعلم من عبد الرّحمن بن مهديٍّ

১১. বুন্দার .... ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। বললেন, কোন জিনিসই অন্য কিছুতে রোগ বিস্তার করতে পারে না। তখন জনৈক বেদুঈন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জননেন্দ্রীয়ে পাঁচড়াযুক্ত একটি উট সবগুলোই তো পাঁচড়া ক্রান্ত করে ফেলে ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে প্রথম উটটিকে কে পাঁচড়াক্রান্ত করেছিল ? সংক্রামক বলতে কিছু নেই। ছফর বলতেও কিছু নেই। প্রতিটি প্রাণ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি এর হায়াত, এর রিযক এবং আপদ-বিপদ সব কিছু লিখে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা, ইবনে আব্বাস ও আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে সাফওয়ান ছাকাফী বাসরী রহ. বলেছেন, আলী ইবনে মাদীনী রহ. কে বলতে শুনেছি, হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝে দাঁড়িয়েও যদি কসম করি, তবে তা করে বলতে পারি যে, আবদুর রাহমান ইবনে মাহদী অপেক্ষা বড় আলিম কাউকে দেখিনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لايُعدِى شئٌ شيئًا ঃ সাধারণতঃ ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে এ ধারণা করা হয় যে, এক ব্যক্তির ছোঁয়াচে রোগ অন্য ব্যক্তির মধ্যে সংক্রমিত হয় শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। কারণ, কোন রোগের মধ্যে সংক্রমিত হয় এর কোন ভিত্তি শরী'আতে নেই। কারণ, কোন রোগের মধ্যে সংক্রমনের নিজস্ব ক্ষমতা নেই। জাহিলীযুগের কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে একটি ধারণা ছিল রোগ সংক্রমনের ধারণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত হাদীসে এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, রোগের মধ্যে সংক্রমণ ক্ষমতা বলতে কোন কিছুই নেই। নতুবা প্রথম উটটি আক্রান্ত হল কিভাবে ? কাজেই আমরা দেখতে পাই, এ ধরনের বোগে আক্রান্ত লোকের সাথে উঠা বসা করার পরেও অনেকে আক্রান্ত হয় না আবার অনেকে উঠা-বসা না করেও আক্রান্ত হয়।

দুই হাদীসের মধ্যে বিরোধ ও তার সমাধান

এখানে প্রশ্ন জাগে, এ হাদীস থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় কোন রোগ সংক্রমিত হয় না। অথচ অন্য হাদীসে ছোঁয়াচে রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। যেমন, বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এসেছে فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ 'সিংহ থেকে যেভাবে পলায়ন কর, কুষ্ঠরোগী থেকেও সেভাবে পলায়ন কর।'

অনুরূপভাবে আরেক হাদীসে এসেছে, لَايُوْرِدُوْنَ مُمَرِّضٌ عَلٰى مُصِحٍّ 'যার সুস্থ-অসুস্থ উট আছে, সে যেন তার উট সুস্থ ব্যক্তির উটের সাথে পানি পান করতে না পাঠায়।' সুতরাং এই উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে বাহ্যতঃ বিরোধ দেখা যায়। এর সমাধান কি?

এর সমাধানের জন্য উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। যথা–

১. কোন কোন উলামায়ে কিরাম لَايُوْرِدُوْنَ مُمَرِّضٌ عَلٰى مُصِحٍّ হাদীসকে আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা 'মানসূখ' সাব্যস্ত করেছেন।

২. কেউ কেউ 'তারজীহ' এর পন্থা অবলম্বন করেছেন। তন্মধ্যে কতক আলেম ছোঁয়াচে নিষেধযুক্ত হাদীসকে বিপরীত হাদীসদ্বয়ের উপর তারজীহ দিয়েছেন। আবার কেউ তার উল্টো করেছেন।

৩. কেউ কেউ আবার تَطْبِيْق তথা সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাদের বক্তব্য হল, এখানে কোন تَعَارُض বা বৈপরিত্ব নেই। যে সব হাদীসে রোগ সংক্রমণের কথা অস্বীকার করা হয়েছে, সেটাই আসল কথা। আর যে হাদীসে কুষ্ঠরোগী থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার কথা বলা হয়েছে, তা মূলতঃ মানুষের আক্বীদাকে বাঁচানোর স্বার্থে। কারণ, এ ধরনের রোগীর নিকট যাওয়ার পর আল্লাহর ফয়সালায় সে ও রোগাক্রান্ত হলে তার আক্বীদায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে। ভাবতে পারে, এ রোগীর নিকট আসার কারণেই সে আজ আক্রান্ত হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তো যা হওয়ার তা আল্লাহর ফয়সালাতেই হয়।

৪. কতক আলেম এভাবে সমাধান দিয়েছেন যে, বস্তুবাদীরা এক্ষেত্রে রোগের নিজস্ব সংক্রমণ ক্ষমতা আছে বলে ধারণা করে। ঠিক জাহিলীযুগের আরবদের ধারণার মত। অর্থাৎ তারা সংক্রামক রোগ مُؤَثِّر حَقِيْقِىْ তথা মূল প্রতিক্রিয়াকারী মনে করে। এজন্য হাদীস শরীফে 'সংক্রমণ হয় না' বলে রোগের মধ্যে সংক্রমণ ক্ষমতা না থাকা বা রোগ মূলতঃ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। এ কথা বুঝানো হয়েছে বরং সংক্রমিত হওয়ার থাকলে কিংবা না থাকলে আল্লাহর ফয়সালাতেই হয়। আর যে হাদীসে কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকার বা রোগাক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ প্রাণীর কাছে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এরূপ রোগীর 'সংস্পর্শ' আক্রান্ত হওয়ার 'ইল্লত' বা কারণ। তাই 'ইল্লত' থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, দুর্বল দেয়ালের কাছে যেতে নিষেধ করা হয়। কারণ, তার পাশে দাঁড়ালে এ দাঁড়ানোই তার মৃত্যুর 'ইল্লত' বা কারণ হতে পারে।

আল্লামা নববী, গাঙ্গুহী, তাকী উসমানী প্রমুখসহ সকল মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম শেষোক্ত মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, এতে হাদীস ও ডাক্তারী বিদ্যার সাথে আর কোন সংঘর্ষ থাকে না।

(আল-কাওকাব, তাকমিলাহ, তোহফাহ)

لَاهَامَةَ এখানে هَامَةَ এর মর্মার্থ কি ?

এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা–

(১) এর দ্বারা এক প্রকারের নির্দিষ্ট জানোয়ার উদ্দেশ্য। যা আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতের আরবদের ধারণা মতে মৃত ব্যক্তির পুরনো হাড্ডি থেকে সৃষ্টি হয় এবং মৃত ব্যক্তির কাছে তার পরিবার-পরিজনের সংবাদ আদান-প্রদান করে। রাসূল ﷺ তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকেও খণ্ডন করেছেন।

(২) জাহিলিয়াত যুগের আরবদের মাঝে এ উদ্ভট কথা প্রচলিত ছিল যে, কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে দেওয়া হলে নিহত ব্যক্তির মাথা থেকে هَامَةٌ নামক একটি জানোয়ার বের হয় এবং নিরবিচ্ছিন্ন ফরিয়াদ জানাতে থাকে যে, 'আমাকে পানি দাও, আমাকে পানি দাও'.... বলে। তারপর যখন নিহত ব্যক্তির কিসাস নেওয়া হয় কিংবা যখন হত্যা কারী মারা যায় তখন ঐ কথিত জানোয়ারটি অজানা পথে উধাও হয়ে যায়। কেউ কেউ তখন বলত, এ জানোয়ারটি মূলতঃ নিহত ব্যক্তির আত্মা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(৩) কতক আলেম বলেনঃ هَامَة অর্থ পেঁচা। অনেকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, যে ঘরে পেঁচা বসবে সে ঘর বিরান করে ছাড়বে অথবা সে ঘরের কেউ না কেউ মারা যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করেছেন।

وَلَاصَفَرَ এর ব্যাখ্যা কি ঃ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও একাধিক উক্তি পাওয়া যায়। যথা–

(১) صَفَرَ দ্বারা উদ্দেশ্য সফর মাস। জাহিলিয়াত যুগে এক বছরের সফর মাস হালাল মনে করা হলে পরের বছরের সফর মাসকে হারাম মনে করা হত। অথবা সফর মাস সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল, এটি একটি কুলক্ষুণে মাস। এ মাসে বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি বেশি দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধারণাটি ভ্রান্ত আখ্যায়িত করেছেন।

(২) কেউ কেউ বলেন, জাহিলিযুগের আরবদের ধারণা ছিল, প্রতেক মানুষের যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন এ সাপ পেটের ভেতরে দংশন করতে থাকে। যার কারণে ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য মনে হয়। রাসূল ﷺ এ হাদীসের মাধ্যমে এ উদ্ভদ ধারণাকে ভিত্তিহীন অভিহিত করেছেন।

(৩) কতক আলেমের মতে জাহিলীযুগে আরবদের মধ্যে একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ছিল, পেটের মধ্যে 'সফর' নামক এক প্রকার জোঁক বা পোকা থাকে। মানুষের ক্ষুধা লাগলে এগুলো দংশন করতে থাকে। কখনো কখনো মানুষ এ কারণে হলুদ বর্ণের হয়ে যায়। এমনকি মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধারণাকে অমলক আখ্যা দিলেন।

(৪) ইমাম বুখারী রহ. বলেন 'সফর' এক প্রকার পেটের রোগ। আরবদের ধারণা মতে এটি হলে মানুষের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবদের এসব উদ্ভট, ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণাকে খণ্ডন করে বলে দিলেন, لَاصَفَرَ ছফর বলতে কিছু নেই। (তোহফাহ, মাজাহেরে হক)

بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ الْإِيْمَانَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ صـ ٣٦

অনুচ্ছেদ ঃ ১০. তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস

حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، حَتّٰى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو . وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ . وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ .

১২. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবনে ইয়াহইয়া বাসরী .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান না রাখা পর্যন্ত কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না। এমনকি তার ইয়াকীন করতে হবে যে, যা তার কাছে পৌঁছার তা কখনও তাকে ত্যাগ করবে না আর যা তাকে ত্যাগ করার তা কখনও তার কাছে পৌঁছবে না।

এ বিষয়ে উবাদা, জাবির ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির রাযি. বর্ণিত হাদীস হিসাবে হাদীস গরীব। আবদুল্লাহ ইবনে মায়মূনের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবতি নই। আবদুল্লাহ ইবনে মায়মূন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার।

حَدَّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيلَانَ ـ حدّثنا أَبُو دَؤاد قال: أنبانا شعبة عَنْ منصور عن ربعي بن حراش عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : لا يُؤمِنُ عَبْدٌ حَتّى يُؤمِنَ بِأَربَعٍ : يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ ، وَيُؤمِنُ بِالْمَوتِ وبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوتِ وَيُؤمِنُ بِالْقَدْرِ ـ

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ اِلّا أَنَّهُ قَالَ رِبْعِيٌّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ ـ قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ ، وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ ـ

حَدَّثَنَا الْجَارُودِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : بَلَغَنَا أَنَّ رِبْعِيًّا لَمْ يَكْذِبْ فِي الْإِسْلَامِ كِذْبَةً ـ

১৩. মাহমুদ ইবনে গায়লান .... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, চারটি বিষয়ে ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না, সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল, তিনি সত্যসহ আমাকে প্রেরণ করছেন; মত্যুর উপর ঈমান আনবে; মৃত্যুর পর পুনরোত্থানের উপর ঈমান আনবে; তাকদীরের উপর ঈমান আনবে।

মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ. শু'বা রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এর সনদে রিবঈ জনৈক ব্যক্তি সূত্রে আলী রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ ... শু'বা রহ. এর রিওয়ায়াতটি (২১৪৮ নং) আমার মতে নাযর রহ. এর রিওয়ায়াত (২১৪৮ক নং) অপেক্ষা অধিক সহীহ। একাধিক রাবী মানসূর... রিবঈ... আলী রাযি. থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। জারূদ রহ. বর্ণনা করেন, ওয়াকী রহ. কে বলতে শুনেছি যে, রিবঈ ইবনে হিরাশ ইসলামের হীবনে কোন একটি মিথ্যা কখনও বলেন নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নেয়ামত, মুসিবত যা কিছু বান্দার তাকদীরে আছে, তা হবেই। আর যা তাকদীরে নেই তা কখনও হবে না। সুতরাং নেয়ামত পেলে এবং সফল হলে একথা বলা যাবে না যে, আমার চেষ্টার কারণে হয়েছে। আর মুসিবত আসলে কিংবা বিফল হলে একথা বলা যাবে না যে, যদি আমি চেষ্টা করতাম, তাহলে এমন হত না। মোটকথা এ হাদীসের মাধ্যমে তাওয়াক্কুল, অল্পেতুষ্টি, সবর, তাকদীরের প্রতিও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

يُؤمِنُ بِالْمَوتِঃ মউতের উপর ঈমান আনার অর্থ হল, প্রথম একথার উপর বিশ্বাস রাখা যে, এ নশ্বর পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে দাহরিয়া সম্প্রদায় যারা পৃথিবী চিরস্থায়ী হওয়ার প্রবক্তা– তাদেরকেও রদ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল। মউত আল্লাহ দেন। অসুস্থতা, দুর্বলতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি মউত দিতে পারে না। এগুলো মউতের জন্য হয়ত উসীলা হতে পারে।

باب ماجاء ان النفس تموت حيث ما كتب لها ص ٣٦

অনুচ্ছেদ ঃ ১১. যেখানে যার মৃত্যু নির্ধারিত তার মৃত্যু অবশ্যই সেখানে হবে

حدثنا بندار حدثنا مؤمل. حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن مطر بن عكامس قال: قال رسول الله ﷺ إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة.

قال أبو عيسى : وفي الباب عن أبي عزة، وهذا حديث حسن غريب ولا يعرف لمطر بن عكامس عن النبي ﷺ غير هذا الحديث.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ.

১৪. বুনদার .... মাতার ইবনে উকামিস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে যমীনে আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার মৃত্যু নির্ধারণ করেন, তিনি তার জন্য সেখানে গমনের প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন। এ বিষয়ে আবূ আযযা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীসটি হাসান গরীব। নবী কারীম ﷺ থেকে মাতার ইবনে উকামিস রাযি. এর বরাতে এ হাদীসটি ছাড়া আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ. সুফইয়ান রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا إِسْمعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً أَوْ قَالَ بِهَا حَاجَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَزَّةَ لَهُ صُحْبَةٌ وَاسْمُهُ يَسَارُ بْنُ عَبْدٍ، وأَبُو الْمَلِيحِ اِسْمُهُ عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرِ الْهُذَلِيُّ، وَيُقَالُ زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ.

১৫. আহমাদ ইবনে মানী' ও আলী ইবনে হুজর রহ. আবূ আযযা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দার জন্য যখন আল্লাহ তা'আলা কোন যমীনে মৃত্যুর ফায়ছালা করেন, তখন সেখানের জন্য তার একটা প্রয়োজন তিনি সৃষ্টি করে দেন। এ হাদীসটি সহীহ।

আবূ আযযা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্য্য পেয়েছেন। তাঁর নাম হল ইয়াসার ইবনে আবদ রাযি.। রাবী আবুল মালীহ ইবনে উসামা রহ. এর নাম হল আমির ইবনে উসামা ইবনে উমায়র হুযালী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مطر بن عكامس ঃ মাত্বার ইবনে উকামিস। তিনি কুফার অধিবাসী। এই একটি মাত্র হাদীস তার থেকে বর্ণিত। তাবরানী বলেন, তিনি সাহাবী কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে ইবনে হিব্বান এর তাহকীক মতে তিনি একজন সাহাবী ছিল। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈনকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তর দেন, আমি জানি না, তিনি সাহাবী কিনা! (তোহফাহ)

بَابُ مَاجَاءَ لَا تَرُدُّ الرُّقٰى وَالدَّوٰى مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا ص ٣٦

অনুচ্ছেদ ঃ ১২. ঝাঁড়-ফুঁক বা ঔষধ কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর রদ করতে পারে না

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِىْ خُزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ : هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ـ

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهٗ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِىْ خُزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ وَهٰذَا أَصَحُّ ـ هٰكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِىْ خُزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ ـ

১৬. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী .... ইবনে আবূ খিযামা তার পিতা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আপনি কি মনে করেন, এই ঝাঁড়-ফুঁক যা আমরা করাই, ঔষধ যা দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, পরহেয (আত্মরক্ষা) যার মাধ্যমে আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি, এ গুলি কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের কিছু প্রতিহত করতে পারে ? তিনি বললেন, এ-ও আল্লাহর তাকদীরের অন্তর্গত।

যুহরীর রিওয়ায়াত ছাড়া এ হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। একাধিক রাবী এ হাদীসটি সুফইয়ান যুহরী –আবূ খিযামা তার পিতা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। এটিই অধিকতর সহীহ। একাধিক রাবী যুহরী– আবূ খিযামা –তার পিতা রাযি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, তাকদীর কখনও কার্যকারণের পৃথিবীর নিয়ম-নীতির অন্তরায় নয়। কারণ, তাকদীরের সম্পর্ক হল, সেই সামগ্রিক ব্যবস্থার সাথে যা একবার করে রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বক্তব্যের এটাই তাৎপর্য। যখন তাক কাছে ঝাড়ু-ফুঁক, ঔষধ-পত্তরও আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقَدَرِيَّةِص ٣٧

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩. কাদারিয়্যা অর্থাৎ তাকদীর অস্বীকারকারী সম্প্রদায়

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْكُوْفِيُّ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيْبٍ وَعَلِيِّ بْنِ نِزَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِىْ لَيْسَ لَهُمَا فِى الْإِسْلَامِ نَصِيْبٌ : اَلْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ ـ

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ـ حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهٗ ـ

১৭. ওয়াসিল ইবনে আবদুল আ'লা .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের দুইটি দল এমন, যাদের ইসলামে কোন হিস্যা নেই, মুরজিআ যারা মনে করে বান্দার কুদরত বলতে কিছু নেই এবং আমলে কোন লাভ ক্ষতি নাই; কাদারিয়া যারা মনে করে বান্দার কুদরতই সবকিছু এবং তাকদীরকে অস্বীকার করে।

এ বিষয়ে 'উমার, ইবনে 'আমর ও রাফি' ইবনে খাদীজ রাযি. থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। মুহাম্মদ ইবনে রাফি' –মুহাম্মদ ইবনে বিশ্‌র –সালাম ইবনে আবূ আমরা –ইকরিমা –ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে রাফি অন্য সনদে আলী ইবনে নিযার –নিযার –ইকরিমা রহ. –ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুরজিয়া المرجئة এ সম্পর্কে ইবনুল মালিক বলেন–

المرجئة من الارجاء، يقولون الأفعال كلها بتقدير الله تعالى وليس للعباد فيها اختيار وانه لا يضر مع الإيمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة

অর্থাৎ مرجئة শব্দটি الإرجاء মাসদার থেকে উৎকলিত। (অর্থ– স্থগিত করা, বিলম্বিত করা, অবকাশ দেওয়া) মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ হল, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব থেবেই নির্ধারিত এবং বান্দার ক্রিয়া-কলাপ তাদের নিজের ইচ্ছাধীন নয়। আর ঈমান থাকলে যেমন কোন গুনাহ দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয় না, তেমনি কুফর থাকলে কোন ইবাদত দ্বারা কোন লাভ হয় না। (অর্থাৎ নাজাতের জন্য ঈমান যথেষ্ট। ইবাদতের কোন উপকারিতা নেই, গুনাহেও কোন ক্ষতি নেই।)

কেউ কেউ বলেন, মুরজিয়া দ্বারা আসলে জাবরিয়্যা (جبرية) ফেরকা উদ্দেশ্য। যাদের আকীদা হল, মানুষ পাথর ও জড়পদার্থের মত নিষ্ক্রীয় বা বাধ্যকর্তা। যাদের নিজ কর্মে কোন ইচ্ছা বা স্বাধীন ক্ষমতা নেই।

এদের বিপরীতে হল কাদরিয়া (قدريه) সম্প্রদায়। তাদের আকীদা হল, মানুষ যে সব কাজ-কর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর স্রষ্টা নন। প্রাণীজগতের কারও কোন কাজের স্রষ্টাও আল্লাহ তা'আলা নন বরং মানুষের এসব অর্জন ও সমগ্র প্রাণীজগতের কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কোন হাত ও পরিকল্পনা নেই। তারা মনে করে, মানুষ নিজে নিজেই তাদের কাজ করতে সক্ষম। অর্থাৎ কাদরিয়া সম্প্রদায় প্রকারন্তরে তাকদীরকে অস্বীকার করে।

মুরজিয়া ফেরকার আবির্ভাবের ইতিকথা

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু জুহরা মিসরী বলেছেনঃ কবীরা গুনাহকারী মুমিন কি মুমিন না –এ প্রসঙ্গে যখন বিতর্ক চলছিল, তখন খাওয়ায়িজ ফেরকা বলেছিল, এরূপ ব্যক্তি কাফের। মু'তাযিলারা বলেছিল, এরূপ ব্যক্তি ঈমানদারই নয়। অর্থাৎ তারা এরূপ ব্যক্তিকে মুমিন নয় মুসলিম বলত। হাসান বসরী রহ. এবং একদল তাবেঈ বলেছিল, এরূপ ব্যক্তি মুনাফিকের শামিল। জমহুরে উম্মত বলেছিল, এমন ব্যক্তি মুমিন তবে গুনাহগার। আল্লাহ চাইলে নিজ দয়ায় ক্ষমা করে দিবেন কিংবা কৃত গুনাহর শাস্তি দিবেন। এই বিতর্কের মাঝে মুরজিয়া নামক ফেরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা দাবী করে বসে যে, ঈমান হল اقرار باللسان তথা মুখের স্বীকৃতির নাম। সুতরাং ইবাদত করা ও গুনাহ করা ঈমানের কোন বিষয় নয় যে, তা না থাকলে মূল ঈমান থাকবে না। আল মিলাল ওয়ান্নিহাল গ্রন্থের বর্ণনা মতে মুরজিয়া আকীদা-বিশ্বাসের প্রথম প্রবক্তা হল হাসান ইবনে মুহাম্মদ নামক জনৈক ব্যক্তি।

মুরজিয়াদের মৌলিক আরও কিছু মতাদর্শ

১. নারীগণ বাগানের ফুলের মত। যে ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে, বিবাহ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।

২. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. কে তার নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এটা অবশ্য মুরজিয়াদের মধ্য থেকে উবায়দিয়া দলের কথা।

কাদরিয়া

এদের মতাদর্শ সম্পর্ক বলা হয়েছে–

وهم المنكرون للقدر القائلون بان افعال العباد مخلوقة بقدرتهم ودواعيهم لا تقدرة الله وإرادته إنما نسبت هذه الطائفة الى القدر لانهم يبحثون فى القدر كثيرا .

অর্থাৎ এরা তাকদীরে অবিশ্বাসী। এদের বক্তব্য হল, বান্দার সকল কর্ম-কাণ্ডের স্রষ্টা বান্দা নিজেই। সবকিছু বান্দার নিজস্ব শক্তি ও সামর্থের বলে হয়। আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছার কোন ভূমিকা এখানে নেই। আর এরা তাকদীর সম্পর্কে বেশি আলোচনা করে বিধায় এদেরকে কাদরিয়া বলা হয়।

ইমাম আবু জুহরা বলেছেনঃ এ সম্প্রদায়কে 'কাদরিয়া নামে অভিহিত করায় অনেকে ঐতিহাসিক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কেননা তারা তো 'কদর'কে অস্বীকার করে, তাহলে তারাই আবার 'কাদরিয়া' হল কি করে ?

কাদরিয়া উৎপত্তি ও ইতিকথা

এই সম্প্রদায়টির উদ্ভব ঘটে সাহাবায়ে কিরামের শেষ যুগে, খোলাফায়ে রাশেদার শেষ আমলে উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকে। ফতহুল মুলহিম রচয়িতা লিখেছেন, কথিত আছে, কা'বা শরীফে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম এ ফিতনার সূচনা হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করে– احترقت بقدر الله অর্থাৎ 'এটা আল্লাহর ইচ্ছায় কদর অনুসারে হয়েছে।' তখন অন্যজন বলে উঠলো– لم يقدر الله هذا অর্থাৎ 'আল্লাহ এরূপ পরিকল্পনা নিতে পারেন না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কাদরিয়া মতবাদটি ছড়িয়ে পড়ে। অথচ খোলাফায়ে রাশেদার যুগে কোন ব্যক্তিই তাকদীরকে অস্বীকার করত না। আল্লামা তূফী লিখেছেন, কাদরিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভাবকের নাম (سوسن) সূসান। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেনঃ বসরার অধিবাসী এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইরাকে এমতবাদের সূচনা করে। অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত এ লোকটির নাম হল (سيسويه) সীসওয়াইহ।

তাদের আরো কতিপয় মতাদর্শ

১. আল্লাহ তা'আলার صفات ازلية বা অনাদি গুনাবলী যথা ইলম, কুদরত, হায়াত, শ্রবন, দর্শন ইত্যাদি বলতে কিছু নেই।

২. আল্লাহ তা'আলার কালাম مخلوق তথা সৃষ্ট এবং حادث তথা নশ্বর।

৩. তারা মে'রাজকে এবং عهد ميثاق তথা আলাসতু দিবসের অঙ্গিকারকে অস্বীকার করে।

৪. তারা জানাযার নামাযের وجوب তথা আবশ্যকতা অস্বীকার করে।

জাবরিয়া

এরা কাদরিয়া দলের সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। জাবরিয়া দলের প্রধান মতাদর্শ হল, যা কিছু ঘটছে সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আগ থেকেই নির্ধারিত এবং সে নির্ধারণ অনুযায়ী সবকিছু হয়। এক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার কোন দখল নেই। বান্দার ক্রিয়াকলাপই প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কর্ম। বান্দা পাথর ও জড়পদার্থের মত নিষ্ক্রিয় বা বাধ্যকতা। বান্দার নিজ কর্মে কোন ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই। বিধায় সাওয়াব বা শাস্তি কোন কিছুরেই অধিকারী হবে না। কেউ কেউ মুরিজিয়া ফেরকাকেই 'জাবরিয়া' ফিরকা নামে অভিহিত করেন।

এসব সম্প্রদায় সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, এরা ইসলাম থেকে খারিজ। সুতরাং এরা কাফির। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেনঃ আল দাউদী, ওরাকী হাফছ ইবনে গিয়াস, আবু ইসহাক আল ফাযারী, হুশায়ন, হাফছ ইবনে গিয়াস, আবু ইসহাক বলেন, আল দাউদী, ওরাকী, হাফছ ইবনে গিয়াস, আবু ইসহাক আল ফাযারী, হুশায়ম এবং আলী ইবনে আছিম এ মতই পোষণ করেছেন। (ইকফারুল মুলহিদীন)

কেউ কেউ বলেন, কাদরিয়াদের মধ্যে যারা পরবর্তী সময়ের (متاخرين) কাদরিয়া, তাদেরকে সরাসরি কাফির অভিহিত করা ঠিক হবে না। তবে প্রথম যুগের (متقدمين) কাদরিয়া যে কাফির, এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। আবার দুটি দিককে যথাযথ অক্ষণ্ন রেখে কেউ কেউ এদের সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছেন। দুটি দিক হল

১. আকীদা ও আমলের বিদআত একটি জঘন্য অন্যায়, নিঃসন্দেহে এটি একটি নিন্দিত নতুন বিষয়ের অনুসারী বিদ'আতী।

২. যারা তাদেরকে কাফের বলেছেন, তাদেরকে মতকে উপেক্ষা না করা। এ দুটি বিষয়কে অক্ষুণ্ন রাখার এবং মর্যাদা দানের প্রয়াসে তারা নীরবতা অবলম্বন করে বলেছেন, এদের সম্পর্কে তড়িগড়ি কাফের না বলে নীরবতা অবলম্বনই শ্রেয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

بَابٌ ...ص ٣٧

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪. (উপরের সাথে সংশ্লিষ্ট)

حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ ابْنِ اٰدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَّتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتّٰى يَمُوتَ .

قَالَ أَبُوعِيسٰى : وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو الْعَوَّامِ هُوَ عِمْرَانُ وَهُوَ ابْنُ دَاوُدَ الْقَطَّانُ .

১৮. আবূ হুরাইরা মুহাম্মদ ইবনে ফিরাস বাসরী .... মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর তার পিতা আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, আদম সন্তানের রূপক আকৃতির সাথে তার পাশে নিরানব্বই ধরনের মৃত্যু ঘটার মত আপদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যদি সে এ আপদগুলি অতিক্রম করে যায় তবে সে জ্বরায় নিপতিত হয়। শেষে সে মৃত্যু বরণ করবে।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। রাবী আবুল আওওয়াম হল, 'ইমরান আল কাত্তান রহ.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিগতভাবে বিপদাপদ মানুষের সঙ্গে লেগেই থাকে। মানুষ এসব বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি পেতে পারে না। আর কখনও যদি পৃথক হতে পারেও অবশেষে এমন এক রোগ তাকে এসে ধরে যার কোন চিকিৎসা নেই। অর্থাৎ, বার্ধক্য।

মোটকথা, দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা আর কাফেরদের জন্য বেহেশতের বাগিচার মত, তাই قَضَاء এবং قَدَر উপর সন্তুষ্ট থাকাটাই মুমিনের জন্য শ্রেয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرِّضَاءِ وَالْقَضَاءِ ص ٣٧

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫. আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمٰعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ : بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا حَمَّادُ بْنُ أَبِى حُمَيْدٍ وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِىُّ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِىِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

১৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার .... সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যা ফায়সালা করে রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকাতেই হল আদম-সন্তানের নেকবখতী, আর আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা ত্যাগ করা হল মানুষের বদবখতী এবং আল্লাহর ফায়সালার উপর অসন্তুষ্ট থাকাও হল তার দুর্ভাগ্য। এ হাদীসটি গারীব। মুহাম্মদ ইবনে আবূ হুমায়দ -এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আর তাকে হাম্মাদ ইবনে আবূ হুমায়দও বলা হয়। তিনি হল আবূ ইবরাহীম মাদীনী। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি শক্তিশালী নন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قضاء এবং قدر এর মধ্যে পার্থক্য

قضاء এবং قدر এর মধ্যে পার্থক্য হল قَضَاء শব্দের আভিধানিক অর্থ ফয়সালা করা, হুকুম দেওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় قَضَاء বলা হয়– الارادة الأزلية المتعلقة بالموجودات الكائنة فيما لايزال (نبراس) অর্থাৎ অনাদিতে সৃষ্টবস্তু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার যে ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিল, তাকেই قضاء বলে। আর قدر হল ঐ সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার বিস্তারিত ও বাস্তব রূপ।

যেমন প্রথমে একটি ইমারত নির্মানের পরিকল্পনা করা হল, নির্মানের পূর্বে মনে মনে তার একটি কল্প চিত্র তৈরী করা হল। তারপর সে অনুযায়ী কাজ করা হল, এখন এ কল্পিত চিত্র হল কাযা আর দ্বিতীয়টি হল কদর। হযরত কাসেম নানুতুবী রহ. এর মতে সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার নাম কদর আর বিস্তারিত রূপের নাম কাযা।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

উক্ত হাদীসে প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাযা এবং কদ্‌রের উপর সন্তুষ্ট হওয়া ওয়াজিব। সুতরাং বলা যায় যে, আল্লাহ যদি গুনাহ বা কুফরের ফয়সালা করেন, তাহলে رِضَاءٌ بِالْمَعَاصِى وَالْكُفْرِ তথা গুনাহ-কুফরের উপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব অথচ সকলেই একমত যে, رِضَاءٌ بِالْكُفْرِ তথা কুফরির উপর সন্তুষ্ট থাকাও কুফরি।

এর উত্তর হল এখানে বিষয় দুইটি। (এক) قَضَاء যা মাসদারের অর্থে। অর্থাৎ সৃষ্টি করা, অস্তিত্ববান করা, দ্বিতীয় বিষয় قضاء যা মাফউলের অর্থে। অর্থাৎ সৃষ্টিকৃত, অস্তিত্বে আনা হয়েছে এমন বস্তু। প্রথম বিষয়ের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে এবং তার উপর সন্তুষ্ট থাকাই হচ্ছে رِضَاءٌ بِالْقَضَاءِ যা ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় বিষয়ের সম্পর্ক বান্দার সাথে, যা কুফরি। সুতরাং رِضَاءٌ بِالْكُفْرِ ও কুফরি।

بَابُ...ص ٣٧

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬. (পূর্বসূত্রে)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِى أَبُو صَخْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ فُلاَنًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلاَ تُقْرِئْهُ مِنِّى السَّلاَمَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَكُونُ فِى هٰذِهِ الأُمَّةِ أَوْفِى أُمَّتِى الشَّكَ مِنْهُ ـ خَسْفٌ أَوْ مَسْخٌ ـ أَوْ قَذْفٌ فِى أَهْلِ الْقَدَرِ قَالَ أَبُوعِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَأَبُو صَخْرٍ اسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ

২০. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার .... নাফি' রাযি. থেকে বর্ণিত যে, ইবনে উমার রাযি. এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি খবর পেয়েছি যে, সে ব্যক্তি বিদআতী। সুতরাং সে যদি (বাস্তবেই) বিদআতী হয়ে থাকে তবে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম দিবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি। আমার এই উম্মতের কাদরিয়া আকীদা পোষণকারীদের মধ্যে ঘটবে ভূমি ধ্বস বা চেহারা বিকৃতি বা প্রস্তর নিক্ষেপ।

এ হাদীসটি হাসান সাহীহ গরীব। আবু সাখর রহ. এর নাম হল হুমায়দ ইবনে যিয়াদ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ـ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِى صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : يَكُونُ فِى أُمَّتِى خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذٰلِكَ فِى الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدَرِ ـ

২১. কুতাইবা .... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে যদি ভূমি ধ্বস ও চেহারা বিকৃতি ঘটবে। আর এটা হবে তাকদীর অস্বীকারকারীদের মধ্যে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ ধরনের হাদীসের ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম বলেন, ফাসিক ও বিদ'আতীর সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত নয়। এর হেমত হল, ফাসিক ও বিদ'আতী যেন সতর্ক হয়ে যায় এবং তাদের কার্যকলাপ থেকে ফিরে আসে। এ উদ্দেশ্যে তাদের সাক্ষাত বর্জন ও জায়িয।

একটি বিরোধ ও তার সমাধান

বিরোধ হল, অপর হাদীসে এসেছে, আমার উম্মতের মধ্যে অন্যান্য উম্মতের মত ভূমিধ্বস ও চেহারাবিকৃতি ঘটবে না।

অথচ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা এগুলো সাব্যস্ত হয়। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। এর উত্তর কয়েকভাবে দেওয়া হয়। যথা–

১. نَفِى এর হাদীস আসল। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস সতর্কবানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. ব্যাপক আকারে ভূমিধ্বস ও চেহারাবিকৃতি ঘটবে না। অবশ্য বিশেষ করে তাকদীর অস্বীকারকারীদের ঘটানো হবে।

৩. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস شَرط এবং جَزاء হিসাবে এসেছে, অর্থাৎ যদি আমার উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস ও চেহারা বিকৃতি ঘটত, তাহলে তাকদীর অস্বীকারকারীদের বেলায় ঘটত। তাদের ক্ষেত্রে যেহেতু ঘটেনি, সুতরাং অন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটবে না।

بَابُ...ص ٣٧

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭. (পূর্ব সূত্রে)

حَدَّثَنَا ـ يَحْيَى بْنُ مُوسَى ـ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْقَدَرِ ، قَالَ: يَا بُنَيَّ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ فَاقْرَإِ الزُّخْرُفَ ، قَالَ: فَقَرَأْتُ (حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ) فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا أُمُّ الْكِتَابِ ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ، فِيهِ إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَفِيهِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ـ قَالَ عَطَاءٌ : فَلَقِيتُ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَاحِبَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ : مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِنْدَ الْمَوْتِ ؟ قَالَ دَعَانِي أَبِي فَقَالَ لِي : يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللّٰهَ وَاعْلَمْ أَنَّكَ أَنْ تَتَّقِيَ اللّٰهَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ـ فَإِنْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمُ فَقَالَ : أُكْتُبْ ، فَقَالَ مَا أَكْتُبُ ؟ قَالَ : أُكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ ـ

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ـ

২২. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা ....আবদুল ওয়াহিদ ইবনে সালীম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মক্কায় এলাম। সেখানে 'আতা ইবনে আবূ রাবাহ রহ. এর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে বললাম, হে আবূ মুহাম্মদ, বাসরাবাসীরা তো তাকদীরের অস্বীকৃতিমূলক কথা বলে। তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! তুমি কি কুরআন তিলাওয়াত কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সূরা আয্-যুখরুফ তিলাওয়াত কর তো। আমি তিলাওয়াত করলাম।

حم ـ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ، إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ـ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ـ

হা-মীম, কসম সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি তা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার। তা রয়েছে আমার কাছে উম্মুল কিতাবে, এ তো মহান, জ্ঞানগর্ভ। (৪৩ ঃ ১-৪)

তিনি বললেন, উম্মুল কিতাব কি তা জান ? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এ হল একটি মহাগ্রন্থ, আকাশ সৃষ্টির ও পূর্বে এবং যমীন সৃষ্টিরও পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এতে আছে ফির'আওন জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত। এতে আছে, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ –আবূ লাহেবের দুটি হাত ধ্বংস হয়েছে আর ধ্বংস হয়েছে সে নিজেও।

আতা রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম সাহাবী 'উবাদা ইবনে সামিত রাযি. এর পুত্র ওয়ালীদ রহ. এর সঙ্গে আমি সাক্ষাত করেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মৃত্যুর সময় তোমার পিতা কি ওয়াসীয়াত করেছিল ? তিনি বললেন, তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, হে প্রিয় বৎস! আল্লাহকে ভয় করবে।

জেনে রাখবে যতক্ষণ না আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ সব কিছুর উপর ঈমান আনবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কখনও আল্লাহর ভয় অর্জন করতে পারবে না। তাছাড়া অন্য কোন অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে জাহান্নামে দাখেল হতে হবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। এরপর একে নির্দেশ দিলেন, লিখ! সে বলল, কি লিখব ? তিনি বললেন, যা হয়েছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত যা হবে সব তাকদীর লিখ। এ হাদীসটি এ সূত্রে গারীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عَطَاءُ ابْنُ أَبِى رِبَاحٍ ঃ আতা ইবনে আবি রাবাহ কুরাইশী রহ. কুনিয়াত আবু মুহাম্মদ। (আবু বারাবের নাম আসলাম। কুরাইশদের আযাদকৃত গোলাম।) মক্কার প্রখ্যাত তাবিঈ এবং শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ছিল। ইমাম আওযায়ী রহ. বলেন, হযরত আতা এমনভাবে ইনতিকাল করেছেন যে, সকল মানুষ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। হযরত আতা ছিল হাবশী নিগ্রো। মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। রঙ ছিল কালো। নাক ছিল চেপ্টা। হাত ছিল লুলা। চোখ ছিল কানা এবং পরে তিনি অন্ধ হয়ে যান। সালঅমা ইবনে কুহাইল বলেন, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম হাসিল করেছেন। এ মহৎ গুণের অধিকারী তিন ব্যক্তি ব্যতীত আমি কাউকে দেখতে পাইনি। তাঁরা হল, হযরত আতা, তাউস ও মুজাহিদ। তিনি ইবনে আব্বাস রাযি. আবু সাঈদ রাযি. আবু হুরাইরা রাযি. সহ বহু সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি ১১৪ সালে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

أُمُّ الْكِتَابِ ঃ অর্থাৎ লাওহে মাহফুজ। এটাকে উম্মুল কিতাব বলার কারণ হল, এটি সব কিতাবের মূল। যেমন মা সকল সন্তানের মূল হয়ে থাকে।

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمُ ঃ সর্বপ্রথম মাখলুক কি ? এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। এর সামঞ্জস্যবিধান হল, সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মদী, তারপর পানি, তারপর আরশ, তারপর কলম, তারপর দোয়াত, অতঃপর অবশিষ্ট সৃষ্টি। বস্তুতঃ নূরে মুহাম্মদী অথবা রূহে মুহাম্মদী সর্বপ্রথম মাখলুক। অবশিষ্ট জিনিসগুলো প্রথম মাখলুক হওয়া হল أَمْرِاضَافِى তথা আপেক্ষিক হিসাবে। এজন্য এক হাদীসে এসেছে أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِى আরেক হাদীসে এসেছে– أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَحَى (মিশকাত ১/১৬৭)

بَابُ..ص ٣٧

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮. ....

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْبَاهِلِيُّ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ـ حَدَّثَنِى أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : قَدَّرَ اللّٰهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ـ

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ـ

২৩. ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুনযির সানআনী .... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর তাকদীর নির্দ্ধারণ করেছেন। এ হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব। ছিল

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ و مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمٰعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُخَاصِمُونَ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ـ (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ـ

২৪. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনে আলা ও মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, কুরাইশ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এল। তারা তাকদীর নিয়ে বিতণ্ডা করছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ـ

যে দিন এদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া হবে (সে দিন বলা হবে) জাহান্নামের যন্ত্রণার স্বাদ লও। আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট তাকদীরে। (সূরা কামার ঃ ৪৮, ৪৯)। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

انه بلغني قد احدث ঃ হযরত ইবনে উমরের উদ্দেশ্য ছিল, যার পক্ষ থেকে আমার নিকট সালাম পৌঁছাচ্ছো, তার ব্যাপারে আমি শুনেছি যে, সে তাকদীরকে অস্বীকার করে। আর এটা তো জঘন্যতর বিদ'আত। তাই তার সালাম আমার নিকট পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই। কেননা আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিদ'আতীদের সাথে সম্পর্ক যেন না থাকে।

এ ধরনের হাদীসের ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম বলেছেন, ফাসিক ব্যক্তি সালাম দিলে সেই সালামের উত্তর নেওয়া জায়িয নয়। যেন এতে তার বোধদয় হয় এবং গুনাহ ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হয়। এমনকি এ নিয়ত থাকলে, প্রয়োজনে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দেওয়াও জায়িয আছে।

قَدَّرَ اللّٰهُ الْمَقَادِيرَ ঃ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় كَتَبَ اللّٰه مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ এসেছে শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর পরিমাণ আদি থেকেই সুপরিজ্ঞাত। বর্ণিত আছে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সকল সৃষ্টির সংখ্যা ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং তাঁর আদি অনুগ্রহ মোতাবেক সকল সৃষ্ট বস্তুকে আরশের অস্তিত্বের আওতায় সন্নিবেশিত করেছেন। যেখানে তিনি সব কিছুর নমুনা সৃষ্টি করেছেন। শরী'আতের পরিভাষায় সেটাকে বলা হয় যিক্র। যেমন সেখানে তিনি মুহাম্মদ ﷺ নমুনা করে নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তাকে অমুক সময়ে মানবজাতির নিকট প্রেরণ করা হবে এবং তিনি তাদেরকে খোদায়ী বিধান অবহিত করবেন। তাছাড়া আবু লাহাব তাকে অস্বীকার করবে এবং তার পাপ তাকে দুনিয়াতেই গ্রেফতার করবে আখেরাতে তাকে আগুন ঘিরে রাখবে ইত্যাদি। তখনই সেখানে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক এভাবেই পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহের প্রতিটি ব্যাপার সেখানে নির্ধারিত হয়ে আছে। আর সে কারণেই তা সেভাবেই ঘটে থাকে। বিষয়টিকে আমরা আমাদের قُوَّتِ خَيَالِيَّه এর অনুরূপ অনুমান করে নিতে পারি। যেমন আদামের ধারণা যে, দেয়ালের উপর রাখা কাঠটি স্থির হয়ে থাকার সুযোগ না থাকায় ফসকে পড়েছে। ভূমির উপর রাখলে তা ফসকে পড়ত না। এটিও তেমনি ব্যাপার। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ)

قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ঃ কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা নির্দিষ্ট কোন সময় উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয় বরং দীর্ঘ সময় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইমাম নববী বলেন, 'পঞ্চাশ হাজার বছর' দ্বারা উদ্দেশ্য যে, লওহে মাহফূযে লিখতে এত সময়ে লেগেছে। মূল তাকদীর তো অনাদিকাল থেকেই আছে। যার কোন শুরু নেই।

ابواب الفتن

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ٣٨

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فتن শব্দটি فتنة এর বহুবচন। তার আভিধানিক অর্থ স্বর্ণকে আগুনে উত্তপ্ত করে ভেজাল-নির্ভেজাল যাচাই করা। আল্লামা তাকী উসমানী যিক্র ও ফিক্র নামক গ্রন্থে লিখেন–

'ফিতনা' আরবী শব্দ। তার মূল আভিধানিক অর্থ স্বর্ণকে আগুনে উত্তপ্ত করে ভেজাল নির্ভেজাল যাচাই করা। এ কাজ দ্বারা যেহেতু স্বর্ণকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য হয়ে তাকে, তাই প্রত্যেক পরীক্ষাকে ফেতনা বলা হয়ে থাকে। কোনো মন্দকাজ যুগের ফ্যাশন হয়ে গেলে সেও একটি 'ফিতনা'। কারণ এটিও মানুষের পরীক্ষার বস্তু যে, সে যুগের ফ্যাশনের মুখে আত্মসমর্পন করে, নাকি তার প্রকৃত মন্দের দিক উপলব্ধি করে নিজেকে তা রক্ষা করে চলে। যখন কোন ভ্রান্ত মতাদর্শ নজরকাড়া দলীল-প্রমাণের স্বর্ণ-প্রলেপ লাগিয়ে সমাজে বিস্তার লাভ করে তখন সেটিও একটি 'ফিতনা' হয়ে থাকে। কারণ এর মধ্যে মানুষের কঠিন পরীক্ষা থাকে যে, সেকি বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে হয়ে সত্যকে পরিত্যাক্ত করে বসে, নাকি গোমরাহীর গভীরে পৌঁছে তার মোকাবেলা করে। যখন মানুষের মধ্যে বর্ণ ও বংশের ভিত্তিতে পরস্পর রক্তারক্তি আরম্ভ হয় তখন এটিও বড় ধরণের একটি 'ফিতনা'। এতে মানুষের জন্য এই পরীক্ষা রয়েছে যে, সে অন্যায়ভাবে নিজের বংশ নিজের ভাষাভাষী এবং নিজের আপন জনের সঙ্গে থাকে, নাকি সত্যকে দৃঢ়হস্তে ধারণ করে নিজের সঠিক অবস্থানে অবিচল থাকে।

আল্লামা তাকী উসমানীর উক্ত বক্তব্যের অনুকূলে আমরা আরবী ভাষার ব্যবহারও দেখতে পাই। যথা বলা হয়ে থাকে– فتن (فتوه، ض) الرّجل الى النّساء বিভ্রান্ত করলো। পরীক্ষা করলো।

فتن او افتتن ফিতনার শিকার হয়ে সম্পদ বা জআন-বুদ্ধি হারালো। فتن (فتنة) الصّائغ الذّهب সোনা গলিয়ে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করলো।

মিসবাহুল লোগাতে রয়েছে– الفتنة (ج) فتن অর্থ পরীক্ষা ও যাচাই, সিফা, শাস্তি, অসুস্থতা, উন্মাদনা। কুফরী ও পথভ্রষ্টতা, অপদস্থতা, সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি। মতানৈক্য ও যুদ্ধ বিগ্রহ।

এখানে كتاب الفتن দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওই সমস্ত হাদীস উল্লেখ করা যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত ফিতনাসমূহ ও বড় বড় ঘটনাসমূহ সম্পর্কে। এসব হাদীসের মাধ্যমে রাসূল ﷺ উম্মতকে সতর্ক করেছেন এবং ফেতনা থেকে বাঁচার কর্মকৌশলও উল্লেখ করেছেন।

بابُ ماجاء لا يحلّ دمُ امرئ مُسلمٍ إلّا بإحدى ثلاثٍ ص ٣٨

অনুচ্ছেদ ঃ ১. তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া মুসলিম ব্যক্তির খুন হালাল নয়

حدّثنا أحمدُ بنُ الضّبيّ . حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن أبى أمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ أنّ عثمانَ بنَ عفّانَ أشرفَ يومَ الدّارِ فقالَ : أنشدكمُ اللّهَ أتعلمونَ أنّ رسولَ اللّهِ ﷺ قالَ : لا يحلّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلّا بإحدى ثلاثٍ : زنًا بعدَ إحصانٍ، أو ارتدادٍ بعدَ إسلامٍ، أو قتلِ نفسًا بغيرِ حقٍّ فقُتلَ به فو اللّهِ ما زنيتُ فى جاهليّةٍ ولا فى إسلامٍ ولا ارتددتُ منذُ بايعتُ رسولَ اللّهِ ﷺ ، ولا قتلتُ النّفسَ الّتى

حَرَّمَ اللّٰهُ فَبِمَ تَقْتُلُوْنَنِى ؟ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ـ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ فَرَفَعَهُ ـ وَرَوٰى يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَأَوْقَفُوْهُ وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَرْفُوْعًا

১. আহমাদ ইবনে 'আবদা যাব্বী .... আবু উসামা ইবনে সাহল ইবনে হুনায়ফ রহ. থেকে বর্ণিত যে, উসমান ইবনে আফফান রাযি. যখন (বিদ্রোহীদের দ্বারা) ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন তখন একদিন উকি মেরে বলেছিলেনঃ তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি জান না রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এই তিন কারণের একটি ছাড়া মুসলিম ব্যক্তির খুন হালাল নয়– বিবাহিত হয়েও যদি যিনা করে বা ইসলাম গ্রহণের পর যদি মুরতাদ হয়ে যায় বা অন্যায়ভাবে যদি কাউকে হত্যা করে আর সে জন্য তাকে হত্যা করা হয়। আল্লাহর কসম জাহেলী যুগে এবং ইসলামের পরও কখনো আমি যিনায় লিপ্ত হইনি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে বায়'আতের পর থেকে কখনও মুরতাদ হইনি আর আল্লাহ তা'আলা যে প্রাণ -বধ হারাম করেছেন তা ও আমি হত্যা করিনি। সুকরাং কি কারণে তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও ?

এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, আইশাও ইবনে 'আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ. এ হাদীসটিকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. এর বরাতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ রহ. ও এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তাঁরা মারফূ' করেননি, মাওকূফ রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। 'উসমান রাযি. -নবী কারীম ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يَوْمُ الدَّارِ এর দ্বারা ওই দিন উদ্দেশ্য যে দিন বিক্ষোভকারীরা হযরত উসমান রাযি২. এর গৃহ অবরোধ করে রাখে। সেদিন হযরত উসমান রাযি. নিজ গৃহের ছাদে উঠে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছিলেন।

زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ইমাম কুদুরী বলেন, রজমের ক্ষেত্রে 'মোহছান' হওয়ার অর্থ হলো স্বাধীন হওয়া, সুস্থ মস্তিস্ক হওয়া, মুসলমান হওয়া এবং বিশুদ্ধ বিবাহ সম্পন্ন করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে এমন হওয়া।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়াযন্ত্র এবং হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাত

আবদুল্লাহ ইবনে সারা ছিলো ইবনে সাওদা নামে পরিচিত। সে ছিলে সানআ শহরের অধিবাসী একজন ইয়াহুদী। হযরত উসমান গণী রাযি. এর খেলাফতকালে সে যখন লক্ষ্য করলো যে, মুসলমানগণ অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং মুসলিম উম্মাহ এখন বিশ্বের বিরাট দিগ্বজয়ী জাতিতে পরিণত হয়েছে, তখন সে মদীনা শরীফ এসে বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করলো এবং মুসলমানদের সঙ্গে এমনভাবে মিলে গেলো যে, তার মনের কথার কেউই জানতে পারলো না। এ সুযোগে সে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহ আবিস্কার করলো এবং তা ভালোভাবে যাঁচাই করে নিলো। তারপর ইসলামের বিরুদ্ধে কি কি কৌশল অবলম্বন করা যায় বা কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে সম্পর্কে খুব চিন্তা-গবেষণা করলো। ওই সময় বসরায় হাকীম ইবনে জাবালা নামক এক ব্যক্তি বাস করতো। সে তার পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেছিলো যে, সে কোনো একটি ইসলামী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে সুযোগ মত জিম্মীদের উপর লুটপাট চালাতো। তার এ দুস্কর্মের সংবাদ শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান রাযি. এর কানে গিয়েও পৌছে।

খলীফা উসমান রাযি. বসরার গভর্ণরকে লখলেন যে, 'হাকীম ইবনে জাবালাকে বসরায় অভ্যন্তরে নযরবন্দী করে রাখ এবং কখনো শহরের বাইরে যেতে দিও না।' কাজেই হাকীম ইবনে জাবালকে বসরাতে নযরবন্দী করে রাখা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে সারা হাকীম ইবনে জাবালার অবস্থাদি শুনে মদীনা শরীফ থেকে সোজা বসরাতে চলে যায়। সেখানে সে হাকীম ইবনে আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির ঘরে অবস্থান করে হাকীম ইবনে জাবালা এবং তার মাধ্যমে তার সঙ্গী-সাথীদের সাথে যোগাযোগ করে ইসলাম ও মুসলমানগণের ধ্বংস সাধনের একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করে। ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী সে নিজেকে মুসলমানদের বন্ধু এভং রাসূল পরিবারের একান্ত মঙ্গলকামী বলে যাহির করতো এবং অত্যন্ত সুক্ষ্মকথার মার-প্যাঁচে নিজের ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা ও আকাইদ বিশ্বাস সাধারণ্যে প্রচার করতো। সে কখনো বলতো, মুসলমানগণই বলে বেড়ায়, দুনিয়ায় হযরত ঈসা আ. পুনরায় আবির্ভূত হবেন, কিন্তু তারা একতা ভাবতে আশ্চর্যবোধ করে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও দুনিয়ার পুনরাবির্ভূত হবেন। সে জনসাধারণের সামনে إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ

'যিনি কুরআনকে তোমার জন্য করেছেন বিধান তিনি অবশ্যই তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তনস্থলে"

–এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে তাদেরকে এ আকীদা বিশ্বাসে টেনে আনার চেষ্টা করে যে, অবশ্যই অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ ﷺ দুনিয়াতে পুনরাবির্ভূত হবেন। অনেক বোকা লোক তার এ প্রতারণার ইন্দ্রজালে পতিত হয় এবং সে ওই বোকাদের নিয়ে এমন একটি আকীদা দাঁড় করাবার প্রয়াস পায় যে, প্রথ্যেক নবীরই একজন 'খলীফা ও ওসী' (প্রতিনিধি) থাকেন। আর মুহাম্মদ ﷺ এর ওসী হযরত আলী রাযি.। হযরত মুহাম্মদ ﷺ যেমন 'খাতুমুল আম্বিয়া' (শেষ নবী) ঠিক হযরত আলী রাযি.ও তেমনি 'খাতুল আওসিয়া' শেষ ওসী। তারপর সে প্রকাশ্যে বলতে শুরু করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পর মুসলমানরা হযরত আলী রাযি. ব্যতীত অন্যকে খলীফা বানিয়ে (আলীর) অধিকার খর্ব করেছে। কাজেই, এখন সকলেরই উচিত হযরত আলী রাযি. কে সাহায্য করা এভং বর্তমান খলীফাকে হত্যা করা অথবা পদচ্যুত করে হযরত আলীকেই খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত করা। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা অনেক ভাবনা-চিন্তার পর এসব পরিবল্পনা তৈরী করেই মদীনা শরীফ থেকে বসরায় এসে ছিলো। এখানে সে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে এবং যথাযথভাবে তার ওইসব বদ আকীদা ও কুবিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করে।

ক্রমে ক্রমে এ ফেতনার খবর যখন বসরার গভর্ণর আব্দুল্লাহ ইবনে আমারের কানে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কে ? কোথা থেকে এসেছো এবং কেন এসেছো ? আবদুল্লাহ ইবনে সারা উত্তর দিলো ঃ আমি ইহুদী ধর্মের দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে শাশ্বত সুন্দর ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমি এখানে আপনার একজন মুসলিম প্রজা হিসাবে বসবাস করতে চাই। আব্দুল্লাহ ইবনে আমের বলেনঃ আমি তোমার হালচাল ও কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার তো মনে হয়, তুমি একজন ইহুদী হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা, বিভ্রান্তি ও ফাটল সৃষ্টি করতে চাও। আব্দুল্লাহ ইবনে আমেরের মুখে একথা শুনে সুচতুর আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা বুঝতে পারলো, এখন আর বসরাতে অবস্থান করা তার জন্য নিরাপদ নয়। তাই সে তার একান্ত বিশ্বস্ত লোকদেরকে তার দলের আদর্শ ও কর্মপ্রদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়ে বসরা থেকে কূফায় চলে গেলো। কূফাতে পূর্ব থেকে তার সমমনা একদল লোক ছিলো। তাই আবদুল্লাহ সাবা কূফায় এসে তাদের মাধ্যমে তার অসৎ উদ্দেশ্য সফল করার ভালোই সুযোগ পেলো।

কূফায় এসেই ছদ্মবেশী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নিজেকে সকলের নিকট একজন মুত্তাদী ও ধর্মপরায়ন ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করে। তাই সাধারণভাবে লোকেরা তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতে থাকে। কেউ কেউ তার উক্ত অনুরক্তে ও পরিপত হয়। যখন কূফায় আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার আকীদা বিশ্বাসের চর্চা শুরু হয় তখন সেখানকার গভর্নল সাঈদ ইবনে আস রাযি. তাকে ডেকে পাঠিয়ে খুব করে শাসিয়ে দেন। কূফার বুদ্দিমান ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা তাকে একজন সন্দেহজনক লোক বলে মনে করে। এবার আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা কূফা থেকে সিরিয়া অভিমূখে রওয়ানা হয়। বসরার ন্যায় কূফায়ও সে তার একদল সাঙ্গপাঙ্গ রেখে গেলো। কূপা থেকে সিরিয়ায় তথা দামিশকে

পৌঁছে সে খুব একটা সুবিধা করতে পারলো না। তাই শীঘ্রই সেখান থেকে চম্পট দিলো। হযরত উসমান রাযি. এর প্রতি আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার শত্রুতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এক শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য শহরে আশ্রয়গ্রহণ যেন তার সামনে সাফল্যের এক একটি নতুন ক্ষেত্র ও নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে লাগলো। সিরিয়া থেকে বের হয়ে সোজা মিশরের দিকে চলে গেল। সেখানকার গর্ভণর ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে সা'আদ। মিসর পৌঁছে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা তার অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ আরম্ভ করলো। এখানে সে তার গুপ্ত সংগঠনের একটি পরিপূর্ণ সংবিধান রচনা করলো। তাতে আহলে বাইতে তথা নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও হযরত আলী রাযি. এর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করাকে সাফল্যের সবিশেষ মাধ্যম রূপে গণ্য করা হলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'আদ তখন আফ্রিকা, বার্বার, কন্সানটিনোপোল প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার মত অবকাশ তার বড় একটা ছিলো না।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মিসর থেকে কূফা ও বসরার সাঙ্গপাঙ্গনের সাথে পত্রালাপ শুরু করে। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উথাপিত বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত পত্রাদি মদীনাবাসীগণের কাছে প্রেরিত হতে থাকে। সেই সাথে বসরাবাসীগণের কাছে কুফা ও মিসর থেকে, মিসরবাসীদের কাছে বসরা ও কূফা থেকে এবং কূফাবাসীদের কাছে বসরা, মিসর ও দামিশক থেকে এ মর্মে অনবরত পত্র আসতে থাকে যে, ওই সমস্ত এলাকার গভর্নররা মানুসের উপর এতই জুলুম করছিলেন না, তাই প্রত্যেক এলাকার লোকও ধারণা করে বসলো যে, শুধু আমাদের এলাকা ছাড়া অন্য সব এলাকায়ই জুলুম-অত্যাচারের স্টীমরোলার চলছে এবং তা সত্ত্বেও উসমান রাযি. উক্ত গভর্ণর কর্মকর্তাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের পদে বহাল রাখছেন এবং তাদেরকে পদচ্যুত করতে অস্বীকার করছেন। প্রত্যেক প্রদেশ এবং প্রত্যেক এলাকা থেকে পরিকল্পিতভাবে অনবরত রাজধানী মদীনা শরীফেও পত্র আসছিলো।

যখন দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে মদীনাতে অনবরত অভিযোগপত্র আসতে থাকে এবং সেখানেও কানাঘুসা শুরু হয় তখন মদীনার কিছু সংখ্যক গণ্য-মান্য ব্যক্তি উসমান রাযি. এর সাথে দেকা করে অনুরোধ করেন। যেন তিনি তার নিযুক্ত কর্মকর্তঅ ও গভর্ণরদের সম্পর্কে তদন্ত চালান এবং জনসাধারণের অভিযোগসমূহ দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। উসমান রাযি. কয়েকজন নির্ভরযোগ্য সাহাবাকে বাছাই করে তাদের একেকজনকে একেক প্রদেশে পাঠান, যেন তার সংশ্লিষ্ট এলাকার অবস্থা তদন্ত করে তার কাছে এসে রিপোর্ট প্রদান করেন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. কে কূফায়, উসামা ইবনে যায়দ রাযি. কে বসরায় এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। এভাবে প্রত্যেকটি ছোট-বড় প্রদেশে এক একজন তদন্তকারী পাঠানো হয়।

কিছু দিন পর তারা ফিরে এসে রিপোর্ট দেন যে, তাদের কেউ কোনো এলাকায় কোন গর্ভনর বা কর্মচারীকে আপত্তিকর অভিযোগ যোগ্য কোন কিছু করতে দেখেননি। এসব কথা শুনে মদীনাবাসীগণ অনেকটা স্বস্তিলাভ করে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ওই অবস্থা আবার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যেমন একটু আগে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মিসরে বসে জনসাধারণের অগোচরেই তার যড়যন্ত্রমূলক যাবতীয় কর্মপন্থা একেবারে পাকাপোক্ত করে নিয়েছিলো। তার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সে এবং তার মুসলিম বেশধারী বিশেষ কয়েকজন বন্ধু ব্যতীত আর কেউই অবহিত ছিলো না। ইসলামী খেলাফতকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সে বাহ্যতঃ হুব্বে আলী (আলী প্রেম) ও হুব্বে আহলে বাইত (আহলে বায়তের প্রতি প্রেম) কে মাধ্যমে পরিণত করেছিলো। অথচ তার মূল উদ্দেশ্য ছিলো সুদূরপ্রসারী ও মুসলিম মিল্লাতের জন্য অনেক সরলপ্রাণ মুসলমানই ইবনে সাবার প্রতারণা জালে আটকে পড়ে এবং তারই ইঙ্গিতে প্রত্যেকটি স্থানেই হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি চলে। প্রত্যেকটি স্থানের ও প্রত্যেকটি দলের লোকেরা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলো যে, উসমান রাযি. কে হয় পদচ্যুত, নয়ত হত্যা করতে হবে। তবে অবশেষে ৩৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে মিসর, কূফা এভং বসরা থেকে বিদ্রোহীদের তিনটি কাফেলা মদীনা অভিমূখে রওয়ানা হয় এবং সকলেই নিজ শহর থেকে বের হওয়ার সময় একথা প্রচার করে যে, তারা হজ্ব করতে চলেছে। এভাবে কয়েক মনযিল অতিক্রম করার পর তিনটি শহরের তিনটি কাফেলাই পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং একই কাফেলায় রূপান্তরিত হয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মদীনা শরীফে অবস্থানরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার লোকেরা হযরত আলী রাযি., তালহা রাযি., যুবাইর রাযি. এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিবিগণের পক্ষ থেকে অনেক চিঠি কূফা, বসরা ও মিসরের ওই সমস্ত লোকের কাছে পাঠিয়ে ছিলো, যারা এ মহান ব্যক্তিদেরকে শ্রদ্ধার চোখের দেখেন, অথচ তখন পর্যন্ত তারা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার ফাঁদে নিশ্চিতভাবে আটকা পড়েন নি। ওই সমস্ত বানোয়াট চিঠিতে বলা হয়েছিলো, যেহেতু হযরত উসমান রাযি. খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছেন, তাই তাকে পদচ্যুত করা একান্ত বাঞ্চনীয়, আর মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থে আগামী জিলহজ্ব মাসেই এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধান করা উচিত। বিশেষতর এ প্রেক্ষাপটেই এ তিনটি কাফেলা সর্ব প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টি এভং হত্যা ও রক্তারক্তির উদ্দেশ্য মদীনা শরীফ এসে জড়ো হয়েছিলো। তাদের ধারণা ছিলো, মদীনা শরীফের সব গণ্য-মান্য লোকেরাই তো আমাদের পক্ষে রয়েছে। কিন্তু তারা যখন দেখলো, মদীনা শরীফের গন্য-মান্য লোকেরা তাদের এ আগমনকে অন্যায় সাব্যস্ত ক=রছে এবং তারা নিজেরাও মদীনাতে কোনো প্রকার যুদ্ধ প্রস্তুতি দেকতে পেলো না, তখন তারা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এই বিরোধিতাকে একটি দূরদর্শিতা মূলক সাময়িক সিদ্ধান্ত বলে মনে করলো এবং মিসরের দাঙ্গাবাজরা এ দাবী করে বসলো যে, মিসরের গভর্ণরকে পদচ্যুত করা হোক। পরিস্থিতি বিবেচনা করে হযরত আলী রাযি. ও আরো কয়েকজন সাহাবা উসমান রাযি. কে পরামর্শ দেন ঃ 'এ বিক্ষোভকারীরা যে কথার উপর যে কথার উপর জিদ ধরেছে তা আপনি পূরণ করে দিন এবং মদীনা শরীফে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করার পূর্বেই ওরা যাতে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়, সেই ব্যবস্থা করুন। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে সা'আদ রাযি. কে আপাততঃ অপসারণ করে তার স্থলে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রাযি. কে নিয়োগ দিন।'

অতঃপর হযরত উসমান রাযি. একটি লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রাযি. কে মিসরের আমীর তথা গর্ভনর নিয়োগ করেন। এবার হযরত আলী রাযি. বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদেরকে বললেনঃ 'যাও, এবার তোমাদের দাবী পূরণ হয়েছে।' ফলে তারা ভালোয় ভালো মদীনা চেড়ে চলে গেলো। কিন্তু পরবর্তী তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে সকল বিক্ষোভকারী তাকবীর ধ্বনি তুলে মদীনা শরীফে প্রবেশ করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত উসমান রাযি. এর বাসগৃহ ঘিরে ফেললো। হযরত আলী রাযি. তখন তাদেরকে বললেনঃ তোমরা তো এখান থেকে চলে গিয়েছিলে, আবার ফিরে আসলে কেন ? মিসরের বিক্ষোভকারীরা বললোঃ খলীফা উসমান রাযি. আবদুল্লাহ ইবনে সা'আদ রাযি. কে লিখিত একটি পত্র তার এক গোলামের মাধ্যমে মিসরে পাঠিয়ে ছিলেন। তাতে লেখা ছিলো, আমরা যখনই মিসর পৌঁছাবো, তখনই যেন আমাদেরকে হত্যা করে ফেলা হয়। আমরা পথেই ওই পত্র ধরে ফেলেছি এবং তা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কূফা ও বসরার বিক্ষোভকারীরা বললোঃ যেহেতু আমরা আমাদের মিসরীয় ভাইদের সুখ ও দুঃখের অংশীদার থাকতে চাই তাই আমরাও তাদের সাথে ফিরে এসেছি। হযরত আলী বললেন, আল্লাহর কসম! তা তোমাদের একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। তার মধ্যে তোমাদের নেক নিয়তের কোনো সদিচ্ছাই আমি দেখছিনা। অবশেষে হযরত আলী রাযি. বিক্ষোভকারীদেরকে থামাতে না পেরে মদীনা শরীফ থেকে 'আহজারুয যায়ত' নামক স্থানে চলে যান।'

যা হোক, ত্রিশ দিন পর্যন্ত হযরত উসমান রাযি. ঘেরাও অবস্থায়ই মসজিদে এসে নামায আদায় করেন। তারপর বিক্ষোভকারীরা তাকে ঘর হতে বের হতে দেয়নি এবং তার ঘরে পানি পৌঁছানোর রাস্তাও বন্ধ করে দেয়। হযরত ওসমান রাযি. বার বার বলেনঃ তোমরা যে চিঠিকে কেন্দ্র করে আমাকে এভাবে হয়রানি করছ সে চিঠি যে আমি লিখেছি তার কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ থাকলে পেশ কর অথবা আমার থেকে কসম নাও। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা তখন কোনে যুক্তিপূর্ণ কথাই শুনতে রাজী নয়। ব্যাপক বাড়াবাড়ি শুরু হলো এভং পানির অভাবে তিনি আপন পরিবারসহ খীযণ কষ্টের সম্মুখীন হলেন। তখন তিনি ঘরের ছাদের উপর আরাহন করে সকলকে তার ন্যায্য অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং নবীজী ﷺ এর পবিত্র যবান থেকে নিঃসৃত আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসটিও স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিক্ষোভকারীদের উপর তার এ বক্তৃতার কিছুটা প্রভাব পড়ে। ফলে তাদের কেউ কেউ বলতে থাকে, ভাই

ওকে ছেড়ে দাও এবং ক্ষমা কর। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার বিশ্বস্ত অনুচর মালিক ইবনে আশতার এসে পড়ে এবং বিক্ষোভকারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে ঃ খবরদার! এসব কথায় ভুলে গেলে চলবে না। এগুলো প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। এতে ফেঁসে যাওয়ার অর্থ নিজেদেরই সবনাশ ডেকে আনা। তার কথা শুনে লোকেরা আবার ওসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলো, বিক্ষোভকারীরা যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলো যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব সেনাবাহিনী আসবে তারা অবশ্যই হযরত ওসমান রাযি. এর সমর্থক এবং আমাদের বিরোধী হবে। তাই তারা হযরত উসমান রাযি. কে অবিলম্বে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।

এ ন্যক্কার জনক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হযরত তালহা রাযি. হযরত যুবাইর রাযি. এবং অন্যান্য সাহাবীগণ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। তারা না ঘর থেকে বের হতেন, না কারো সাথে মেলামেশা করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হযরত উসমান রাযি. এর দরজায় দণ্ডায়মান থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু হযরত উসমান রাযি. তাকে আমীরে হজ্ব নিযুক্ত করে জবরদস্তিমূলক মক্কাতে পাঠিয়ে দেন। হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি., মুহাম্মদ ইবনে তালহা রাযি., সাঈদ ইবনে আস রাযি. ও দৃঢ়তার সাথে বিক্ষোভকারীদের রুখে দাঁড়াল। কিন্তু হযরত ওসমান রাযি. কসমের পর কসম কেটে দিয়ে তাদেরকে লড়াই থেকে বিরত রাখেন এবং ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে যান। তিনি তাদেরকে বলেনঃ তোমরা এ বিক্ষোভকারীদের মোকাবেলা করো না এবং তাদেরকে হত্যাও করো না। তিনি হাসান ইবনে আলী রাযি. কে নির্দেশ দেনঃ তুমি এখনি তোমার পিতার কাছে চলে যাও। মুগীরা ইবনে আখনাস রাযি. কয়েকজন সাথীসহ বিক্ষোভকারীদের এ বাড়াবাড়ি মেনে নিতে পারেননি, তিনি সাথীদেরকে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ও বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। কিন্তু ওসমান রাযি. জোর করে আবু হুরায়রা রাযি. কে ডেকে নিয়ে আসেন এবং লড়াই করতে নিষেধ করে দেন।

বিক্ষোভকারীরা প্রথমে প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকে। তারপর সেখান থেকে দেয়াল টপকিয়ে হযরত উসমান রাযি. এর ঘরে ঢুকে তার উপর হামলা চালায়। মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সর্বাগ্রে হযরত উসমান রাযি. এর কাছে পৌঁছে এবং তার দাড়ি টেনে ধরে রাগতস্বরে ভালো-মন্দ কিছু কথা বলে। তখন হযরত ওসমান রাযি. তাকে বলেনঃ তোমার বাবা যদি আজ জীবিত থাকতেন, তাহলে তুমি আমার এ বার্ধক্যকে সম্মানের চোখে দেখতে এবং এভাবে আমার দাঁড়ি টেনে ধরতে না। একথা শুনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ভীষণভাবে লজ্জিত হন এবং দাঁড়ি ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে দুস্কৃতিকারীদের আরেকটি দল দেওয়াল টপকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কিনানাহ ইবনে বশীর নামক এক বিক্ষোভকারী এসেই উসমান রাযি. এর উপর তরবারি চালায়। হযরত উসমান রাযি. এর স্ত্রী নায়িলাহ আগে বেড়ে হাত দিয়ে তরবারির আঘাত রুখে রাখার চেষ্টা করেন। ফলে তার আঙ্গুলগুলো কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিনানাহ আবার আঘাত করে এবং সে আঘাতেই হযরত উসমান গণী রাযি. শাহাদাত বরণ করেন। তখন তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। রক্তের ফোঁটা কুরআনের যে আয়াতের পড়েছিলো তা ছিলো–

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ঠ। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

১৮ই জিরহজ্ব ৩৫ হিজরীতে জুমার দিন মুসলিম উম্মার ইতিহাসে এ মর্তান্তিক ঘটনাটি ঘটে। হযরত উসমান রাযি. ১২ বছর খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে ৮২ বছর বয়সে শাহাদাত লাভ করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। (তারীখে খুলাফা, তারীখে ইসলাম,)

রজম ওয়াজিব হওয়ার বিধান

বিবাহিত নারী ও পুরুষ যিনা করলে তাদের উপর 'রজম' ওয়াজিব। এ ব্যাপারে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। খারেজীদের একটি উপদল যারা সাহাবায়ে কিরামকে ও কাফের বলতে কুণ্ঠিত হয় না, তারা ব্যতীত গোটা মুসলিম উম্মাহ এ মাসআলার ব্যাপারেও একমত। যথা হিদায়া গ্রন্থকার বলেন–

وَاِذَا وَجَبَ الْحَدُّ وَكَانَ الزَّانِى مُحْصَنًا رُجِمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتّٰى يَمُوْتَ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجَمَ مَا عِزَّ اَوْ قَدْ اَحْصَنَ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ الْمَعْرُوْفِ وَزِنَا بَعْدَ الْاِحْصَانِ وَعَلٰى هٰذَا اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ـ

"হদ্দ যখন ওয়াজিব হয়, আর যিনা কারী 'মুহছান' হয় তবে তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। কেননা নবী কারীম ﷺ হজযরত মাইযকে রজম করেছিলেন। আর তিনি 'মুহছান' ছিলেন। তাছাড়া প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে 'যদি মুহছান অবস্থায় যিনা করে, (তাহলে তার খুন হালাল হবে।)' এর উপর সকল সাহাবার ইজমা রয়েছে।"

মুরতাদের শাস্তিঃ

'ইরতিদাদ' অর্থ কোনো মুসলমান ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়া। ইসলাম ধর্ম যে ত্যাগ করে তাকে মুরতাদ' বলে। আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেন ঃ

"ইসলামের পরিভাষায় ইরতিদাদ অর্থ হলো, ইসলাম ধর্মের স্থানে অন্য ধর্ম, ইসলামী আকীদার স্থানে অন্য আকীদা গ্রহণ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে শিক্ষা নিয়ে আগমন করেছিলেন, যা কিছু نَصّ قَطْعِى তথা অকাট্য সত্যরূপে বর্ণনা পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যা কিছু ইসলামে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত তাকে অস্বীকার করা'। যেমন ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম কিংবা কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করা অথবা নামায-রোজা, হজ্ব ইসলামের দণ্ডবিধি ইত্যাদিকে অস্বীকার করা। কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِى اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

মুরতাদের শাস্তি ঃ

ইমাম কুদুরী বলেন ঃ

اِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنِ الْاِسْلَامِ عُرِضَ عَلَيْهِ الْاِسْلَامُ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كُشِفَ لَهُ وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ اَسْلَمَ وَالْاِقْتِلَ ـ

অর্থাৎ মুসলমান যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার সামনে ইসলাম পেশ করা হবে। যদি তার মনে সন্দেহ থাকে তাহলে তার সন্দেহ দূর করা হবে। তাকে তিন দিন আটকে রাখা হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তো ভালো, অন্যাথায় তাকে হত্যা করা হবে।

মুরতাদ পুরুষ হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, এটা সকল ইমামের অভিমত। আর যদি মুরতাদ মহিলা হয় তাহলে এ ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ আছে। ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, মুরতাদ নারীকে ও হত্যা করতে হবে। কারণ, ইরতিদাদ সম্পর্কে হাদীসের মূল ভাষ্য হলো– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ অর্থাৎ 'যে ধর্ম ত্যাগ করেছে, তাকে হত্যা কর।' এত নারী পুরুষের প্রার্থক্য করা হয়নি। পক্ষান্তরে আহনাফের অভিমত হলো কোন মহিলাকে ধর্ম ত্যাগের অপরাধে হত্যা করা বৈধ নয়। কারণ হাদীসে এসেছে– نَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে, "যদি কোনো নারী ধর্ম ত্যাগ করে তবে তাকে ইসলামের দিকে আহবান করাবে। যদি সে ফিরে আসে তবে তাকে গ্রহণ করবে। যদি অস্বীকার করে তাকে বন্দী করে রাখবে।

যিন্দিক কাকে বলে ?

زنديق শব্দটি ফারসী শব্দের আরবী রূপান্তর। এর বহুবচন زنادقة আভিধানিক অর্থ ধর্মের ভানকারী, ইসলাম ধর্মচ্যুত। আবার কেউ কেউ বলেন, আরবী الزندقة শব্দ থেকে زندق শব্দটি গৃহীত হয়েছে। তাজুল আ'রূস (৬ষ্ঠ খ) খণ্ডে যিন্দিকের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এভাবে–

الزنديق من لا يؤمن بالاخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان

"যারা আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাত ও পরকালে বিশ্বাসী নয় (অথচ মুসলমান দাবী করে) তারা যিন্দিক; অথবা যারা কুফরিকে গোপন রেখে ঈমান প্রকাশ করে, তার যিন্দিক।"

কেউ কেউ বলেন, যিন্দিক বলা হয়, যার মুসলমানিত্বের দাবী করে ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজের কুফরি বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে প্রচার করে। কুরআন মজীদের পরিভাষায় এদেরকে 'মুলহিদ' বলা হয়। আর হাদীসের পরিভাষায় বলা হয় 'যিন্দক'। যেমন গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, হাদীস অস্বীকারকারী আব্দুল্লাহ চকড়ালুভী গং।

মুরতাদ ও যিন্দিকের মধ্যে পার্থক্য

১. ইসলামী হুকুমতের উপর ফরজ হলো, যিন্দিককে যেখানে পার, সেখানেই হত্যা করা। মুরতাদের ছেলে-সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে মুরতাদ হলে 'ওয়াজিবুল কতল' নয়, কিন্তু যিন্দিকের ছেলে-সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে যিন্দিক হলে সেও 'ওয়াজিবুল কতল'। অনুরূপভাবে মুরতাদ নারী 'ওয়াজিবুল কতল' নয়, কিন্তু যিন্দিক নারীর 'ওয়াজিবুল কতল'।

২. গ্রেপ্তারের পর যিন্দিকের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু মুরতাদের তাওবা গ্রেফতারের পর গ্রহণযোগ্য। (জাওয়াহিরুল ফিক্বহ, আহসানুল ফাতাওয়া)

باب ماجاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرامٌ ص ٣٨

অনুচ্ছেদ ঃ ২. রক্ত ও সম্পদ হারাম।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ : أَىُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قَالُوا : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قال: فإنّ دماء كُم وأموالكم وأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِى بَلَدِكُمْ هذا ـ ألا لا يجنى جانٍ إلّا على نفسه ألا لا يَجْنِى جَانٍ عَلٰى وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُودٌ عَلٰى وَالِدِهٖ ـ ألا وإنّ الشَّيْطَانَ قد أيس مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِى بِلَادِكُمْ هٰذِهٖ أَبَدًا وَلٰكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طاعةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أعمالكم فسيرضى به ـ

قَالَ أَبُو عِيسٰى : وَفِى الْبَابِ أَبِى بَكْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَحُذَيْمِ بْنِ عَمْرٍو السَّعْدِيِّ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ـ

وَرَوٰى زَائِدَةُ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ نَحْوَهُ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ـ

২. হান্নাদ .... সুলায়মান ইবনে আমর ইবনে আহওয়াস তার পিতা আমর আবিনে আহওয়াস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিদায় হজ্জের সময় লোকদের সম্বোধন করে বলতে শুনেছি, এটা কোন দিন ? লোকেরা বললঃ আজ হজ্জে আকবারের দিন।

তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্ভ্রম পরস্পরের জন্য হারাম যেমন আজকের এ দিন এ শহর হারাম। শুনে রাখ, অপরাধী তার নাফসের উপরই অপরাধ করে থাকে; শুনে রাখ, তোমাদের এ শহরে আর কখনও শয়তানের ইবাদত করা হবে সে সম্পর্কে শয়তান অবশ্য নিরাশ হয়ে গেছে। তবে যে সমস্ত কাজকে তোমরা খুবই ছোট বলে মনে করে থাক সে ধরণের কাজে অচিরেই তার আনুগত্য করা হবে। আর তাতেই সে সন্তুষ্ট হবে।

এ বিষয়ে আবূ বাকরা ইবনে আব্বাস, জাবির এবং হুয়ায়ম ইবনে আমর সাদী রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ। যাইদা রহ. ও এটিকে শাবীব ইবনে গারকাদা রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করছেন। শাবীব ইবনে গারকাদা রহ. এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْحَجُّ الْاَكْبَرُ হজ্বে আকবরের ব্যাখ্যা ঃ এর ব্যাখ্যায় মতবিরোধ আছে। যথা–

(১) অধিকাংশ উলামাদের মতে হজ্বে আকবর দ্বারা উদ্দেশ্য اَلْحَجُّ الْمُطْلَقُ অর্থাৎ সাধারণ হজ্ব। কারণ ওমরাহকে হজ্বে আসগর তথা ছোট হজ্ব বলা হয়। উমরাহ থেকে হজ্বকে আলাদা করার জন্য হজ্বকে হজ্বে আকবর বলা হয়েছে।

(২) কতক আলেমের অভিমত হলো, রাসূলুল্লাহ সা. নিজে যে হজ্বে অংশগ্রহণ করেছেন, কেবল সে হজ্বই হজ্বে আকবর।

يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ ঃ হজ্বে আকবরের দিন প্রসঙ্গেও উলামায়ে কিরামের একাধিক মতামত পাওয়া যায়। যথা–

(১) হজ্বে আকবরের দিন হচ্ছে, يَوْمُ النَّحْرِ তথা কুরবানীর দিন। কেননা, হজ্বের অধিকাংশ কর্ম যেমন সুবহে সাদিকের পর মুযদালিফার অবস্থান, জামরায়ে আকবরে রমী, যবেহ, মাথা মুণ্ডানো ও আওয়াফে যিয়ারত এই দিনে করা হয়। হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওফা, শাফেঈ ও মুজাহিদের মতামত এটাই যে, يَوْمُ النَّحْرِ হলো يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ

(২) আরাফাহর দিন। এটা হযরত উমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণিত। اَلْحَجُّ عَرَفَةُ অথবা اَلْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ জাতীয় হাদীসও এমতকে সমর্থন করে।

(৩) সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেনঃ হজ্বের পাঁচ দিনই يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ এর মেসদাক। যেখানে يَوْمُ النَّحْرِ ও عَرَفَه উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে বহুবচন ব্যভহার করা হলো কেন ?

উত্তরে বলা যায়, এখানে প্রচলিত পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা অসেক সময় يَوْم শব্দ বলে 'সময়' বা 'কিছুদিন' বুঝানো হয়। যেমন বদর যুদ্ধের কয়েকদিনকে কুরআন মজীদে يَوم الْفُرْقَانِ একবচন যোগে বর্ণনা করা হয়েছে। এ তৃতীয় মতটি উপরোক্ত দু' মতকে শামিল করে।

(৪) জন সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো, যে বছর ইয়াওমে আরাফাহ জুমআর দিনে হবে সে বছরের হজ্বই হজ্বে আকবর। তবে এ ধারণাটির স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর কোন সমর্থন নেই। বরং বিশুদ্ধ কথা হলো, প্রত্যেক বছরের হজ্বই হজ্বে আকবর। যে বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্ব করেছেন, সে বছর কাকতালীয়ভাবে ইয়াওমে আ'রাফাহ জুম'আর দিনে পড়েছিলো, সে কথা ভিন্ন হজ্বে আকবরের ধারণার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

(দরসে তিরমিযী ৩য় খণ্ড অবলম্বনে, বিস্তারিত কিতাবুল হজ্ব এ দেখুন)

اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা اَبْوَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ (১ম খণ্ড) তে করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য)।

بَابُ مَاجَاءَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرُوعَ مُسْلِمًا ص ٣٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৩. কোন মুসলিমকে আতংকিত করা কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয়

حدّثنا بَنْدارٌ . حدّثنا يحيى بن سعيد . حدّثنا عَبْدُ اللّه بْنُ السّائِب بن يزيد عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول اللّه ﷺ : لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادًّا ، فمَنْ عَصا أخيه فليردّها إليه .

قَالَ أَبُو عِيسَى: فِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وسُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَجَعْدَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وهذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَهُ صُحْبَةٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ وَهُوَ غُلَامٌ وَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَوَالِدُهُ يَزِيدُ بْنُ السَّائِبِ لَهُ أَحَادِيثُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ .

৩. বুন্দার .... আবদুল্লাহ ইবনে সাইব ইবনে ইয়াযীদ তার পিতা তার পিতামহ ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কৌতুকভাবেই হোক বা সত্যিকার অর্থেই হোক কোন অবস্থাতেই তোমাদের কেউ তার ভায়ের লাঠিতে হাত দিবে না। কেউ যদি তার ভাইয়ের লাঠি নেয় তবে সে যেন তা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়।এ বিষয়ে ইবনে উমার সুলায়মান ইবনে সুরাদ, জা'দা এবং আবূ হুরায়রা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হাসান–গরীব। ইবনে আবূ যি'র রহ. এর সূত্রে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা।

সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. নবী কারীম ﷺ এর সংসর্গ পেয়েছেন। শৈশবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা শুনেছেন। নবী কারীম ﷺ এর যখন ইন্তিকাল হয় তখন সাইব –এর বয়স ছিল সাত বছর। তাঁর পিতা ইয়াযীদ ইবনে সাইব রাযি. ও সাহাবী ছিলেন। নবী কারীম ﷺ থেকে তিনি কিছু হাদীসও বর্ণনা করেছেন। সাইব ইবনে ইয়াযীদ নামির –এর ভাগিনেয়।*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَجَّ يَزِيدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ .

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَبْتًا صَاحِبَ حَدِيثٍ وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ جَدَّهُ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ يَقُولُ : حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ جَدِّي مِنْ قِبَلِ أُمِّي .

৪. কুতায়বা .... সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. বলেন, (আমার পিতা) ইয়াযীদ নবী ﷺ এর সাথে বিদায় হজ্জে অংশ গ্রহণ করেন তখন আমি ছিলাম সাত বছরের বালক। আলী ইবনুল মাদীনী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাবী মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ নির্ভরযোগ্য, সাইব ইবনে ইয়াযীদ ছিলেন তাঁর মাতামহ। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ বলতেন, সাইব ইবনে ইয়াযীদ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আমার মাতামহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا ঃ যেমন কোনো ব্যক্তি বাহ্যত কৌতুকচ্ছলে কারো লাঠি নিয়ে নিলো। মূলতঃ তার উদ্দেশ্য হলো লাঠিটি জাতিয়ে নেওয়া। আজকাল এরকম অনেক ঘটে থাকে যে, কোনো প্রথমে ঠাট্টাচ্ছলে নেয়, তারপর মালিক যখন জানতে পারে, তখন বলে যে, মজা করার জন্য নিয়েছি। আর না জানতে পারলে চিরদিনের জন্য জিনিসটি গায়েব করে দেয়। রাসূল ﷺ এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এ ধরণের কাজের শুরুর দিকটাতে বাহ্যত মজা ও কৌতুক থাকলেও মূলত সিরিয়াসনেস উদ্দেশ্য থাকে।

অথবা এর ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, কারো কোনো জিনিস চুরির উদ্দেশ্য নয় বরং মালিককে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য কিংবা ক্ষেপানোর উদ্দেশ্য নেওয়া। এটাও নিষেধ। (মিরকাত তুহফাহ)

হাদীসের মধ্যে বিশেষভাবে লাঠির কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, লাঠি একটি সাধারণ ও কম দামি বস্তু। এর ক্ষেত্রে বিধান এরকম হলে, অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে তো আরো কঠোর হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى إِشَارَةِ الرَّجُلِ (الْمُسْلِمِ) عَلَى (إِلَى) أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ ص ٣٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৪. কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَشَارَ عَلٰى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ.

قَالَ أَبُو عِيسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا .

৫. আবদুল্লাহ ইবনে সাব্বাহ হাশিমী .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি ধারালো কিছু দিয়ে ইশারা করে ফিরিশতাগণ তার উপর লানত করেন। এ বিষয়ে আবূ বাকরা, 'আইশা ও জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। এ সূত্রে গারীব। খালিদ আল-হায্যা রহ. এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটিকে গারীব বলে মনে করা হয়। আয়্যুব রহ. এটিকে মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি মারফূ' করেন নি। এতে আরো আছে "যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়।"

কুতায়বা রহ. .... আয়্যুব রহ. থেকে তা বর্ণিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দ্বীনী ভাই অথবা হাকীকী ভাইর প্রতি রোহা কিংবা অস্ত্র দ্বারা যখন ইঙ্গিত করার মধ্যে নিশ্চয় কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থাকে না, বরং এর মধ্যে হাসি-মজাই উদ্দেশ্য থাকে। কেননা এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কিংবা এক ভাই অপর ভাইকে হত্যা করতে পারে না। সুতরাং এখানে হাসি-তামাশাই উদ্দেশ্য থাকা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তবুও ফেরেশতারা অভিসম্পাত করে। মজা-কৌতুকাচ্ছলে যদি ফেরেশতাদের লা'নত চলে, তাহলে হত্যা উদ্দেশ্য এরূপ করলে অবশ্য ফেরেশতাদের লা'নত আসবে। (মিরকাত) অতএব, হাদীসে উল্লেখিত নিষেধ مُبَالَغَة করা হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ تَعَاطِى السَّيْفِ مَسْلُوْلًا ص ٣٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৫. খাপ থেকে বের করা অবস্থায় তলওয়ার আদান-প্রদান নিষেধ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . وَرَوٰى ابْنُ لَهِيْعَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ بَنَّةَ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَحَدِيْثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدِىْ أَصَحُّ .

৬. আবদুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া জুমাহী বাসরী .... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাপ থেকে খোলা অবস্থায় পরস্পর তলওয়ার আদান-প্রদান করা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে আবূ বাকরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ. এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি গারীব। ইবনে লাহীআ রহ. এ হাদীসটি আবুয-যুবাইর, জাবির ও বাননা জুহানী রাযি. সূত্রে নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে সালামা –এর রিওয়ায়াতটি (২১৬৬ নং) আমার কাছে অধিকতর সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ নিষেধটি نَهْى تَنْزِيْهِى হিসাবে নবীজী আ. স্নেহসূলভ মতকে কাজটি থেকে বারণ করেছেন। কারণ হতে পারে, এভাবে নাঙ্গা তরবারী একে অপরকে দিতে গেলে যেখেয়ালে অপরের হাত বা কিছুতে লেগে কাটা যেতে পারে অথবা কোনো ব্যক্তি নাঙ্গা তরবারি দেখে ভয়ও পেতে পারে, বিধায় রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ ص ٣٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৬. যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল সে আল্লাহর যিম্মায় চলে গেল।

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَتْبَعَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنْ ذِمَّتِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ جُنْدُبٍ وَابْنِ عُمَرَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৭. বুনদার .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল সে আল্লাহর যিম্মায় চলে এল। আল্লাহ যেন তার যিম্মার বিষয়ে তোমাদেরকে কোনরূপ অভিযুক্ত না করেন। এ বিষয়ে জুন্দুব ও ইবনে উমার রাযি. থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এ সূত্রে গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জামাতের সাথে সকাল বেলার নামায আদায় করেছে, সে আল্লাহর অঙ্গীকার ও নিরাপত্তাধীন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং অন্যান্য মুসলমানের জন্য উচিত, তার সাথে যেন অন্যায় আচরণ না করে। কারণ তার জান-মাল ইজ্জতের উপর আঘাত করার অর্থ হলো, আল্লাহর নিরাপত্তা বুহ্য ভঙ্গ করা। অথবা হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত ذِمَّةُ اللّٰهِ

এর অর্থ নামায, যা নিরাপত্তার কারণ। অর্থাৎ সকাল বেলার নামায পড়লে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপদে রাখবেন– এ ওয়াদা করেছেন। সুতরাং একজন মুসলমানের উচিত, যেন সকাল বেলার নামায মোটেও কাযা না করে। অন্যথায় তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে কৃত চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى لُزُومِ الْجَمَاعَةِ ص ٣٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৭. মুসলিমদের জামা'আত আঁকড়ে থাকা।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِينَا فَقَالَ : أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتّٰى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذٰلِكَ الْمُؤْمِنُ -

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৮. আহমাদ ইবনে মানী' .... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাযি. আমাদরকে জাবিয়া নামক স্থানে ভাষন দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোকেরা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন আমাদের মাঝে দাঁড়াতেন তেমনি আজ আমি তোমাদের মাঝে দাঁড়িয়েছি। তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীগণ সম্পর্কে ওয়াসীয়ত করে যাচ্ছি। এরপর যারা তাদের পর আসবে, এরপর তারা যারা তাদেরও পরে আসবে। এরপর মিথ্যার বিস্তৃতি ঘটবে। এমনকি একজন কসম করে বসবেআথচ তাকে কসম করতে বলা হয়নি। কোন সাক্ষী দিয়ে বসবে অথচ তাকে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়নি। শুনে রাখ, কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সঙ্গে নিভৃতে একত্রিত না হয় অন্যথায় শয়তান অবশ্যই তৃতীয় জন হিসাবে হাযির থাকে। তোমরা অবশ্যই মুসলিম জামা'আতকে আঁকড়ে থাকবে। বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকবে। শয়তান একাকী জনের সাথে থাকে। আর দুইজন থেকে সে আরো দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের সর্বোত্তম স্থান কামনা করে সে যেন জামা'আতকে আঁকড়ে থাকে। নেক আমল যাকে আনন্দিত করে এবং মন্দ আমল যাকে দুঃখিত করে সেই হল মু'মিন। হাদীসটি হাসান–সহীহ। এ সূত্রে গরীব। ইবনে মুবারক রহ. এটি মুহাম্মদ ইবনে সূকা রহ. এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। 'উমার রাযি. এর বরাতে নবী কারীম ﷺ থেকে এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوسٰى - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ -

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ـ

৯. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর হাত হল জামাআতের উপর। এ হাদীসটি হাসান–গরীব। ইবনে আব্বাস রাযি. এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ ـ حَدَّثَنِي الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ ـ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ الْعُقَدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ـ

১০. আবূ বকর ইবনে নাফি' বাসরী .... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে (বর্ণনান্তরে উম্মতে মুহাম্মদীকে) কখনও গুমরাহীর উপর অবশ্যই একত্রিত করবেননা। আল্লাহর হাত হল জামা'আতের উপর। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে একাকী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। হাদীসটি এ সূত্রে গারীব। আমার মতে সুলায়মান মাদীনী রহ. বলেন, সুলায়মান ইবনে সুফইয়ান। তার নিকট থেকে আবূ দাউদ তায়ালিসী, আবূ আমির উকদী প্রমুখ আলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বস্তুত এ হাদীসের মধ্যে ইসলামের প্রথম তিন যুগের ফযীলত তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম যুগ হলো, সাহাবীদের যুগ। ইবনে আবদিল বার রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সোহবত, তাঁর সুন্নাতের হেফাযত ও প্রচারের দুর্লভ মর্যাদা আল্লাহ এসব মহান ব্যক্তি অর্থাৎ সাহাবীগণের ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন, তাই তাদের যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। সাহাবীগণের পরেই তাবেঈগণের মর্যাদা। তাঁরা ঈমান ও আমলের ব্যাপারে যেমন সাহাবীগণের অনুসারী। তেমনি কালের দিক থেকেও তাঁরা সাহাবাগণের উত্তরসূরী। তাবেঈগণের পরেই তাবে-তাবেঈগণের মর্যাদা। কেননা তারা ঈমান ও আমলের ব্যাপারে যেমন তাবিঈ ও সাহাবীগণের অনুসারী, তেমনিভাবে যুগ ও সময়ের দিক দিয়েও তাঁরা তাদের উত্তরসূরী।

ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ ঃ এ তিন যুগের মধ্যে দ্বীনের মূল কায়া-কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আসবে না। দ্বীনের কাজগুলো ইখলাসের সাথে সম্পাদিত হবে। কিন্তু তাবে তাবেঈনের যুগের পর যে যুগ আসবে, সে যুগ দ্বীন ও ধার্মিকতার অনুকূলে হবে না। অন্যায়, বিদ'আত, নফসের তাড়না সহ যাবতীয় গুণাহ তখন শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَيُسْتَحْلَفُ ঃ অর্থাৎ এমন লোকও হবে, যারা চিন্তা-প্রয়োজনে কসম খাবে। কসমের ব্যাপারে তারা পারায়াহীন হবে। কেউ কেউ বলেনঃ এর দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ অধিকহারে মিথ্যা কসম খাবে। (মিরকাত, হাশিয়ায়ে তিরমিযী)

يَشْهَدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ ঃ এখানে দৃশ্যত একটি تَعَارُض তথা বৈপরীত্য আছে। এখানে হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়, সাক্ষ্য তলব করা ছাড়া সাক্ষ্য দেওয়া একটি মন্দ কাজ। অথচ অন্য হাদীসে এসেছে–

خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِىْ يَأْتِىْ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا অর্থাৎ সাক্ষ্য তলবের পূর্বে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে সে উত্তম সাক্ষী। সুতরাং এই تعارض এর সমাধান কি ? এর সমাধান হলো

(১) অধ্যায়ের হাদীসের সম্পর্ক হলো ওই ব্যক্তির সাথে যে ব্যক্তি সম্পর্কে এটা জানা আছে যে, সে অমুক বিষয়ের বা ঘটনার সাক্ষী। অথচ صَاحِبِ مُعَامَلَه (ঘটনার নায়ক) তার থেকে সাক্ষী তলব করছেনা। কিন্তু এ ব্যক্তি স্বতস্ফুর্ততার সঙ্গে সাক্ষ্য দিতে লাগলো। তাহলে ধরে নেওয়া হবে, তার থেকে সাক্ষ্য তলব না করা সত্ত্বেও তার সাক্ষ্য প্রদান এজন্য যে, এর মাধ্যমে সে হয়ত কোনো ফায়দা লুটতে চায়। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি একটি ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু صَاحِبِ مُعَامَلَه জানে না যে, অমুক ব্যক্তি এ ঘটনার সাক্ষী। তাই صَاحِبِ مُعَامَلَه তার কাছে সাক্ষ্য তলব করছে না। ফলে صَاحِبِ مُعَامَلَه এর হক খর্ব হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এ মুহূর্তে এ ব্যক্তির সাক্ষ্য তাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষ্য করতে পারবে। এ পরিস্থিতিতে স্বতস্ফুত সাক্ষ্য প্রদান নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

(২) অথবা বলা হবে, আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসটির সম্পর্ক ওই ব্যক্তির সঙ্গে যে ব্যক্তি সাক্ষী হওয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা হয়ত সে মিথ্যাবাদী হিসাবে প্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদীসটির সম্পর্ক সত্য সাক্ষী সম্পর্কে, যে সাক্ষী হওয়ার উপযুক্ত।

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَة জামাতের মেসদাক কে ? এ ব্যাপারে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। যথা-

(১) জামাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাহাবায়ে কেরামের জামাত।

(২) জামাত দ্বারা উদ্দেশ্য যারা কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে সঠিক ও গভীর জ্ঞান রাখে।

(৩) জামাত দ্বারা উদ্দেশ্য جَمَاعَتِ الْمُسْلِمِيْن তথা মুসলমানদের জামাত। যারা কোন যোগ্য আমীরের অধীনে আনুগত্য শীল।

(৪) জামাত দ্বারা উদ্দেশ্য আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত। এমতটিই বিশুদ্ধ ও অগ্রাধিকারযোগ্য।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِىْ عَلٰى ضَلَالَةٍ ঃ ইবনুল মালিক বলেনঃ এখানে উম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য উম্মতে ইজাবত। আর ضَلَالَت দ্বারা উদ্দেশ্য, কুফরি ছাড়া অন্যান্য বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা। (মিরকাত)

يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ঃ এখানে জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য, ওই সমস্ত লোক যারা ইসলামের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হয়েছে। তথা আহলে হকের জামা'আত যাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলা হয়। (মিরকাত)

مَنْ شَذَّ ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আকীদাগতভাবে কিংবা মৌখিকভাবে অথবা কাজে কর্মে জামা'আত পরিত্যাগ করেছে।

شُذَّ فِى النَّار ঃ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. বলেন, প্রথম شَذَّ মা'রূফের সীগাহর সাথে নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় شَذَّ মা'রূফ এবং মাজহূল উভয়ভাবেই পড়া যাবে। লিসানুল আ'রবের বাচনিক থেকে বুঝা যায় যে, شُذَّ মাজহূলের সীগার সাথে ব্যবহার কম। আসমা'ঈ شُذَّ অর্থাৎ مُتَعَدِّى এর সাথে ব্যবহারকে অস্বীকার করেছেন। شَذَّ إِلَى النَّارِ এবং شَذَّ فِى النَّارِ আর দ্বিতীয় সূরতে ইবরত হবে- شُذَّ مُلْقًى فِى النَّارِ

উক্ত হাদীসে 'ইজমায়ে উম্মত' দ্বারা উদ্দেশ্য, উম্মতের উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য। সাধারণ মানুষের ঐকমত্য বিবেচ্য নয়। (মিরকাত)

بَابُ مَاجَاءَ فِى نُزُوْلِ الْعَذَابِ إِذَا لَمْ يُغَيِّرِ الْمُنْكَرُ ص ٣٩

অনুচ্ছেদ ঃ ৮. অন্যায় কাজ প্রতিহত না করা হলে আযাব নাযিল হবে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ ـ أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَئُونَ هٰذِهِ الْآيَةَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ، وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلٰى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ ـ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ عَنْ إِسْمٰعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ نَحْوَهُ ـ قَالَ أَبُو عِيسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ ، هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمٰعِيلَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ، وَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ إِسْمٰعِيلَ وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ ـ

১১. আহমাদ ইবনে মানী .... আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোকেরা তোমরা এ আয়তটি পড়ে থাক– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ـ হে মুমিনগণ, তোমাদের নিজেদের সংশোধনই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি হিদায়াতের পথ চল তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ১০৫) অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন যালিমকে যুলুম করতে দেখে তখন তারা যদি তাকে তার হাত ধরে প্রতিহত না করে তবে আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাদের সবাইকে তার ব্যাপক আযাবে নিপতিত করবেন।

১২. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে 'আইশা, উম্মু সালামা, নু'মান ইবনে বাশীর, আবদুল্লাহ ইবনে উমার এবং হুযায়ফা রাযি. থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী এ হাদীসটিকে ইসমাঈল রহ. এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ ইসমাঈল রহ. থেকে মারফূ' রূপে আর কেউ কেউ মাওকূফ রূপে এটির রিওয়ায়াত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. বলেন– উল্লেখিত হাদীসটিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. লোকেরদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা না করে। আয়াতটি ব্যাখ্যায় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি হাদীস ইরশাদ করেছেন, যার আলোকে আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

হযরত সিদ্দীকে আকবার রাযি. এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, কেউ কেউ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন বলেছেন, নিজেদের খবর নাও, আত্মসংশোধনের ফিকির কর। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব তো শুধু নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চিন্তা করা। অন্যদেরকে ভুল কাজ করতে দেখলে তাদেরকে বাঁধা দেওয়া, তাদের সংশোধনের ফিকির করা তো আমাদের দায়িত্ব নয়।

হযরত সিদ্দীকে আকবর বলেছেন, আয়াতের এ জাতীয় ব্যাখ্যা করা ভুল। কারণ, মানুষ যখন কোন জালিমকে জুলুম করতে দেখবে, আর তাকে জুলুম থেকে না ফিরাবে, এ অবস্থায় অচিরেই আল্লাহ তা'আলা শাস্তি আপতিত

করবেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি. বুঝাতে চাচ্ছেন, রাসূল ﷺ এ হাদী- একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে, তোমাদের সামনে জালিম যখন জুলুম করে, জুলুমকে ফিরানোর শক্তিও তোমার থাকে, এতদসত্ত্বেও তোমার তোমার চিন্তা হলো তার জুলুম ও তার দোষ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি তো জুলুম করছিনা, তাই তার কাজে আমার হাত না দেওয়া চাই। তারপর দলীল হিসাবে এ আয়াত পেশ করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তো নিজের চিন্তা করার কথা বলেছেন, অন্য কেউ গুণাহ করলে, আমার কি ? হযরত আবু বকর বলেন, আয়াতের এ ব্যাখ্যা করা ভুল।

প্রশ্ন জাগে, তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যা কি ? আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, এক ব্যক্তি সাধ্য ও সামর্থনুসারে সৎ কাজের আদেশের কর্তব্য আদায় করছে, তবুও অপর ব্যক্তি তার কথা মানে না। আদেশের কর্তব্য আদায় করছে, তবুও অপর ব্যক্তি তার কথা মানে না। তখন তোমাদের উপর তার কোন দায়দায়িত্ব বর্তাবে না। তখন তোমরা নিজের চিন্তা কর, নিজের সবকিছু ঠিক রাখ। 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহর দরবারে তখন তোমাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে না। যেমন সন্তনের ব্যাপারে শরী'আতের বিধান হলো, যদি মাতা-পিতা তাকে ভুল পথে চলতে দেখে, তখন তাদের বর্তব্য হলো, তাকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে। এখন কেউ যদি তার পূর্ণ কৌশল ও শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও সন্তান তার কথা মানে তখন সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট শাস্তিযোগ্য হবে না। যেমন হযরত নূহ নিজ সন্তানকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, সাধ্য মতে তার পেছনে মেহনত করেছেন, কিন্তু সে ঈমান আনেনি। এজন্য নূহ আ. কে জবাবদিহী করতে হবে না। এটাই আয়াদের সঠিক ব্যাখ্যা। বর্ণিত হাদীস দ্বারা যার সমর্থন মিলে।

কোন কোন আলেম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটি কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যখন ওয়াজ-নসীহত কোন কাজে আসবে না। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর সামনে আয়াতটি তেলাওয়াত করা হলে তিনি বলেন– لَيْسَ هٰذَا زَمَا نُنَاوِزَ مَا نُكُمْ অর্থাৎ আয়াতের বক্তব্য আমাদের যামানা এ (সাহাবাদের যামানা) ও তোমাদের যামানার (তাবেঈদের যামানা) সাথে সম্বন্ধযুক্ত নয় বরং এটা ওই অনাগত যামানার সাথে সর্ম্পযুক্ত যে যমানার মানুষ আমর বিন মা'রূফ ও নাহি আ'নিল মুনকারকে উপেক্ষা করবে।

কেউ কেউ বলেন, আয়াতের বক্তব্য মূলত তাদের জন্য, যারা সব সময় অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়, তাদেরকে বলা হয়েছে, প্রথমে নিজের খবর নাও। তোমার সবকিছু ঠিক মত চলছেনা তো ?

মোল্লা আলী কারী আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা নিজেদেরকে গুণাহমুক্ত রাখ। তারপর আমর বিন মা'রূফ ও নাহি আ'নিল মুনকার না করলেও অপরের ভ্রষ্টতা তোমদেরকে স্পর্শ করবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ ص ٤٠

অনুচ্ছেদ ঃ ৯. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِىْ عَمْرٍو بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

১৩. কুতায়বা .... হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করতে থাক। নতুবা

অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তাঁর আযাব নিপতিত করবেন। তখন তোমরা তাঁর নিকট দু'আ করবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল করবেন না।

আলী ইবনে হুজ্র ... আমর ইবনে আবূ 'আমর রহ. থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান।

حدّثنا قُتيبَةُ ، حدّثنا عبدُ العزيز بنُ محمّد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرّحمن الانصاري الأَسْهَليّ عن حُذيفة بن اليمان أنّ رسول الله ﷺ قال: والّذي نفسي بيده لاتقومُ السّاعة حتّى تقتلوا إمامكم، وتجتلدوا بأسيافكم، ويرث دُنياكم شِرارُكم. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ.

১৪. কুতায়বা .... হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ঈমামকে (বাদশাহ) হত্যা করেছ এবং পরস্পর অস্ত্রধারণ করছে আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা দুনিয়ার হর্তাকর্তা হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, অন্যান্য শাস্তিম মুসিবত দু'আর মাধ্যমে দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আমর বিল মা'রূফ ওয়ান নাহি আ'নিল মুনকার ত্যাগ করার যে শাস্তি নির্ধারিত হয়, তা দু'আর মাধ্যমেও দূরীভূত হয় না।

أمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر এর বিধান ঃ

'সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষে:' করণের কর্তব্য উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির তখনই আরোপিত হবে, যখন চোখের সামনে কাউকে অসৎকাজ করতে দেখবে। উদাহরণতঃ কোন মুসলমানকে মদ্যপান করতে অথবা চুরি করতে কিংবা ভিন্ন নারীর সাথে অশালীন মেলামেশা করতে দেখলে সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু চোখের সামনে এসব কাজ না পড়লে তা ওয়াজিব নয়, বরং এরূপ কাজ বন্ধ করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। সরকার অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করে শাস্তি দিবে।

'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' করণের দ্বিতীয় স্তর হলো, মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ একটি দল থাকবে, যে দলের কাজ হবে কল্যানের প্রতি আহবান করা, তখন অসৎকাজ হতে দেখা যাক, বা না যাক অথবা কোন ফরয আদায় করার সময় হোক বা না হোক। উদাহরণতঃ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত নামাযের সময় নয়। কিন্তু এ সম্প্রদায় এ সময়ও এই বলে নামায পড়ার উপদেশ দেবে যে, সময় হলে নামায আদায় করা জরুরী। মোটকথা এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করতে থাকা।

হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. মাস'আলাটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এভাবে বিন্যস্ত করেন।

(১) যে ব্যক্তি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে সক্ষম অর্থাৎ তারা জানা আছে, আমি সৎকাজে আদেশ কিংবা অসৎকাজে নিষেধ করলে তাহলে আমার কোন ক্ষতি হবে না। তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। সুন্নাত, মুসতাহাব ভেদে আমর বিন মারূ'ফ কিংবা নাহি আনিল মুনকার করা ওয়াজিব। যেমন নামায যেহেতু ফরজ তাই তা করতে বলতে এমন ব্যক্তির জন্য ফরয। নফল নামায যেহেতু মুস্তাহাব, তাই নফল নামাযের আদেশ করাও এ ব্যক্তির জন্য মুসতাহাব।

(২) যে ব্যক্তি উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে সৎকাজ করার আদেশ কিংবা অসৎকাজে বাঁধা প্রদান করতে সক্ষম নয়, বরং এগুলো করতে গেলে তার কোন না ক্ষতি হবে, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার ওয়াজিব নয়। তবে সাহস করে করলে অবশ্যই সাওয়াব পাবে।

(৩) অতঃপর উক্ত সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, সে যদি হাতের মাধ্যমে 'নাহি আনিল মুনকার' করতে সক্ষম হয়, তাহলে হাত দ্বারা করবে, মুখ দ্বারা সক্ষম হলে মুখ দ্বারা করবে। আর সক্ষম না হলে কমপক্ষ্যে ঘৃণা করবে।

(৪) সক্ষম ব্যক্তির জন্য একটি শর্ত হলো কঠোরের স্থানে যথা ওয়াজিবের ক্ষেত্রে কঠোরতা করবে আর নম্রতার স্থানে যথা নফলের ক্ষেত্রে নম্রতা দেখাবে।

(৫) সক্ষমতার ক্ষেত্রে আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, আমর বিল মা'রূফ অথবা নাহি আ'নিল মুনকার যদি হাত দ্বারা সম্ভব হয় তাহলে তা করতেই হয়। আর যবানী কুদরতের ক্ষেত্রে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে না করাও জায়েয আছে।

(৬) সক্ষম ব্যক্তির জন্য আ'মর বিল মা'রূফ ও নাহি আ'নিল মুনকার হচ্ছে ওয়াজিবে কিফায়াহ।

(বিস্তারিত দেখুন, বয়ানুল কুরআন, মা'আরিফুল কুরআন)

আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আ'নিল মুনকার এবং ওয়াজ-নসীহত ও বয়ান করার সুন্নত ও আদবসমূহ

সহীহ নিয়ত করবে। অর্থাৎ এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহর হুকুম চালু করার, আল্লাহর দ্বীন যিন্দা করার এবং সাওয়াব হাসিল করার নিয়ত করবে।

- আল্লাহর কথা বা হক কথা বলার কারণে যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে তার উপর ধৈর্য ধারণের জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিবে।
- শ্রোতাকে তাদের হাজ থেকে এবং কথাবার্তা থেকে ফারেগ করে নিবে।

ওয়াজ-নসীহত ও বয়ানের পূর্বে আল্লাহর হামদ ও দুরুদশরীফ পড়ে নিবে।

- যে বিষয় বিশুদ্ধভাবে জানা আছে, একমাত্র সেটাই বলবে। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যেটা জানা হয়নি, তাহকীক ছাড়া সেটা বর্ণনা করা মিথ্যা বয়ান করার শামিল।
- হেকমত, যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলা জরুরী।
- নম্রতার সাথে কথা বলা, কঠোরতা পরিহার করা। মুস্তাহাব পর্যায়ের বিয়ষ হলে সর্বদাই নম্রতার সাথে বলা জরুরী। আর ফরয কিংবা ওয়াজিব পর্যায়ের বিয়ষ হলে প্রথমে নম্রতার সাথে তারপর কঠোরতার সাথে বলবে।
- অন্যকে যে বিষয়ের দাওয়াত ও নসীহত করবে,প্রথমে নিজে সেটার উপর আমল শুরু করতে পারলে উত্তম। অন্যথায় মানুষের মনে তার দাওয়াত ও নসীহতের আছর কম হবে।
- এত ঘন বা দীর্ঘ সশয় ওয়াজ-নসীহত না করা, যাতে শ্রোতাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়।
- শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য রেখে কথা বলা জরুরী।
- তারগীব, তারহীব, ফাযায়েল ও আহকাম সব বিষয়ের সমন্বয়ে বয়ান করা। এমনিভাবে ঈমান ও ইবাদতের বিষয়ের সাতে উসলামের মু'আমালাত, মুআ'শারাত ও আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে বয়ান রাখা চাই।
- শ্রোতাদরে মন-মেযায লক্ষ্য রেখে কথা বলা চাই, যে বিয়ষ শ্রোতাদের জন্য বেশি প্রয়োজন সে বিষয়ের বওয়ানকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরী।
- দাওয়াত ও নসীহতের বিনিময়ে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ না করা নবীদের সুন্নাত।
- শ্রোতাদের খায়েখাহির জযবা নিয়ে বয়ান ও নসীহত করবে।
- পরকালমুখী করে বয়ান করা, অর্থাৎ মখ্যতঃ আল্লাহর হুকুম ও দীন মানা-না মানার পরকালীন লাভ-ক্ষতিকে তুলে ধরেই বয়ান করা। কখনও কখনও পার্থিব লাভ-লোকসানকেও গৌনভাবে উল্লেক করা যায়।
- দ্বীনকে সহজভাবে পেশ করা নিয়ম, যেন শ্রোতারা দ্বীনকে কঠিন মনে করে না বসে।
- পর্যায়ক্রমে জরুরী হুকুম-আহকামের চাপ দেওয়া যাতে একসঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ের চাপ মনে করে শ্রোতাগণ বিগড়ে না যায়।

- দোষ-ত্রুটির নেছবত নিজের দিকে করা যেমন বলা যে, আমরা কেন ইবাদত করবো না ? আমরা এই গুনাহ ত্যাগ করি ইত্যাদি। এরূপ না বলা যে, আপনারা কেন ইবাদত করেন না ? আপনারা এই গুণাহ ছাড়ুন, ইত্যাদি।
- দাঈ নিজের অবস্থানকে পরিস্কার রাখবে। এমন কোন কাজ করবে না যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য বৈধ হলেও বাহ্যিকভাবে সেটা দেখে তার ব্যাপারে কেউ সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে। অন্যায়ভাবে তার উপর কোন অপবাদ আরোপিত হলে সমাজের সামনে তার সঠিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে দিবে। বয়ান ও ওয়াজের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নসীহত না করা। এতে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে বক্তার প্রতি মনে মনে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং হিতে বিপরীত হতে পারে। (মা'আরিফুল কুরআন, আহকামে যিন্দেগী)

اَمَر بِالْمَعْرُوف এর শ্রেণী বিন্যাস

প্রথমে নিজেকে সৎকাজের উপর পরিচালিত করবে। তারপর নিজ পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন– قُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

দ্বিতীয় স্তরে নিজের আত্মীয়-স্বজন, সাথী-বন্ধু, অধিনস্ত লোকজন প্রমুখকে সৎকাজের আদেশ দিবে। যথা কুরআন মজীদে বলা হয়েছে– وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

তৃতীয় স্তরে গোটা নিজ সমাজ, পাড়া-প্রতিবেশী ও পর্যায়ক্রমে সারা বিশ্বের মানুষকে সৎপথের প্রতি আহ্বান করবে। যথা ইরমাদ হয়েছে। لا نذركم به ومن بلغ

نَهِى عَنِ الْمُنْكَرِ এর স্তর সমূহ

অসকাজে বাঁধা প্রদানের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা–

প্রথমত ক্ষমতা থাকলে হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়া ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা না দিলে সে নিজেও গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তির মত গুণাহগার বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয়ত কখনও যদি হাত দ্বারা বাঁধা দিলে ফিতনা-ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা তার চেয়েও বড় ধরনের গুণাহ সংগঠিত হওয়ার আশংঙ্কা থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় মুখের কথা দ্বারা বাঁধা দিবে।

তৃতীয়ত যদি কেউ হাত বা মুখ দ্বারা বাধা দেওয়ার শক্তি না লাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা খারাপ কাজকে ঘৃণা ও পরিবর্তন করবে। অন্তর দিয়ে পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো, ওই খারাপ কাজের উপর এমন ঘৃণা সৃষ্টি করা যে, তার চেহারায় অসন্তুষ্টির প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠে ও মন অস্থির হয়ে যায় এবং হাত বা মুখ দ্বারা বাধা প্রদানের সুযোগ তালাশ করে।

دَعْوَت اِلَى الْخَيْر বা কল্যাণের প্রতি আহ্বানের দু'টি পর্যায়

আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার ক্ষেত্রবিশেষ ওয়াজিব হয়। কিন্তু কল্যাণের প্রতি আহ্বান সব সময়ের জহন্য ওয়াজিবে কেফায়াহ। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দল সবসময় থাকতে হবে যারা মানুষকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে।

কল্যাণের প্রতি আহ্বানের দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়, অমুসলমানদেরকে 'খায়র' তথা ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়া। প্রত্যেক মুসলমান সাধারণভাবে এবং উল্লেখিত দলটি বিশেষভাবে বিশ্বের সব জাতিকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে মুখেও এবং কর্মের মাধ্যমেও।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো, কল্যাণের প্রতি স্বয়ং মুসলমানদেরকেও আহ্বান করা। অর্থাৎ সব মুসলমানদের সাধারণভাবে এভং উল্লেখিত দল বিশেষভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবে। এ আহ্বান দু' প্রকার। একটি ব্যাপক আহ্বান অর্থাৎ সব মুসলমানকে শরী'আতের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা। দ্বিতীয়টি বিশেষ আহ্বান অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহের মধ্যে কুরআন-সুন্নহের বিশেষজ্ঞ লোক তৈরী করা। (মা'আরিফুল কুরআন)

بَابٌ .... صـ ٤٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১০. ..... ।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الْجَيْشَ الَّذِي يَخْسِفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَعَلَّ فِيهِمُ الْمَكْرَةَ، قَالَ إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ -

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

১৫. নাসর ইবনে আলী .... উম্মু সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী কারীম ﷺ ঐ বাহিনীর কথা আলোচনা করলেন যারা ভূমিতে (জীবন্ত) ধ্বসে যাবে। তখন উম্মু সালামা রাযি. বললেন, তাদের মধ্যে হয়ত এমন লোকও থাকবে যাকে জবরদস্তী করে সেই বাহিনীতে শামিল করা হয়েছিল।রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের নিয়্যাত অনুসারে তাদেরকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করা হবে। হাদীসটি হাসান এ সূত্র গরীব। এ হাদীসটি নাফি' ইবনে জুবায়র 'আইশা রাযি. সূত্রে ও নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আলোচ্য হাদীসটি এখানে সংক্ষেপে আনা হয়েছে। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় হাদীসটির বিস্তারিতরূপ পাওয়া যায় এভাবে।

قوله "ذكر الجيش الذى يخسف بهم" - وفى رواية مسلم من طريق عبيد الله بن القبلية قال - دخل الحارث بن ابى ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فسألاها عن الجيش الذى يخسف به وكان ذالك فى أيام ابن الزبير فقالت قال رسول الله ﷺ يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت يا رسول الله ! فكيف بمن كان كارها ؟ قال: يحسف بهم معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على بنته (رواه مسلم، فى كتاب الفتن واشراط الساعة)

অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের এক আল্লাহর বান্দা বাইতুল্লাহ শরীফে আশ্রয় নিবে, তখন তার শত্রুশক্তি তাকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য এবং বাইতুল্লাহ শরীফের মর্যাদাহানি করার উদ্দেশ্য একদল লোক পাঠাবে। এ বাহিনী যখন পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ পৌছবে, তখন তাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা বাহিনীকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। বাইতুল্লাহ ও বাইতুল্লাহর মধ্যে আশ্রয়গ্রহণকারী লোকটিকে আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করার কারণে এই শাস্তি দেওয়া হবে। এ বক্তব্য শুনে হযরত উম্মে সালমা রাযি. বললেন, ওই বাহিনীতে তো এমন কিছু লোকও থাকবে যারা বাধ্য হয়ে এসেছে, তাদেরকে কেন ধসিয়ে দেওয়া হবে? নবীজী ﷺ তখন উত্তর দিলেন (যেহেতু এরা একটি অপবিত্র ইচ্ছায় সহযোগী না হলেও সহযোগীর 'কারণ' হয়েছে,) তাই তখন তাদেরকে ধসিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু হাশর হবে তাদের নিয়ত অনুপাতে।

কে এই দল ?

(১) কেউ কেউ বলেছেন ঃ এই দল দ্বারা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বাহিনী উদ্দেশ্য। কেননা, তারা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বায়তুল্লাহ শরীফে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনাতে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর একজন হিতাকাংখী ছিলেন এবং যুবাইর রাযি. এর সাথে বন্দী হয়ে ছিলেন, পরবর্তীতে শহীদও হয়েছিলেন– তিনি উক্ত মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেনঃ উক্ত মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর বিরুদ্ধে যে বাহিনী যুদ্ধ করেছিলো তারা এ হাদীসের মিসদাক নয়। তাছাড়া হযরত যুবাইর রাযি. বিরুদ্ধে হামলাকারী বাহিনীটি জমীনের বুকে ধসে যায়নি।

(২) জমহূর উলামায়ে কেরাম বলেন, বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীসে যে ভবিষ্যতবাণী দেওয়া হয়েছে তা এখনও বাস্তবে ঘটেনি। আমরা বিশ্বাস করি, এরূপ কোন ঘটনা একদিন ঘটবেই। (শেষোক্তক মতটিউ অধিক সহীহ বলে অনুমতি হয়।) তাকমিলাহ, আ'উনুল মা'বুদ)

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ صـ ٤٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১১. হাত বা যবানে অথবা মনে মনে হলেও অন্যায় কর্ম প্রতিহত করা

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ، فَقَالَ لِمَرْوَانَ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ ، فَقَالَ يَا فُلَانُ : تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأٰى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْأَيْمَانِ . قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৬. বুনদার .... তারিক ইবনে শিহাব রহ, থেকে বর্ণিত যে, (ঈদে) সালাতের পূর্বে খুৎবা প্রদানের প্রথম রেওয়াজ শুরু করে মারওয়ান। তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দারওয়ানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তুমি সুন্নার বিপরীত আচরণ করছ। মারওয়ান বললঃ হে অমুক, ঐ পদ্ধতি পরিত্যাক্ত হয়ে গেছে।

এরপর আবূ সাঈদ রাযি. বললেন, এই ব্যক্তি (প্রতিবাদকারী ব্যক্তি) তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখবে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে, তাতে যে সমর্থ নয় সে যেন তার যবান দিয়ে তা প্রতিহত করে, তাতেও যে সমর্থ নয় সে যেন মনে মনে তা ঘৃণা করে। আর এ হল দুর্বলতম ঈমান। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সর্বপ্রথম ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা কে দিয়েছে ?

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঈদের নামাযের পূর্বে খোতবা সর্বপ্রথম মারওয়ান দিয়েছে। অথচ মুসান্নাফে আবদির রাযযাক ও ইবনে আবি শাইবার এক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, একাজটি হযরত উমর রাযি. সর্ব প্রথম করেছিলেন। ইবনুল মুনযির বিশুদ্ধ সনদসহ উল্লেখ করেছেন যে, এটি সর্বপ্রথম হযরত উসমান রাযি. শুরু করেছেন। মুসান্নাফে আবদির রাযযাক –এর অন্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, মু'আবিয়া রাযি. এ কাজটির সর্বপ্রথম প্রবর্তক। ইবনুল মুনযির ইবনু সীরীন এর সূত্রে কাজটির প্রথম প্রবর্তক 'যিয়াদ' বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং উক্ত বর্ণনাসমূহে

পারস্পারিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া এসকল বর্ণনার আলোকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা দেওয়া জায়েয। অথচ খোলাফায়ে রাশেদীন ও জমহূরে উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, দুই ঈদের নামায শেষ করার পর দেওয়া সুন্নাত।

উল্লেখিত বিরোধ ও প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ উক্ত বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যালোচনা করেছেন। যথা–

(১) উমর রাযি. এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা বিননূরী বলেন–

وَهُوَ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِرِوَايَةِ الصَّحِيْحَيْنِ

(২) কেউ কেউ বলেন, হযরত উমর রাযি. এর যামানার হেতু লোকজনের সংখ্যা অত্যাধিক হয়ে যায় এবং খুতবার সময় গ্রাম্য লোকেরা খুতবা না শুনে চলে যেতো, তাই এ অবস্থা দেখে হযরত উমর রাযি. খুতবাকে ঈদের নামাযের আগে দিয়ে দেন।

উক্ত দুই মতের মধ্যে প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ।

(৩) উসমান রাযি. এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বর্ণনা সম্পর্কে ইবনু কুদামা বলেন–

وری عن عثمان وابن الزبير الهما فعلاه ولم يصح ذالك عنهما

(৪) কেউ কেউ বলেনঃ দূর-দূরান্ত থেকে আগত লোকজনের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করে হযরত উসমান রাযি. ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা দিয়ে ছিলেন।

(৫) হযরত মু'আবিয়া রাযি. হতে পারে, উসমান রাযি. এর অনুসরণার্থে এমনটি করেছেন। তারপর যিয়াদ যেহেতু মু'আবিয়া রাযি. এর আমলে তাঁর পক্ষ থেকে বসরার গভর্ণর ছিলো, আর মারওয়ান মদীনার গভর্ণর ছিলো, তাই তাঁরা উভয়ে মু'আবিয়া রাযি. এর অনুসরণ করে খুতবাকে ঈদের নামাযের পূর্বে দিয়েছেন।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন থাকে যায় যে, তাহলে তাদের প্রত্যেককে أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ বলা হলো কেন? এর উত্তর হলো, মূলতঃ রাবীগণ তাদের ধারণানুযায়ী এটি বলেছেন, যে রাবী যাঁকে আগে দেখেছেন, তিনি তার সম্পর্কে বলে দিয়েছেন أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ (ফতহুল মুলহিম, নববী)

فَقَامَ رَجُلٌ الخ ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয়, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. একজন বিশিষ্ট জলীলুল কদর সাহাবী। তিনি মারওয়ানের শরী'আত কর্তৃক এ অস্বীকৃত কাজটি অস্বীকার করতে বিলম্বিত করলেন কেন?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা–

(১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. সেখানে প্রথম থেকে উপস্থিত ছিলেন না। পরবর্তীতে তিনি এসেছেন, যখন মারওয়ান ও লোকটির মাঝে বাকবিতণ্ডা চলছিলো।

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. মারওয়ানের কাজটি অস্বীকার করতে যাচ্ছিলেন, আর তখনি ওই ব্যক্তি তা করে ফেললেন। তারপরে আবু সাঈদ খুদরী রাযি. ওই ব্যক্তিকে সহযোগিতা করলেন।

(৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তবে ফেতনা সৃষ্টির ভয়ে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। আর ওই ব্যক্তির গোত্রের লোকজনও সেখানে উপস্থিত ছিলো বিধায় প্রতিবাদ করার সাহস করেছে। (ফতহুল মুলহিম, নববী)

مَنْ رَأَى مُنْكَرًا ঃ ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পুন্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন যুগে যেসব সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই 'মা'রূফ' তথা সৎকর্মের অন্তর্ভূক্ত। 'মা'রূফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্মও সাধারণ্যে পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মা'রূফ' বলা হয়।

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব সৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষনা করেছেন, তা সবই 'মুনকার' এর অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে 'ওয়াজিবাত' (জরুরী জরণীয় কাজ) ও 'মা'আসী' (গুণাহর কাজ) এর পরিবর্তে 'মা'রূফ' ও 'মুনকার' বলার রহস্য সম্ভবত এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। ইজতেহাদী মাস'আলায় শরীয়তের নীতি অনুসারেই বিভিন্নজনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। এসব মাসআলায় নিষেধ ও বাধাদান সঙ্গত নয়। পরিতাপের বিষয়, এহেন বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষার প্রতি ইদানিং উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে, আজকাল ইজতেহাদী মাসআলাকে বিতর্কের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হয় এবং একেই সর্ববৃহৎ পুণ্যের কাজ বলে সাব্যস্ত করা হয়। অথচ এর বিপরীতে সর্বসম্মত গুণাহর কাজে বাধা প্রদানের প্রতি তেমন মনোনিবেশ করা হয় না।

وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ঃ এর মর্মার্থ একাধিক। যথা–

(১) যে ব্যক্তি 'মুনকার' কাজ দেখে কেবল অন্তরে ঘৃণা করে, তাহলে বুঝতে হবে, সে ঈমানদারদের মধ থেকে সবচে দুর্বল সদস্য। কেননা, তার ধর্মীয় অনুভূতি যদি সতেজ হতো, তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করাকেই কেবল যথেষ্ট মনে করতো না, বরং হাত ও মুখ দ্বারা তার প্রতিবাদ করার চেষ্টা-তদবীর সে চালাতো। উক্ত মর্মার্থের অনুকূলে কুরআন মজীদের আয়াত لَا يَخَافُوْنَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ এবং অপর একটি হাদীস– اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ পাওয়া যায়।

(২) ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ এর মর্মার্থ হলো– اَضْعَفُ زَمَنِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ যখন দেখা যাবে যে, 'মুনকার'কে মুখ ও হাত দ্বারা বাধা প্রদানের মত কোন শক্তির বিশেষ কোন তৎপরতা নেই, তখন বুঝে নিতে হবে যে, এই যমানা হচ্ছে, ঈমানের দৃষ্টিকোণে ঈমানদারদের জন্য দুর্বল যামানা। কেননা, ঈমানদাররা যদি শক্তি ও সামর্থবান হতো, তাহলে কেবল আন্তরিক ঘৃণাকেই যথেষ্ট মনে করতো না; বরং পাশাপাশি 'মুনকার'কে মিটিয়ে দেওয়ার ও তৎপরতা চালাতো।

(৩) কতক আলেম এর মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কোন 'মুনকার'কে দেখে কেবল আন্তরিক ঘৃণা করা হচ্ছে ঈমানের সর্বশেষ স্তর। কেননা, কোন মুসলমান যদি 'মুনকার' দেখার পর কমপক্ষে অন্তর দ্বারাও ঘৃণা না করে তাহলে সে কাফের হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(৪) নববী বলেন, এর মর্মার্থ হলো, এ ধরনের ঈমানের প্রতিফলন অধিক উপকারী নয় বরং এ ধরনের ঈমান قَلِيْلُ الْمَنْفَعَةِ তথা কম উপকারী।

بَابُ مِنْهُ.... صـ ٤٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১২. এ বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلٰى حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْمُدْهِنِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ فِى الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِىْ أَسْفَلِهَا يَصْعَدُوْنَ فَيَسْتَقُوْنَ الْمَاءَ فَيَصُبُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ فِىْ أَعْلَاهَا قَالَ الَّذِيْنَ فِىْ أَعْلَاهَا لَا نَدْعُكُمْ تَصْعَدُوْنَ فَتُؤْذُوْنَنَا فَقَالَ الَّذِيْنَ فِىْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَنَسْتَقِىْ فَإِنْ أَخَذُوْا عَلٰى أَيْدِيْهِمْ فَمَنَعُوْهُمْ نَجَوْا جَمِيْعًا وَإِنْ تَرَكُوْهُمْ غَرِقُوْا جَمِيْعًا ـ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

১৭. আহমাদ ইবনে মানী' .... নু'মান ইবনে বাশীর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর হুদূরের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং এ বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শনকারীর উদাহরণ হল এমন এক সম্প্রদায়ের মত, যারা লটারীর মাধ্যমে সমুদ্রের মাঝে জাহাজে নিজ নিজ আসন নির্ধারণ করল। কতকজন তো পেল উপর তলার আসন আর কতক জন পেল নীচ তলার, যারা নীচ তলায় ছিল তারা উপর তলায় চড়ত সেখানে তারা পানি পান করত এবং উপর তলার লোকদের উপরও তা পড়ত। সুতরাং উপর তলার লোকেরা বলল, তোমাদের জন্য আমরা উপরে উঠার সুযোগ ছাড়তে পারি না। কারণ, তোমরা আমাদের কষ্ট দিচ্ছ। নীচের তলার এরা বলল, তা হলে আমরা জাহাজের নীচ দিয়ে ছিদ্র করে নিব এবং পানি লাভ করব।

এমতাবস্থায় উপর তলার লোকরা যদি তাদের হাত জাপটে ধরে এবং এ কাজ থেকে তাদের বিরত রাখে তবে সকলেই মুক্তি পাবে কিন্তু তারা যদি এদেরকে ছেড়ে রাখে তবে সকলেই ডুববে। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْقَائِمُ عَلٰى حُدُوْدِ اللّٰهِ ঃ আল্লাহর সীমানায় দণ্ডায়মান অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমর বিন মারূফ ওয়া নাহি আ'নিল মুনকার –এর কর্তব্য পালন করে।

اَلْمُدْهِنُ فِيْهَا ঃ আল্লাহর সীমানায় উদাসীনতা প্রদর্শনকারীর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন গুণাহর যেসব শাস্তি ও দণ্ডবিধি নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শন করা অথচ তার সামর্থ্য ও শক্তি আছে সেগুলো প্রয়োগ করার এভং আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার আঞ্জাম দেওয়ার মত শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আঞ্জাম না দেওয়া।

مُدَارَاة এবং مُدَاهَنَة এর মধ্যে পার্থক্য ঃ

مُدَاهَنَة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শক্তি-সামর্থ সত্ত্বেও শরি'আত পরিপন্থী কোন কাজ দেখে তা মিটানোর ফিকির না করা এবং লজ্জা অথবা দ্বীনের প্রতি উসাদীনতা কিংবা স্বার্থপরতা বা অন্য কোন লোভ-লালসার কারণে اَمْر بِالْمَعْرُوْف وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা। আর مُدَارَات বলা হয়, কাফেরদের সঙ্গে বাহ্যিক ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিকতা প্রকাশ করা। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, مُدَارَاة হয় দ্বীনের সংরক্ষণের লক্ষ্যে বা সময় ও পরিবেশের স্বার্থে কিংবা যালিমের জুলুম থেকে অব্যাহতি লাভের স্বার্থে। আর مداهنة এর ভিত্তি হলো< ব্যক্তি স্বার্থ ও দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা না থাকা।

হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী রহ. লিখেন–

والفرق بين المداهنة أن المداراة بذل الدينا الصلاح الدنيا أو الدين أو كليهما والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا (تحفة الاحوذى)

অর্থাৎ مُدَارَة এবং مُدَاهَنَة এর পার্থক্য হলো مُدَارَاة বলা হয় দুনিয়া বা দ্বীন অথবা উভয়ের স্বার্থে দুনিয়াকে কাজে লাগানো আর مُدَاهَنَة বলা নিছক দুণিয়ার স্বার্থে দুনিয়াকে কাজে লাগানো আর مُدَاهَنَة বলা নিছক দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীনকে ত্যাগ করা।

اِسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ ঃ অর্থাৎ তারা নৌকায় অবস্থানের বিষয়টি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে নিয়েছে। নৌকা কিংবা জাহাজের প্রথম তলা এক স্তরের যাত্রীর জন্য, যারা হবে বিশেষ শ্রেণীর। আর নীচের তলা সাধারণ শ্রেণীর যাত্রীর জন্য বরাদ্দ কে কোন শ্রেণীর যাত্রী, তা নির্ধারণের জন্য তারা লটারীর ব্যবস্থা করেছে। বলা বাহুল্য এখানে লটারির কয়েকটি قَيْد اِتِّفَاقِى তথা দৈবক্রমে সংঘটিত বিষয়।

بَابُ مَاجَاءَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ص ٤٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩. জালিম কর্তৃপক্ষের সামনে ন্যায়ের কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১৮. কাসিম ইবনে দীনার কূফী .... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, সব চেয়ে বড় জিগাদ হল অত্যাচারী কর্তৃপক্ষের নামনে ন্যায় কথা বলা। এ বিষয়ে আবূ উমামা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি এ সূত্রে হাসান–গরীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কাফের দুশমনের মোকাবেলায় লড়াই করলে সেক্ষেত্রে জয়-পরাজয় উভয়টিরই সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা উচ্চারণ করতে গেলে নিজের প্রাণনাশেরই সম্ভাবনাই অধিক থাকে অথবা অন্তত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। সম্ভবত এই জন্য একে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। (তোহফাহ)

كَلِمَةُ عَدلٍ এক বর্ণনায় এসেছে–

وَالْمُرَادُ بِالْكَلِمَةِ مَا أَفَادَا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ لَفْظٍ أَوْ فِي مَعْنَاهُ كَكِتَابَةٍ وَغَيْرِهَا

অর্থাৎ এখানে كلمة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা আমর বিল মা'রূফ অথবা নাহি আনিল মুনকারকে বুঝায়। সেটি শব্দ কিংবা লেখনী ইত্যাদি যা শব্দের তাৎপর্য বুঝায় যে কোনভাবে হতে পারে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي سُؤَالِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاثًا فِي أُمَّتِهِ ص ٤٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪. এই উম্মতের বিষয়ে নবী কারীম সা. এর তিনটি প্রার্থক্য

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ خباب بْنِ الْاَرَتِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةً فَأَطَالَهَا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا ؟ قَالَ : أَجَلْ إِنَّهَا صَلَاةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ إِنِّي سَأَلْتُ اللّٰهَ فِيهَا ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ .

১৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার .... আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বান ইবনে আরত তার পিতা খাব্বাব ইবনে সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমন সালাত আজ আদায় করলে যা আর কখনও করেননি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই। এ

হল আশা ও ভয়ের সালাত। এতে আমি আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছিলাম। আমাকে দুটি বিয়ষ দিয়ে দিয়েছেন আর একটি বিষয়ে মানা করে দিয়েছেন। আমি তার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে হালাক করে না দেন। আমার এই প্রার্থনা মানা করে দেন। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। এ বিষয়ে সা'দ এবং ইবনে উমার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উক্ত হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে দুটি জিনিস থেকে চির নিাপ করে দিয়েছেন। প্রথমটি হলো, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ যা সমষ্টিগতভাবে সকল মুসলমানকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। দ্বিতীয়টি হলো, দুনিয়ার তাবৎ কুফরি শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েও যদি এই প্রচেষ্টা চালায় যে, মুসলমানের ধর্মীয় ও ঐক্য শক্তি সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দিবে এবং মুসলমানদের প্রতিটি এলাকা তাদের আয়ত্বে নিয়ে নিবে, তাহলে এটা সম্পূর্ণভাবে তারা পারবে না। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, যদি মুসলমানদের পারস্পরিক হানাহানির সুযোগে কোথাও কোন রাষ্ট্রে অমুসলিম শক্তি জুলুম-নিপীড়ন চালায় কিংবা রাজনৈতিক ফায়দা লুটে ন্যায়, ফলে মুসলিম শক্তি যদি দুর্বল হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতি ছাড়া অন্য কোন পরিস্থিতি দুশমন মুসলমানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে না। (তুহফাহ)

إِنَّهَا صَلٰوةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ: অর্থাৎ এই নামাযের মাঝে আমি আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করছিলাম, যেগুলো কবুল হওয়ার আশা ছিলো আবার কবুল না হওয়ারও ভয় ছিলো। তাই অন্যান্য নামায যেরকম শুধু বান্দার বন্দেগী ও মা'বুদের মা'বুদিয়্যাত প্রকাশের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আজকের এই নামাযটি সেসব নামাযের মত গতানুতিক কোন নামায ছিলো না বরং আজকের নামাযে কিছু আশা ও ছিলো, আবার কিছুটা ভয়ও ছিলো। আশা ও আশঙ্কার মাঝে দোল খেতে খেতে নামায বিলম্বিত হয়ে গেলো। (আল কাওকাব)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ زَوَى الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِى سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِىَ لِى مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَصْفَرَ وَإِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى لِأُمَّتِى أَنْ لَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّى أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا حَتّٰى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا . قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২০. কুতায়বা ....ছাওরান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য যমীন সংকোচিত করে দেন। এতে আমি এর পূর্ব-পশ্চিম সব দিক প্রত্যক্ষ করি। পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য সংকোচিত করে দেওয়া হয় আমার উম্মতের সাম্রাজ্য অচিরেই ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আমাকে লাল (স্বর্ণ) ও সাদা (রৌপ্য) উভয় খাযানাই প্রদান করা হয়। আমি আমার প্রভুর নিকট আমার উম্মতের জন্য দু'আ করেছিলাম তিনি যেন তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে হালাক করে না দেন, তিনি যেন এমন কোন বিজাতি শত্রু তাদের উপর

কর্তৃত্বাধিকারী করে না দেন যারা তাদের সমূলে উৎপাটিত করে দিবে। আমার রব বললেন ঃ হে মুহাম্মদ, আমি যখন কোন ফায়সালা করি তখন তা রদ হওয়ার নয়। আমি আপনার উম্মতের বিষয়ে আপনাকে দিয়ে দিলাম যে, তাদেরকে আমি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে হালাক করে দিব না, বিজাতি শত্রুকে তাদের উপর এমন কর্তৃত্বাধিকারী করব না যে তাদের সমূলে উৎখাত করে দিতে পারবে যদিও সব দিক থেকেই সকলেই তারা একত্রিত হয়ে আসে। তবে তাদের কতক কতককে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে বন্দী করবে। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে একত্র করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উপস্থিত করেছেন। আয়নাতে যেমনিভাবে বিশাল বিশাল দৃশ্য ও দেখা যায়। তেমনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত তথা পূরা পৃথিবী রাসূল ﷺ দেখেছেন। এ দৃশ্য অবলোকন করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার উম্মত অচিরেই ওই বিশ্ব ভূ খণ্ডে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে যা আমাকে একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন– مَا زُوِىَ لَهَا مِنْهَا এর মধ্যে مِنْ تَبْعِيْضِيَّة এই জন্য দেখা যায়, মুসলমানদের বাদশাহী পুরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আল্লামা খাত্তাবী প্রমুখ বলেন, مِنْ تَبْعِيْضِيَّه হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। বরং এখানে مِنْ এসেছে পূর্ববর্তী জুমলা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য। আর পূর্ববর্তী জুমলার ভাষ্য হলো, পুরা দুনিয়া একত্রিত করে আমাকে দেখানো হয়েছে। নবীজী ﷺ পূরা দুনিয়াকে দেখেছেন। তবে এ ব্যাখ্যার আলোকে প্রশ্ন হয় যে, তাহলে পুরা দুনিয়াতে মুসলমানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি কেন? এর জবাবে মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেন, إِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِى الْاَرْضَ এর মধ্যে اَرْض দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اَرْض اِسْلَام তথা ইসলামী ভূখণ্ড। আর مِنْهَا এর ضَمِير এর اَرْض اِسْلَام হলো مَرْجَع

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন–

لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ لَمْ يَبْلُغْ مُلْكُهَا اِلٰى جَمِيْعِ الْاَرْضِ حَتّٰى الْآنَ اَنْ لَا يَقَعَ ذَالِكَ فِى الْمُسْتَقْبَلِ فَقَدْ يُوْخَذُ مِنَ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيْحَةِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَصِيْرُ سَائِدًا عَلٰى جَمِيْعِ بُقَاعِ الْأَرْضِ فِىْ آخِرِ الزَّمَانِ .

অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ এখন পর্যন্ত গোটা বিশ্বের ক্ষমতা নিজের আয়াত্তে আনতে পারে নি; এর দ্বারা একথা বুঝায় না যে, ভবিষ্যতেও পারবে না। বরং বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, শেষ যামানায় গোটা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। (উক্ত হাদীসে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং এখানে مِن কে مِنْ تَبْعِيْضه বলার প্রয়োজন নেই। اَرْض দ্বারা اَرْضُ الْاِسْلَام উদ্দেশ্য নেওয়ারও প্রয়োজন নেই।) (তাকমিলাহ)

أُعْطِيْتُ الْكَنْزَ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ লাল ও সাদা খাজানা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বর্ণ-রৌপ্যের খাজানা। এ দুই খাজানা দ্বারা কিসরা ও কাইসারের বাদশাহির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা ওই যুগে পারস্যে সোনার মুদ্রার এবং রূমে রূপার মুদ্রার প্রচলন ছিলো।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْفِتْنَةِ ص ـ ٤٠

(كَيْفَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ فِى الْفِتْنَةِ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫. যে ব্যক্তি ফিতনার যুগে থাকবে।

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى الْقَزَّازُ الْبَصْرِىُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ طَاوُوْسٍ عَنْ أُمِّ مَلِكٍ الْبَهْزِيَّةِ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا ؟ قَالَ رَجُلٌ فِى

مَاشِيَتِهٖ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا وَيَعْبُدُ رَبَّهٗ ، وَرَجُلٌ اٰخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهٖ يُخِيْفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيْفُوْنَهٗ ـ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ اُمِّ مُبَشِّرٍ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ وَرَاهُ اللَّيْثُ بْنُ أَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُوْسٍ عَنْ اُمِّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

২১. ইমরান ইবনে মূসা কাযযায বাসরী .... উম্মু মালিক বাহযিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তা অত্যন্ত নিকটবর্তী বলে বর্ণনা দেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এতদপ্রেক্ষিতে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে হবেন ? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি হল যে তার পশুপালের মাঝে অবস্থান করবে এবং এগুলোর হক আদায় করবে আর তার রবের ইবাদত করবে। আরেক জন হল সেই ব্যক্তি যে তার ঘোড়ার মাথা ধরে থাকবে এবং শত্রুদের ভয় দেখাবে আর তারাও তাকে ভয় দেখাবে।

এ বিষয়ে উম্ম মুবাশশির, আবূ সাঈদ খুদরী এবং ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি এ সূত্রে গারীব। লায়ছ ইবনে আবূ সুলায়ম এটিকে তাউস –উম্মু মালিক বাহযিয়্যা রাযি. এর সূত্রে নবী কারীম ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উক্ত ফেতনার বর্ণনা দেওয়ার সময় বললেন, ফেতনাটি অচিরেই আসবে। আল্লামা তাইয়্যিবী এর মর্মার্থে বলেন, রাসূল ﷺ ফেতনাটির বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন ভঙ্গি ইখতিয়ার করেছেন যে, কেমন যেন তা অত্যাসন্ন। ফেতনাটির আবির্ভাব অবশ্যই ঘটবে বিধায় তাঁর উপস্থাপনা-কৌশল এমনটি ছিলো।

قَالَ رَجُلٌ فِىْ مَا شِيَتِهٖ ঃ অর্থাৎ যখন মুসলমানরা পরস্পর খুনাখুনিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন ওই ব্যকিতই সফল যে ব্যক্তি ফেতনার অনুযাঙ্গিক বিষয় তেকে নিজেকে মুক্ত রেখে নিজের কাজ-কারবারে মশগুল থাকবে। নিজেকে নিয়ে এমনভাবে ব্যস্ত থাকবে যে, তার কাজ-কারবারে শরী'আত কর্তৃক আরোপিত হকসমূহ সঠিকভাবে আদায় করবে এবং আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে।

رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهٖ ঃ অর্থ যে ব্যক্তি উক্ত ফেতনা-ফাসাদে নিজেকে না জড়িয়ে এবং নিজেদের মধ্যে দলাদলি না করে তার পরিবর্তে ওই সকল কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে যারা বাস্তবেই ইসলাম ও মুসলমানের প্রকাশ্য দুশমন। সে ব্যক্তি সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসাবে বিবেচ্য হবে। কেননা এর মাধ্যমে সে যেমনিভাবে প্রকৃত দুশমনের সঙ্গে জিহাদ করার সুযোগ পাবে অনুরূপভাবে নিজেকে ফেতনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি মুসলমানদের প্রকৃত দুশমনকে এর প্রতিও সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

بَابٌ .....صــ ٤٠

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬. ....

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ـ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُوْسٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سِيْمِيْنَ كُوْشَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبُ قَتْلَاهَا فِى النَّارِ اَللِّسَانُ فِيْهَا أَشَدُّ مِنَ السَّيْفِ ـ قَالَ أَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ لَا يُعْرَفُ لِزِيَادِ بْنِ سِيْمِيْنَ كُوْشَ غَيْرُ

هٰذَا الْحَدِيْثِ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ فَرَفَعَهُ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ فَأَوْقَفَهُ ـ

২২. আব্দুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া জুমাহী .... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন ফিত্না হবে য আরবদেরকে ধ্বংস গ্রাস করে নিবে। এ সময়ে যারা নিহত হবে তারা হবে জাহান্নামী। সে সময় তরবারী অপেক্ষাও মারাত্মক হবে কথা। এ হাদীসটি গারীব।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) রহ. কে বলতে শুনেছি যে, যিয়াদ ইবনে সীমীন গুশ-এর এ রিওয়ায়াতটি ছাড়া আর কোন রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ. এটিকে লায়ছ রহ. এর বরাতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন আর হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহ. এটিকে লায়ছ রহ. থেকে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ফেতনা দ্বারা কোন ফেতনা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে একাধিক বক্তব্য রয়েছে।

(১) আল্লামা তায়্যিবী ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেনঃ এ ফেতনা দ্বারা উদ্দেশ্য আলী রাযি. বনাম মু'আবিয়া রাযি. এর মধ্যে সৃষ্ট পরস্পর লড়াই। আর হাদীসের ভাষ্য قَتْلَاهَا فِى النَّارِ বলা হয়েছে زَجْر وَتَوْبِيْخ তথা সতর্ক ও সাবধান করার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু শরহুত তাইয়্যিবীর টিকাকার উক্ত উক্তিকে দূরবর্তী সম্ভাবনা হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন–

اقول: هذا الاحتمال بعيد لا يساعده سياق الحديث لأنه أخبر فى صدر الحديث أن قتلى هذه الفتنة فى النار وجمهور أهل السنة على عدم الحكم على قتلى حرب صفين بأنهم فى النار ـ

'অর্থাৎ আমি বলি ঃ এই সম্ভাবনা অনেক দূরের। হাদীসের ভাষ্য এ সম্ভাবনাকে সমর্থন করে না। কেননা হাদীসের শুরুর দিকে বলা হয়েছে, এই ফিতনায় যারা নিহত হবে তারা জাহান্নামী। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ সদস্য সিফফীন যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের জাহান্নামী বলেন না।'

(২) শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. بذل المجهود এর হাশিয়াতে লিখেন–

حملها عامة المحشين كأبى داؤد والترمذى القتال بين على ومعاوية رض الله عنهما ـ وسكت عنه محشى ابن ماجه وكذا حكاها القارى وبسط الكلام وقال : لا يجوز حمله على هذه الفتنة ـ

وهذا فى الكوكب الدرى أن الأسلم إنها لم تعلم أيها هى (طيى مرقاة بذل المجهود)

অর্থাৎ 'আমি টিকাকারগণ যেমন আবু দাউদ ও তিরমিযীর টিকাকারগণ উক্ত ফিতনাকে আলী রাযি. ও মু'আবিয়া রাযি. এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের অর্থে নিয়েছেন। ইবনু মাজাহ্র টীকাকার এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অনুরূপভাবে মোল্লা আলী কারী এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তিনি বলেছেন, উক্ত ফিতনার (সিফফীন যুদ্ধের) অর্থে হাদীসটিকে নেওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে আল কাওকাবুদ দুররারীতে এসেছে, নিরাপদযোগ্য কথা হলো, জানা নেই, ও টি কোন ফেতনা।

(৩) হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, আমার মতে উক্ত ফেতনা দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সংঘটিত পারস্পরিক যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয় বরং এর দ্বারা অন্য বড় কোন ফেতনা উদ্দেশ্য হবে। (আল মিছকুয্যাকী)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ ..صــ٤١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭. আমানত উঠিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ـ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ ـ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُمِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفَطَتْ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَئٌ ، ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهَا عَلٰى رِجْلِهِ قَالَ : فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ لَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ حَتّٰى يُقَالَ إِنَّ فِى بَنِىْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِيْنًا وَحَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ وَمَا فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ قَالَ : وَلَقَدْ أَتٰى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِىْ أَيُّكُمْ بَايَعْتُ فِيْهِ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلٰى دِيْنِهِ وَلَئِنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلٰى سَاعِيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا ـ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৩. হান্নাদ .... হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দু'টো হাদীস বলেছিলেন। একটি তো দেখেছি আরেকটির জন্য আমি অপেক্ষা করছি। তিনি আমাদের বলেছিলেন, আমানত মানুষের অন্তমূলে নাযিল হয়। এরপর কুরআন নাযিল হয় আর তারা কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে আবার সুন্না সম্পর্কেও বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়বে আর তার অন্তর থেকে আমানত কবয করে নেওয়া হবে। এতে এর চিহ্ন থেকে যাবে ফোটার মত। এরপর সে আবার নিদ্রা যাবে আর তার অন্তর থেকে আমানত কবয করে নেওয়া হবে। এতে এর আছর থেকে যাবে একটা ফোস্‌কার মত। যেমন কোন পাথরের টুকরা যদি তোমার পায়ে ঘসাও আর যখন এতে ফোসকা পড়ে যায় তখন তুমি এটিকে ফোলা দেখতে পাও। অথচ এর ভেতর কিছুই নেই।

তারপর তিনি একটি কংকর নিয়ে এটি তার পায়ে ঘসে দেখালেন, তিনি আরো বলেন, লোকেরা বিকি-কিনি করবে কিন্তু হয়ত একজনও এমন হবে না যে আমানতদারী করছে, এমনকি বলা হবে অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছে। এমন অবস্থা হবে যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে সে কত সাহসী, কত হুঁশিয়ার কত বুদ্ধিমান অথচ তার অন্তরে রাইয়ের দানা পরিমানও ঈমান নাই।

(হুযাইফা রাযি.) বলেন, এমক এক সময় আমার উপর অতিবাহিত হয়েছে যে, কার সঙ্গে আমি ক্রয়-বিক্রয় করছি সে বিষয়ে কোন পরওয়া করতাম না। কারণ, সে যদি মুসলিম হত তবে তার দীনি দায়িত্ববোধই তা আমাকে ফিরিয়ে দিত। আর যদি ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হত তবে তার প্রশাসকই আমাকে তা ফিরিয়ে দিত। কিন্তু আজ অমুক ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের কারো সাথে আমি ক্রয়-বিক্রয় করার মত নই। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আমানের উদ্দেশ্য ঃ এ প্রসঙ্গে অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। যথা–

(১) আমানত দ্বারা তার প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কারো হক অথবা কারো মালিকানায় খেয়ানত না করা।

(২) আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য শরী'আতের যাবতীয় কর্তব্য, কর্ম ও বিধান। যেমন শরী'আতের ফরজ কার্যসমূহ, সতীত্বে হেফাজত, ধন-সম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, নামায, যাকাত, রোজা হজ্ব ইত্যাদি।

(৩) আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমান যা শরী'আতের যাবতীয় আহকামের মূল ভিত্তি প্রস্তর স্বরূপ। আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে রয়েছে وَمَا فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ দ্বারাও এটা বুঝা যায়।

(৪) হাদীসে উল্লেখিত وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ দ্বারা বুঝা যায় যে, إِنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِى جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ এর মধ্যে 'আমানত' দ্বারা আমানতের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাই উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যার আলোকে হাদীসের শেষ বাক্যে وَمَا فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ "আমানতকে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা কারণ হলো, আমানত আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

(৫) মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, এখানে প্রবেশযোগ্য জিনিস হলো ঈমান। আর প্রচলিত 'আমানত' হলো ঈমানের অংশ। ঈমানের পূর্ণতার জন্য যা অত্যাবশ্যক।

(৬) তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরী'আতের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের সমষ্টিই আমানত।

(৭) তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে বলা হয়েছে, আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে. শরী'আতের বিধানবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতে চিরস্থায়ী নেয়ামত এবং বি. ধিতা অথবা ত্রুটি করলে জাহান্নামের আযাব প্রতিশ্রুত।

(৮) কেউ কেউ বলেন, আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খোদায়ী বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল।

(৯) আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, 'আমানত' আরবী শব্দ। যার অর্থ হলো কারো উপর কোন বিষয়ে ভরসা করা। সুতরাং প্রত্যেক ওই জিনিস, যা অন্যের নিকট এই মর্মে সোর্পদ করা হয় যে, সোপর্দকারী তার উপর এই ভরসা করে যে, সে এর হক পূর্ণরূপে আদায় করবে– একেই ইসলামী শরী'আতে বলা হয় আমানত। অতএব, কেউ যদি কোন কাজ, জিনিস কিংবা অর্থকড়ি কারো নিকট এ ভরসাসহ সোপর্দ করে যে, সে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজ দায়িত্ব পুরিপূর্ণভাবে আদায় করবে, এতে কোন প্রকার গাফলতি করবে না। তাহলে এটাকেও আমানত বলা হবে।

ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ ঃ অর্থাৎ জন্মগতভাবে মানুষের তবিয়তে আমানত প্রোথিত ছিলো, অতঃপর এই আমানতের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করলেন। فَاجْتَمَعَ الطَّبْعُ وَالشَّرْعُ فِى حِفْظِهَا

فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَمِلُوا مِنَ السُّنَّةِ ঃ অর্থাৎ সর্বপ্রথম ঈমানের নূর মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি হলো এবং স্থান করে নিলো। এর মাধ্যমে সে কুরআন-সুন্নাহের উপর আমল করার পথ আলোকিত করলো। তারপর ঈমানের এ নূরের মাধ্যমেই মানুষ ওই সব শিক্ষা, আহকাম ও মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলো, যেগুলো কুরআন-হাদীস থেকে চয়ন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 'আমানত' শব্দটি যদি তার প্রসিদ্ধ অর্থ তা খেয়ানতের বিপরীতে আসে, তাহলে মর্মার্থ দাঁড়ায়, কুরআন-সুন্নাহ থেকে আমানত সম্পর্কে নিশ্চিত ও মজবুত বিধান জেনেছে।

يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ ঃ এর দ্বারা হাকীকী ঘুমও উদ্দেশ্য হতে পারে অথবা উদাসীনতার অর্থে রূপক (مَجَازًا) ভাবেও হতে পারে।

فَيَظَلُّ أَثَرُ هَا مِثْلُ الْوَكْتِ ঃ আমানতের নিশানা وَكْت এর নিসানার মত হয়ে যাবে। وَكْت বলা হয় ওই দাগকে যা কোন কিছুর রঙের মত করে দৃশ্যমান হয়। যেমন সাদা জিনিসের মধ্যে কোন দাগ দৃশ্যমান হওয়া। হাদীসের এ অংশের সারমর্ম হলো, দ্বীন ও শরী'আত থেকে গাফেল হয়ে যাওয়ার কারণে এবং সমূহ গুণাহতে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে অন্তরের মধ্যে ঈমানের নূর নিস্প্রভ হয়ে পড়বে। আর এই গাফেল ব্যক্তি যখন নিজের ঈমানকে তলিয়ে দেখবে, অনুভূত হবে যে, তার অন্তরে আমানতের নূর কেবল একটি দাগ সমপরিমাণ আছে। এছাড়া আর নেই।

ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً ঃ সে যখন দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে পড়বে। উদ্দেশ্য হলো দ্বীন-শরী'আতের ব্যাপারে গাফলের নিদ্রা যখন তার আরো গাঢ় হবে এবং আরো অধিক গুণাহর লিপ্ত হবে, তখন ঈমানের নূরের অবশিষ্ট অংশও তার অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে। তখন অন্তরে ঈমান শুধু مجل এর সূরতের ন্যায় অবশিষ্ট থাকবে। مجل বলা হয় ফোসকা পড়ে যাওয়াকে কিংবা অধিক কাজ করার কারণে চামড়া ও গোশতের মাঝে পানি সৃষ্টি হওয়া। সুতরাং মর্ম দাঁড়ালো, যেমনিভাবে মানকদেহে ফোসকা পড়ে , সেই ফোসকা দৃশ্যতঃ যদিও টমটসে পানি ভর্তি মনে হয়, মূলত, কিন্তু তার ভেতরে থাকে দুর্গন্ধ ও নাপাক পানি। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির অন্তর থেকে আমানতের অবশিষ্ট চিহ্নটুকুও মুছে যাবে, দৃশ্যতঃ যদিও তাকে সুস্থ, সুঠাম ও কর্মঠ মনে হবে, মূলতঃ সে সফলতা ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে চরম হতাশায় নিমজ্জিত হবে। উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে বুঝা গেলো, وكت এবং مجل ঈমানের নূরের ওই অংশের দৃষ্টান্তস্বরূপ যা অন্তরে নিভু নিভু ভাবে অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এ দু'টির সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে পারতপক্ষে এ দিকে ইঙ্গিত করা হলো যে, এ ধরনের যুগে ইসলামের নাম যারা নিবে, ঈমানের ভিত যদিও তাদের নিতান্ত দুর্বল হবে, কিন্তু একেবারে ঈমানহারা হয়ে যাবে না। বরং অত্যন্ত ধীম গতিতে হলেও তাদের ঈমান যৎসামান্য কাজ হলেও করবে।

حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ ঃ এখানে আসল ঈমানের نَفِى ও উদ্দেশ্য হতে পারে কিংবা كَمَال اِيْمَان এর نَفِى ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا فُلَانًا ঃ হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন, যেহেতু নবী যুগের পর আমানতের মধ্যে কিছুটা শীথিলতা দেখা দিলো, খেয়ানতের প্রকাশ শুরু হলো< তাই আমি হাতে-গোনা নির্দিষ্ট কিছু মানুষের সঙ্গে কাজ-কারবার করি যাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করি। হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাতের চল্লিশ দিন পরে ছত্রিশ হিজরীর শুরুলগ্নে হযরত হুযাইফা রাযি. ইনতেকাল করেন। সুতরাং তিনি যুগের কিছুটা পরিবর্তন দেখেছেন। হাদীসে إِلَّا فُلَانًا فُلَانًا দ্বারা উদ্দেশ্য قَلِيْلُ الْأَفْرَادِ (তুহফাহ)

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. বলেনঃ হাদীসের ভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যুগের সকল মানুষ খেয়ানত কারী হয়ে গেছে। বরং উদ্দেশ্য হলো, মানুষ খেয়ানতের লিপ্ত হওয়া আরম্ভ করে দিয়েছে। যদিও সেই খেয়ানত পরবর্তী যামানার মত এত অধিক ছিলো না। তাই নবী যুগের মত নির্দ্বিধায় প্রত্যেকের সঙ্গে লেন-দেন করতেন না। শুধু নির্ভরযোগ্য লোকদের সঙ্গে লেনদেন করতেন, যাদের আমানতদারি স্পষ্ট ছিলো। এই ব্যাখ্যার আলোকে أَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ এ কথারও সঠিক অর্থ ফোটে উঠে। কেননা আমানত উঠে যাওয়ার বিষয়টি হাদীসে যেভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেভাবে পূর্ণভাবে এখনও প্রকাশ পায়নি।

এখানে প্রশ্ন হয়, হাদীসের প্রথমাংশে হযরত হুযাইফা রাযি. বলেছেন, 'দ্বিতীয় কথাটি আমি দেখিনি; বরং তা দেখার অপেক্ষায় আছি।' তাহলে যুগের মানুষের সঙ্গে লেনদেন ত্যাগ করলেন কিভাবে ?

এর উত্তরে বলা হবে যে, দ্বিতীয় কথাটির নিদর্শন প্রকাশ হওয়া শুরু হয়ে গেলেও 'পূর্ণতায়' পৌছতে তিনি দেখেননি। তাই তিনি সকল মানুষের সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করেননি। বরং গ্রহণযোগ্যদের সঙ্গে লেন-দেন করতেন।

بَابُ مَاجَاءَ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ صـ٤١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮. তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অবলম্বন করবে।

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِيْ سِنَانٍ عَنْ أَبِيْ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلٰى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ

لِلْمُشْرِكِيْنَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : سُبْحَانَ اللّٰهِ هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسٰى : اِجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَأَبُوْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ اِسْمُهُ الْحٰرِثُ بْنُ عَوْفٍ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ .

২৪. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযুমী .... আবূ ওয়াকিদ লায়ছী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুনায়ন অভিযানে বের হন তখন মুশরিকদের একটি বৃক্ষের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। একে "যাত আনওয়াত" বলা হত। তারা এতে তাদের অস্ত্র-সস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এদের যেমন 'যাত আনওয়াত' আছে আমাদের জন্যও একটা 'যাত আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন।

নবী কারীম ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ! এতো মূসা আ. এর কওমের কথার মত হল যে, এদের (কাফিরদের) যেমন অনেক ইলাহ আছে আমাদের জন্যও ইলাহ বানিয়ে দাও। যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নতি অবলম্বন করবে। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ। সাহাবী আবূ ওয়াকিদ লায়ছী রাযি. এর নাম হল হারিস ইবনে 'আওফ। এ বিষয়ে আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

أَنْوَاطٌ শব্দটি نَوْطٌ এর বহুবচন। যেটি মূলত মাসদার। অর্থ ঝুলিয়ে রাখা। যেহেতু উক্ত বৃক্ষের উপর অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা হতো, তাই তার নাম ذَاتُ أَنْوَاطٍ হয়ে যায়, এটা উক্ত বৃক্ষের সবিশেষ নাম ছিলো।

لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ঃ অর্থাৎ অধঃপতনের যুগে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ইহুদী-খ্রিস্টানের অনুকরণ করার প্রবণতা পুনরায় দেখা দিবে। ইহুদী-খ্রিস্টানদের অনুসরণ, যা এক সময় অত্যন্ত ঘৃণারবস্তু ছিলো, তা প্রিয়বস্তুতে রূপান্তরিত হবে। এ বাণীটি নবীজী ﷺ এর একটি স্পষ্ট মু'জিযা। আজকের যুগে তা পরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত হচ্ছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَلَامِ السِّبَاعِ صـ٤١

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯. হিংস্র প্রাণীর কথোপকথন

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُوْ نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَكَلَّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَحَتّٰى تَكَلَّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

২৫. সুফইয়ান ইবনে ওয়াকী ....আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, যতদিন না হিংস্রপ্রাণীরাও মানুষের সাথে কথোপকথন করছে

ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এমনকি তখন একজনের লাঠির মাথা, জুতার ফিতাও তার সাথে কথা বলবে এবং স্বীয় উরুদেশ বলে দেবে তার পরিবার তার অনুপস্থিতিতে কি করেছে। এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ। কাসিম ইবনে ফাযল রহ. এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না, কাসিম ইবনুল ফাযল হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে নির্ভরযোগ্য ও নির্দোষ। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এবং আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. ও তাকে ছিকা বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জন্তুদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে। যে ভাষাতে তারা নিজেদের মাঝে ভাব-বিনিময় করে। তাদের সেই ভাষা আমরা শুনতে পেলেও বুঝতে পারি না। কিন্তু তাই বলে তাদের ভাষা একেবারে বুঝা অসম্ভব যে এমন নয়। বরং বুঝতে না পারা হলো স্বাভাবিক রীতি ও নিয়ম। কেয়ামতের পূর্বে এ স্বাভাবিক নিয়মের পর্দা ধীরে ধীরে উঠে যাবে। এ ধরনের আরো অনেক দুর্বোধ্য বিয়ষ মানুষের নিকট 'সহজ' হয়ে ধরা দিবে। পশু-পাখি বোধগম্য কথা বলবে, এর তাৎপর্য কি ? এ ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা করার সময় এখনও আসেনি। হতে পারে বাস্তবেই তারা অর্থবোধক কথা বলবে। অথবা হতে পারে, তাদের বুনির সঙ্গে কোন কৃত্রিম কথা-বার্তা ফিট করে দেওয়া হবে কিংবা হতে পারে, মানুষ এত বেশী উৎকর্ষ সাধন করবে, নিজেদের মেধা ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে পশু-পাখির কথাও আয়াত্ত করতে সক্ষম হবে। এ সবই সম্ভাবনা। এসব সম্ভাবনার যে কোনটি বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহই জানেন, তাদের কথা বুঝার পদ্ধতি কি হবে ? আজকের বিজ্ঞানের যুগে এজাতীয় হাদীস বুঝা খুব কঠিন নয়। যেমন উদ্ভিদজগতকে এক সময় প্রাণহীন মনে করা হতো, আর বর্তমানে তা প্রাণীজগতের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। তাদের খাদ্য, সুস্থতা, অসুস্থতাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মোবাইল টেলিফোন, ওয়ারলেস –যেগুলো জড়বস্তু। অথচ এসব জড়বস্তুর মাধ্যমেই মানুষ নিজেদের ভাব আদান-প্রদান করতে পারে। সুতরাং কিয়ামতের পূর্বে জুতার ফিতা কথা বলবে, চাবুকের বেশমগুচ্ছ কথা বলবে অথবা পশু-পাখি কথা বলবে –এসব বিষয় আজ মানুষের অবোধগোম্য ও অবিশ্বাসযোগ্য বিষয় নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اِنْشِقَاقِ الْقَمَرِ صـ٤١

অনুচ্ছেদ ঃ ২০. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: اِنْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِشْهَدُوْا ـ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَنَسٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

২৬. মাহমূদ ইবনে গায়লান .... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, আনাস এবং জুবাইর ইবনে মুতইম রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'জিযার কারণ ঃ বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস–

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمْ اِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ (رواه البخارى فى باب علامات النبوة وباب انشقاق القمر)

এর দ্বারা বুঝা যায়, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযাটি মক্কার কাফেরদের আবদারের কারণে সংঘটিত হয়েছে। দুররে মানসূরের কারণে সংঘটিত হয়েছে। দুররে মানসূরের বর্ণনার সে-সব কাফেরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বর্ণনাটি দুর্বল। যে বর্ণনার সারকথা হলো, হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় মিনাতে যেতেন। একবার সেখানে ওলীদ ইবনে মুগীরা, আবু জাহল গং একসাথ হয়েছিলো। তারা রাসূল ﷺ এর নিকট তাঁর নবুওয়াতের নিশানা তলব করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন এবং তাদেরকে বললেনঃ আসমানের প্রতি তাকাও। তারা আসমানের প্রতি তাকালো। আর তখনি দেখতে পেলো, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক খন্ড পশ্চিম দিকে অপর খণ্ড পূর্ব দিকে চলে গেছে। মাঝখানে পাহাড় অন্তরায় হয়ে রয়েছে। সকলেই যখন ভালোভাবে মু'জিযাটি দেখা শেষ করলো। তখনি চাঁদ পুনরায় আগের মত একসাথ হয়ে গেলো, কাফেররা তখন বলাবলি শুরু করলো, মুহাম্মদ চাঁদের উপর কিংবা আমাদের উপর যাদু করে দিয়েছে। উক্ত ঘটনা হরো চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযা এবং তার কারণ ও প্রেক্ষাপট। (তাকমিলা, তাফসীরে উসমানী)

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযার প্রমাণ

মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট তাঁর রেসালাতের স্বপক্ষে কোন নিদর্শন চাইরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা পকাশ করেন। এ মু'জিযার প্রমাণ কুরআন মজীদে সূরায়ে ক্বামাতের শুরুতেই (وانشق القمر) আছে এবং অনেক সহীহ হাদীসেও আছে। ইমাম তহাবী ও ইবনে কাসীর এ সম্পর্কিত সকল বর্ণনাকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এ মু'জিযার বাস্তবতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদরাক হাকেম, বায়হাকী ও দালায়েলে আবিনাঈম প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্ণ স্পষ্টভাবে ঘটনাটি উল্লেখিত হয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আনাস ইবনে মালেক, যুবায়র ইবনে মুতঈম, আলী ইবনে আবি আনহুম –প্রমুখ এ ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন। তন্মধ্যে সবচে সহীহ ও শক্তিশালী সনদযুক্ত বর্ণনা হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রাযি.। বর্ণনাটি সহীহাইনে উদ্ধৃত হয়েছে। সর্বোপরি তিনি নিজে এ ঘটনাকালে অনুকলস্থলে ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন–

عـن عـبد الله بـن مسعـود رضى الله عنـه قـال: انشـق القـمـر ونحـن مع النـبى ﷺ - بـمنـى - فقـال: اشهـدوا وذهـبـت فـرقـة نـحـو الـجـبـل (رواه البـخـارى فى بـاب انـشـقاق القـمـر ومسلم فى بـاب انشقاق القمر)

"আমরা নবী কারীম ﷺ এর সঙ্গে মিনায় অবস্থান করছিলাম। এসময় চন্দ্র দীর্ণ হলো। তার একটি টুকরা পাহাড়ের দিকে চলে গেলো। নবী কারীম ﷺ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।"

হযরত আনাস রাযি. এর নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটিও বুখারী ও মুসলিম উভয় গন্থে উদ্ধৃত হয়েছে–

عـن انـس رضـى الله عنـه ان أهـل مـكـة سـألـوا رسول الله ﷺ أن يـريـهـم آيـة فـأراهـم انـشـقـاق الـقـمـر وفى روايـة شـقـيـن حـتـى رأوا حـراء بـيـنـهـمـا -

'মক্কার লোকেরা নবী কারীম ﷺ এর নিকট কোনো মু'জিযা দেখাবার দাবী জানালো। তখন নবী কারীম ﷺ তাদেরকে চন্দ্রকে দু'খণ্ডে ভাগ করে দেখালেন। তার এক খণ্ড হেরার এক পাশে ও অপর টুকরাটি অপর পাশে অবস্থিত ছিলো।

আবু দাউদ ও বাইহাকীর রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন–

فـقـال كـفـار مـكـة هـذا سـحـر يـسـحـركـم بـه ابـن ابـى كـبـشـة انـظـروا الـى السـفـار (أى الـمـسـافـريـن) فـإن كـانـوا رأوا مـار أيـتـم فـقـد صـدق وإن كـانـوا لـم يـروا مـا رأيـتـم فـهـو سـحـر سـحـركـم بـه - قـال فـسـئـل السـفـار وقـدمـوا مـن كـل وجـه فـقـالـوا رأيـنـا -

"(মক্কী জীবনে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা যখন প্রকাশ পায়) কাফেররা তখন বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে জাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবী সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু ব্যতীত কিছু নয়। তারপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত দেখেছে বলে স্বীকার করে। (ইবনে কাছীর, মা'আরিফুল কুরআন, মুজিযাতুন নবী, তুহফাহ, কাওকাব)

মু'জিযাটি কোথায় এবং কখন সংঘটিত হয় ?

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযাটি হিজরতের পূর্বে মিনায় সংঘটিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কর্তৃক বর্ণিত পূর্বোলোখিত হাদীসটি তার প্রমাণ। এছাড়াও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন– مضى ذالك قبل الهجرة হিজরতের পূর্বে মু'জিযাটি সংঘটিত হয়। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণিত অপর একটি হাদীসেও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে– قبل ان نصير الى المدينة অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করার পূর্বে মু'জিযাটি সংঘটিত হয়। উক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে কোনটিতে বলা হয়েছে, 'এটি মিনায় সংঘটিত হয়েছে,' আবার কোন বর্ণনাতে বলা হয়েছে, 'এটি মক্কায় সংঘটিত হয়েছে।'

আবার কোন হাদীসে বলা হয়েছে, 'এটি হিজরতের পূর্বে সংগটিত হয়েছে।' এসব বর্ণনার মাঝে দৃশ্যতঃ বিরোধ পরিলক্ষিত হলেও বাস্তবে কোন বিরোধ নেই। কেননা, মূলতঃ মু'জিযাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার অবস্থানকালে হিজরতের পূর্বে মিনা নামক স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। আর মিনা প্রকৃতপক্ষে মক্কারই অংশ।

হাফেয ইবনু হাযার আসকালানী রহ. বলেন, অধিকাংশ বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি চন্দ্র ডোবার একটু পূর্বে প্রকাশ পেয়েছে। এও সম্ভাবনা আছে যে, এটি চন্দ্র উদিত হওয়ার শুরু সময়ে প্রকাশ পেয়েছে। কোন কোন বর্ণনা মতে বুঝা যায়, মু'জিযাটি লাইলাতুল বদর তথা পূর্ণিমার রাতে প্রকাশ পায়।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আনাস রাযি. এর উল্লেখিত বর্ণনা মতে বুঝা যায় যে, চন্দ্রের বিদীর্ণ দু'টি খণ্ড হেরা পাহাড়ের দু'প্রান্তে চলে। অথচ দালায়েলুন নাবুওয়াত -এ এসেছে–

عن أبى معمر عن عبد الله مسعود رض قال : رأيت القمر منشقا شقتين مرتين بمكة قبل مخرج النبى صلى الله عليه وسلم - شقة على أبى قيس وشقة على سويداء (والسوايداء ناحية خارج مكة عندها جبل)

এ বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিদীর্ণ চন্দ্রের এক খণ্ড জাবালে আবু কুবাইস –এ চলে যায়, অপর অংশ ছুয়াইদা তে চলে যায়। সুতরাং উভয় হাদীসের দৃশ্যতঃ تعارض দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে কোন تعارض নেই। কেননা এও সম্ভাবনা আছে যে, এক খণ্ড জাবালে আবু কুবাইস এর এভং অপর খণ্ড ছুওয়াইদা তে চলে যায়, তখন হেরা পর্বত উভয়টির মাঝখানে ছিলো। কিংবা যারা ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী, তাদের দেখার সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে দেখেছে, যে যেই স্থানে দেখেছে, সে সেই স্থানের কথা বলেছে। কেউ কেউ বলেনঃ চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা নবুওয়াতপ্রাপ্তি নবম বর্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

মু'জিযাটি কতবার অনুষ্ঠিত হয়েছে ?

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে মু'জিযাটি একবার অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মুসলিম শরীফের হাদীস–

عن أنس أن اهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين -

এ হাদীস দআবারা বুঝা যায় যে, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা দু'বার প্রকাশ পায়।

হাফেজ ইবনে হাযার উক্ত তা'আরুযের সমাধান কল্পে বলেন, মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতটি مرجوح পক্ষান্তরে যেসব রেওয়ায়াতে شقتين অথবা فرقتين কিংবা فلقتين শব্দ এসেছে, সেসব রেওয়ায়াতকে راجح বলা হবে।

হাফেয ইবনে কাছীর বলেনঃ فی الروایة التی فیها مرتین فنظر সম্ভবত مرتين দ্বারা সেখানে فرقتين উদ্দেশ্য।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ

প্রথম প্রশ্ন ঃ প্রাচীন দার্শনিকদের ধারণা ছিলো, আকাশ মণ্ডলে ভাঙ্গা-গড়া ও বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং জোড়া লাগা অসম্ভব। সুতরাং এ নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব।

তার জবাব ঃ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের উক্ত নীতি নিছক একটি ধারণা বা দাবী। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে সবগুলোই আসার ও ভিত্তিহীন। কালাম শাস্ত্রবিদরা প্রমাণ করেছেন যে, আকাশমণ্ডলে ভাঙ্গা-গড়া ও বিচ্ছিন্ন হওয়া জোড়ালাগা সম্ভাবপর। বলা বাহুল্য, এছাড়াও মু'জিযা তো বলাই হয় এমন কাজকে যা সাধারণ অভ্যাস-বিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যতীত এবং অসম্ভব ধারণা করে থাকে। আর চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাতো একটা মু'জিযাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ এ প্রশ্নটি মূলত খ্রিস্টান বিতর্কবাদীরা প্রচার করেছে। প্রশ্নটি হলো, সত্যিকারেই যদি এ মু'জিযা সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে এটা কেবল মক্কাবাসীরা দেখতো না বরং সারা দুনিয়ার মানুষ এটি দেখতে পেতো। পৃথিভীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এর ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা চলতো। কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে, এ ঘটনার বর্ণনা ও আলোচনা কেবল মক্কাবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে এর কোন চর্চা হতে দেখা যায় না। প্রাচীনকালের সব জ্যোতির্বিদ্যা, খগোলবিদ্যা ও ইতিহাস এ বিষয়ে সম্পূর্ণ খামুস হয়ে আছে।

এর জবাব ঃ এ সংশয়েরও জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রথমত এ ঘটনার কেবল মক্কার লোকেরা দেখেছে, অন্যান্য দেশের লোকেরা দেখে নাই. একথা আমরা মানতে পারি না। বলা হতে পারে, অন্যান্য দেশের লোকেরা তা দেখে থাকলে সেসব দেশের ঐতিহাসিকতা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। এ প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য এই যে, একটি দেশের সর্বজন জ্ঞাত ঘটনা অপরাপর দেশের ইতিহাসে উল্লেখ না থাকলে সে জন্য তো এর মূল ঘটনাকেই অস্বীকার করা যায় না। তাহলে হযরত ঈসা আ. এর সমস্ত মু'জিযা –তাঁর জীবনের ঘটনাবলী পর্যন্ত অস্বীকার করা যেতে পারে। কেননা সিরিয়া ও মিসরের সময়কালীন রোমান ঐতিহাসিকরা এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর এক বিন্দুও উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 'তারিখে ফেরেশতা' গ্রন্থে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার এই ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। মালবারের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর রোজ নামচার তা লিপিবদ্ধ ও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিলো। উপরে আবু দাউদ ও বাইহাকীর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মক্কার কাফেররা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, জ্যোতির্বিদরা তো আকাশ মণ্ডলীর এক একটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকেন, কিন্তু তারা এত বড় ঘটনার কিছুই উল্লেখ করেন নি কেন?

তার জবাব ঃ এ প্রশ্নের জবাব এই যে, এ মু'জেযাটি রাতের বেলায় সংঘটিত হয়েছিলো। যারা জাগ্রত ছিলো, তারা হয়ত নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে এ দিকটার প্রতি লক্ষ্য করেনি। কেননা এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কথা তাদেরকে পূর্ব হতে জানানো হয়নি। আর যার প্রতক্ষ্যদর্শী তাদের মধ্য হতে অনেকে হয়ত এমন, যারা ঘটনাটি নিয়ে রাখার যোগ্যতা রাখতো না কিংবা এর প্রয়োজনও মনে করে নি; লেখা-পড়া জানা লোকেরা এর উল্লেখ করলেও অন্যান্য হাজার হাজার রচনার মত এটিও বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। সৃষ্টির শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কত লক্ষ্য বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার ইয়তা নেই। কিন্তু তা কি সবই কাগজের পৃষ্ঠায় লিখিত অবস্থায় এখন কোথাও পাওয়া যায়? আর কোন ঘটনার লিখিত না হওয়াকেই কি তার মূল অস্তিত্বের অস্বীকৃতির জন্য যথেষ্ঠ প্রমাণ হতে পারে? আকাশ মণ্ডলীর এ ধরনের ঘটনা-দুর্ঘটনার কথা বিভিন্ন ধর্মপুস্তকে উদ্ধৃতি হয়েছে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান ও খগোলবিদ্যা

এ বিষয়ে নির্বাক, কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না যে, ঘটনাটি আদৌ সংঘটিত হয়নি। ইঞ্জিলে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা আ. এর জন্মের পরএকটি নবুওয়াতের তারকা উদিত হয়েছে, ইউরোপের লোকেরা তা দেখেছে, ইঞ্জিলে এও বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আ. কে যখন শূলে বসানো হয়েছিলো, তখন সারাটি দুনিয়া সহসা অন্ধকরাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু খগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থাবলীতে এসব কথার উল্লেখ পাওয়া যায় কি ?

আকাশমণ্ডলীর ঘটনা দুর্ঘটনা অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ তো তার দিকচক্রবালের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সকল এলাকার দিকচক্রবলি এক নয়। বিশেষ করে চন্দ্রের দিকচক্রবালতো আরো জটিল ব্যাপার। এক স্থানে যদি চন্দ্রের আস্তগমন হয়, তাহলে অন্য স্থানে তা-ই উদয় হয়। এক এলাকায় চাঁদনী রাত, অন্যত্র সূচীভেদ্য অন্ধকার, এ কারণে সারা দুনিয়ার লোকেরা যদি এ মু'জিযা দেখতে না পেরে থাকে, তাহলে এর দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি আদৌ সংঘটিত হয় নাই– এ কথা তো প্রমাণিত হয় না। অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লেখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না। (মা'আরিফুল কুরআন, বিদায়া, ওয়ান-নিহায়া, মু'জিযাতুন নবী)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْخَسْفِ ص۔٤١

অনুচ্ছেদ ঃ ২১. ভূমি ধ্বস।

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ۔ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُالسَّاعَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَرَوْا عَشْرَ اٰيَاتٍ : طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَالدَّابَّةَ ، وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنَ تَسُوقُ النَّاسَ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ، فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ۔

حَدَّثَنَا هَنَّادٌحَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ مِنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ۔

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيِّ سَمِعَا مِنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُرَاتٍ، وَزَادَ فِيهِ الدَّجَّالَ أَوِ الدُّخَانَ

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعِجْلِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ فُرَاتٍ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِى دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: وَالْعَاشِرَةُ إِمَّا رِيحٌ تَطْرَحُهُمْ فِى الْبَحْرِ، إِمَّا نُزُولُ عِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ ۔ قَالَ أَبُو عِيسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۔

২৭. বুন্দার .... হুযায়ফা ইবনে উসায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তার হুজরা থেকে উকি দিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এরপর তিনি বললেন, দশটি আলামত তোমরা না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত ঘটবে না-পশ্চিম থেকে সূর্যোদয় হওয়া, ইয়াজূজ-মাজূজ, দাব্বাতুল আরদ, তিনটি ভূমি ধ্বস একটা পূর্বে, একটা পশ্চিমে, আরেকটা ধ্বস হল আরব উপদ্বীপে। একটা মহাআগুন (ইয়ামানের) আদনের মধ্য থেকে বের হবে যা মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে (বা তাদের একত্রিত করবে)

সুতরাং তারা যেখানে রাত কাটাবে সেখানে তাদের সাথে এ-ও রাত্রি কাটাবে তারা যেখানে দুপুরের বিশ্রাম নিবে সেখানে তাদের সাথে এ-ও দুপুরে বিশ্রাম নিবে।

২৮. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ. ..... সুফইয়ান রহ. সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে ধোয়া সম্পর্কেও উল্লেখ আছে।

২৯. হান্নাদ .... ফুরাত কাযযায রহ. থেকেও ওয়াকী -সুফইয়ান রহ. সূত্রের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ. ..... ফুরাত কাযযায রহ. থেকে আবদুর রহমান -সুফইয়ান ফুরাত রহ. সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে দাজ্জাল অথবা ধোয়া কথাটি অতিরিক্ত আছে। আবূ মূসা মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না রহ. -ফুরাত রহ. থেকে আবূ দাউদ -শু'বা রহ. সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আছে দশম হল প্রচণ্ড বাতাস যা তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে কিংবা ঈসা ইবনে মারয়াম আ. এর অবতরণ।এ বিষয়ে আলী, আবূ হুরায়রা, উম্ম সালামা ও সাফিয়্যা রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উক্ত হাদীসে কেয়ামতের দশটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে এগুলো বিন্যস্ত করা হয়নি। বরং কেবল নিদর্শনগুলোকে একসাথে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যথায় পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার নিদর্শন দেখা দিবে ঈসা আ. এবং ইসরাফিলের সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পূর্বে, যকন তাওবাহর দওজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে।

কেয়ামতের আলামত

কেয়ামতের পূর্বে দুই প্রকারের আলামত প্রকাশ পাবে। (১) عَلَامَتْ صُغْرٰى তথা ছোট আলামত। (২) عَلَامَتْ كُبْرٰى তথা বড় আলামত। বড় আলামতগুলো কেয়ামতের খুবই কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ পাবে। এগুলোকে সত্য, সঠিক জানা ও তার উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব।

কেয়ামতের ছোট ছোট আলামত দেখে বোঝা যাবে, কেয়ামতের তথা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এসব আলামতের মধ্যে রয়েছে-

(১) কেয়ামতের ছোট আলামতগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হলো আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর আভির্ভাব। এজন্যই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে নবী কারীম ﷺ এর লকব বা উপাধি ছিলো نَبِىُّ السَّاعَةِ। অর্থাৎ কেয়ামতের নবী।

(২) তারপর রাসূল ﷺ এর অব্যবহিত পর فِتْنَةُ اِرْتِدَادْ বা মুরতাদ হওয়ার ফেতনা। যা নবী কারীম ﷺ ইনতেকালের অব্যবহিত পর সংঘটিত হয়েছিলো। অতঃপর কেয়ামতের বহু ছোট ছোট আলামত প্রকাশ পাবে। আল্লামা তাকী উসমানীর 'যিকর ও ফিকর নামক গ্রন্থ থেকে তার আরো কিছু ছোট আলামত তুলে ধরা হলো-

(৩) সময় অতিদ্রুত অতিক্রান্ত হবে। (অর্থাৎ বড় বড় বিপ্লব সংঘটিত হবে।)

(৪) দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে এবং দ্বীনের ইলম উঠে যাবে।

(৫) হত্যা ও লুণ্ঠন তীব্র হবে। ঘাতক নিজেও জানবে না সে কেন হত্যা করছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, তাকে কেন হত্যা করা হলো ?

(৬) সন্তানের চাহিদার পূর্বে তাকে অবাঞ্ছিত মনা করা হবে। বৃষ্টিতে শীতলতার পূর্বে গরমের কষ্ট অনুভব হবে। অপকর্ম প্লাবনের ন্যায় ছড়িয়ে পড়বে।

(৭) মিথ্যুককে সত্যবাদী, সত্যবাদীকে মিথ্যুক এবং খেয়ানতকারীকে আমানতদার ও আমানতদারকে খেয়ানতকারী বলা হবে।

(৮) অনাত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া হবে এবং আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।

(৯) প্রত্যেক সম্প্রদায় ও দলের নেতৃত্ব থাকবে তাদের মুনাফেকদের হাতে এবং প্রত্যেক বাজারের নেতৃত্ব থাকবে বাজারের দুষ্ট লোকদের হাতে।
(১০) মসজিদের মেহরাবসমূহ কারুকার্য দ্বারা সুশোভিত হবে, কিন্তু মানুষের অন্তর হবে বিরান।
(১১) পুরুষ পুরুষের সঙ্গে যৌনচাহিদা পূর্ণ করবে এবং নারী নারীর সঙ্গে।
(১২) শেষ যামানার লোকেরা উম্মতের প্রথম যামানার লোকদেরকে ভৎর্সনা করবে।
(১৩) কলম (অর্থাৎ, কলম দ্বারা লিখিত বিষয়সমূহের) প্রসার ঘটবে এবং সত্যকে গোপন করা হবে।
(১৪) সাধারণ অযোগ্য মানুষ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিয়ষসমূহে মতামত প্রদান করবে।
(১৫) মানুষ পিতার অবাধ্য হবে, মায়ের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে, বন্ধুর ক্ষতি করবে এবং স্ত্রীর আনুগত্য করবে। ইত্যাদি।

যেগুলোকে أَشْرَاطُ سَاعَة বা عَلَامَتْ كُبْرٰى বলা হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–
(১) হযরত মাহ্দীর আবির্ভাব।
(২) দাজ্জালের আবির্ভাব।
(৩) আকাশ থেকে ঈসা আ. এর দুনিয়াতে অবতরণ।
(৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব।
(৫) দাব্বাতুল আরজ –এর বহিঃপ্রকাশ।
(৬) দাব্বাতুল আরজ –এর বহিঃপ্রকাশের কিছুকাল পর একটা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হওয়া।
(৭) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়।
(৮) তিনটা বিরাটাকারের ভূমিধস।
(৯) আকাশ থেকে এক ধরনের কালো ধোঁয়া পকাশ পাওয়া।
(১০) ইয়ামান থেকে একটা বিশেষ আগুন প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি। (ইসলামী আকীদা, যিক্র ও ফিক্র)

উল্লেখিত হাদীসের বিশ্লেষণ

وَالدَّابَّةُ দাব্বাতুল আরজ ঃ কেয়ামতের কিছু পূর্বে মক্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে অদ্ভুত আকৃতির এক জন্তু বের হবে। একে বলা হয় دَابَّةُ الْأَرْضِ বা ভূমির জন্তু। (সাধারণ প্রজনন পদ্ধতির ব্যতিক্রম ভূমি থেকে এর জন্ম হওয়ার কারণে এরূপ নামকরণ হয়ে থাকবে।) ইবনে কাসীর আবু দাউদ তায়ালিসীর বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে উমরের এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামে কালো পাথর ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌঁছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দিবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন এঁকে দিবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে। (ইবনে কাসীর)

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কেয়ামতের সর্ব শেষ আলামত সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম সূর্য পশ্চিম দিক তেকে উদিত হবে। সূর্য উঠার পর 'দাব্বাতুল আরজ' নির্গত হবে। এ আলামতদ্বয়ের যে কোন একটি প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর)

শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী রহ. বলেন, দাব্ব্যতুল আরজ নির্গত হওয়ার সময় আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আসিল মুনকার এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করবেনা। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এ বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। (মাযহারী)

'দাব্বাতুল আরজ' এর আকার আকৃতি ঃ

আল্লামা ইবনে কাসীর প্রমুখ এ জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত যে, এটি একটি কিম্ভুতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মুকাররমায় এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমন করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনতে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলবে। কুরআনও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়ের উপরই বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরী নয় এবং তাতে কোন উপকারও নহেই।

দাব্বাতুল আরজ এর বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে কুরআন মজীদের যে আয়াতে বলা হয়েছে তাহলো

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ.

'যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করবো। সে মানুষের সাথে কলা বলত্তব। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করতো না।' (সূরা আন-নাম্‌ল ঃ ৮২)

دَابَّةُ الْأَرْضِ মানুষের সাথে কি কথা বলবে ?

এ প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বলেনঃ কুরআনে উল্লেকিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ "أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ" এ বাক্যটি সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই– 'অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করবেনা।' উদ্দেশ্য এই যে, এখন সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু একনকার বিশ্বাস আইনতঃ ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। (ইবনে কাছীর)

ثَلٰثَةُ خُسُوفٍ الخ ঃ তিনটি বিরাটাকের ভূমিধস ঃ

এ তিনটি ভূমিধস হয়ে গিয়েছে নাকি এখনও হয়নি বরং ভবিষ্যতে হবে– এ বাপারে কয়েকটি বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা–

(১) الاشاعة গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, উল্লেখিত ভূমিধস সংঘটিত হয়ে গেছে। তিনি এর ব্যাখ্যায় আরো বলেন যেমন–

منها خسف ثلاثة عشر قرية بالمغرب سـ٢٠٨ هـ وخسف عدة أماكن بغرناطة فى شعبان سـ٨٣٤ هـ وخسف مأة وخمسين قرية من قرى الرى سـ٣٤٣هـ غير ذالك

অর্থাৎ, ২০৮ হিজরী সনে মরক্কোর তেরটি জনপদের ভূমি ধসে গেছে। ৮৩৪ হিজরীতে গ্রানাডার বেশ কয়েকটি জনপদ ধসে যায়। ৩৪৩ হিজরীতে 'রায়' এর দেড়শ' জনপদ ধসে যায়। (হতে পারে, অন্য কোথাও ভূমিধস হয়েছে।)

(২) কিন্তু হযরত মাওলানা শাহ রফী' উদ্দীন রহ. اشراط الساعة সামক রেসালাহতে লিখেন–

انها تكون بعد وفات عيسى على نبينا وعليه الصلوة

অর্থাৎ, উক্ত তিনটি ভূমিধস ঈসা আ. এর ইনতেকালের পর হবে।

(৩) ইবনুল মালিক বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা এভাবে অনেক জনপদকে শাস্তি দিয়েছেন। হাদীসে উল্লেখিত 'ভূমিধস' সম্ভবত সেগুলো নয়। মনে হয়, আরো বড় ধরনের ভূমিধসের কথাই হাদীসে বলা হয়েছে। (আ'উনুল মা'বুদ, তাকমিলাহ, মিরকাত)

وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَن ঃ উল্লেখ্য, এ আগুন আর অপর হাদীসে উল্লেখিত হেজাজের আগুন এক

নয়। দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘঠনা। হেজাজের আগুন সম্পর্কে বুখারী, মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা সূত্রে বর্নিত হয়েছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِئُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرٰى

অর্থাৎ 'কেয়ামত সে সময় পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ হেজাজে এমন এক আগুন বের না হবে, যার আলো বসরার উটগুলোর গর্দান উজ্জ্বল করে দিবে।'

ইমাম নববী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ এ আগুন ৬৫৪ হিজরীর ২ জুমাদাসসানী বুধবারে মদীনার দেখা দিয়েছিলো। আগুনের স্ফুলিঙ্গ এক একটি পাহাড়সম ছিলো। হাফেজ সুয়ুতী লিখেছেন, সে সময় বসরায় অবস্থানকারী অনেক লোকের নিকট থেকে এ সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, তারা রাতের বেলায় এ আগুনের আলোতে বসরার উস্ট্রগুলির গর্দান পর্যন্ত দেখেছিলো। সুতরাং বুঝা গেলো, আলোচ্য অধ্যায়ে যে আগুনের কথা বলা হযেছে সেটা আর হেজাজের আগুনের ঘটনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ অধ্যায়ে যে আগুনের কথা বলা হয়েছে, তা হলো কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতগুলোর একটি দাব্বাতুল আরজ এর ঘটনার পর এ আগুন দেখা দিবে। আগুনের এ ঘটনাও কেয়ামতের عـلامت كـبـرى এর মধ্য থেকে একটি। মুসলিম শরীফে ও এ সম্পর্কে হযরত হুযাইফা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেয়ামতের দশটি আলামত বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সর্বশেষ আলামত হলো এটি। তিনি বলেন–

نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلٰى مَحْشَرِهِمْ، وَفِىْ رِوَايَةٍ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوْقُ النَّاسَ إِلٰى الْمَحْشَرِ (رواه مسلم)

অর্থাৎ, একটা আগুন বের হবে ইয়ামান থেকে, যা মানুষকে তাদের হাশরের ময়দানের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, এডেনের এক গুহা থেকে যে আগুন বের হয়ে লোকদেরকে ময়দানে হাশরের দিকে পরিচালিত করবে।

تَسُوْقُ النَّاسَ اَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ ঃ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় إِلٰى مَحْشَرِهِمْ অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে, কতক আলেমের মতে, হাদীসে উল্লেখিত 'হাশর' দ্বারা حَشْرٌ مِنَ الْقُبُوْرِ فِى الْاٰخِرَةِ তথা কবর থেকে পুনরুত্থান উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে, এখানে হাশর দ্বারা উদ্দেশ্য ওই হাশর নয়, যা সকলের মাঝে প্রসিদ্ধ এবং আখেরাতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বরং এখানে 'হাশর' দ্বারা ভিন্ন এক হাশর উদ্দেশ্য যা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে নিদর্শন হিসাবে দুনিয়াতে অনুষ্ঠিত হবে। مَحْشَر শব্দের অর্থ মজমা বা সমাবেশস্থল। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, যখন এ আগুন বের হবে, মানুষ তখন আগুন থেকে বাঁচার জন্য বাসা-বাড়ী থেকে বের হয়ে যাবে এবং অন্যত্র হিজরত করবে। مَحْشَر দ্বারা উদ্দেশ্য ওই স্থান যেখানে সে সময় অধিকাংশ মানুষ একত্রিত হবে। কিন্তু লোকজন আগুন থেকে পালাতে চাইলেও পালাতে পারবে না। আগুন তাদের সাথে সাথে থাকবেই।

কোন কোন উলামা হাদীসটিকে مَجَاز তথা রূপকার্থে নিয়েছেন। তথা আগুন দ্বারা উদ্দেশ্য, মহা ফেতনা। দুনিয়ার প্রতিটি এলাকায় ফেতনার জয়জয়কার হবে। কেবল শামদেশ কিছুটা ফেতনামুক্ত থাকবে। এই জন্য মানুষ শামদেশের দিকে অধিক হিজরত করবে। (ফতহুল বারী খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৩৭৮, তাকমিলাহ ৬/২২৩)

দশ নিদর্শনের তারতীব

উক্ত হাদীসে দশ নিদর্শন থেকে সাততির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটির বর্ণনা এই হাদীসের অপর সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই তিনটি হলো– (১) دُخَان তথা এক প্রকার ধোঁয়া। (২) দাজ্জাল (৩) এক প্রকার বাতাস।

এ দশ নিদর্শনের মধ্য থেকে কোনটি আগে সংঘটিত হবে আর কোনটি পরে সংঘটিত হবে– এ ব্যাপারে একাধিক বক্তব্য রয়েছে–

কেউ কেউ সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে এগুলো ক্রমবিন্যাস এভাবে করেছেন– (১) দুখান (২) দাজ্জালের আবির্ভাব (৩) ঈসা আ. এর অবতরণ (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব (৫) দাব্বাতুল-আরজ এর বহিঃপ্রকাশ (৬) পশ্চিম দিকে সূর্য উদয়। (অবশিষ্ট চারটি তারা উল্লেখ করেননি।)

فتح الودود এর প্রণেতা বলেন প্রথমে (১) তিনি ভূমিধসের ঘটনা প্রকাশ পাবে (২) দাজ্জাল বের হবে (৩) ঈসা আ. অবতরণ করবেন। (৪) ইয়াজূজ-মাজূজ বের হবে। (৫) একটি কোমল বাতাস প্রবাহিত হবে, ফলে সকল মুমিন মারা যাবে। (৬) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে। (৭) দাব্বাতুল আরজ বের হবে। (৮) দুখান দেখা দিবে।

এই তারতীবকে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. সমর্থন করেছেন। আল্লামা কুরতুবীও এরূপ তারতীব দিয়েছেন। তবে তিনি 'দুখান' এর স্থলে 'দাজ্জাল' উল্লেখ করেছেন।

হযরত মাওলানা রফী উসমানী সাহেব যে তারতীবে উল্লেখ করেছেন তা এরকম (১) দাজ্জালের আবির্ভাব। (২) ঈসা আ. এর অবতরণ (৩) ইয়াজুজ-মাজুজ (৪) তিনটি ভূমিধস। (৫) ধোঁয়া। (৬) পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় (৭) দাব্বাতুল আরজ। (৮) ইয়ামান থেকে আগুন বের হবে। (৯) এক প্রকার নির্মল বাতাস প্রবাহিত হবে। ফলে মুমিনদের প্রাণ চলে যাবে। (১০) গাধার মত খোলামেলা যৌনাচার।

وزاد فيه الدخان ঃ দুখানের ব্যাখ্যাঃ

হযরত ঈসা আ. এর ইনতেকালের পর কয়েকজন নেককার লোক ন্যায় পরায়নতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা করবেন। তারপর ক্রমান্বয়ে ধর্মের কথা কমে যাবে। চতুর্দিকে বে-দ্বীনী শুরু হয়ে যাবে। এ সময় আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া আসবে। যার ফলে মুমিন-মুসলমান যারা তাদের সর্দির মত ভাব হবে এবং কাফেররা বেহুশ হয়ে যাবে। ৪০ দিন পর ধোঁয়া পরিস্কার হয়ে যাবে। কুরআন মজীদে এ ধোঁয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ

'অপেক্ষা কর সে দিনের যে দিন আকাশ স্পষ্ট ধোয়ায় আচ্ছন্ন হবে।'

দুখান সংক্রান্ত আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ঃ

فارتقب يوم تاتى السماء بدخان مبين - يغشى الناس - هذا اعذاب اليم - ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون - انى لهم الذكرى وقد جاء هم رسول مبين - ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون - انا كاشفوا العذاب قليلا انكم عائدون - يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون -

অর্থাঃ 'অতএব আপনি সে দিনের অপেক্ষা করুন, যে দিন আকাশ ধূয়ায় চেয়ে যাবে, যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর থেকে কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল। অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে! সে তো উন্মাদ- শিখানো কথা বলে। আমি তোমদের উপর থেকে আযাব কিছুটা প্রত্যাহার করবো, কিন্তু তোমরা তো পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। যেদিন আমি প্রবলভাবে ধৃত করবো, সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবোই।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখিত ধোঁয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেঈগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। যথা-

(১) এটা কেয়ামতের অন্যতম আলামত। যা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। এই উক্তি হযরত আলী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হাসান বসরী রহ. প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।

(২) এ ভবিষ্যৎবানী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে। যা রাসূল ﷺ এর বদদু'আর ফলে মক্কাবাসীদের উপর অর্পিত হয়েছিলো। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলো এবং মৃতজন্তু পর্যন্ত খেয়ে ছিলো। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে তখন ধূঁয়া দৃষ্টিগোচর হতো। এ উক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. প্রমুখের।

(৩) এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উত্থিত ধুলিকনাকে ধূম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আবদুর রহমান আ'রাজ প্রমুখের।

প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয় সমধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। (তাঁর ভাষায় هٰذَا الْقَوْلُ غَرِيْبٌ جدا بل منكر)

সহীহ হাদীসসমূহের প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়েরই আলোচনা এসেছে। ইবনে কাসীর ও কুরতুবীর বর্ণনা থেকে প্রথমোক্ত উক্তি বিশুদ্ধ অগ্রাধিকার যোগ্য বলে অনুমিত হয়।

প্রথম উক্তির পক্ষে বর্ণনা সমূহ

আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসে এ উক্তির পক্ষে পেশ করা যেতে পারে। এছাড়াও ইবনু কাছীর এ উক্তির পক্ষে বেশ কয়েকটি রেওয়ায়াত একসাথে করেছেন। তন্মধ্যে থেকে একটি বর্ণনা নিম্নরূপ–

আবু মালেক আশ'আরী বর্ণিত রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমি তোমাদেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি–

(১) ধূঁয়া যা মুমিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেব। এবং কাফেরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি বন্ধপথে বের হতে থাকবে।

(২) দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত জানোয়ার

(৩) দাজ্জাল।

ইবনে কাছীর এমনি ধরনের আরো কয়েকটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃতি করে লিখেন, কুরআনের তাফসীরকার হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈর উক্তিও তাই, তাঁরা ইবনে আব্বাসের সঙ্গে একমত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সহীহ, হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, দুখানা তথা ধুয়া কেয়ামতের ভবিষ্যত আলামত সমূহের অন্যতম। কুরআনের বাহ্যিক ভাষাও এ সাক্ষ্য দেয়।

দ্বিতীয় উক্তির দলীল

দ্বিতীয় উক্তি ছিলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর উক্তি। এ প্রসঙ্গে বুখারী, মুসলিম ইত্যাদিতে হযরত মাসরূকের বাচনিক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবর্তী কূফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক ওয়ায়েজ ওয়াজ করেছেন। তিনি يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে পশ্ন করলেন, এই দুখানে কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতঃপর নিজেই বললেন, এটা এক ধুম্র, যা কেয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের কর্ম ও চক্ষু নষ্ট করে দিবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের মধ্যে এর কারণে কেবলমাত্র সর্দি সৃষ্টি হবে। মাসরূক বলেন ঃ ওয়ায়েজের কথা শুনে আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন– ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহতা'আলা আমাদের নবীকে এই পথ নির্দেশ দিয়েছেন – مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ

'আমি তোমাদের কাছে আমার সেবাকর্মের কোনো বিনিময় চাইনা এবং আমি কোন কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে আলেম হবে, সে যা জানে না, তা পরিস্কার বলে দিবে, আমি জানি না, আল্লাহ তা'আলাই জানেন। নিজে কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতঃপর তিনি বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তাফসীর সংক্রান্ত ঘটনা শুনাই। কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াত কবুল কতে অস্বীকার করলো এবং কুফরিকেই আঁকড়ে রইলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদ দু'আ করলেন যে,ম হে আল্লাহ! এদের উপর ইউসুফ আ. এর দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে পতিত হলো। এমনকি তারা অস্থি ও মৃতজন্তুও ভক্ষণ করতে লাগলো। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধুম্র ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এক বর্ণনায় আছে, তাদরে কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতার সে কেবল ধুম্রের মত দেখতো। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ – فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলে। বৃষ্টি হলো, তখন اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ

عَـائِدُوْن আয়াত নাযিল হলো। অর্থাৎ ইম কিছু দিনের জন্য তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাবে।

বাস্তবে তাই হলো তারা তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলো। তখন আল্লাহ তা'আলা يَـوْمَ نَبْـطِـشُ الْـبَـطْـشَـةَ الْـكُـبْـرٰى اِنَّا مُـنْـتَـقِـمُـوْن আয়াত নাযিল করলেন। অর্থাৎ, যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করবো। সে দিনের ভয় কর। অতঃপর ইবনে মাসউদ বললেনঃ এই প্রবল পাকড়াও বদরযুদ্ধে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরও বললেন, পাঁচটিবিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুখান তথা ধুম্র রোম, চাঁদ, পাকড়াও ও লেয়াম। (ইবনে কাছীর) দুখন অর্থ মক্কার দুর্ভিক্ষ। রোম অর্থ সেই ভবিষ্যতবাণী যা সূরা রূমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে। চন্দ্র অর্থ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া যা اِقْـتَـرَبَـتِ الـسَّـاعَـةُ وَانْـشَـقَّ الْـقَـمَـرُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ বদরযুদ্ধে কুরাইশ কাফেরদের পরিণতি। লেযাম অর্থে فَـسَـوْفَ يَـكُـوْنُ لِـزَامًـا আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

رَاجِـح তথা অগ্রাধিকার দেওয়া তাফসীর কোনটি ?

আলোচ্য আয়াতসমূহ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যতবাণী দেখতে পাওয়া যায়–

(১) আকাশে ধুম্র দেখা দিবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে।

(২) মোশরেকরা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করতঃ আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।

(৩) তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং পরে তারা বেঈমানী করবে।

(৪) তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য আযাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দেবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবেনা এবং

(৫) আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যতবাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারিটি মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অন্তবর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যতবাণীটি বদরযুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তাফসীর কুরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাকে না। কুরআনের ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধূঁয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত মানুষ এই ধূম্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধুম্র তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রুতি। এই কারণেই ইবনে কাছীর রহ. কুরআন মজীদের বাহ্যিক ভাষা দৃষে।ট এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ ধুম্র কেয়ামতের অন্যতম আলামত। একে অগ্রাধিকার দেওয়ার আরও কারণ এই যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদের তাফসীররে তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্তু ইবনে কাছীরের অগ্রাধিকার দেওয়া তাফসীরে বাহ্যতঃ খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে– اِنَّـا كَـاشِـفُـوا الْعَذَابِ قَـلِـيْـلًا اِنَّـكُـمْ عَـائِـدُوْن অথচ কেয়ামতে কাফেরদের থেকে কোন সময় আযাব প্রত্যাহার হবে না। সুতরাং কিছু দিনের জন্য আযাব প্রত্যাহারে বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে ?

এর উত্তরে ইবনে কাছীর বলেন, এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে–

(১) উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথঅ অনুযায়ী আযাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদরেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরিই করতে থাকবে।

(২) كَـشْـف عَـذَاب এর মানে যদিও আযাবের 'কারণ' সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আযাব তোমাদের নিকট এসে গেছে; কিন্তু কিছু দিন আমি তা পিছিয়ে দিবো।

ইউসুফ আ. এর কওমের ব্যাপারেও এমনিভাবে اِنَّـا كَـشَـفْـنَـا عَـنْـهُـمُ الْعَذَابَ বলা হয়েছে। অথচ তাদের উপর আযাবে লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। আযাব আসার কখনও বিলম্ব ছিলো। একেই كَـشْـف عَذَابْ বল ব্যক্ত করা

হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূম্রের ভবিষ্যতবাণীকে কেয়ামতের আলঅমত গণ্য করা হলে كاشفوا العذاب আয়াত দ্বারা কোনো খটকা দেখা দেয় না এবং এ তাফসীর অনুযায়ী نبطش البطشة الكبرى অর্থ হবে কেয়ামত দিবসের পাকড়াও। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীরে যা বদর যুদ্ধের পাকড়াও। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীরে যা বদর যুদ্ধের পাকড়াও বলা হয়েছে। এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ হতে পারে। কারণ, এটাও একটা প্রবল পাকড়াও ছিলো। কিন্তু এতে জরুরী হয় না যে, কেয়মতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবান্তর মনে হয় না যে, কুরআন মজীদ কাফেরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভারী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছে। এরপর তাদের উপর যে কোনো আযাব এসেছে, তাকেই মুফাসসিররা এ আয়াতের প্রদীক মনে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং এটা যে, কেয়ামতের আলামত তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে– ধূম্র দু'টি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ মক্কার দুর্ভিক্ষের সময়।) আর যেটি বাকী আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর শূন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। এতে মুমিনের মধ্যে কেকবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফেরদের দেহের সমস্ত বন্ধ্র ছিন্ন করে দিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়ামানের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির কাফেরকুল অবশিষ্ট থাকবে। (রূহুল মা'আনী,)

মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. লিখেন – রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার যদিও এ বর্ণনার সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু যদি এটা প্রমাণিত হয়, তাহলে কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনার সাথে মারফু' হাদীসের কোন বৈপরিত্ব থাকে না।

মুফতী তাকী উসমানী বলেন, যদি ইবনে মাসউদ রাযি. এর বর্ণনাটি প্রমাণিত না হয়, তাহলে ও এটা অসম্ভব কিছু নয় যে, কুরআন মজীদের শব্দের মধ্যে উবয় 'দুখান' এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি 'দুখান' যা মুশরিকরা মক্কাতে দুর্ভিক্ষের সময় দেখেছিলো এবং তা একটি কাল্পনিক বিষয় ছিলো। দ্বিতীয়টি কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে প্রকাশমান হবে। (মা'আরিফুল কুরআন, তাকমিলাহ)

وَزَادَ فِيْهِ (قَالَ) وَالْعَاشِرَةُ اِمَّا رِيْحٌ تَطْرَحُهُمْ ঃ হাদীসের এই সনদে কেয়ামতে দশম নিদর্শন হিসাবে একপ্রকার বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কথা কিংবা ঈসা আ. এর অবতরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (রাবী সন্দেহ করেছেন দশম হিসাবে বিবৃত হয়েছে কোনটি)। যে বায়ুর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রবাহমানতা এতটা তেজস্বী হবে যে, লোকজনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।

আল্লামা মুহাম্মদ আবদুর রাসূল (মৃঃ ১০৪০ হি.) তাঁর রচিত গ্রন্থ الإشاعة لأشراط الساعة –এ লিখেন ঃ এই বাতাস ওই বাতাস নয়, যা ইয়াজুজ-মাজুজকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। বরং قَعْرُعَدَن তথা এডেনের গুহা থেকে যে আগুন বের হবে (বিবরণ পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে) সেই আগুনের পেছনে এ বাতাসও বের হবে এবং এটা কেয়ামতের স্বতন্ত্র একটি আলামত। এটাও হতে পারে যে, উল্লেখিত আগুন ও বাতাস একই সাথে বের হবে। মিরকাত –এ মোল্লা আলী কারী রহ. এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে– رِيْحٌ تَطْرَحُهُمْ فِى الْبَحْرِ এ বর্ণনাটি দৃশ্যতঃ ওই বর্ণনার পরিপন্থীম, যে বর্ণনাতে আগুনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান রক্ষার্থে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় বর্ণনায় (كَمَا فِى رِوَايَةِ مُسْلِمٍ رِيْحٌ تُلْقِى النَّاسَ فِى الْبَحْرِ) উদ্দেশ্য হলো, কাফেররা। আর তাদেরকে যে আগুন সমুদ্রের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে তার সাথে প্রচণ্ড তেজস্বী বায়ূর দাপানিও থাকবে। যেন সমুদ্রে নিক্ষেপের কাজটি ক্ষিপ্রতার সাথে সম্পন্ন হয়। যেমন বলা হয়েছে, সমুদ্র আগুন হয়ে যাবে। কুরআন মজীদে এসেছে, وَإِذَا السَّمَاءُ فُجِّرَتْ যখন সমুদ্র উত্তাল হবে। এর বিপরীতে মুমিনদের জন্য যে আগমন হবে তা শুধু ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হবে। আ আগুণের শুধু কাজ হবে মুমিনদেরকে হাকিয়ে নিয়ে একত্রিত করা। (তাকমিলাহ মেরকাত)

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ ـ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ الْمَرْهَبِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هٰذَا الْبَيْتِ حَتّٰى يَغْزُوَ جَيْشٌ حَتّٰى إِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ عَلٰى مَا فِى أَنْفُسِهِمْ ـ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

৩০. মুহাম্মদ ইবনে গায়লান .... সাফিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। লোকেরা এই আল্লাহর ঘর নিয়েও লড়াই থেকে বিরত হবে না। শেষ পর্যন্ত এক বাহিনী যখন লড়াইয়ে আসবে আর তারা যখন খোলা ময়দানে উপস্থিত হবে তখন তাদের প্রথম ও মেষ সকলকে নিয়ে যমীন ধ্বসে যাবে। যারা মাঝে ছিলেন তারাও এ থেকে বাঁচতে পারবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে ব্যক্তি তাদের মাঝে বাদ্য হয়ে শামিল হয়েছে তার কি হবে ? তিনি বললেন, তাদের অন্তরের অবস্থা অনুসারে আল্লাহ তা'আলা তাদরকে উত্থিত করবেন। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

حَتّٰى إِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ ঃ بَيْدَاء শব্দের অর্থ নির্জন প্রান্তর, মরুভূমি। বহুবচন بَيْد , بَيْدَاوَاتٌ মুসলিম শরীফে উম্মে সালমার বর্ণনায় আবু জা'ফর বাকের বলেছেনঃ এখানে بَيْدَاء দ্বারা উদ্দেশ্য, মদীনার মরুভূমি। যেটি যুলহুলাইফার সন্নিকটে একটি প্রসিদ্ধ মরুপ্রান্তর। হযরত তাকী উসমানী লিখেনঃ সম্ভবত, এ ব্যাপারে বিশেষ কোন বর্ণনা তিনি পেয়েছেন। অন্যথায় হাদীসের লফয তো আ'ম, যা প্রত্যেক بَيْدَاء কেউ অন্তর্ভুক্ত করে।

خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ঃ ভূমিধসের এলাকা থেকে কেবল এক ব্যক্তি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে, যে সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে অন্যান্যদেরকে এ বিষয়ের সংবাদ ও বিবরণ দিবে। (এ হাদীসের আনুসাঙ্গিক আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত সেখানে দ্রষ্টব্য।)

حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ـ حَدَّثَنَا صَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَكُوْنُ فِى اٰخِرِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنُهْلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخُبْثُ ـ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ تَكَلَّمَ فِيْهِ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ـ

৩১. আবু কুরায়ব.............. আইশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ উম্মতের শেষ যুগে ভূমি ধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের আযাব হবে। 'আইশা রাযি. বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের মাঝে সালিহীন ও সৎলোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করা হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন অন্যায়ের প্রাবল্য ঘটবে। 'আইশা রাযি. –এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. স্মরণ শক্তির বিষয়ে বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে উমার রহ –এর সমালোচনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يَكُوْنُ فِىْ آخِرِهٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ.وَقَذْفٌ الخ ঃ এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই উম্মতের সদস্যরাও خَسْف (ভূমিধস) ও مَسْخ (চেহারা বিকৃতি)-র মত আযাবের সম্মুখীন হবে। যেমনিভাবে পূর্ববর্তী উম্মতগণ হঠকারিতা ও অকৃতজ্ঞার কারণে এ জাতীয় আয়াতে নিপতিত হয়েছিল। অথবা অপর হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়ে যে, এই উম্মত এ ধরনের কোনো আযাবে নিপতিত হবে না। সুতরাং এ উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলা হবে–

(১) এই উম্মতের প্রথম দিকের লোকজন বিশেষ কূরুনে ছালাছাহর লোকজনের উপর خَسْف ও مَسْخ এর মত আযাব আসবে না– নিষেধের হাদীস দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। পক্ষন্তরে আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– শেষ যামানার উম্মত, অকৃতজ্ঞতা ও গুণাহর সয়লাবের কারণে তাদের উপর এ ধরণের আযাব আসতে পারে। যথবা

(২) ইজতেমায়ি তিথা সমষ্টিগতভাবে এই উম্মত خَسْف ও مَسْخ অপরদিকে ইনফেরাদী ভাবে তথা ব্যক্তিবিশেষ এ ধরনের আযাবের মুখোমুখী হতে পারে।

اَنُهْلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ঃ অর্থাৎ ভূ পৃষ্ঠের মধ্যে যখন অন্যায়, অবিচার, পাপাচার ও নাফরমানির সয়লাব শুরু হয়, যদি এ সবের কারণে আল্লাহর আযাব ও গযব আসে, তখন সকলেরই উপর আসে। নাফরমানদের পাশাপাশি নেককাররাও এই গণ-আযাব থেকে নিষ্কৃতি পায় না। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, হাশরের ময়দানের হিসাব-কিভাবে ওই নেককারের অবস্থা কি হবে? কেননা সেখানে যার যার আ'মল হিসাবেই বিচারকার্য পরিচালিত হবে।

اِذَا ظَهَرَ الْخُبُثُ ঃ এখানে خُبُثٌ তথা خَاء এবং بَاء যবরের সাথে। অর্থ ফিসক ও ফজর বা অন্যায়, পাপ, দুস্কর্ম। কেউ কেউ বলেনঃ এর অর্থ হলো ব্যভিচার। কারো কারো মতে এর অর্থ– আরজ সন্তান। তবে এখানে যে কোন অন্যায় ও পাপকেই বুঝানো হয়েছে। নতুন বৈরুতি সংস্করণে শব্দটি خُبْثُ তথা خَاء এর মধ্যে পেশ এবং بَاء এর মধ্যে সাকিন –এর সাথে এসেছে, যার অর্থ অন্যায়, অশ্লীলতা, অবৈধতা, দুস্কর্ম, পাপ ইত্যাদি। (তোহফাহ, আলকাওয়াকব)

بَابُ مَاجَاءَ فِى طُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ص ٤٢

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩. পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়।

حدثنا هناد ـ حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن ابى ذر قال : دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبى ﷺ جالس فقال: يا أبا ذر أتدرى أين تذهب هذه؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم ، قال فإنها تذهب تستأذن فى السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل له اطلعى من حيث جئت فتطلع من مغربها ، قال ثم قَرَأَ: وَذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّلَهَا ، قَالَ وَذٰلِكَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ـ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَفِى الْبَابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِىْ مُوْسٰى وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

৩২. হান্নাদ .... আবূ যার্‌র রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় আমি মসজিদে এসে

ঢুকলাম নবী কারীম ﷺ তখন উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ যার্‌র, তুমি কি জান কোথায় যায় এই সূর্য? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর হুকুমে সিজদার অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এটি যায়। এরপর তাকে অনুমতি প্রদান করা হয় এবং তাকে যেন বলা হয়, যেখান থেকে তুমি এসেছ সেদিক থেকেই তুমি উদিত হও। তারপর এটি পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।

আবূ যার্‌র রাযি. বলেন, এরপর নবী কারীম ﷺ পাঠ করলেন وَذَالِكَ مُسْتَقَرٌّلَهَا আর এ হচ্ছে তার অবস্থান স্থল। বর্ণনাকারী বলেন, এ হল ইবনে মাসউদ রাযি. এর কিরাআত। এ বিষয়ে সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল, হুযায়ফা ইবনে আসীদ, আনাস ও আবূ মূসা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসটি এখানে সংক্ষিপ্ত। বুখারী, মুসলিম ও মুসান্নাফে আবদির রায্‌যাক -এ তার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। যার সার সংক্ষেপ হলো– সূর্য অস্ত যাওয়ার আরশের নীচে পৌঁছে সেজদা করে এবং নতুন পরিভ্রমনের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমন শুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রমনের অনুমতি দেওয়া হবে না, বরং পশ্চিমে অস্ত গিয়ে পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। এটা হবে কেয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। তখন তাওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এবং কোন গুণাহগার, কাফের ও মুশরিকের তাওবা কবুল হবে না। (ইবনে কাসীর)

এ বর্ণনায় বলা হয়েছে– আবু যর গেফারী রাযি. একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল ﷺ বললেনঃ আবু যর; আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নীচে পৌঁছে সেজদা করে। অতঃপর বললেন–

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّلَّهَا ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ,

আয়াতে مُسْتَقَر বলে তাই বোঝানো হয়েছে। (ইবনে কাছীর) আরশের নীচে সিজদা এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, এই সূর্য প্রত্যহ বিশেষ অবস্থানস্থলের দিকে ধাবিত হয় এবং সেখানে পৌঁছে আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদা পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার দ্বিতীয় পরিভ্রমন শুরু করে। কিন্তু ঘটনাবলী, চাক্ষুস প্রমাণ এবং সৌরবিজ্ঞানের বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে এতে একাধিক শক্তিশালী খটকা দেখা দেয়।

প্রথম, কুরআন ও হাদীস থেকে আরশের অবস্থা এই জানা যায় যে, আরশ সমগ্র ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে ঘিরে রেখেছে। ভূমণ্ডল এবং গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমস্ত নভোমণ্ডল আরশের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রয়েছে। কাজেই সূর্যতো সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আরশের নীচেই রয়েছে। অস্ত যাওয়ার পর আরশের নীচে যাওয়ার মানে কি?

দ্বিতীয়, সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ হয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যায়, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হয়। তাই তার উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং অস্তের পর আরশের নীচে যাওয়া ও সিজদা করার অর্থ কি?

তৃতীয়, উপরোক্ত হাদীস তেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সূর্য তার অবস্থানস্থলে পৌঁছে বিরতি করে এবং এতে সে আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদা করতঃ পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি গ্রহণ করে। অথচ চাক্ষুস দেখা যায় যে, সূর্যের গতিতে কোন বিরতি নেই। অতঃপর সূর্য উদয় ও অস্ত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দিক থেকে যেহেতু সর্বদাই অব্যাহত থাকে, তাই তার বিরতিও সর্বদা ও সর্বক্ষন হওয়া চাই,য ার ফলে সূর্য কোন সময় গতিশীলই হবে না।

এগুলো কেবল সৌর বিজ্ঞানেরই খটকা নয়, ঘটনাবলী ও চাক্ষুস অভিজ্ঞতার আলোকেও এসব খটকা দেখা দেয় যা উপেক্ষনীয় নয়। দার্শনিক বাৎলীমূসের মতবাদ ছিলো এই যে, সূর্য সর্বোচ্চ আকাশের অনুগামী হয়ে স্বীয় কক্ষথে প্রাত্যহিক বিচরণ করে এবং সূর্য চতুর্থ আকাশে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কিন্তু দিথাগোরস এই মতবাদের বিরোধিতা

করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষনা এটা প্রায় নিশ্চিত করে দিয়েছে যে, বাৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং পিথাগোরাসের মতবাদ নির্ভুল। সাম্প্রতিক কালের মহাশূন্য ভ্রমন এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদচারণার ঘটনাবলী পমাণ করেছে যে, সমগ্র গ্রহ উপগৃহ আকাশের নীচে শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত। আকাশগাত্রে প্রোথিত নয়। কুরআন মজীদের وكل فى فلك يسبحون আয়াত দ্বারাও এ মতবাদ সমর্থিত হয়। এতে আরো আছে যে, দৈনন্দিন উদয় ও অস্ত সূর্যের গতির কারণে হয়ে থাকে। এ মতবাদের দিক দিক উপরোক্ত হাদীসে আরো একটি খটকা দেখা যায়।

এর জবাব হাদীসবিদ ও তাফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। বাহ্যিক ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যের সিজদা দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র একবার অস্ত যাওয়ার পর হয়ে থাকে, যারা হাদীসের এ বাহ্যিক অর্থ নিয়েছেন, তারা অস্ত যাওয়া সম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। এক. যে স্থানে সূর্য অস্ত গেলে দুনিয়ার অধিকাংশ জনবশতিতে অস্ত হয়ে যায়, সে স্থানের অস্ত বোঝানো হয়েছে, দুই. বিষুব রেখার অস্ত বোঝানো এবং তিন. মদীনার দিগন্তে অস্ত বোঝানো হয়েছে। ক্নিতু আল্লামা শাহির আহমদ উসমানী রহ. এর জওয়াবই পরিষ্কার ও নির্মল। কয়েকজন তাফসীরবিদের উক্তি দ্বারাও তা সমর্থিত হয়।

'সুজুদুশ শামস্' নামক এক প্রবন্ধে প্রদত্ত তাঁর এই জওয়াব হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে পয়গম্বরগণের শিক্ষা ও বর্ণনা সম্পর্কে এ মৌলিক বিষয়গুলো বুঝে নেওয়া জরুরী যে, আসমানী কিতাব ও পয়গম্বরগণ মানুষকে আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার অবিরাম দাওয়াত দেন এবং এগুলোকে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাওহীদ সর্বব্যাপী জ্ঞঅন ও কুদরতের প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন। কিন্তু প্রথম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ততটুকুই কাম্য, যতটুকু মানুষের পার্থিব ও সামাজিক প্রয়োজনের সাথে অথবা ইহলৌকিক ও পরলৌকিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অতিরিক্ত নিরেট দার্শনিকসূলভ চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিষয়বস্তুর স্বরূপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে সাধারণ মানুষকে জড়িত করা হয় না। কেননা এগুলোর পরিপূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞান দার্শনিকরাও সারা জীবন ব্যয় করা সত্ত্বেও অর্জন করতে সক্ষম হননি। সাধারণ মানুষ কি অর্জন করতে পারে? আর যদি তা অর্জিত হয়ে যায়, তবে এর মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় কোন প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া এবং কোন বিশুদ্ধ পার্থিব লক্ষ্যও হাসিল হয় না। এমতাবস্থায় এই অনর্থক ও বাজে আলোচনায় প্রবৃত হওয়া জীবন ও অর্থের অপচয় বৈ নয়।

আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের পরিবর্তন ও স্থানান্তরের ততটুকু অংশই কুরআন ও পয়গম্বরগণ প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন, যতটুকু মানুষ প্রত্যক্ষ করে এবং সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। দার্শনিক ও আলিমগণই করতে পারেন। এরূপ বিশ্লেষণের উপর প্রমাণ নির্ভরশীল থাকে না এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনার -ও উৎসাৎ দেওয়া হয় না। কেননা, জ্ঞানী হোক কিংবা মুর্খ, পুরুষ হোক কিংবা নারী, শহরবাসী হোক কিংবা গ্রামবাসী, পাহাড়় ও দ্বীপে বাস করুক অথবা উন্নত শহরে বাস করুক প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তার আদেশ নিষেধ পালন করা ফরয। তাই পয়গাম্বরগণের শিক্ষা জনসাধারণের চিন্তা ও বিবেকবুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। এসব শিক্ষা বোঝার জন্য কোনরূপ কারিগরি পারিদর্শিতার প্রয়োজন হয় না।

এ ভূমিকার পর আমল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। রাসূল ﷺ সূর্যাস্তের সময় আবু যর গিফারীর এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরশের নীচে আল্লাহকে সেজদা করে এবং পরবর্তী পরিভমন শুরু করার অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর যথারীতি সামনের দিকে এবং প্রত্যুষে পূর্ব গঘনে উদিত হয়। এর সারমর্ম এর বেশী নয় যে, সূর্যোস্তের সময় বিশ্ব চরাচরে এক নতুন বিপ্লব দেখা দেয়। সূর্যকে কেন্দ্র করেই এটা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য এই বৈপ্লবিক সময়টিকে উপযুক্ত বিবেচনা করে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সূর্যকে উপযুক্ত বিবেচনা করে শিফা দিয়েছেন যে, সূর্যকে স্বাধীন ও স্বীয় শক্তি বলে বিচরণকারী মনে করো না।ন সে কেবল আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছার অনুসারী হয়ে বিচরণ করে। তার প্রত্যেক উদয় ও অস্ত আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে হয়।

আদেশ অনুসারে বিচরণ করাকেই সেজদা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক বস্তুর সিজদা তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। কুরআন বলে كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ অর্থাৎ প্রথ্যেক সৃষ্টি আল্লাহর ইবাদত ও তাসবীহ করে এবং প্রত্যেককে তার ইবাদত ও তাসবীহ পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন মানুষকে তার নামায ও তাসবীহর পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই সূর্যের সিজদা করার অর্থ এরূপ বুঝে নেওয়া ভ্রান্ত যে, সে মানুষের ন্যায় মাটিতে মস্তক রেখে সেজদা করে।

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ সমস্ত আকাশ, গ্রহ-উপগ্রহ ও পৃথিবীকে উপর দিক থেকে বেষ্টন করে নিয়েছে। অতএব সূর্য সর্বদা ও সর্বত্র আরশের নীচেই থাকে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যেতে থাকে, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হতে থাকে। তাই সূর্য প্রতিনিয়তই উদিত হচ্ছে ও অস্ত যাচ্ছে। সুতরাং সূর্য সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় আরশের ও নীচেই থাকে এবং উদিত ও অস্তমিত হতে থাকে। থাই হাদীসের সারমর্ম এইযে, সূর্য তার সমগ্র পরিভ্রমনে আরশের নীচে আল্লাহর সামনে সিজদারত থাকে। অর্থাৎ তার অনুমতি ও আদেশ অনুসারে পরিভ্রমন করে। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত তা এমনিভাবে অব্যাহত থাকবে। অতঃপর যকন কেয়ামত আসন্ন হওয়ার আলামত প্রকাশ করার সময় হবে, তখন সূর্যকে তার কক্ষপথে পরবর্তী পরিভ্রমন শুরু করার পরিবর্তে পেছনে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং তখন সে পশ্চিম থেকে উদিত হবে। এসময় তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কারো ঈমান ও তওবা কবুল করা হবে না।

মোটকথা, বিশেষভাবে সূর্যাস্ত, অতঃপর আরশের নীচে যাওয়া ও সিজদা করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি চাওয়ার যেসব ঘটনা উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো পয়গম্বর সুলভ কার্যকর শিক্ষার একান্ত উপযোগী এবং জনসাধারণের দৃষ্টিতে পৌঁছে পুরোপুরি একটি উপমা মাত্র। এতে জরুরী হয় না যে, সূর্য মানুষের মত মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করে এবং সিজদা করার সময় সূর্যের গতিতে বিরতি হওয়াও অনিবার্য হয় না। এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, সূর্য দিবারাত্রিতে মাত্র একবার কোন বিশেষ জায়গায় পৌছে সিজদা করে এবং শুধু অস্তমিত হওয়ার পর আরশের নীচে যায়। কিন্তু এই বৈপ্লবিক সময়ে সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ করে যে, সূর্য তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে, তখন উপমাস্বরূপ তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এসব প্রকৃতপক্ষে আরশের নীচে সূর্যের আজ্ঞাধীন হয়ে চলার কারণেই হচ্ছে। সূর্য স্বয়ং কোন শক্তি ও ক্ষমতা রাখে না। তখন মদীনাবাসীরা যেমন স্বস্থানে অনুভব করছিলো যে, এখন সূর্য সিজদা করে পরবর্তী পরিভ্রমনের অনুমতি নেবে, তেমনি যে যে জায়গায় অস্ত হতে থাকেব, সকলের জন্যই একই শিক্ষা হয়ে যাবে।

উপরোক্ত আলোচনার সারকথা দাঁড়ালো, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণকালে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে সি জদাও করে এবং সামনের দিক এগিয়ে যাওয়ারও প্রার্থনা করে। এর জন্য তার কোন বিরতির প্রয়োজন হয় না।

এই ব্যাখ্যার পর পূর্বোক্ত হাদীসের বিষয় বস্তুতে চাক্ষুস অভিজ্ঞতা, সৌর ও অঙ্ক বিজ্ঞানের নীতি বাৎলীমুসীয় অথবা পিথাগোরাসীয় মতবাদ ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই কোন আপত্তি ও খটকা অবশিষ্ট থাকে না। তথাপি আরো একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা হলো, পূর্বোক্ত হাদীসের সূর্যের সিজদা করা এবং পরবর্তী পনিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এটা ব্যক্তি ও জ্ঞানবুদ্ধিশীলের কাজ। সূর্য ও চন্দ্র নির্জীব ও চেতনাহীন। তারা একাজ কিরূপে সম্পাদন করতে পারে? কুরআন শরীফের وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ আয়াতটি এ প্রশ্নের জবাব। অর্থাৎ আমরা যেসব বস্তুকে নির্জীব, নির্বোধ ও চেতনাহীন মনে করি, তারাও প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ প্রকার প্রাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনার অধিকারী। তবে তাদের প্রাণ, জ্ঞন ও চেতনা মানুষ ও জীজ জন্তুর তুলনায় এত কম যে, সাধারণভাবে অনুভূত হতে পারে না। কিন্তু তাদের যে এগুলো নেই, এর পক্ষে কোন শরীয়তগত অথবা বিবেকপ্রসূত দলীল নেই। কুরআন মজীদের এ আয়াতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তারও প্রাণী এবং বোধ ও চেতনাসম্পন্ন। আধুনিক গবেষণাও একটি স্বীকার করেছে। (মা'আরিফুল কুরআন, ফতহুল মুলহিম, বিস্তারিত দেখুন, 'সুজুদুশ শামস' লিল-উসমানী)

بَابُ مَاجَاءَ فِى خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ صــ٤٢

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪. ইয়া'জূজ –মা'জূজের প্রাদুর্ভাব।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُومِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: اِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ شر اِقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهٖ وَعَقَدَ عَشْرًا ، قَالَتْ زَيْنَبُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَفَنُهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ جَوَّدَ سُفْيَانُ هٰذَا الْحَدِيثَ ، هٰكَذَا رَوٰى الْحُمَيْدِىُّ وَعَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ نَحْوَ هٰذَا وَقَالَ الْحُمَيْدِىُّ : قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَفِظْتُ مِنَ الزُّهْرِىِّ فِى هٰذَا الْحَدِيثِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ : زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبَةَ وَهُمَا رَبِيبَتَا النَّبِىِّ ﷺ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجَى النَّبِىِّ ﷺ ، وَهٰكَذَا رَوٰى مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ حَبِيبَةَ ، وَقَدْ رَوٰى بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِبْنِ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.

৩৩. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী প্রমুখ .... যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রা থেকে যেগে উঠলেন, তখন তাঁর চেহারা লাল টকটকে হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলছিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনবার তিনি এটি পাঠ করলেন এবং বললেন, যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তজ্জন্য দুর্ভাগ্য আরবের। দশ সংখ্যা দেখিয়ে অর্থাৎ তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলের সঙ্গে লাগিয়ে একটি বৃত্ত করে ইশারা করে বললেন, ইয়াজূয ও মা'জূজের প্রাচীরের এতটুকু ফাঁক হয়ে গেছে আজ। যায়নাব রাযি. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মাঝে সালিহীনের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করে দেওয়া হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি পাপ কর্মের বিস্তার ঘটে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সুফইয়ান রহ. এ হাদীসটি উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন। হুমায়দী বর্ণনা করেন, সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. বলেছেন, আমি যুহরী রহ. এর বরাতে এ সনদটিতে চারজন মহিলার কথা সংরক্ষণ করেছিঃ যায়নাব বিনতে আবূ সালামা– হাবীবা রাযি. এরা উভয়ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রবীবা বা স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাদের গর্ভজাত কন্যা, –উম্মু হাবীবা –যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. এরা ছিলেন নবী কারীম ﷺ এর সহধর্মিনী।

মা'মার প্রমুখ রহ. এ হাদীসটিকে যুহরী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর সনদে হাবীবা রাযি. এর উল্লেখ করেন নি। ইবনে উয়ায়নার কিছু শাগিরদ হাদীসটিকে ইবনে উয়ায়না রহ, থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা সনদে উম্মু হাবীবা রাযি. –এর উল্লেখ করেননি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

إِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ ঃ বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, دَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا فَزِعًا উভয় বর্ণনার মাঝে বৈপরীত্ব দেখা যাচ্ছে। তার সামঞ্জস্য বিধান হলো, রাসূল ﷺ সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলেন। তারপর ওই অবস্থাতেই যয়নাব রাযি. এর নিকট গিয়েছেন। ভীত সন্ত্রস্ত থাকার কারণে তখন চেহার রক্তিম আকার ধারণ করেছিলো।

وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِاقْتَرَبَ ঃ এখানে شَرٌّ শব্দ দ্বারা ফেতনা-ফাসাদ, হত্যা-লুণ্ঠণের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যেগুলো অনাগত ভবিষ্যতে আরম্ভ হবে এবং তার শিকার সর্বপ্রথম আয়বরা হবে। রাসূল ﷺ নির্দিষ্ট করে বলেন নি যে, নিকটবর্তী এ ফেতনা কোন ফেতনা ? তা এর ব্যাখ্যায় উক্তি পাওয়া যায়। যথা–

(১) কতক আলেম বলেনঃ এর দ্বারা তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ঘটনার পরই ফেতনার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

(২) কেউ কেউ বলেন, এ ফেতনার মাধ্যমে রাসূল ﷺ কেমন যেন এ দিকে ইঙ্গিত করলেন যে, যখন আরববাসীরা ইসলামের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দেশের পর দেশ চয় করবে এবং এর মাধ্যমে সম্পদের স্তুপ তাদের পদতলে লুটে পড়বে, তখন তার অনিবার্য পরিণতিতে মানুষের মাঝে ইখলাসের ও লিল্লাহিয়্যাতের ঘাটতি দেখা দিবে। শাসন ও পদ, ও সম্পদের প্রতি মানুষের মোহ সৃষ্টি হবে এবং এসব কারণে ঝগড়া ফাসাদ, মতবিরোধ, বিদ্বেষ, লড়াই ও স্বার্থপরতা দেখা দিবে। সবিশেষ আরবজাতির কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, কেননা তখন অধিকাংশ মুসলমানই আরবের অধিবাসী ছিলো।

فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ مَاجُوْجَ مِثْلُ الخ ঃ প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেও নিয়েছেন। এবং কেউ কেউ রূপক (مجاز) অর্থেও নিয়েছেন যে, প্রাচীরটি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলঅমত আরবজাতির অধঃপতনরূপে প্রকাশিত হবে।

একটি تَعَارُض (বৈপরীত্ব) ও তার সমাধান ঃ

তবে প্রকৃত অর্থ (معنى حقيقى) উদ্দেশ্য নিলে তিরযিমীর অপর এক বর্ণনার সাথে বৈপরিত্ব দেখা দেয়। বর্ণনাটি এই–

عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . فى السد قال يحفرونه كل يوم حتى اذا كادوا يخرقونه قال الذى عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كاشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله ان يبعثهم على الناس قال الذى عبيهم ارجعوا فستخرقونه غدا انشاء الله واستثنى ق ال فيرتعون فيجدون لهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس (روى الترمذى فى تفسير سورة الكهف)

অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে তারা এ লৌহপ্রাচীরের প্রান্ত সীমার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তখন তারা একথা বলে ফিরে যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়কেবা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ তা'আলা থেকে তা মেরামতের এ ধারণা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহর ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে

বলবেঃ "ইনশা আল্লাহ" আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে ওপারে চলেয যাবো। (আল্লাহর নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তাওফীক হয়ে যাবে।) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে।

উক্ত বৈপরিত্বে সমাধান হলো, ইমাম তিরযিমী উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর হাদীসের স্তর সম্পর্কে বলেছেন, هذا حديث حسن غريب انما نعرف من هذا الوجه مثل هذا অর্থাৎ হাদীসটি হাসান, গরীব। আমরা এই সনদেই এরকম বিস্ময়কর কথা জেনেছি।'

হাফেজ ইবনে কাছীর তার তাফসীরের মধ্যে উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন–

واسناده جيد قوى ولكن متنه فى رفعه نكارة لأن ظاهر الأية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتفاعه ولا من ولا من نقبه لإحكام بناءه وصلابته وشدته ولكن هذا قدروى عن كعب الأخبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه الا القليل فيقولون غدا نفتحه فيأتون من الغد وقدعاد كما كان فيلحسونه ويقولون غدا نفتحه ويلهمون ان يقولوا إن شاء الله فيصبحون و هو كما فارقوه فيفتحونه وهذا متجه ولعل أباهريرة تلقاه من كعب فإنه كان كثيرا ماكان يجالسه ويحدثه فحدث به أبوهريرة فتوهم بعض الرواة عنه انه مرفوع فرفعه ـ

অর্থাৎ তার সনদ সুদৃঢ়। কিন্তু হাদীসকে যহযরত আবু হোরায়রা কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিসবত করার মধ্যে এক ধরনের খাপছাড়া মনে হচ্ছে। কেনান কুরআন মজীদের فما اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا আয়াতটি দ্বারা বোঝা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ যুলকারনাইনের দেয়ালের উপর চড়তে পারে না এবং তাকে সম্পূর্ণ খুঁদতেও পারে না। পকৃত ব্যাপার হলো, হুবহু এ ধরনের একটি ইসরাঈলী কাহিনী কা'ব আহ্‌বার থেকে বর্ণিত আছে, যেখানে সকল কথা এভাবেই উল্লেখ আছে। হযরত আবু হোরায়রা প্রায় সময় কা'ব আহ্‌বার থেকে ইসরাঈলী কেচ্ছা-কাহিনী শুনতেন। সেটিকেই তিনি ইসরাঈলী বর্ণনা হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। আর এটাকে পরবর্তী রাবী ধরে নিয়েছেন, এটা আবু হুরায়রা রাযি. কিংবা রাসূল ﷺ এর বর্ণনা। মূলতঃ এটা রাবীর সন্দেহ।

ইবনু কাছীর البداية والنهاية গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন–

فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظا وإنما هو ماخوذ عن كعب الاحبار كما قاله بعضهم فقد استرحنا من المؤنة وإن كان محفوظا فيكون محمولا على أن ضيعهم هذا يكون فى آخر الزمان عند اقتراب خروجهم كما هو المروى عن كعب الاحبار او يكون المراد بقوله وما استطاعوا له نقبا اى نا فذا منه فلا ينفى ان يلحسوه ولا ينفذوه ـ

অর্থাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নয়, বরং কা'ব আহ্‌বাবের বর্ণনা, তবে এটা যে ধতব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকার নাইন প্রাচীরটি নির্মান করেছিলেন। কাজেই এতে কোন বৈপরিত্য নেই তাছাড়া আরো বলা যায় যে, কুরআনে ছিদ্র বলে এপার ওপার ছিদ্র বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার-ওপার হবে।

সুতরাং উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকেত তিরমিযী শরীফে উক্ত হাদীস এবং আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه এর মাঝেও সামঞ্জস্যবিধান হয়ে যায়।

عَقْدِ تِسْعِيْنَ এবং عَقْدِهٖ عَشَرَه এর সূরত ঃ

وَعَقْدَ عَشْرًا ঃ আরবদের অভ্যাস ছিলো যে, নিজেদের আঙ্গুল দ্বারা বিভিন্ন সূরত বানিয়ে বিভিন্ন জিনিস গণনা করতো। প্রত্যেক গণনার জন্য তাদের নির্দিষ্ট একটা সূরত ছিলো। যেমন 'দশ' এর জন্য সূরত ছিলো এর কম যে, ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলকে বৃত্তের ন্যায় করে শাহাদাত আঙ্গুলের মাথাকে বৃদ্ধাঙ্গুলের গিরার নীচে রাখা।

عَقْدِ تِسْعِيْن হলো, ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের মাথাকে সেই আঙ্গুলের গোড়াতে খুব মিলিয়ে রাখা। যা দেখতে অনেকটা সাপের কুণ্ডুলির মত দেখায়।

عَقْد مِأة এর সূরতে عَقْد تِسْعِيْن এর মতই। পার্থক্য হলো, عَقْدِ مِأة বাম হাতের মাধ্যমে হয়। আর عَقْد تِسْعِيْن বাম হাত দ্বারা (তাকমিলাহ)

ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয়

তাদের সত্যিকার পরিচয় কি এবং বর্তমানে কোন দেশের কোথায় কিভাবে তারা অবস্থান করে তাদের বর্তমান পরিচয় কি– তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। সংক্ষেপে এ সম্পর্কে অনেকগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত রয়েছে, যেমন

(১) তার এক বিঘত লম্বা আকৃতির এক অদ্ভুত মাখলূক।

(২) তারা আদম ও হাওয়া উভয়ের বংশধর নয় বরং তারা শুধু হযরত আদম আ. থেকে। তাই তারা হলো এক ধরণের بَرْزَخِي مَخْلُوق বা বরযখী সৃষ্টি।

(৩) তারা এমন এক অদ্ভুত প্রাণী যাদের এক কান হয় উড়না আরেক কান হয় বিছানা।

হাফেয ইবনে কাছীর এসব বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন–

وَهٰذَا قَوْلٌ غَرِيْبٌ جِدًّا لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ لَا مِنْ عَقْلٍ وَلَا نَقْلٍ وَلَا يَجُوْزُ الْاِعْتِمَادُ مِنْهَا عَلٰى مَا يُحْكِيْهِ بَعْضُ اَهْلِ الْكِتَابِ لِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ الْمُفْتَعِلَة

অর্থাৎ এ এক বিরল ও ভিত্তিহীন কথা। আকল ও নকল কিছুই তকার সমর্থন করে না। আহলে কিতাবদের কেউ কেউ এ সম্পর্কে যেসব বর্ণনা দিয়েছেন। সেগুলোর ভিত্তি করা যাবে না। যেহেতু তাদের নিকট এরূপ স্বপ্রণোদিত বহু বর্ণনা রয়েছে।

মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামর মতে ইয়াজুজ-মাজুজ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নূহ আ. এর সন্তান-সন্তুতি। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াফেস ইবনে নূহেরু বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, ইয়াফেসের বংশধর নূহ আ. এর আমল থেকে যুলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূর-দূরান্তের বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিলো। যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজুজ-মাজুজ, তাদের ক্ষেত্রে এটা জরুরী নয় যে, তারা সবাই যুলকারনাইনের প্রাচীরের ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু তাদেরই নাম যারা বর্বর, অসভ্য ও রক্তপিপাসু, জালেম। মোগল, তুর্কী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ করেছে, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নামের বাইরে। (আল বিদায়া)

কারো কারো মতে مَاجُوج এর মূল নাম ছিলো (موگ) মগ, তা থেকে হয়ে (میگاگ) মেগাগ, তা থেকে হয়েছে (مَاجُوج) মাজুজ। আর (یاجوج) ইয়াজুজের মূল নাম ছিলো (یواچی) ইউওয়াচী, সেখান থেকে হয়েছে (یواجی) ইউয়াজী, সেখান থেকে হয়েছে (یوگاگ) ইউগাগ, সেখান থেকে হয়েছে (یاجوج) ইয়াজুজ।

হাদীসমূহে ইয়াজুজ-মাজুস সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যঃ

ইবনু কাছীর বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনগণের চাইতে অনেকগুণ বেশী, কম পক্ষে এক ও দশের ব্যবধান। ইয়াজুজ-মজুজের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র যুলকারনাইনের প্রাচীরের কারণে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তারা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবেই আবদ্ধ থাকবে। তাদের বের হওয়ার সময় মাহদী আ. আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের আগমণের পর হবে, যকন ঈসা আ. অবতরণ করে দাজ্জালের নির্বনকার্য সমাপ্ত করবেন। (মুসলিম)

ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্ত হওয়ার সময় যুলকারনাইনের প্রচীর বিধবস্তু হয়ে সমতল ভূমির সমান হয়ে যাবে। তখন ইয়াজুজ-মাজুজের একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে পিছলে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠীর সাধারণ জনবসতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের মোকাবেলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। হযরত ঈসা আ. ও আল্লাহর আদেশে মুসলমানদেকে সাথে নিয়ে তুর পাহাড়ে আশ্রয় নিবেন এবং যেখানে যেখানে কেল্লা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। পানাহারের রসদ-সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার জীবনধারনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মূল্য আকাশকুম্বী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে। এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে। (মুসলিম)

হযরহ ঈসা আ. ও তার সঙ্গীদের দোয়ায় এই পঙ্গপাল সদৃশ অগণিত লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দুরূহ হয়ে পড়বে। (মুসলিম)

অতঃপর ঈসা আ. ও তার সঙ্গীদেরই দোয়ায় তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অথবা অদৃশ্য করে দেওয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূ পৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক-সাফ করা হবে। (মুসলিম)

এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ভূপৃষ্ঠ তকার বরকতসমূহ উদগীরণ করে দেবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কাউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে।(মুসলিম) শান্তি ও শৃঙ্খলার সময় কা'বা গৃহে হজ্ব ও উমরাহ অব্যাহত থাকবে। ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে উল্লেখিত তথ্যগুলো হাদীস শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলোর পতি বিশ্বাস রাখা এবং বিরোধিতা করা নাজায়েয।(আহমদ,)

ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হয়ে গেছে কি ?

কুরতুবী নিজের তাফসীরগ্রন্থে সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের বাইশটি গোত্রের মধ্য থেকে দেওয়া হয়েছে। একটি গোত্র প্রাচীরের ওপারে রয়ে গেছে। আর সে গোত্রটি হলো তুর্ক। এরপর কুরতুবী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে খাপ খেয়ে যায়। শেষ যামানায় তাদের সাথে যুদ্ধের কথা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। অতঃপর কুরতুবী বলেন, বর্তমান সশয় তুর্কজাতির বিপুল সংখ্যক লোক মুসলনামদের মোকাবেলা করার জন্য অগ্রসর মান। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনি মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারেন। মনে হয় যেন তারাই ইয়াজুজ-মাজুজ অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল। (কুরতুবী খণ্ড, ১১, পৃষ্ঠা ৫৮)

কুরতুবীর সময় কাল ষষ্ঠ হিজরী। তখন তাতারীদের ফেতনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী খেলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামী ইতিহাসে তাদের এ ফেতনা সুবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর; তাও প্রসিদ্ধ। তাই মূলতঃ কুরতুবী তাতেরকে ইযাজুজ-মাজুজের সমতুল্য ও অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাদের ফেতনাকে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব বলেননি, যা কেয়ামতের অন্যতম আলামত। কেননা মুসলিম শরীফের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ঈসা আ. এর অবতরণের পর তাঁর আমলে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে। একারণেই আল্লামা আলুসী তাফসীর রূহুল মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইয়াজুজ মাজুজ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন, এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য রকমের পথভ্রষ্টতা এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফেতনা ইয়াজুজ মাজুজের ফেতনার সমতূল্য। (তাফসীরে রুহুল মা'আনী খণ্ড ১৬ পৃষ্ঠা ৪৪)

বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদ বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন অথবা উভয়কেই ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করেন, তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলুসীর মতই হয় যে, তাদের ফেতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনার সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি তাদেরকেই কেয়ামতের আলামতরূপে কুরআন ও হাদীসে বর্নিত ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হিসাবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় ঈসা আ. এর অবতরণের পর বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতেই ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে। (মা'আরিফুল কুরআন)

যুলকারনাইনের প্রাচী (سَدِّ ذُ والْقَرْنَيْن) কোতায় অবস্থিত ?

মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী রহ. 'আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা আ. গ্রন্থে ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্তা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়ায়েতের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। তিনি বলেনঃ দুস্কৃতকারী ও বর্বর মানুষদের লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পৃথিবীতে এক নয়– বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নির্মান করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্ব প্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য আবু হাইয়্যান আন্দালুসী (ইরানের শাহী দরবারের ঐতিহাসিক) বারশ' মাইল বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাগ 'ফুগফুর'। এর নির্মাণের তারিখ আদম আ. এর অবতরণের তিন হাজার চারশ' ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা "আনকুদাহ" এবং তুর্কীরা 'বুরকুরা' বলে থাকে। তিনি কারও বলেন, এমনি ধরনের কারও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়।

মাওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ারী রহ. কাসাসুল কুরআনে বিস্তারিতবাবে শাহ সাহেবের উপরিউক্ত বর্ণনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছে। এর সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ–

ইয়াজুজ-মাজুজের লুণ্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল। অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বক্ষণ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মান করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর। উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযীর নিকটে অবস্থিত। এর অবস্থানস্থলের নাম দরবন্দ। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জার্মেনীও তার গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের সম্রাট কাষ্টাইনের দূত ক্ল্যাফছুও তার ভ্রমনকাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসাবে তৈমুরের দরবারে পৌঁছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন, বাবুল হাদীদের প্রাচীর মুসেলের ঐ পথে অবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান। (তাফসীরে জাওয়াহেরুল কুরআন খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৯৮)

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল আবওয়ার নামে খ্যাত। ইয়াবুত হমভী 'মুজামুল বুলদানে', ইদরিসী 'জুগরাফিয়ায়-য় এবং বুস্তানী 'দায়িরাতুল মা'আরিফ'–এ এর বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ–

দাজিস্তানে দরবন্দ রাশিয়ার একটি শহর। শহরটি কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি তিন ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে তেতাল্লিশ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে দরবন্দে নওশের ওয়া নামে অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল আবওয়াব নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল আবওয়ার থেকে পশ্চিম দিকে কাফেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ আছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে কাফফায অথবা জাবালে কোফা অথবা কাফ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এ সম্পর্কে বলেন ঃ

এবং এরই (অর্থাৎ বাবুল আবওয়াবের প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবত পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি নির্মাণ করেছে। এর নির্মাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোনও বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কেউ কেউ একেত সিকান্দার (যুলকারনাইন) এর প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ার প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকুত বলেন ঃ গলিত তামা দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছে। (দায়িরাতুল মা'আরিফ খণ্ড ৭. পৃষ্ঠা ৬৫)

এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্য নির্মিত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে যুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা, উভয়স্থানের নাম দরবন্দ এবং উভয়স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে

সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়– দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কুরআন মজীদের ইংগিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকার নাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত।

এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাখরী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকার নাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল আবওয়াবের দরবন্দ স্থঅনে কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারী ও তিরমিযের দরবন্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুলকার নাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবত দরবন্দ নাম দ্বারা প্রতারিত হয়েচেন। এখন যুলকারনাইনের অবস্থানস্থল প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ, দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে। (এক) দাগিস্তান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল–আবওয়াবের দরবন্দের প্রাচীন এবং (দুই) আরও উচ্চে কাফকায অথবা কাফ অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর ঃ উভয়স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে।

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর। (কাসাসুল কুরআন, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِفَةِ الْمَارِقَةِ ص-٤٢

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫. মারিকা বা খারিজীদের বিবরণ

حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقْرَئُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ ذَرٍّ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِىَ فِىْ غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ وَصَفَ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ يَقْرَئُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، إِنَّمَا هُمُ الْخَوَارِجُ وَالْحَرُوْرِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْخَوَارِجِ .

৩৪. আবূ কুরায়ব .... আবদুল্লাহ রাযি. খেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শেষ যামানায় এক সম্প্রদায় বের হবে যারা বয়সে হবে নবীন, জ্ঞান–বুদ্ধিতে হবে কাঁচা ও নির্বোধ তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠ ও অতিক্রম করবে না, তারা সৃষ্টির সেরা নবী কারীম ﷺ এর কথা বলবে কিন্তু দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে তীর শীকারকে ছেদ করে বের হয়ে যায়। এ বিষয়ে আলী, আবূ সাঈদ এবং আবূ যার্‌র রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

যাদের পরিচয় বর্ণনা করতে যেয়ে নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠও অতিক্রম করবে না, দীন থেকে তারা বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ছেদ করে বেরিয়ে যায় –এদের সম্পর্কে অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে এরা হল হার্‌রী প্রমুখ খারিজী সম্প্রদায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ ঃ এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফেতনাটি আখেরী যামানায় প্রকাশ পবে। অথচ ফেতনাটি হযরত আলী রাযি. এর যমানাতেই পুরোদমে প্রকাশ পেয়েছিল। এই বৈপরীত্যের সমাধান কল্পে একাধিক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। যথা–

(১) আখেরী যামানা দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের যামানা উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বক্তব্যের পেছনেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের আখেরী যুগ তো একশ' বছর পর্যন্ত ছিল। অথচ ফেতনা আরও বহুপূর্বে তথা আলী রাযি. এর যুগেই পকাশ পেয়েছে।

(২) আখেরী যামানা দ্বারা উদ্দেশ্য, خِلَافَت عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّة এর আখেরী কাল। তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফে এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

اَلْخِلَافَةُ فِى أُمَّتِى ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَالِكَ (واللفظ للترمذى)

আর খারেজীদের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে আলী রাযি. খেলাফতের শেষ দিকে, ২৮ হিজরীতে। হযরত নানুতুবী রহ. বুখারী শরীফের হাশিয়াতে লিখেন–

قُلْتُ لَايَرِدُ السُّوَالُ إِنْ قُلْنَا بِتَعَدُّدِ خُرُوْجِ الْخَوَارِجِ وَقَدْ وَقَعَ خُرُوْجُهُمْ مِرَارًا

অর্থাৎ যদি বলা হয়, খারেজীদের আত্ম প্রকাশ বার বার হবে, তাহলে আর কোনও প্রশ্ন থাকে না। তাছাড়া তারা কয়েকবার আত্মপ্রকাশ ও করেছিল। (বুখারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৩৪)

يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ الخ ঃ অর্থাৎ তারা অত্যান্ত সুমিষ্ট সূরে কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং নিজেদেরকে কুরআনের অধিকারী বলে দাবী করবে। কিন্তু বদ'ইতিকাদ ও দুষ্টুমি লুকায়িত থাকার কারণে তাদের অন্তরে সুন্দর তিলাওয়াতের কোন প্রভাব পড়বে না। কুরআনের উপর তাঁদের অন্তরে সুন্দর তিলাওয়াতের কোন প্রভাব পড়বে না। কুরআনের উপর তাঁদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে না। রবং তাদের বাতিল উক্তি ও মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কুরআন দ্বারা দলীল দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং আয়াতের অপব্যাখ্যা করবে।

لَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ঃ অর্থাৎ তাদের অন্তরে এর কোন প্রভাব পড়বে না। অথবা কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর অতিক্রম করবে না অর্থ আল্লাহর দরবারে পৌঁছবে না।

يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ঃ এখানে خَيْر শব্দ بَرِيَّة শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। যার অর্থ হল, তারা সর্বোত্তম মানুষের কথা তথা রাসূলের হাদীস বর্ণনা করবে। কিন্তু বুখারী শরীফ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০২৪ ও ইবনু মাযাহ পৃঃ কে يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ এর স্থলে مِنْ قَوْلِهِ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ এসেছে। তখন خَيْر শব্দটি قَوْل এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবে। যার মর্মার্থ হবে, লোকজনের ভালো কথা বর্ণনা করবে তথা উল্লেখিত লোকগুলো ওই সমস্ত কথা বর্ণনা করবে যেগুলো সাধারণত নেক মানুষের যবানে জারি থাকে। তাহল কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ। তারা কথায় কথায় কুরআনের আয়াত বলবে এবং নিজেদের ভ্রষ্টতা প্রতিষ্টা করার উপস্থাপিত আয়াতের অপব্যাক্যা করবে। (মেরকাত, তোহফাহ)

ইবনে কাছীর البداية والنهاية গ্রন্থে তাদের উল্লেখিত চরিত্রের একটি চিত্র ধরেন। এভাবে রাত্রিজাগরণে তাদের চেহারা মলিন হয়ে গিয়েছিল। অধিক সিজদার ফলে তাদের কপালে দাগ পড়েছিল। পায়ের হাটু ও হাতের কনুই ইবাদতের চিহ্ন বহন করত। সাদা ধবধবে কাপড় পরিধান করত। অর্থাৎ তারা ইবাদত-বন্দেগীতে অত্যন্ত অগ্রসর ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ইসলামী ইলমের বড় অভাব ছিল। এই অভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, কারণ তারা রাযূল ﷺ এর পর ইসলামী ইলমের ধারক-বাহকদের অনুসরণ বা তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জনের আন্তরিক চেষ্টা কখনও করেনি। পক্ষান্তরে তারা তাদের মন-মানসিকতা ও মনোবৃত্তির অনুসরণ কতে গিয়ে কুরআন মজীদের অপব্যাক্যা করত এবং সাহাবায়ে কিরামের আদর্শকে অবহেলা করত। পরিণতিতে তাদের মনে অনাস্থা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্ম নেয়। তাদের বাহ্যিক ইবাদত-বন্দেগীর অহমিকা তাদেরকে হক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ الخ ঃ এখানে 'দ্বীন' দ্বারা উদ্দেশ্য সমকালীন ইমাম এবং হক্কানী উলামায়ে কিরামের অনুসরণ। তার ধনুক থেকে যেবাবে ছিটকে পড়ে এরাও উলামায়ে হক থেকে এভাবে ছিটকে পড়েছিল। বুখারী ও ইবনে মাজাহতে এসেছে– يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ সেখানে ইসলাম দ্বারা পারিভাষিক ইসলাম উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল, ইসলাম শব্দের অর্থ অনুগত্য করা। অর্থাৎ তারা উলামায়ে হকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে পড়বে।

اَلْخَوَارِجُ খাওয়ারেজ ঃ

নাম ও নামকরণ রহস্য ঃ এ সম্প্রদায়ের অনেকগুলো নাম আছে। যথা–

(১) اَلْخَوَارِجُ খাওয়ারেজ। শব্দটি خَارِج কিংবা خَارِجِيٌّ এর বহুবচন। اَلْخُرُوْجُ মাসদার থেকে উৎকলিত। অর্থ প্রস্থান করা। ত্যাগ করা, অবাধ্য হওয়া, বিদ্রোহ করা, এই শব্দে এদেরকে নামকরণ করা হয়েছে। যেহেতু মিসকীন যুদ্ধের সময় সালিশকে কেন্দ্র করে আলী রাযি. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এজন্যই তাদেরকে দলত্যাগী বা খারেজী বলা হয়। আসলে প্রত্যেক যুগের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত বৈধ ইমাম (الامام الحق) বা খলীফার বিদ্রোহী কিংবা আনুগত্য বর্জনকারী ব্যক্তিই খারেজী নামে অভিহিত।

(২) اَلْمَارِقَةُ আলমারেকা ঃ اَلْمُرُوْقُ থেকে উদগত। যার অর্থ সটকে পড়া, দ্রুত বেরিয়ে পড়া। কারণ, তীর যেমন ধনুক থেকে ছিটকে পড়ে এরাও তেমনি দ্বীন থেকে ছিটকে পড়েছিল।

(৩) اَلْحَرُوْرِيَّةُ আল-হারুরিয়া ঃ কূফার ছোট শহর কিংবা গ্রাম 'হারূরা'র দিকে নিসবত করে এই নাম রাখা হয়েছে। এরাও হযরত আলী রাযি. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আলী রাযি. যখন সিফফীন থেকে কূফায় ফিরে আসছিল, তখন এরা হারুরা নামক স্থানে সংঘবদ্ধ হয়েছিল।

(৪) اَلْبُغَاةُ আল বুগাত ঃ আরবী بَاغٍ শব্দের বহুবচন। অর্থ বিদ্রোহী। খারিজীরা হযরত আলী রাযি. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তাই এ শব্দে নামকরণ করা হয়েছে।

(৫) اَلْحَكَمِيَّةُ اَوِالْمُحَكِّمِيَّةُ আল হাকমিয়্যা বা আল-মুহাককিয়া ঃ এ দলটির সার্বক্ষণিক শ্লোগানই ছিল إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ তাই এই "حُكْم" শব্দ থেকেই 'হাকামিয়্যা'র উৎপত্তি। অথবা اَلتَّحْكِيم (সালিশ নির্ধারণ করা) শব্দ থেকে তাদেরকে 'মুহাককিমা' বলে।

(৬) اَلشُّرَاةُ আশ-শুরাত ঃ এটি شَارٍ এর বহুবচন। অর্থ ক্রেতা বা বিক্রেতা। এদের ধারণা, এরা তাদের জীবনকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এ অর্থেই এদেরকে اَلشُّرَاةُ বলা হয়।

(৭) اَلنَّاصِبِىُّ اَوِ النَّوَاصِبُ আন-নাসিবী বা আন-নাওয়াসিব ঃ نَاصِب শব্দের বহুবচন نَوَاصِب। অর্থ কঠিন, ক্লান্তিকর। এই ফিরকাটি যেহেতু হযরত আলী রাযি. এর বিরোধতার খুবই কঠোর, তাই উক্ত শব্দদ্বয় দ্বারাও তাদেরকে অভিহিত করা হয়।

খারিজীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

খারেজীরা হল শী'আ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দল। সিফফীন যুদ্ধকালে আলী রাযি. এবং মু'আবিয়া রাযি. যখন নিজেদের মতবিরোধ নিরসনে দু'জন লোককে সালিশ নিযুক্তিতে সম্মত হন, ঠিক সে সময় এ দলের উদ্ভব হয়। তখন পর্যন্ত এরা আলী রাযি. এর সমর্থক ছিল। কিন্তু সালিফ নিযুক্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে হঠাৎ এরা বিগড়ে যায়। তারা বলে, আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে মানুষকে ফয়সালাকারী স্বীকার করে আপনি কাফের হয়ে গেছেন। এভাবে তারা আলী রাযি. এর ঘোর বিরোধীতা শুরু করে এবং নানা স্থানে গোলযোগ করতে থাকে। পরিশেষে আলী রাযি. তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হন, এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করেন। নাহ্‌রাওয়ানের ধ্বংসের হাত থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন খারেজী রক্ষা পায়। তারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করে এবং পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য তারা আলী রাযি. ও মু'আবিয়া রাযি. এবং আমর ইবনুল আস রাযি. কে দোষী সাব্যস্ত করে। তারা তাঁদের হত্যা করে। রাজনৈতিক অস্থিরতা দূরীকরণের ষড়যন্ত্র করে। তাদের ষড়যন্ত্রেই আলী রাযি. আব্দুর রহমান ইবনে মুলযিম নামক জনৈক খারেজীর হাতে শহীদ হন। তারা মু'আবিয়া রাযি. ও আ'মর রাযি. কেও আক্রমণ করেছিল। কিন্তু তাঁদের হত্যা করতে পারেনি।

খারেজীরা উমাইয়া এবং হাশেমী উভয়েরই বিরুদ্ধাচরণ করে। তারা উগ্রপন্থী মতবাদ প্রচার করতে থাকে। এবং যারাই এমতবাদ অস্বীকার করত, তাদের বিরুদ্ধেই তারা অস্ত্রধারণ করত। মু'আবিয়া রাযি. এর মৃত্যুর পর ইয়াযীদের শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রকট গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। সেই সুযোগে খারেজীরা শক্তিশালী হয়ে উঠে। কিন্তু খলীফা আব্দুল মালিক তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। ফলে উমাইয়া আমলে তারা কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পায়নি। এতে তারা আফ্রিকা পালিয়ে যায় এবং সেখানে বারবারদের মধ্যে তাদের মতবাদ প্রচার করতে থাকে।

উমাইয়াদের পতনের যুগে তারা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং দ্বিতীয় মারওয়ানের স্বল্পকালীন শাসনামলে তারা গোলযোগ শুরু করে কিন্তু মারওয়ান তাদেকে কঠোর হস্তে দমন করেন। পরে আব্বাসীদের সাতে মারওয়ানের সংগ্রামের সযোগে খারেচীরা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে।

আব্বাসী আমলেও তারা মুসলিম বিশ্বের নানা স্থানে বিদ্রোহ করে এবং গোলযোগ সৃষ্টি করে কিন্তু আব্বাসী খলীফাগণও তাদের দমন করেন। আব্বাসী আমলে আফ্রিকায় পুনঃপুনঃ খারিজী বিদ্রেহ হয় কিন্তু তৎকালীন শাসকগণ তাদের কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে দেননি। মিসরে ফাতেমী খলীফাগণও খারেজীদের দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে কোন স্থানে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু খারেজীরা ছিরো চরম কঠোর মনোভাবপন্ন, উপবন্তু তারা নিজেদের থেকে ভিন্ন মতবাদ পোষণকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার সমর্থক ছিল, তাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা খুন-খারাবী চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় শাসনামলে তাদের শক্তি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। (ইলমুর-রিজাল, তারিখূল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যাহ ইত্যাদি।)

খারেজীদের বিভিন্ন ফেরকা

শী'আদের মত খারেজীরাও দল-উপদলে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল–

(১) المحكمة। আল মাহকামাহ (২) الازارقه। আল-আযারিকা (৩) النجدات। আন নাজদাত (৪) الصفرية। আস-সাফারিয়্যাহ (৫) البيهسية। আল-বায়হাসিয়্যাহ (৬) الحازمية। আল-হাযিমিয়্যা (৭) الثعالبه। আছ–ছা'আলিবাহ (৮) الاباضية। আল-ইবাযিয়্যাহ (৯) العجاردة। আল-আ'জারিদা (১০) الاخنسية। আল-আখনাসিয়্যা (১১) الابراهمية। আল-ইবরাহিমিয়্যাহ (১২) الرشيدية। আর-রশীদিয়্যা প্রভৃতি। এরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হলেও সকলেরই মূলনীতি ছিল এক।

মূল প্রতিষ্ঠাতা ঃ শাহরাস্তানী লিখেছেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন আলী রাযি. এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যারা বিদ্রোহ করে, তারা সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দলভুক্ত একটি জামা'আত। অধিকন্তু তাঁর বিরোধিতা ইসলাম থেকে ছিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর ও অগ্রনী ছিল আশআছ ইবনে কায়স আল-কিন্দী, মিসআর ইবনে ফাদাক আত-তাইমী, যায়দ ইবনে হুসাইন আত-তাঈ। তারাই সর্বপ্রথম আলী রাযি. এর বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলেছিল। (তারীখুল মাযাহিব)

খারেজীদের মৌলিক কিছু মতবাদ ও আকীদা

১. খারেজীরা আবু বকর ও উমর রাযি এর খেলাফতকে বৈধ স্বীকার করত কিন্তু তাদের মতে খেলাফতের শেষের দিকে উসমান রাযি. ন্যায় ও সত্যচ্যুত হয়েছেন। তিনি হত্যা বা পদচ্যুতির যোগ্য ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া মানুষবে সালিশ নিযুক্ত করে আলী রাযি. ও কবীরা গুণাহ করেছেন। উপরন্তু উভয় সালিশ অর্থাৎ আ'মর ইবনুল আস রাযি. ও আবু মূসা আল-আশ'আরী রাযি. এবং তাদের সালিশীতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ আলী রাযি. এবং মু'আবিয়া রাযি, এর সকল সঙ্গীই গুণাহগার ছিল। তালহা, যুবায়র এবং আয়শা রাযি. সমেত জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই বিরাট পাপের ভাগী ছিলেন।

২. তাদের মতে সকল গুণাহ কুফরের সমার্থক। কবীরা গুণাহকারীকে তারা কাফের বলে আখ্যায়িত করে। তাই উপরোকল্লিকিত সকল বুযুর্গকেই তার প্রকাশ্য কাফের বলতো, এমনকি তাঁদেরকে অভিসম্পাত করবে এবং গালি-গালাজ করতেও এরা ভয় পেতো না। উপরন্তু প্রথমত তারা পাপযুক্ত নয়; দ্বিতীয়ত পূর্বোক্ত সাহাবাগণকে সাধারণ মুসলমানরা কেবল মুমিনই স্বীকার করত না, বরং নিজেদের নেতা বলেও গ্রহণ করত।

৩. খেলাফত সম্পর্কে তাদের মত ছিল এই যে, কেবল মুসলমানদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতেই তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৪. তাদের মতে খলীফা কুরাইশী হতে হবে এমন কোনও কথা নেই– যেমনটি অন্যরা বলে। তবে তারা অ-কুরাইশী খলীফা হওয়াকেই বেশী প্রাধান্য দেয়, যাতে তাদের মতের বিপরীত হলে খলীফাকে হত্যা করা সহজ হয়।

৫. পবিত্র কুরআনকে তারা ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস সিহেবে মানতো। কিন্তু হাদীস এবং ইজমার ক্ষেত্রে তাদের মত সাধারণ মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

৬. এদের একটি বড় দল যাদেরকে (النجدات) আন-নাজদাত বলা হয়। মনে করত যে, খেলাফত প্রতিষ্ঠা আদতেই অপ্রয়োজনীয়, এর কোন দরকার নেই। মুসলমানদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সামাজিকভাবে কাজ করা উচিত। অবশ্য তারা যদি খলীফা নির্বাচন করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। তাও করতে পারে। এটা করাও বৈধ।

৭. এদের আরেকটি বড় দল (الازارقه) আল-আযারিকা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে মুশরিক বলতো। তাদের মতে নিজেদের ছাড়া আর কারো আযানে সাড়া দেওয়া খারেজীদের জন্য জায়েয নয়। অন্য কারো জবেহ করা পশু তাদের জন্য হালাল নয়, তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও জায়েয নয়। খারিজী আর অ-খারিজী একে অন্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরা অন্য সব মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরযে আইন মনে করত। তাদের স্ত্রী-পুত্র হত্যা করা এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করাকে মুবাহ মনে করত। তাদের নিজেদের মধ্যকার যে-সব লোক এ জিহাদে অংশগ্রহণ করে না। তাদেরকেও কাফির মনে করত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের কঠোরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তাদের কাছে অমুসলিমরা অধিক নিরাপত্তা লাভ করত। এ দলটি ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে কট্টরপন্থী দল।

৮. এদের সবচেয়ে নমনীয় দল ছিল (الاباضيه) আল-ইবাযিয়্যাহ; এরা সাধারণ মুসলমানকে কাফির বললেও মুশরিক বলা থেকে বিরত থাকতো। তারা বলতো 'এরা মুমিন নয়।' অবশ্য তারা সাধারণ মুসলমানদের সাক্ষ্য গ্রহণ করত। এদের সাথে বিয়ে-শাদী এবং উত্তরাধিকারকে বৈধ জ্ঞান করত। এরা তাদের অঞ্চলকে দারুল কুফর বা দারুল হরব নয়; বরং দারুত-তাওহীদ মনে করত। অবশ্য সরকারের কেন্দ্রকে এরা দারুত-তাওহীদ মনে করত না। গোপনে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করাকে এরা অবৈধ মনে করত। অবশ্য প্রকাশ্যে যুদ্ধ করাকে তারা বৈধ মনে করত। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, লণ্ডন সংস্করণ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮-১০০; মুরুযুয যাহার ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯১, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক পৃষ্ঠা ৭২-১১৩)

খারেজীরা কি কাফের ?

এরা যে একটি নিন্দিত ও ভ্রান্ত ফিরকা এতে উম্মতের কারো কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু তারা কি কাফের ? এ প্রশ্নে এসে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আমরা এ সুবাদে দু'রকম অভিমত পাই।

১. তারা বিদ্রোহী, ফাসেক, অপরাধী।

২. তারা কাফের। যারা তাদেরকে কাফের নয় বরং ফাসেক মনে করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা খাত্তাবী, ইমাম গাযালী, কাজী ইয়ায প্রমুখ। আর যারা কাফের মনে করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন শায়খ তকী উদ্দীন সুবকী, ইমাম তাবারী প্রমুখ, ইমাম বুখারীরও ঝোঁক এ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতি বলে অনুমিত হয়। তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, বিশুদ্ধ মত হল, তারা কাফের। ইমাম কুরতুবীও তদীয় গ্রন্থ المفهم -এ একথা বলেছেন।

যারা খাওয়ারেজদের تَكْفِيْر তথা কাফের মনে করেন তাদের দলীলসমূহ

(১) আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ الخ

(২) অপর হাদীসে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ অর্থাৎ তারা মাখলুকের মধ্যে নিকৃষ্টতর।

(৩) নবীজী ﷺ বলেছেন– لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَفِى لَفْظٍ ثَمُوْدَ

অর্থাৎ, তাদেরকে পেলে আ'দ/ছামুদ গোত্রের মত হত্যা করবো।

(৪) অন্যত্র তিনি বলেছেন– كِلَابُ اَهْلِ النَّارِ 'তারা জাহান্নামের কুকুর।'

(৫) তারা বিশিষ্ট সাহাবীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছিল। প্রকারান্তরে নবী কারীম ﷺ কেই অস্বীকার করা হয়। কেননা নবী কারীম ﷺ তাদেরকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

(৬) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, খাওয়ারেজদের কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট দলীল হল ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীস, যা হযরত আবু উমামাহ বর্ণনা করেছেন– قَدْكَانَ هٰؤُلَاۤ مُسْلِمِيْنَ فَصَارُوْا كُفَّارًا অর্থাৎ তারা মুসলমান ছিল অতঃপর কাফের হয়ে গিয়েছে।

যারা খারেজীদেরকে ফাসেক, বিদ্রোহী মনে করেন তাদের দলীল সমূহ

১. হযরত আলী রাযি. কে নাহরওয়ান অধিবাসীদের সম্পর্কে (তারা ছিল খাওয়ারেজ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তারা কি কাফের ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوْا 'তারা কি মুনাফিক ? তিনি বললেন–

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا، وَهٰؤُلَاءِ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا

'মুনাফিকরা খুব কম আল্লাহকে স্মরণ করে, অথচ এরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে স্মরণ করে।'

পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাহলে তারা কি ? এরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে স্মরণ করে।'

পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাহলে তারা কি ? তিনি উত্তরে দিলেন, قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوْا। 'তারা এমন এক সম্প্রদায়, ফিতনায় পতিত হওয়ার ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে।' (মিরকাত পৃ ঃ ১০৭ খণ্ড ৭)

২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে খারেজীদের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া কথা এবং তীর নিক্ষেপকারী কর্তৃক তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করার কথা বলার পর সবশেষে বলা হয়েছে– فَتَمَارٰى هَلْ يَرٰى شَيْئًا أَمْ لَا ? 'তখন সন্দেহ হল যে, সে কিছু দেখলো কিনা ?' এখানে تَمَارٰى অর্থ সন্দেহ। আর কারো ইসরামে প্রবেশের ব্যাপারে একীন অথচ বের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে এমন কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা যায় না।

হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. اكفار الملحدين। গ্রন্থে বলেন, হযরত আলী রাযি. থেকে উল্লেখিত বর্ণনা যদি প্রমাণিত থেকে থাকে, তবে তা খারেজীদের কুফর প্রমাণিত হতে পারে এমন আকীদা সম্পর্কে হযরত আলী রাযি. এর অবগত না হওয়ার ভিত্তিতেই হয়ে থাকবে। তা দ্বারা দলীল দেওয়া চলবে না। এ কারণে যে, উপরিউক্ত হাদীসের কোন কোন طرق এ لم يعلق منه بشئ বাক্য এসেছে। সবগুলো طرق এর সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, মূল সন্দেহ ছিল তীরের উপরিভাগে শিকারের কোন রক্ত, গোশ্‌ত লেগে আছে কিনা সে ব্যাপারে।তারপর দেখা গেল, তীর বা তীরের কোন অংশেই শিকারের কোন চিহ্ন রেগে নেই। এমতাবস্থায় يتمارى উক্তিটি দ্বারা ইংগিত হবে যে, তাদের কতক ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের কিছুটা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লামা কুরতুবী المفهم। গ্রন্থে বলেন, খারেজীদের কাফের বলার উক্তিটি হাদীসে অধিকতর স্পষ্ট।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. اكفار الملحدين। গ্রন্থের অন্যত্র বলেন, "যারা কুরআনে বর্ণিত কোন نص صريح তথা স্পষ্ট বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করবে বা তা নিয়ে বিরোধ করবে, তাদের তাকফীরের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। অথবা সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত কোন ব্যাপক ও নিশ্চিত অর্থবোধক কোন হাদীস যার মাখসূস না হওয়া, তাতে কোনরূপ তাখসীস না থাকা এবং তার জাহেরী অর্থ গৃহত হওয়ার ব্যাপারে উলামা ও ফকীহদের ঐক্যমত রয়েছে– এমন কোন হাদীসকে তাখসীস করলেও তার ভিত্তিতে তাকফীর হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। যেমন খাওয়ারেজগণ কর্তৃক বিবাহিত যিনাকারী পুরুষ ও নারীদেরকে রজম সম্পর্কিত বিধানকে অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে তাকফীর করা।"

খাওয়ারেজদের তাকফীর সম্পর্কিত اكفار الملحدين। গ্রন্থে বর্ণিত উপরিউক্ত উলামায়ে কেরামর বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্টতঃ বোঝা গেল যে, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের একটা বিরাট অংশ তাদের তাকফীরের পক্ষে রয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আল্লামা খাত্তাবী বলেন, খাওয়ারিজগণ গোমরাহ হওয়া সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের একটা দল- এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে। আরও অনেকে জমহূরের মত তাদের তাকফীর না করার ব্যাপারে রয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাকফীর করার পক্ষে উপরিউক্ত নির্ভরযোগ্য বহুসংখ্যক উলামায়ে কেরামের মতামতকে বাদ দিয়ে কিভাবে ইজমা' সংঘটিত হওয়ার দাবী করা যায় তা কিছুটা বিবেচনার দাবী রাখে।

(ইসলামী আকীদা পৃষ্ঠা ২২৪-২২৫)

بَابُ فِى الْأَثَرَةِ وَمَا جَاءَ فِيهِ ص-٤٢

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬. পক্ষপাতিত্ব।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ـ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ـ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ إِسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِى، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتّٰى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ ـ قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ـ

৩৫. মাহমূদ ইবনে গায়লান .... উসায়দ ইবনে হুযায়র রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক আনসারী ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি অমুককে কর্মকর্তা নিয়োগ করেছেন কিন্তু আমাকে কর্মকর্তা বানালেন না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমারপ রে অচিরেই তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিতে দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করে যে পর্যন্ত না আমার সঙ্গে হাওযে কাওসারের পার্শ্বে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

إِسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا ঃ মাওলানা তাকী উসমানী লিখেন, এই فُلَان এর নাম কি, তা স্পষ্টভাবে কোন বর্ণনাতে আমি পাইনি। হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী রহ. ফতহুল বারীর ভূমিকাতে উল্লেখ করেন, প্রশ্নকারীর নাম ছিল উসাইদ ইবনে হুযাইর। আর যাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আ'মেল বানিয়েছেন তিনি হলেন হযরত আ'মর ইবনে আ'স রাযি.।'

কিন্তু ফতহুল বারীর মানাকিব (৭/১১৮) -এ তিনি বলেছেন, ؛ وَلَا أَدْرِى الْآنَ مِنْ أَيْنَ نَقَلْتُهُ অর্থাৎ আমার এ মুহূর্তে জানা নেই যে, আমি এটি কোথেকে নকল করেছি। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা উবাই বলেছেন, আনসারী সাহাবীর এই আমিরের পদ চাওয়া সম্ভবত إِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّى عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ أَحَدًا وَلَا أَحَدًا

أَحْرَصَ عَلَيْهِ -ঃ এই নিষেধ বর্ণিত হওয়ার পূর্বে ঘটেছে। কিংবা হতে পারে উক্ত নিষেধ বর্ণিত হওয়ার পর উক্ত সাহাবী আমীরের পদ চেয়ে, কিন্তু নিষেধের রেওয়ায়াতটি তাঁর কাছে পৌঁছেনি। এই ব্যক্তি আমীরত্বের পদ পাওয়ার পর রাসূল ﷺ অন্যদের ব্যাপারে যেরকম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, এর ব্যাপারে এরকম করেননি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, রাসূল ﷺ লক্ষ্য করেছেন। এই ব্যক্তির পদ চেয়েছে ধৈর্য শক্তির ত্রুটি থাকার কারণে। সে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমীর নির্বাচিত হচ্ছে দেখে ধৈর্য্য ধরে রাখতে পারে নি।(তাকমিলাহ ৩/৩৩৯)

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ঃ এই আনসারী সাহাবী যখন আমীরের পদ চেয়ে তখন রাসূল ﷺ سَتَرَوْنَ بعدى اثره বলেছেন এই উদ্দেশ্য যে, তিনি এর মাধ্যমে একথার প্রতি স্পষ্ট ইংগিত দিলেন যে, অযোগ্য ব্যক্তিকে আমীরের পদ দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না। (তাকমিলাহ ৩/৩৭০)

হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন-

قلت معناه عندى إن هذه الاثرة لمصلحة لكن لما لم تصبروا على هذه فكيف تصبرون على ما يكون لغير مصلحة فانى آمركم فيها بالصبر ـ

অর্থাৎ আমার মতে হাদীসের মর্মার্থ হল, 'রাসূল ﷺ আনসারীকে সম্বোধ করে একথা বলছেন যে, আমার এই অগ্রাধিকার পদ্ধতির একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে রয়েছে। কিন্তু যখন তুমি এর উপর ধৈর্য্য ধরতে পারলেনা, তাহলে এই অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কিভাবে ধৈর্য্য ধারণ করবে না, যে অগ্রাধিকার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য হবে না। আমি তোমাদের এমন পরিস্থিতিতেও সবর করার শিক্ষা দিচ্ছি।' এই হাদীসে এদিকেও ইংগিত রয়েছে যে, খেলাফতের দায়িত্ব গাইরে আনসারীর মধ্যে থাকবে । (তাকমিলাহ ঃ ৩/৩৩৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالَ فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللّٰهَ الَّذِي لَكُمْ ـ قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ـ

৩৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার .... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, আমার পর তোমরা অচিরেই পক্ষপাতিত্ব এবং অপছন্দনীয় বহুবিধ বিষয় দেখতে পাবে। সাহাবীগণ বললেন, এমতাবস্থায় আপনি আমাদের কি করতে নির্দেশ দেন ? তিনি বললেন, তোমাদের উপর তাদের যে হক আছে তা আদায় করে দিও আর তোমাদের যে হক আছে সে বিষয়ে আল্লাহর কাছে চেয়ো। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অর্থাৎ তোমাদের শাসক যদি তোমাদের সাথে অগ্রাধিকার পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তা এভাবে যে, বাইতুল মালের ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়েও অন্যকে অগ্রাধিকার দেন এবং তোমাদের অধিকার ক্ষুন্ন করেন, তাহলে এ ধরনের পরিস্থিতিতে ও তোমাদের ভূমিকা থাকবে সহনশীল। এমন পরিস্থিতিতেও তোমরা শাসকের অধিকার রক্ষা করবে, অর্থাৎ তার আনুগত্য করবে এবং প্রয়োজনে তাকে সহযোগিতা করবে। আর তোমাদরে অধিকারের ব্যাপারে সবর ইখতিয়ার করবে এবং আল্লাহ দরবারে দু'আ করতে থাকবে যেন তিনি তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শাসকের অন্তরে ঢেলে দেন অথবা এর পরিবর্তে যেন অন্য কোন উত্তম ব্যবস্থা করে দেন।

ইমাম নববী রহ. বলেন, উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, আমীর, তত্ত্বাবধায়ক যদি ফাসেক কিংবা জালেমও হয় তবুও তার অসুগত থাকতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করা যাবে না। (তাকমিলাহ, নববী, তোহফাহ)

بَابُ مَاجَاءَ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَصْحَابَهُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ صـ٤٢

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭. কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সে সম্পর্কে নবী কারীম ﷺ কর্তৃক সাহাবীগণকে অবহিত করা।

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسٰى الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ ـ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : صَلّٰى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَارٍ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، وَكَانَ فِيمَا قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، وَكَانَ فِيمَا قَالَ أَلَا لَا تَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَبَكٰى أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ قَدْ وَاللّٰهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا وَكَانَ فِيمَا قَالَ: أَلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامِ عَامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اِسْتِهِ، فَكَانَ فِيمَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذٍ: أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلٰى طَبَقَاتٍ شَتّٰى فَمِنْهُمْ مَنْ

وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ، وَمِنْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ الاَوَانَّ مِنْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيئُ الْفَيْئِ أَلاَ وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ، أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْءِ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ حُسْنَ الْقَضَاءِ حُسْنَ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ حُسْنُ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ حُسْنُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَخَيْرُهُمْ حُسْنُ الْقَضَاءِ حُسْنُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْئٍ مِنْ ذَالِكَ فَلْيَلْصَقْ بِالأَرْضِ قَالَ: وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَي الشَّمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَلاَ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضٰى مِنْهَا إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيمَا مَضٰى مِنْهُ . قَالَ أَبُوعِيسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مَرْيَمَ وَأَبِي زَيْدِ بْنِ أَخْطَبَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَدَّثَهُمْ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلٰى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৭. ইমরান ইবনে মূসা কায্যায বাস্‌রী .... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে দিন থাকতেই (অর্থাৎ একেবারে আওয়াল ওয়াক্তে) আসরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি খুৎবা দিতে দাঁড়ান। এতে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সবকিছু সম্পর্কে তিনি আমাদের অবহিত করেন। যার মনে রাখার তা মনে রেখেছে আর যার ভুলে যাওয়ার সে তু ভুলে গিয়েছে। এতে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল ঃ এ দুনিয়া দেখতে শ্যামল এবং মধুর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করেছেন। এরপর তোমরা কি আমল করছ তা তিরি লক্ষ্য করছেন। শোন, দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকবে আর মেয়েদের থেকেও সতর্ক থাকবে। তিনি আরও বলেছিলেন, শোন, যখন কোন সত্য সম্পর্কে জানবে তখন তোমাদের কাউকে কোন মানুষের ভয় যেন তা বলতে কখনও কখনও বিরত না রাকে। বর্ণনাকারী বলেনঃ এরপর আবূ সাঈদ রাযি. কেঁদে ফেললেন। বললেন আল্লাহর কসম, অনেক বিষয়ই আমরা হতে দেখেছি কিন্তু তা বলতে মানুষকে ভয় করেছি। তিনি নবী কারীম ﷺ আরও বলেছিলেন, শুনে রাখ, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতককেই তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমান অনুসারে এক একটি নিশান লাগিয়ে দেওয়া হবে। মুসলিম রাষ্ট্র নায়ক কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে আর ভীষণ কোন বিশ্বাসঘাতকতা নাই। তার এই নিশান তার নিতম্বের কাছে বেঁধে দেওয়া হবে।

ঐ দিনের কারও যে কথা আমরা স্মরণ রেখেছি তার মধ্যে ছিল, শুনে রাখ, আদম সন্তানকে বিভিণ্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একদল তো এমন যারা মু'মিনরূপেই জন্ম নিয়েছে এবং মুমিনরূপে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে আর মুমিনরূপেই তাদের মৃত্যু ঘটেছে; আরেক শ্রেণী হল, যারা কাফিররূপে জন্ম নিয়েছে এবং কাফিররূপে জীবন অতিবাহিত করেছে আর কাফিররূপেই তাদের মৃত্যু ঘটেছে; আরেক শ্রেণী হল, মুমিনরূপে জন্মগ্রহণ করেছে, মুমিনরূপে জীবন কাটিয়েছে কিন্তু কাফির রূপে তার মৃত্যু ঘটেছে; আরেক শ্রেণী হল, কাফিররূপে জর্ন্ম লাভ করেছে, কাফির রূপে জীবন কাটিয়েছে কিন্তু মুমিনরূপে মৃত্যু বরণ করেছে।

শুনে রেখ, মানুষের মধ্যে কেউ তো এমন আছে যার দেরীতে রাগ আসে আর তাড়াতাড়ি তা প্রশমিত হয়ে যায়, কেউ তো আছে যার ক্রোধ আসেও তাড়াতাড়ি আবার তা প্রশমিত ও হয় তাড়াতাড়ি। সুতরাং উহার পরিবর্তে ইহা।

শোনা, কেউ তো আছে এমন যার ক্রোধ সঞ্চার হয় তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রশমিত হয় দেরীতে। শোন, তাদের মধ্যে উত্তম হল যার ক্রোধ সঞ্চার হয় দেরীতে কিন্তু প্রশমন হয় তাড়াতাড়ি। আর সবচেয়ে বিকৃষ্ট হল যার ক্রোধ সঞ্চার হয়

তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রশমন হয় দেরীতে। শোন, মানুষের মাঝে কেউ তো এমন আছে যে পরিশোধের ক্ষেত্রেও সে সুন্দর আবার তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও সে ভদ্র; কেউ তো এমন যে পরিশোধের ক্ষেত্রে খারাপ কিন্তু তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রে ভদ্র; কেউ তো এমন যে পরিশোধের ক্ষেত্রে তো সুন্দর কিন্তু তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রে অভদ্র। সুতরাং এক্ষেত্রে একটি আরেকটির বদলা হয়ে যায়। শোন, কেউ তো হল এমন, পরিশোধের ক্ষেত্রেও সুন্দর এবং তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও ভদ্র। শোন, তাদের মাঝে সর্বোত্তম হল সে, যে পরিশোধের ক্ষেত্রেও সুন্দর এবং তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও ভদ্র। শোন, তাদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল সে, যে পরিশোধের ক্ষেত্রেও খারাপ এবং তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও অভদ্র। শোন, ক্রোধ হল মানুষের মনের এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। তোমরা কি দেখ নি, ক্রোধান্বিত ব্যক্তির চক্ষু লাল হয়ে যায়, তার রগ ফুলে উঠে তোমাদের কেউ যদি এ ধরনের কিছু টের পায় তা হলে সে যেন মাটির সাথে লেপটে যায়। রাবী বলেন, আমরা সূর্যের দিকে তাকাচ্ছিলাম এখনও (অস্ত যেতে) কিছু বাকী আছে কিনা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দুনিয়ার যতটুকু অতীত হয়ে গেছে সে হিসাবে এতটুকুও আর বাকী নাই যেটুকু আজকের দিনের বাকী আছে যা অতিবাহিত হয়েছে সে তুলনায়। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এ বিষয়ে মুগীরা ইবনে শু'বা আবূ যায়দ ইবনে আখতাব হুযায়ফা ও আবূ মারয়াম রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, নবী কারীম ﷺ কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সে সম্পর্কে তাদের বর্ণনা করেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ঃ অর্থাৎ দুনিয়া ও দুনিয়ার আসবাবপত্র দৃশ্যত খুবই চিত্তাকর্ষক। দুনিয়ার অন্তর্নিহিত অবস্থা সম্পর্কে যারা জানে না তারা বাহ্যিক অবস্থা দেখে তার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে। তাদের চোখে দুনিয়া অত্যন্ত আকর্ষনীয় মনে হয়। কতক আলেম বলেন, যে জিনিস কোমল ও নাযুক হয় এবং ক্ষণস্থায়ী হওয়ার ফরে না বেশী দিন টেকসইযোগ্য নয়– এমন জিনিসকে আরবরা خَضْرَوَات তথা শাক-সবজির সঙ্গে তুলনা করে এগুলোকেও خَضْرَاءُ বলে। মোটকথা, হাদীসের এ বাক্যে একথার প্রতি ইংগিত দেওয়া হয়েছে যে, পার্থিবজগত বাহ্যিক চাকচিক্যে পরিপূর্ণ। যার কারণে মানুষ ধোঁকা খায়। অথচ এসবই ক্ষণস্থায়ী। এসব চাকচিক্য একদিন ফুরিয়ে যাবে।

إِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ الخ ঃ অর্থাৎ পার্থিব জগতে তোমরা যেসব ধন-সম্পদের মালিক হয়েছ, এগুলোর প্রকৃত মালিক তোমরা নও। বরং مالك حقيقى তথা প্রকৃত মালিক হলেন মহান আল্লাহ। তোমরা শুধু এগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে খলীফা, উকিল কিংবা প্রতিনধি। খলীফা কোন জিনিস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ স্বাধীন নয়, সুতরাং তোমরাও স্বাধীন নয়। অথবা এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্মার্থ হল, আল্লাহ তোমাদেরকে ওসব লোকের খলীফা তথা স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন যারা দুনিয়া থেকে তোমাদের পূর্বে বিদায় নিয়ে গেছেন। তাদের পরিত্যাক্ত ধন-সম্পদ তোমাদের দায়িত্বে রেখেছেন। তাই তিনি দেখেন যে, দেখেন তোমরা উত্তরাধিকার হয়ে এসব ধন-সম্পদের সঙ্গে কেমন আচরণ কর। কেউ কেউ বলেন, উক্ত বাক্যের মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা'আলা দেখেন যে, তোমরা অতীত লোকজনের এ দুনিয়াতে আগমন ও প্রস্থান থেকে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ কর।

(তোহফাহ, মেরকাত, মাযাহেরে হক)

إِتَّقُوا الدُّنْيَا ঃ অর্থাৎ পার্থিব জগতের হাকীকত সম্পর্কে যখন তোমরা অবহিত হয়েছে যে, এ জগত ক্ষণস্থায়ী; তারপরেও তার পেছনে পড়া বোকামি বৈ কিছু নয়। সুতরাং তোমরা প্রয়োজনের বেশি দুনিয়া হাসেল করা থেকে বেঁচে থাকি। অনুরূপভাবে إِتَّقُوا النِّسَاءَ এর মর্মার্থ হল, নারীদের রূপ-যৌবন ও সৌন্দর্য্যের প্রতি লালায়িত হয়ো না, বরং এগুলো থেকে দূরে থাকবে। কেননা, এসব বিষয় মানুষের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি লালসা সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ ইলম, আমল, দীন শরীয়তের তোয়াক্কা করে না।

فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. কেঁদেছিলেন এই অনুভূতির ভিত্তিতে যে, আমরা সত্য কথা উচ্চারণের সর্বোত্তম স্তরকে ছেড়ে দিয়েছি, আর তা হল সর্বাবস্থায় এমনকি প্রাণ চলে যাওয়ার হুমকি থাকলেও হক কথা বলে যাওয়া। বলা বাহুল্য, তাঁর এ ধরণের অনুভূতি একমাত্র পরিপূর্ণ ঈমান ও দ্বীনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতার ভিত্তিতেই ছিল। অন্যথায় উক্ত স্তরকে পরিত্যাগ করা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী ছিল না। বরং ওই

সকল হাদীসের উপর আমল করা উদ্দেশ্য ছিল, যেসব হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, দুর্বল ঈমানদারের যুগে কিংবা অপরাগতার মুহূর্তে অথবা জান-মালের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে হক কথা না বলেও নিশ্চুপ থাকা জায়েয। (মিরকাত)

وَاللّٰهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا ঃ এ বাক্য দ্বারা হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. সম্ভবত ইয়াজিদ ও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমীরত্বের প্রতি ইংগিত করেছেন। মানুষ যখন তাদের ভয়ে এমনই তটস্থ ছিল যে, হক কথা বলার সাহস করত না।

وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامِ عَامَّةٍ ঃ আল্লামা ফযলুল্লাহ রহ. বলেন, أَمِيْرِ عَامَّةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওই ব্যক্তি যে মুসলমানদের শহর, দেশ ও কাজ কারবারের শাসক হয়েছে। আর সাধারণ জনগণ উলামায়ে কেরাম ও বুদ্ধিজীবিদের মতামত ছাড়াই তাকে শাসক হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তার সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করছে, তখন এ ধরণের শাসকের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করা জায়েয নেই।

مِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ مُؤْمِنًا الخ ঃ অর্থাৎ মুসলমানের ঘরে অথবা মুসলমানদের জনপদে জন্মগ্রহণ করে বিধায় তাকে 'ঈমানদার' বলা হয়। এই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এজন্য যে, কেননা বিবেকবুদ্ধি হওয়ার আগ পর্যন্ত কারো দিকে ঈমানের নিবত করা যায় না। হ্যাঁ, তাকে 'মুমিন' বলা যায়, আল্লাহর ইলম অথবা তার ভবিষ্যতের অবস্থা বিবেচনা করে। অনুরূপবাবে مَنْ يُوْلَدُ كَافِرًا الخ এর অর্থ হল, যে কাফের মাতা-পিতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করে অথবা যার জন্ম কাফের জনপদে হয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে হাদীসে এ বাক্যটির ওই হাদীসের সঙ্গে বৈপরীত্ব দেখা দিবে না, যে হাদীসে বলা হয়েছে كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (মেরকাত, তোহফাহ)

فَلْيَلْصَقْ بِالْأَرْضِ ঃ গোস্বা আসার ফলে এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এজন্য যে, এ পদ্ধতি গোস্বা দূর করার জন্য একটা সহজতম পন্থা। কেননা, গোস্বার সময় যমীনে লেপ্টে যাওয়ার অর্থ হল সঙ্গে সঙ্গে এ অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া যে, আমার হাকীকত তো এই মাটিই। আমি এ মাটি থেকেই তো সৃষ্ট। অবশেষে এ মাটির ভেতরেই চলে যেতে হবে। সুতরাং অহঙ্কার, গোস্বান স্থলে আমাকে বিনয়ী ও কোমল হওয়া উচিত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الشَّامِ ص-٤٣

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮. শামবাসীদের প্রসঙ্গে।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ ـ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيْكُمْ ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْصُوْرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ : قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ ـ قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِحَوَالَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ـ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ ـ أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيْنَ تَأْمُرُنِىْ ؟ قَالَ: هَاهُنَا وَنَحَا بِيَدِهٖ نَحْوَ الشَّامِ ـ قَالَ أَبُوْعِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৮. মাহমূদ ইবনে গায়লান .... মু'আবিয়া ইবনে কুর্‌রা তার পিতা কুর্‌রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শামবাসিরা যখন খারাপ হয়ে যাবে তখন আর তোমাদের কোন মঙ্গল নাই। আমার উম্মতের মাঝে একদল সবসময়ই বিজয়ী থাকবে, তাদেরকে যারা লাঞ্ছিত করতে চেষ্টা করবে তারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) বলেন যে, আলী ইবনে মাদীনী

রহ. বলেছেন, এইদল হল মুহাদ্দিসীনের জামা'আত। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা, ইবনে উমার, যায়দ ইবনে সাবিত এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

৩৯. আহমাদ ইবনে মানী' .... বাহয ইবনে হাকীম তার পিতা, তার পিতামহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে কোথায় বাস করতে হুকুম করেন ?

তিনি বললেন, এ দিকে এবং হাত দিয় শামের দিকে ইংগিত করলেন। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলাম ধর্মের চির স্থায়িত্বের কথঅ সুসংবাদ স্পষ্টভাবে দিয়েছেন। তা এভাবে যে, তিনি বলেন, আমার উম্মতের একটি দল, এমনকি তারা সংখ্যায় কম হলেও সর্বদা হকের উপর অবিচল থাকবে। ইসলামের দুশমনদের উপর বিজয়ী থাকবে। নবী কারীম ﷺ এর সুন্নাতের উপর অটল ও মজবুত থাকার আল্লাহর রহমত অবারিতভাবে পেতে থাকবে। বিরূদ্ধবাদীরা তাদেরকে কখনও হক থেকে সরাতে পারবে না।

إذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ الخ ঃ তুহফাতুল আহওয়াকী গ্রন্থের গ্রন্থকার এর মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, অর্থাৎ যখন শামবাসীরা বিগড়ে যাবে, তখন সফর করা কিংবা সেখানে বসবাসের জন্য স্থায়ী নিবাস তৈরী করার মাঝে কোন খায়র ও বরকত অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যা সহীহ মনে হয় না। কেননা শামদেশের ফযীলত, বরকত এমনকি ফেতনার যুগে সেখানে আশ্রয় গ্রহণের কথা বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। হযরত থানভী রহ, উক্ত হাদীসের মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু শামবাসীরা ক্ষমতাবান হবে ও রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের হাতে থাকবে, সুতরাং তারা যদি ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহল এর ফলে অবশ্যই অন্যান্য লোক প্রভাবিত হবে। (আল-মিছকুয-যাকী)

শামের চৌহর্দ্দি

সনাতন আরব যুগে শাম বলতে জর্দান, ফিলিস্তিন, লেবানন, হিম্স, বাইতুল মুকাদ্দাস, দামেশক, সিরিয়াসহ বিশাল এলাকাকে বোঝাতে। পরবর্তীতে কেবল সিরিয়াকে শাম বলা হতো। বর্তমানে শুধু দামেশককে শাম বলা হয়।

طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ঃ طَائِفَةٌ অর্থ লোকজনের দল। কখনও এক ব্যক্তিকেও طَائِفَة বলা হয়। ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল।, طَائِفَة অর্থ কি ? তিনি উত্তরে দিয়ে ছিলেন, যে দলে এক হাজারেরও কম মানুষ থাকে, সে দলকে طَائِفَة বলা হয়। তারপর তিনি বলেন, যেসব লোক রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের পথ অবলম্বন করবে, অচিরেই তাদের সংখ্যা এ পরিমাণে পৌছবে। তাই শরীয়তের অনুসারীদেরকে রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, বাতিলের সংখ্যাধিক্য থেকে ও তাদর দল ক্রমশ ভারি হতে দেখে তোমরা ঘাবড়ে যেওনা। কেননা শরীয়তের প্রকৃত অনুসারীদের সংখ্যা কম হলেও তাদেরকে কেউ কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, طَائِفَة যেমনিভাবে একদিকে বোঝায়, অনুরূপভাবে একাধিক ব্যক্তিকে বোঝায়।

طَائِفَة এর তানবীন ও تَقْلِيل ও تَكْثِير ও تَعْظِيم তিন অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ একেকজন একেক অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। تَقْلِيل এর সূরতে অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলার মদদপুষ্ট এমন পরিপূর্ণ মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম হবে। تَكْثِير এর সূরতে অর্থ হবে, এ জামাআত যদিও সংখ্যায় কম দেখা যাবে কিন্তু গুণগতমানের কারণে অনেক মনে হবে। তাদের একজন হাজার জনের সমমূল্য রাখবে। বড় বড় দল ও শক্তিও তাদের সম্মুখে টিকতে পারবে না। تَعْظِيم এর সূরতে অর্থ হবে, এ জামা'আত অত্যন্ত মানসম্পন্ন হবে, তাদের শান নিরবচ্ছিন্ন হবে। উক্ত তিন একই সাথে উদ্দেশ্য নেওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। তখন অর্থ হবে, এ সমস্ত লোক সংখ্যায় খুব কম হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া ও আখেরাতের দিক থেকে এত বেশী শানদার ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হবে যে, হাজার মানুষও যে-কোনও দিক থেকে তাদের মোকাবেলা কতে সক্ষম হবে না।

طَائِفَةٌ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য ?

طَائِفَةٌ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী রহ. বলেন, যে যে রকম চেতনার অধিকারী, তিনি طَائِفَةٌ এর ব্যাখ্যার ওই রকম উক্তিই পেশে করেছেন। طَائِفَةٌ কারা ? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের কয়েকটি উক্তি নিম্নে তুলে ধরা হল, যথা–

(١) قال محمد بن اسماعيل البخارى : هم أهل العلم (صحيح البخارى ٢/١٠٨٧)

(٢) وقال الترمذى: فى آخر هذا الحديث الذى نحن بصدده قال محمد بن اسماعيل قال على بن المدينى : هم أصحاب الحديث .

(٣) قال أحمد بن جنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم . (النووى ١٤٣)

(৪) কাজী ইয়ায মালেকী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন–

إنما أراد أحمد بن حنبل أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث أى المحدثين (الفورى ١٤٣)

(৫) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলে, طَائِفَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ। কেননা, উক্ত হাদীসের অপর একটি طرق এ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ বাক্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। (ফয়যুল বারী ঃ ১/১৭১)

(৬) ইমাম ইবনে মাজাহ باب اتباع السنة এর মধ্যে উক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর ইঙ্গিতে বলেছেন যে, طائفة দ্বারা উদ্দেশ্য, যারা সুন্নাতের অনুসরণ করে।

(৭) আল্লামা সুয়ূতী রহ. ইমাম বুখারীর উক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, আহলে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যারা মুজতাহিদ।

(৮) ইমাম নববী রহ. বলেন, طَائِفَةٌ দ্বারা নির্দিষ্ট কোন জামাআত উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি মুমিনদের বিভিন্ন জামাআতকে বোঝাতে পারে। যেমন ফকীহদের জামাআত, ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের জামা'আত দরবেশ-দুনিয়াত্যাগীদের জামা'আত, আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আ'নিল মুনকার -এর দায়িত্ব যারা আঞ্জাম দেন তাদের জামা'আত। অথবা দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণে লিপ্ত এমন যে, কোন জামা'আতই উদ্দেশ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে উক্ত طَائِفَةٌ নির্দিষ্ট কোন স্থানে একত্রিত থাকাও জরুরী নয়। বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন শহরেও তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। মাওলানা তাকী উসমানী বলেন, আমার নিকট ইমাম নববীর কথাই বিশুদ্ধ অনুমিত হয়েছে।

مَنْصُوْرِيْنَ ঃ অর্থাৎ ওই জামাআত যারা আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতাপুষ্ট অথবা যারা শক্তি কিংবা প্রমাণ দ্বারা বিজয়ী। যেমন মোল্লা আলী কারী বলেছেন– ظَاهِرِيْنَ اَىْ غَالِبِيْنَ وَلَوْ بِالْحُجَّةِ অতএব, এ প্রশ্ন আর করা যাবে না যে, কখনও কখনও দেখা যায়, আহলে হক বাতিলের কাছে পরাজিত হয়। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে তারা সব সময় বিজয়ী থাকবে। উক্ত প্রশ্ন এজন্য করা যাবে না, কেননা শক্তিমত্তায় তারা সর্বদা বিজয়ী থাকা জরুরী নয়; বরং দলীলের দিক থেকে সর্বদা বিজয়ী থাকলে সেটাকেও বিজয়ই ধরা হবে।

لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ঃ এখানে ضَرَر দ্বারা উদ্দেশ্য, দ্বীনী ক্ষয়-ক্ষতি। কেননা, দুনিয়াবী ক্ষতি তথা জান-মালের ক্ষতির সম্মুখীন আহলে হকরা হতে পারে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ

উক্ত ব্যাখ্যার দিকে ইংগিত করে মোল্লা আলী কারী বলেছেন– لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ لِثُبَاتِهِمْ عَلَى الْحَقِّ অর্থাৎ হকের উপর দৃঢ় থাকার কারণে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (মিরকাত)

একটি বিরোধ ও তার সমাধান

উক্ত অধ্যায়ের আলোচ্য হাদীস মুসলিম শরীফের অপর একটি হাদীস لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق এর মধ্যে দৃশ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেননা আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস থেকে বোঝা যায়, কেয়ামত পর্যন্ত হকের উপর একটি দল টিকে থাকবে। অথচ মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, কেয়ামত যখন কায়েম হবে তখন নিম্নস্তরের একজন ঈমানদারও জীবিত থাকবে না, আহলে হক তো অনেক দূরের কথা।

(১) উক্ত বিরোধের সমাধান মুসলিম শরীফের অপর হাদীসে পাওয়া যায়। হাদীসটি এই-

ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلاتترك نفسا فى قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এক সুগন্ধিময় বাতাস পাঠাবেন, বাতাসে সকল ঈমানদারের ইন্তেকাল হয়ে যাবে, শুধু দুষ্ট লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে, তাদের উপর কেয়ামত সংঘটিত হবে।' সুতরাং এই হাদীসের আলোকে আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস حتى تقوم الساعة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কেয়ামতের কিছু দিন পূর্বে প্রবাহমান বাতাসের সময় পর্যন্ত যে বাতাসের কারণে সকল মুমিন মারা যাবে, কেবল দুষ্ট লোকেরা জীবিত থাকবে, তাদের উপর কেয়ামত হবে।

فلاتعارض

বুখারী, মুসলিমের কোনও কোন বর্ণনায় এসেছে- حتى ياتى أمر الله এর মর্মার্থ ও কেয়ামতের পূর্বে প্রবাহমান ওই বাতাস পর্যন্ত। (তাকমিলাহ, তাকমীলুল হাজাহ,)

ফায়দা ঃ

(১) এ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, দুনিয়াতে হক পন্থীরা একেবারে মিটে যাবে না। শত জুলুম বয়ে গেলেও একদল হক পন্থী কেয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই থাকবে। কোন কিছুই তাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীম থেকে হটাতে পারবে না।

(২) উক্ত হাদীস ইসলাম ধর্মের চিরস্থায়িত্বের জন্য প্রমাণ স্বরূপ। এবং

(৩) খতমে নবুওয়াতের পক্ষেও দলীল হিসাবে পেশা করা যায়।

(৪) হাদীসটি রাসূল ﷺ এর একটি স্পষ্ট মু'জেযা। আজ দেড় হাজার বছর পরও দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর বুকে ইসলাম ধর্ম আপন মহিমায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে।

(৫) ইজমার ক্ষেত্রে উক্ত হাদীস একটি সুন্দর প্রমাণ হতে পারে। কেননা, এ হাদীস থেকে বোঝা যায়। উম্মতে মুহাম্মদী গোমরাহের উপর কখনও ঐক্যবদ্ধ হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত মু'আবিয়া ইবনে হাইদাহ রাযি. প্রশ্ন করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জরুরতের তাড়নায় মদীনা ছাড়তে কোথায় অবস্থান করবো? রাসূল ﷺ ইঙ্গিতে শামের প্রতি দেখালেন। প্রশ্ন হয়, রাসূল ﷺ তাঁকে মক্কার কথা বললেন কেন? অথচ মক্কা হল, সর্বত্তোম শহর। এর উত্তর হল, সম্ভবত প্রশ্নকারীর কোন কল্যাণার্থে মক্কার কথা বলেননি। অথবা এও হতে পারে যে, এর মাধ্যমে তিনি শামের ফযীলত তুলে ধরেছেন।

উক্ত হাদীসের আরেকটি ব্যাখ্যা এভাবেও হতে পারে যে, আখেরী যামানায় যখন চারদিকে ফেতনা প্রকাশ পাবে, তখন আপনি আমাকে কোথায় বাসস্থান গ্রহণের জন্য বলেন? নবীজী উত্তর দিলেন, শামদেশে। যেহেতু সে সময় মুসলমানরা শামদেশে আশ্রয় নিবে। (তোহফাহ)

بَابُ مَاجَاءَ لَاتَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ص ـ ٤٣

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯. আমার মৃত্যুর পর তোমারা কাফিররূপে ফিরে যেয়োনা যে, তোমাদের একজন গর্দানে অস্ত্রাঘাত করব।

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَوَكُرْزِبْنِ عَلْقَمَةَ وَ وَائِلَةَ وَالصُّنَابِحِىِّ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৪০. আবু হাফস আমর আবন আলী রাযি. ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমরা আমার পরে কায়িরূপে ফিরে যেয়োনা যে, তোমারা একজন আরেকজনের গর্দানে অস্ত্রাঘাত করবে। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ তআবন মাসঊদ, জারীর ইব উমার কুরয ইবন আলকামা, ওয়াছিলা ইবন আসকা এ হাদীসটি হাসান সাহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لَاتَرْجِعُوا بَعْدِى أَىْ لَا تَصِيْرُوْا بَعْدِى مُسْتَحِلِّيْنَ لِلْقِتَالِ

অর্থাৎ আমার ইনতেকালের পর তোমরা হত্যা হালাল মনে করে কাফের হয়ে যেয়োনা। يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ এটি جُمْلَه مُسْتَأْنِفَه পূর্বোক্ত জুমলাকে কারও স্পষ্ট করার লক্ষে এসেছে। কেমন যেন, প্রশ্ন করা হয়েছে। কুফরের দিকে কিভাবে ধাবিত হবে?

উত্তর দেওয়া হয়েছে, পরস্পরকে হত্যা করা হালাল মনে করে। বাক্যটি حال অথবা صفت ও হতে পারে।

হাদীসের আরেকটি ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় যে, لَاتَشَبَّهُوْا بِالْكُفَّارِ فِى الْقِتَالِ অর্থাৎ একজন অপরজণের গরদান উড়িয়ে দেওয়া এমন এক কাজ যা কাফের কাফেরের কাজের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ। অথবা কাজটি মানুষ কুফরের কাছাকাছি নিয়ে যায়। অতএব, এ হাদীসের মাধ্যমে এ দলীল দেওয়া যাবে না যে, কবীরা গুণাহ যে করে সে কাফের। যেমন খারেজীরা বলে থাকে।

হাদীসটি রাসূল ﷺ বিদায় হজ্বের সময় মিনাতে বক্তৃতা দেওয়া কালে বলেছেন। (তোহফা, হাশিয়ায়ে তিরমিযী)

بَابُ مَاجَاءَ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ص ـ ٤٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০. এমন ফিতনার যুগ হবে যখন উপবিষ্ঠ ব্যাক্তি দাড়ানো ব্যাক্তর চেয়ে উত্তম হবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَيَّاشٍ عَنْ بُكَيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ سَعْدَبْنَ أَبِى وَقَّاصٍ ...... قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَشْهَدُأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى وَالْمَاشِى خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى قَالَ أَفَرَأَيْتَ أفرأيت إِنْ دَخَلَ عَلَىَّ بَيْتِى وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَىَّ لِيَقْتُلَنِى قَالَ كُنْ كَابْنِ أٰدَمَ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ وَأَبِى بَكْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِى وَاقِدٍ وَأَبِى مُوْسٰى وَخَرَشَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ

اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ

৪১. কুতায়বা রহ বাসর ইবন সাঈদ র. থেকে বর্ণিত যে, উছমান ইবন আফফান রা. এর আমালের ফিতনা কালে সা'দ ইবন আবূ ওয়াককাস রা বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অচিরেই এমন ফিতনা আসবে যে সে সময় উপবিষ্ট ব্যাক্তি দণ্ডায়মান ব্যাক্তি থেকে উত্তম হবে। দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে, চলমান ব্যক্তি ফিতনা প্রয়াসী ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। সা'দ রা বলেন, যদি আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বড়িয়ে দেয় এমতাবস্থায় আপনি কি মনে করেন?

তিনি বললেনঃ তখন তুমি আদম আ, এর সন্তানের ন্যায় হও। এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা খাব্বাব ইবন আরাত, আবূ বাকরা ইবন মাসউদ আবূ ওয়াকিদ আবু মূসা এবং খারাশা রা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি হাসান সাহীহ। কেউ কেউ এই হাদীসটিকে লায়ছ ইদীছটিকে লায়ছ ইবন সা'দ র. এর বরাতে নবী ﷺ থেকে একধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উক্ত হাদীসের আসল উদ্দেশ্য হল, একথা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, যে ব্যক্তি ফেতনা থেকে যত দূরে থাকবে যে তত উত্তম হিসাবে বিবেচিত হবে। এই জন্য ফেতনার যুগে ঘরে বসা থাকাটাই উত্তম। কেননা ঘর থেকে বের হলে ফেতনার নিয়ত না থাকলেও নিজের অজান্তেই ফেতনায় জড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান।

كُنْ كَابْنِ آدَمَ ঃ অর্থাৎ হযরত আদম আ. এর সন্তান হাবীল যেমনিভাবে নিজ ভাই কাবীলের আক্রমণের জবাব না দিয়ে মজলুম হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, অনুরূপভাবে ফেতনা চলাকালে যদি তোমাকে হত্যা করার জন্য কোন ব্যক্তি এগিয়ে আসে তাহলে তার মোকাবেলা না করে সবরের সঙ্গে শাহাদাতের মৃত্যুকে কবুল করে নিবে। কেননা তুমি যদি আক্রমণের জবাবে পাল্টা আক্রমণ কর। তাহলে এর দ্বারা ফেতনা ও হতাহত কারও বৃদ্ধি পাবে। অতএব, পাল্টা আক্রমণ না করে কিংবা ফেতনার মধ্যে নিজেকে না জড়িয়ে বরং শাহাদাতের সুধা পান করাটাই উত্তম।

প্রশ্ন হয়, রাসূল ﷺ তো অপর হাদীসে জান-মাল ও ইজ্জত রক্ষার স্বার্থে লড়াইয়ের অনুমতি দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন– مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (رواه البخارى) তাছাড়া ফুকাহায়ে কেরামও ফতওয়া দিয়েছেন যে, যদি অত্যাচারীকে হত্যা করা ছাড়া নিজের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব না হয়, তখন এরূপ অপারগ পরিস্থিতিতে অত্যাচারীকে হত্যা করা জায়েয। অথচ এর বিপরীতে আলোচ্য হাদীসে পাল্টা আক্রমণ কিংবা মোকাবেলা করা থেকে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হচ্ছে।

উত্তরে বলা হবে, অন্যায়ভাবে যদি কেউ কাউকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয়, আর তখন এ অত্যাচারীকে হত্যা করলে যদি ফেতনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, তখন তাকে হত্যা না করে নিজে সবর ইখতিয়ার করে শহীদ হয়ে যাওয়াটাই উত্তম। (আল–কাওকাব, মেশকাত)

ফেতনার সময় লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া প্রসঙ্গে

ফেতনার মুহূর্তে কোন এক দলের সঙ্গে মিশে লড়াইতে লিপ্ত হওয়া জায়েয আছে কিনা , এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

(১) উলামায়ে কিরামের এক দল বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যখন ফেতনা চরম আকার ধারণ করবে, সে সময় কোন এক দলের সঙ্গে মিশে অপর দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া যাবে না। এমনকি তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য কেউ তার ঘরে প্রবেশ করলেও তার সঙ্গে লড়াই করা যাবে না। হযরত আবু বকর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও ইমরান ইবনুল হুসাইন– রযিয়াল্লাহু আনহুম এর মাযহাব এটাই।

(২) তবে জমহূরে সাহাবা, তাবেঈন ও অধিকাংশ উলামার মতে ফেতনা চলাকালে হক পন্থীদের পক্ষ হয়ে

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي الخ –এটাই সঠিক মাযহাব। অন্যথায় দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা ঠিক থাকবে না বরং তখন বাতিল পন্থী ও ধর্মদ্রোহীরা ফেতনা-ফাসাদ ছড়ানোর সুযোগ পাবে।

জমহূরের পক্ষ থেকে আলোচ্য অধ্যায়ে উদ্ধৃত হাদীসটির উত্তরে বলা হয়েছে যে, উক্ত হাদীস ওই ব্যক্তির জন্য প্রয়োজ্য হবে যে ব্যক্তি হক-বাতিল নির্ণয়ে অক্ষম। অথবা উক্ত হাদীস তখন প্রযোজ্য হবে, যখন বিবাদমান উভয় গ্রুপ অত্যাচারী হবে এবং কোন দলের নিকট সঠিক ব্যাখ্যা অনুপুস্থিত থাকবে। (তোহফাহ)

بَابُ مَاجَاءَ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ص۔۴۳

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১. অচিরেই অন্ধকার রতের টুকরার মত ফিতনা আসবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৪২. কুতায়বা র. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অন্ধকার রাতের টুকরার মত ফিতনা আসার আগেই তোমরা আমলের প্রতি অগ্রসর হও। একজন সকালে মুমিন বিকালে কাফির কিম্বা বিকালে মু-মিন সকালে কাফির। একজন দুনিয়ার সামানের বিনিময়ে তার দীন বিক্রি করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা মাওলানা তাকী উসমানী এভাবে দেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এ হাদীসে রাসূল ﷺ এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, নেক আমল তাড়াতাড়ি করে নাও। যতটুকু সময় ততটুকুকেই গণীমত মনে কর। কারণ, অন্ধকারের টুকরার ন্যায় ফেতনা আসবে। অর্থাৎ অন্ধকার রাত শুরু হয়ে যখন তার একটা অংশ অতিক্রম করে তখন তারপর আগত দ্বিতীয় অংশটুকুও কিন্তু রাতেরই অংশ। যে অংশে অন্ধকার কারও গাঢ় হতে থাকে। এভাবে পরবর্তী তৃতীয় ভাগে এসে অন্ধকার চারিদিক চাদরের মত ঢেকে ফেলে। এখন কেউ যদি এ অপেক্ষায় থাকে যে, সবেমাত্র সন্ধ্যা হল। ... অন্ধকার খুব একটা বেশি নয়।

কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পৃথিবীতে আবার আলোকিত হয়ে উঠবে। তো কাজকর্ম তখন করবো, তবে এমন ব্যক্তি নির্বোধ বৈ কিছু নয়। কারণ, সন্ধ্যা চলে যাওয়ার পর সামনের সময় টুকুতে তো অন্ধকার কমবে না বরং বাড়বে। তাই মহানবী ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের অন্তরে এ ধারণা আসে যে, কিছুক্ষন পরেই আমল শুরু করবো। তবে স্মরণ রেখো, সামনে যে সময়টা আসছে তা কারও তমসাচ্ছন্ন। সামনে আগত ফেতনা ঠিক রাতের অন্ধকারের টুকরা বা অংশের মত। প্রত্যেক ফেতনার পর তার চেয়ে বড় ফেতনা আগত। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন ঃ সকালবেলা মানুষ ঈমানদার হবে। আর বিকালবেলা হবে কাফের। অর্থাৎ এমন ফেতনা আসবে যা মানুষের ঈমান ছিনিয়ে নিবে।

সকালবেলা ঈমানদার হিসাবে জাগ্রত হয়েছে বটে, তবে ফেতনায় আক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যায় হয়ত কাফের হয়ে গিয়েছে। আর কাফের এভাবে হবে যে, নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশের মোকাবেলায় বিক্রি করে দিবে। সকালে উঠে ছিল মুমিন হিসাবে এরপর জীবিকা নির্বাহের ময়দানে এসে দুনিয়ার পেছনে পড়ে গিয়েছে। এটকা পড়েছে ধন-সম্পদের চোরাবালিতে। 'দ্বীন ছাড়বে তো দুনিয়া মিলবে' –এমন কোন শর্তের মুখোমুখি হয়ে সে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল যে, দ্বীন ছেড়ে অর্থ উপার্জন করবে, নাকি তাকে লাথি মেরে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরবে। এ ব্যক্তি যেহেতু টালবাহানার অভ্যাস পূর্বে থেকেই করে নিয়েছে, তাই সে চিন্তা করল যেহেতু দ্বীনের ব্যাপারে ফলাফল করে মিলবে, তা নিশ্চিত জানা নেই। কখন মরবো, কখন হাশর হবে, হিসাব-নিকাশের সম্মুখীনই বা কখন হবো ? সে তো

অনেক দূরের কথা... এখনকার লাভ তো অর্থ উপার্জন এভাবে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার মোহে পড়ে দ্বীনকেই বিক্রি করে দেয়। তাইতো মহানবী ﷺ বলেন, 'সকালে উঠেছে মুমিন হিসাবে আর সন্ধ্যায় ঘুমিয়েছে কাফের হিসাবে।"

وَيُمْسِى كَافِرًا ঃ এখানে কুফর দ্বারা কি উদ্দেশ্য ? এ ব্যাপারে নিম্নে কয়েকিট উক্তি তুলে ধরা হল-

(১) হতে পারে এখানে প্রকৃত কুফর (كفر حقيقى) -ই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি বাস্তবেই কুফরের গণ্ডিভুক্ত হয়ে যায়।

(২) অথবা এখানে কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য كُفْرَانِ نِعْمَتْ অর্থাৎ এ ব্যক্তি নেয়ামত অস্বীকার কারীতে পরিণত হয়।

(৩) সে কাফেরদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে।

(৪) সে এমন কাজ করবে, যা কাফেররা করে।

(৫) সে সকাল বেলা যখন উঠবে তখন আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাকে হালালই মনে করবে। কিন্তু সন্ধ্যা হলে তার অন্তরে পরিবর্তন দেখা দিবে এবং হালালকে হারাম মনে করবে আর হারামকে হালাল মনে করবে।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحٰرِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يَارُبَّ كَاسِيَةٍ عَارِيَةٍ فِى الْاٰخِرَةِ

৪৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর র. উম্ম সালামা রা থেকে বর্ণিত যে, এক রাকে নবী ﷺ জেগে উঠলেন। বললেনঃ সুবহানাল্লাহ!এ রাত্রে কতইনা ফিতনা নিপতিত হল। আর কতইনা রহমতের খাযানার অবতনণ ঘটল। এ হুজরাবাসিনীদের কে জাগিয়ে দিব? দুনিয়ায় অনেকেই যারা বস্ত্রপরিহিতা অনেকেই তারা আখিরাতে হাসান সাহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উক্ত হাদীসের প্রথমাংশের মর্মার্থ হল যে, খাজানা ও রহমত রাসূল ﷺ এর উম্মতের জন্য তাকদীরভুক্ত হয়েছে সেগুলো তিনি এরাতে জানতে পেরেছেন কিংবা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতারা জানতে পেরেছেন। অনুরূপভাবে যেসব ফেতনা ও আযাব উম্মতের জন্য তাকদীরভুক্ত হয়েছে সেগুলো রাসূল ﷺ জানতে পেরেছেন অথবা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের অবহিত করা হয়েছে। (তোহফাহ)

مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ ঃ صَوَاحِبُ الْحُجُرَاتِ দ্বারা উদ্দেষ্য হল, নবীজী ﷺ এর পবিত্র স্ত্রীগণ। সবিশেষ তাদের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, যেহেতু ওই সময় তাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, অন্যথায় বিষয়টি সকলের জন্যই فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٌ

হাদীসের এ অংশের একাধিক মর্মার্থ পাওয়া যায়। যথা-

(১) অধিকাংশ নারী দুনিয়াতে দামী কাপড় পরিধান করবে অথচ নেক আমল না থাকার কারণে আখেরাতে রিক্তহস্ত হবে।

(২) দুনিয়াতে অনেক নারী তাকওয়ার পোশাক পরে আছে অথচ তাদের অন্তর মূলতঃ তাকওয়ামুক্ত। ফলে কেয়ামতের দিন তারা বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকবে। যেহেতু কেয়ামত দিবসে সকলের বস্ত্র তাকওয়া অনুপাতে হবে।

প্রশ্ন হয়, إِنَّهُمْ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, কেয়ামতদিবসে পুরুষ-নারী সকলেই বস্ত্রহীন হবে, তাহলে আলোচ্য হাদীসটি বিশেষভাবে নারীদের কথা বলা হল কেন ?

এর উত্তর হল, আলোচ্য হাদীসে إعطاء كسوه তথা পুনরায় যখন বস্ত্র দেওয়া হবে- তার পরের কথা বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে, হাশরের ময়দানে সর্ব প্রথম ইবরাহীম আ. কে কাপড় পরানো হবে, তারপর অন্যান্য দেরকে। পক্ষান্তরে বহু নারী তখনও কাপড় পাবে না তাকওয়ার অনুপস্থিতির কারণে।

(৩) অধিকাংশ নারী দুনিয়াতে নিদ্রার বস্ত্র মুড়ি দিয়ে আছে, অর্থাৎ অধিক নিদ্রার কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে আছে, তাই কেয়ামত দিবসে তারা উঁচু মর্যাদা পাবে না।

(৪) অনেক নারী পাতলা ও আটশাঁট পোশাক এ দুনিয়াতে পরবে, তারা আখেরাতে তাকওয়ার পোশাক থেকে বঞ্চিত হবে।

(৫) অনেক নারী স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনের কাপড় পরিধান করে থাকবে এবং স্বামীদের উপর ভরসা করে নেক আমলে মনোযোগী হবে না অথচ আখেরাতে স্বামীর আমল তাদের কোনও কাজে আসবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَلَاأَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

তাহলে কেমন যেন রাসূল ﷺ তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে একথা বোঝাতে চেয়েছেন, নবীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে খুব আশাবাদী হয়ে বসে থেকো না, বরং গাফলতের নিদ্রা থেকে জেগে উঠে নেক আমলে লিপ্ত হও। কেননা আখেরাতে স্বামীর আমল তোমাদের জন্য কোনও কাজে আসবে না। (তোহফাহ, মেরকাত, কাওকাব)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ص . قَالَ تَكُونُ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَجُنْدَبٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَأَبِى مُوسَى وَهٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

৪৪. কুতায়বা র. আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বালেছেনঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অন্ধকার রাতের খণ্ডের মত অনস ফিতনা হবে। তখন সকালে একজন মুমিন বিকালে সে কাফির আর বিকালে একজন মুমিন সকালে সে কাফির। বহু সম্প্রদায় দুনিয়ার সামানের বিনিময়ে তাদের দীন বিক্রি করেব।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, জুন্দুর নুমান ইবন বাশীর এবং আবূ মূসা রা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يصبح الرجل فيها ঃ এখানে সকল-সন্ধ্যা দ্বারা নির্দিষ্টভাবে সকাল-সন্ধ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হল, প্রতি মুহূর্তে অতিদ্রুতগতিতে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আমানত, খেয়ানত, ওয়াদা, ওয়াদাভঙ্গ, ভালো, খারাপ; সুন্নাত, বিদ'আত, ঈমান, কুফর প্রভৃতি উঠা-নামা করবে। মানুষ দ্রুততার সাথে একেকবার একেকটি গ্রহণ করবে।

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ يَقُولُ فِى هٰذَا الْحَدِيثِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا قَالَ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُحَرِّمًا لِدَمِ أَخِيهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُمْسِى مُسْتَحِلًّا لَهُ وَيُمْسِى مُحَرِّمًا لِدَمِ أَخِيهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلًّا لَهُ

৪৫. সালিহ ইবন আবদুল্লাহ র. হাসান র. থেকে বর্ণিত যে, তিনি এ হাদীসটিতে কারও উল্লেখ করতেন, একজন সকালে মুমিন তো বিকালে মুমিন সকারে কাফির। সকালে সে তার অপর ভাইয়ের খুন, সম্মান ও সম্পদ হারাম বলে জ্ঞান করলে। আর বিকালেই তা তার জন্য হালাল বলে মনে করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عن الحسن ঃ হাসান আল-বসরী (মৃ. ১১০/৭২৯) একজন প্রখ্যাত তাবেঈ ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবু সাঈদ আল-হাসান ইবনে আবুল হাসান ইয়াসার আল বসরী রহ.। ইবনে সা'দ এর মতে তিনি উমর রাযি. এর খেলাফত আমলের পরিসমাপ্তির দু'বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা উসমান রাযি. গৃহবন্দী থাকার সময় তাঁর বয়স ছিল ১৪ বছর। যা হোক, তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তখনকার পরিবেশ সর্বত্র রিসালাতের আওয়াযে মুখরিত ছিল। ইবনে সা'দ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ হাসান আল বসরী বহু পূর্ণত্ব ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। অতি বড় আলিম ছিলেন। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। ফকীহ ছিলেন। ফেতনা হতে সুরক্ষিত ছিলেন। বড় আবেদ ও পরহেগার ছিলেন। গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শুদ্ধভাষী, মিষ্টভাষী, সুন্দর ও অমায়িক ছিলেন।

তিনি উসমান রাযি. ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি., আলী রাযি., আবু মূসা আল-আশআরী রাযি., ইবনে আব্বাস রাযি. ইবনে উমর রাযি., আমর ইবনুল আ'স রাযি., মু'আবিয়া রাযি., মা'ক্বিল ইবনে ইয়াসার রাযি., আনাস ও জাবির রাযি. প্রমুখ থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম যাহাবী রহ. এর মতে তিনি যখন (حَدَّثَنَا) বলে হাদীস রেওয়ায়াত করেন তখন সকলের নিকটেই তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। (তারীখুল ইসলাম ১/৪৮৩, তাহযীবুত তাহযীব ২/২৩১)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُبْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَرَجُلٌ سَأَلَهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاء يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص. إِسْمَعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৪৬. হাসান ইবনে আলী খাল্লাল .... আলকামা ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর তার পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল আমাদের উপর যদি এমন আমীর নিযুক্ত হয় যারা আমাদের হক ফিরিয়ে রাখে অথচ তাদের নিজেদের হক আমাদের থেকে চায় তবে এমতাবস্থায় আমরা কি করব বলে আপনি মনে করেন ?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাদের কথা শুনবে এবং তাদের আনুগত্য করবে। কেননা, যে দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর ন্যাস্ত এর জবাবদিহী করতে হবে তাদেরই আর তোমাদের উপর যে দায়িত্বের বোঝা ন্যাস্ত এর জবাবদিহী করতে হবে তোমাদেরই। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শাসক ও দায়িত্বশীলের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত তা আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব। যেমনিভাবে শাসকের উপর ওয়াজিব হল, বনগণের অধিকার আদায় করা, তাদের সঙ্গে সুবিচার করা এবং দায়িত্বের প্রতিটি সূচী সঠিকভাবে পালন করা, অনুরূপভাবে জনগণের উপরও ওয়াজিব হচ্ছে, প্রকাশ্যে-অপ্রাকাশ্যে শাসকের অনুগত্য করা, তার সহযোগিতা করা, সুতরাং উভয়শ্রেণীর জন্য নিজ দায়িত্ব আদায়ে সচেতন হওয়া ওয়াজিব। যেকোন পক্ষ থেকে সীমালংঘন শান্তি ও শৃংখলায় বিঘ্ন ঘটাবে।

নববী শিক্ষার একটি মূলনীতি ঃ

আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এর শিক্ষা ও আদর্শের সারকথা হল, সকলেই হতে হবে কর্তব্যপরায়ন, আপন দায়িত্ব পালনে গভীর মনোযোগী। সকলেই যদি নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন হয় তাহলে কারো অধিকার ভুলুণ্ঠিত হবে না বরং তখন সকলেই নিজ নিজ অধিকার বুঝে পাবে। মালিক যখন তার দায়িত্ব আদায়ে সক্রিয় হবে তখন শ্রমিকেরও অধিকার আদায় হবে যথাযথভাবে। শাসক দায়িত্ব সচেতন হলে জনগণের অধিকার পদদলিত হবে না। জনগণ

কর্তব্যপরায়ন হলে শাসকের অধিকার বিধবস্ত হবে না। মূলত শরীয়তের তাগিদ এটাই। ইসলামী শরীয়াহ মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করতে চায়, অধিকার সচেতন নয়। তাই ইসলাম সকলের অধিকারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করলেও অধিকার চাওয়ার প্রতি তেমন জোর দেইনি। জোর দিয়েছে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায়ের প্রতি। কেননা প্রত্যেকে দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ন হয়ে গেলে অপরের অধিকার স্বয়ং ক্রিয়ভাবে আদায় হয়ে যায়।

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, বর্তমানে স্রোত চলছে উল্টো দিকে। বর্তমানে অধিকার আদায়ের দাবী। অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে চলে আন্দোলন, বিক্ষোভ, সংগ্রাম, হরতাল ও মনশন-ধর্মঘট। অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে অসংখ্য দল ও সংগঠন। কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় শিরোনামে কোনও দল নেই। সং গঠন নেই। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব কি আমি আদায় করছি? আমার কর্তব্য পালনে আমি কতটা আন্তরিক? -এ নিয়ে যেন কারো মাথা ব্যথা নেই। শ্রমিক শ্লোগান তুলছে, অধিকার দাও মালিকের দাবী হচ্ছে, আমার পূর্ণাঙ্গ অধিকার চাই। অথচ উভয়শ্রেণীর কেউ ভাবতে রাজী আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি না তো? ফলে এজন্যই দুনিয়াতে আজ হাজারও ফেতনা-ফাসাদ মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে।

অধিকার আদায়ের জন্য হরতাল ও অবরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধান

অধিকার আদায়ের জন্য হরতাল ও অবরোধ জায়েয আছে কিনা, এ সম্পর্কে সাম্প্রতিকবালের উলামায়ে কিরামে দু'টো মত লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ শতর্ং সাপেক্ষে হরতাল অবরোধ ডাক জায়িয বলতে চান। তাদের বক্তব্য হল, জনগণ যদি স্বতঃস্ফুর্তভাবে হরতাল অবরোধ পালন করে এবং পালন করার সময় কারো জান-মালের ক্ষতি সাধন করা না হয়, তাহলে এরূপ হরতাল-অবরোধ ডাকা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই।

উলামায়ে কিরামের অপর একপক্ষ হরতাল-অবরোধ জায়েয নয় বলে মত পোষণ করেন। তারা বলেন, সাধারণত নির্দিষ্ট কোন হরতাল-অবরোধের ব্যাপারে সমস্ত জনগণ একমত হয় না এবং একমত না হওয়া সত্ত্বেও জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর ভয়ে হরতাল পালন করতে হয়, অর্থাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাড়ি-ঘোড়া, দোকান-পাঠ ও যানবাহন বন্ধ রাখতে হয় এবং এতে করে বহু লোকের আয়-উপার্জন বন্ধ থাকায় তাদেরকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ যেহেতু জায়িয নয়, অতএব যে হরতালের কারণে এটা হয় তাও অনিবার্য কারণেই জায়েয হবে।

আমাদের সমাজে হরতাল অবরোধের ডাক দেওয়া হলে স্বাভাবিকভাবেই জোরপূর্বক সকলকে হরতাল মানতে বাধ্য করা হয়। অন্যথায় জান-মাল ইজ্জত-আব্রুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, এ হল সমাজের প্রচলিত অবস্থা। আর ফতওয়া হয়ে থাকে প্রচলিত প্রেক্ষাপটের আলোকেই। অতএব ফতওয়ার নীতি হিসাবে হরতাল-অবরোধ সম্পর্কে শেষোক্ত মতটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

হরতালের সময় কারো জান-মালের ক্ষতি সাধন বা ইজ্জত-আব্রুর হানি করা হারাম ও কবীরা গুণাহ। কারণ এতে নিজের অধিকার আদায় করতে গিয়ে অণ্যের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়। জোরপূর্বক কাউকে হরতাল মানতে বাধ্য করা তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার নামান্তর। আর এভাবে কারো স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা জায়েয নয়। অন্যায় করবে একজন, আর সেই অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে, এটা শরীয়তের নীতি নয়।

(আহকামে যিন্দেগী)

অনশন ধর্মঘট প্রসঙ্গ

অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বা রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসাবে অনশন-ধর্মঘট করা শরীয়তসম্মত নয়। অনশন-ধর্মঘট আত্মহত্যার সমার্থবোধক। এভাবে মৃত্যু হলে হারাম মৃত্যু হবে এবং আত্মহত্যার পাপ হবে।

(حكيم الامت حضرت تهانوى كى سياسى افكار)

সরকারের আনুগত্য বা সরকার উৎখাতের আন্দোলন প্রসঙ্গে

যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান কোনও পাপ কাজের জন্য বাধ্য না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। কোন পাপ কাজে তার আনুগত্য করা যাবে না।

সরকার রাষ্ট্রপ্রধান কোন পাপ কাজের জন্য জনগণকে বাধ্য না করলে তাকে উৎখাতের জন্য আন্দোলন করা জায়েয নয়। তবে ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং পাপ প্রীতির কারণে কোন পাপ কাজের জন্য বাধ্য করলে তাকে উৎখাতের জন্য আন্দোলন করা বৈধ এই শর্তে যে, উৎখাতকারীগণ সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানকে উৎখাত করার দেশ ও দেশের শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত রাখতে সক্ষম হবেন। (আহকামে যিন্দেগী, ইমদাদুল ফতওয়া)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْهَرَجِ وَالْعِبَادَةِ فِيْهِ ص٤٤

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২. গণহত্যা এবং সে যুগে ইবাদাত করা।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرَجُ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْهَرَجُ؟ قَالَ: اَلْقَتْلُ . قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَهٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

৪৭. হান্নাদ .... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পরে এমন এক যামানা আসছে যখন ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং ব্যাপকভাবে "হারাজ" হবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, "হারাজ" কি ? তিনি বললেন, হত্যাযজ্ঞ। এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْهَرَجُ মিসবাহুল লুগাতে রয়েছে (اَلْهَرَجُ (بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ) বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ। اَلنَّاسُ (ض.) هَرَجَ (هَرَجًا) গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা ও হত্যায়জ্ঞে লিপ্ত হল। هَرَجَ فِى الْحَدِيثِ অধিক কথা বললো বা কথায় তালগোল পাকিয়ে গেল। تَهَارَجَ الْقَوْمُ একে অন্যের উপর আক্রমণ করল।

মাওলানা তাকী উসমানী বলেন–

الهرج: أصله فى اللغة الاختلاط وقد وقع فى آخر هذا الحديث فى رواية جرير عند البخارى الهرج بلسان الحبشة القتل وإنما حضه بلسان الحبشة لأن أصل الكلمة فى اللغة العربية بمعنى الا ختلاط وقد تستعار بمعنى القتل وأما فى لسان الحبشة بمعنى القتل ابتداء

অর্থাৎ "اَلْهَرَجُ শব্দের মূল অর্থ তালগোল পাকিয়ে যাওয়া। বুখারী শরীফের জারীর সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসের শেষের দিকে এসেছে, اَلْهَرَجُ হাবশী ভাষায় এর অর্থ হত্যাযজ্ঞ। বুখারীতে শব্দটিকে হাবশী ভাষার সাথে খাছ করা হয়েছে, যেহেতু আরবী ভাষায় তার প্রকৃত অর্থ সংমিশ্রন ঘটা বা তালগোল সৃষ্টি হওয়া। হত্যাযজ্ঞের অর্থে তাকে اِسْتِعَارَةٌ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। অন্যথায় হাবশী ভাষায় শুরু থেকেই এর অর্থ হত্যাযজ্ঞ।"

يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ ঃ অর্থাৎ কেয়ামতপূর্ব সময়ে প্রকৃত ইলমের ধারক-বাহক হক্কানী উলামায়ে কিরামকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। তাদের ইনতেকালের ফলে হাকীকী ইল্‌ম ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিংবা ইলমী ফেতনার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বে। যার ফলে মনে হবে, ইলমের চেরাগ নিভু নিভু মনে হবে এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকার চারিদিক ঘিরে ফেলবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ بْنِ قرة رَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَالْهِجْرَةِ إِلَيَّ ـ قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلَّى ـ

৪৮. কুতায়বা ....মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, হারাজ বা হত্যাযের যুগে ইবাদত করা আমার কাছে হিজরতের মত।

এ হাদীসটি সহীহ–গরীব। কেবল মুআল্লা ইবনে যিয়াদের সূত্রেই এটি সম্পর্কে আমরা জানি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এত বড় সওয়াব দান করা হবে এজন্য যে, যেহেতু ফেতনার যামানায় অধিকাংশ মানুষ ইবাদ সম্পর্কে গাফেল থাকবে এবং ধর্মীয় কাজে অনীহা দেখাবে, তখন হাতে গোনা কিছু লোক দ্বীনের উপর টিকে থাকবে। আর এ টিকে থাকাটা নিশ্চয় অনেক কষ্টদায়ক ও পরীক্ষাজনক হবে। আর কায়েদা আছে– اَلْعَطَا يَاعَلٰى قَدْرِ الْبَلَايَا (তোহফাহ)

যখন আমার উম্মতের মাঝে পরস্পর তরবারী ও শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হবে এবং উদ্ভূত সমস্যা ইসলামের আলোকে সমাধান করার পরিবর্তে যখন কঠোরতা ও রক্তারক্তির সিলসিলা শুরু হয়ে যাবে, তখন এই সিলসিলা কেয়ামত অবধি চলতে থাকবে। এক শহরে না হলে অন্য শহরে চলবে। ভাই ভাইয়ের রক্ত ঝরাবে। উম্মতের মাঝে এ ধরনের পারস্পারিত লড়াই শুরু হওয়ার যে আশঙ্কা রাসূল ﷺ ব্যক্ত করেছেন, তার সূচনা হয় আমীরুল মু'মেনীন হযরত উসমান রাযি. কে শহীদ করার মাধ্যমে। মুসলমানদের পারস্পারিক এ দ্বন্ধ-লড়াই কেয়ামত অবধি ঠাণ্ডা হবে না।

উল্লেখ্য, এখানে হাদীস শরীফে যে سَيْف তথা তরবারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য। হত্যাযজ্ঞ, খুনাখুনি ও পারস্পরিক লড়াই। এই লড়াই তলোয়ার কিংবা নেওয়া অথবা মিনযানিক বা অন্য কোন অস্ত্র দ্বারাও হতে পারে। সবিশেষ তলোয়ারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু ওই যুগে সাধারণত তরবারি দ্বারা লড়াই চলতো।

আ'উনুল মা'বুদ এর গ্রন্থকার লিখেছেন, রাসূল ﷺ যে লড়াইয়ের কথা বলেছেন, তা হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর যুগ থেকে শুরু হয়। (বযলুল মাযহূদ, আ'উনুল মা'বুদ)

بَابُ مَاجَاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَشَبٍ صـ٤٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩. কাঠের তলোয়ার বানিয়ে নেওয়া

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

৪৯. কুতাইবা .... ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মাঝে যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে তলওয়ার এসে পড়বে তখন আর কিয়ামত পর্যন্ত তা উঠিয়ে নেওয়া হবে না। এ হাদীসটি হাসান–সহীহ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَتْ: جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَبِي فَدَعَاهُ

إِلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : إِنَّ خَلِيلِي وَابْنَ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَيَّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ فَقَدِ اتَّخَذْتُهُ، فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ قَالَتْ فَتَرَكَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ.

৫০. আলী ইবনে হুজর .... উদায়সা বিনতে উহবান ইবনে সায়ফা গিফারী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি. আমার পিতার কাছে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে বের হওয়ার হন্য তাকে আহ্বান জানালেন। তখন আমার পিতা তাকে বললেন, আমার প্রিয় বন্ধু আর আপনার চাচাত ভাই আমাকে ওয়াসীয়াত করে গিয়েছেন যে, লোকেরা যখন পরস্পরে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে তখন আমি যেন কাঠের তলওয়ার বানিয়ে নেই। তদনুসারে বর্তমানে আমি তা বানিয়ে নিয়েছি। আপনি যদি চান তবে তা-ই নিয়ে আপনার সঙ্গে বের হতে পারি।

উদায়সা রহ. বলেন, এরপর, তিনি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিলেন। এ বিষয়ে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-গরীব। আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দ রহ. এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উক্ত ঘটনাটি সম্ভবত 'জঙ্গে জামাল' এর সময় সংঘটিত হয়েছিল। হাদীসটি সুনানে ইবনে মাযাহ কারও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন, নিম্নে তা প্রদত্ত হল–

فقالت عديسة بنت أهبان لما جاء علي بن ابي طالب ههنا البصرة دخل على أبي فقال : يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم ؟ قال بلى . قال فدعاجارية له فقال ياجارية أحزجي سيفي قال فأخرجته فسل منه قد شبر فإذا هو خشب فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت حزجت معك، قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك .

লাকড়ি তলোয়ার বানিয়ে নেওয়ার অর্থ হল, লড়াই পরিত্যাগ করা। কিন্তু হযরত আহ্বান হাদীসের বাহ্যিক দিক তথা শব্দের উপর আ'মল করতে সত্যি সত্যি লাকড়ির তলোয়ার বানিয়ে রেখেছেন।

হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন, সম্ভব উক্ত সাহাবার কাছে এটা স্পষ্ট ছিল না যে, আলী রাযি. হকের উপর আছেন। তাই তিনি কোনও দলেই অংশগ্রহণ করেননি। (তোহফাহ আল-কাওকাব)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ: كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ، وَالْزَمُوا فِيهَا أَجْوَافَ بُيُوتِكُمْ وَكُونُوا كَابْنِ آدَمَ. قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَرْوَانَ هُوَ أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ.

৫১. আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান .... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ ফিতনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এই সময় তোমরা তোমাদের ধনুকগুলি ভেঙ্গে ফেলবে, এগুলোর ছিলা কেটে ফেলবে। ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করাকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করবে, আর আদমপুত্র (হাবিলের) মত হয়ে থাকবে। এ হাদীসটি হাসান-গরীব সহীহ। রাবী আবদুর রহমান ইবনে ছারওয়ান হলেন আবূ কায়স আওদী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كَثِّرُوْا فِيْهَا قِسِيَّكُمْ ঃ এখানে قِسِيٌّ শব্দটি قَوْسٌ এর বহুবচন। যথা আল-মুনজিদ এ রয়েছে- قِسِيٌّ، اَلْقَوْسُ، اَقْيَاسٌ، اَقْوُسٌ (ج) قِسِيٌّ، اَقْوَاسٌ، قِيَاس অর্থ ধনুক বা ধনকাকৃতির যে কোন বস্তু।

اَوْتَارُكُمْ ঃ মিসবাল-লুগাতে শব্দটির তাহকীকে বলা হয়েছে- اَلْوَتَرُ (واحد) وَتَرَةٌ (ج) اَوْتَارٌ، وِتَارٌ অর্থ ধনুকের ছিলা। যেমন বলা হয়ে থাকে- اَوْتَرَ (اِيْتَارًا) اَلْقَوْسَ অর্থ ধনুকে ছিলা সংযুক্ত করল, ধনুকের জন্য ছিলা তৈরী করল, ধনুকের ছিলায় টান দিলো।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ صـ٤٤

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪. কিয়ামতের আলামত।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِىْ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَفْشُو الزِّنَا، وَتُشْرَبُ الْخَمْرُ، وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ قَا لَ اَبُوْ عِيْسٰى وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

তরজমা ৫৩৭ মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্নিত, তিনি বলেনঃ আমি তোমার এমন একটি হাদীস শুনাচ্ছি যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি এবং আমার পরেও এমন কেউ তোমাদেরকে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করতে পারবে না যে সরাসরি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন – কিয়ামতের আলামত হল, ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটবে, যিনা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান করা হবে, নারীদের আধিক্য ঘটবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার মাত্র একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকবে।

এ বিষয়ে আবু মূসা আবু হুরায়রা রাযি. থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

شَرْطٌ (بِسُكُوْنِ الرَّاءِ) বহুবচন شُرُوْطٌ অর্থ কোন জিনিসকে কোন জিনিসের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা অথবা কোন জিনিসকে আবশ্যক করে নেওয়া। পক্ষান্তরে شَرَطٌ (بِفَتْحِ الرَّاءِ) বহুবচন اَشْرَاطٌ অর্থ চিহ্ন, আলামত, যে-কোনও বস্তুর প্রথম। সুতরাং এখানে اَشْرَاطٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ওই সকল আলামত যেগুলো কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

اَلسَّاعَةُ দিন বা রাতের যে কোন অংশকে বলা হয়। 'বতমান' সময়কেও اَلسَّاعَةُ বলা হয়। সুতরাং কেয়ামতকে اَلسَّاعَةُ বলার কারণে হল, যেহেতু কেয়ামতের সঠিক সময় কারো জানা নেই, যে কোন সময় কেয়মত সংঘটিত হতে পারে। এমনকি অনাগত প্রতিটি মুহূর্ত কেয়ামতের সম্ভাব্য সময়।

اَشْرَاطُ السَّاعَةِ দ্বারা এখানে কোন আলামত উদ্দেশ্য ?

এখানে অধিকাংশই عَلَامَتْ صُغْرٰى তথা ছোট ব্যভিচার বেড়ে যাওয়া, ফেতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাওয়া, আকাশচুম্বী ইমারত গড়ে উঠা। ইত্যাদি যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

لَا يُحَدِّثُكُمْ اَحَدٌ بَعْدِىْ : হযরত আনাস রাযি. কথাটি এজন্য বলেছেন, যেহেতু ওই সময় বসরাতে তিনি ছাড়া অন্য কোন সাহাবী ছিলেন না। অথবা তিনি হয়ত যেখানোভাবে জানতে পেরেছেন যে, উক্ত রাসূল ﷺ থেকে তিনি ছাড়া অন্য কেউ শোনেন নি। (হাশিয়ায়ে বুখারী ২/৮৩৬)

حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسَةِ نِسَاءٍ : নারীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, যেহেতু পৃথিবীর বুকে যুদ্ধ-বিগ্রত বেড়ে যাবে, আর সাধারণত পুরুষরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে তাদের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, কোন কারণে নয়, বরং নারীদের সংখ্যা এমনিতেই বৃদ্ধি পাবে আর এটা কেয়ামতেরই আলামত।

এখানে خَمْسِيْنَ শব্দ দ্বারা হতে পারে বাস্তবেই 'পঞ্চাশ' সংখ্যা উদ্দেশ্য অথবা আধিক্য বুঝানোও উদ্দেশ্য হতে পারে। শেষোক্ত কথাটার সমর্থনে অপর একটি হাদীসও পাওয়া যায়। যথা

وَيَرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَرْبَعُوْنَ اِمْرَأَةٌ–

কেউ কেউ বলেন, হাদীসের এ অংশের ব্যাখ্যা হল, যখন যমীনের মধ্যে আল্লাহর নাম নেওয়ার মত কেউ থাকবে না, তখন প্রতিজনের ঘরে পঞ্চাশজন করে স্ত্রী থাকবে।

এ ব্যাখ্যাটা আসলে সঠিক নয়। সঠিক ব্যাখ্যা হল, প্রত্যেক পুরুষের উপর পঞ্চাশজন নারী কর্তৃত্ব দেখাবে।

بَابٌ مِنْهُ صـ٤٣

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫. .... ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ أَبُو عِيسَى: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৫৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার .... যুবাইর ইবনে আদী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর কাছে গেলাম এবং হাজ্জাজের পক্ষ থেকে যে যুলুম ও নিপীড়নের আমরা শিকার হচ্ছিলাম, সে বিষয়ে তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত এমন কোন বছর যাবে না, যার চেয়ে পরবর্তী বছর আরও খারাপ না হবে। এ কথাটি আমি তোমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে শুনেছি। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** হাদীসটি হাসান সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَا مِنْ عَامٍ اِلَّا الَّذِىْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ : এখানে প্রশ্ন হয়, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যামানার পর হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের যামানা এসেছে। অনুরূপভাবে কেয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা ও হযরত মাহদীর যামানা আসবে। তাহলে ঢালাওভাবে কিভাবে বলে দেওয়া হল যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফদের যমানার চেয়ে নিকৃষ্ট যামানা আর আসবে না ? এর উত্তরে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা–

(১) হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন– হাদীসটি আতিশয্য ও অধিকতর সম্ভাব্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে অধিকাংশ যামানা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যামানার চেয়েও নিকৃষ্ট হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে।

(২) হাদীসটি মোটের উপর সমষ্টিগতভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে পরবর্তী যামানা পূর্ববর্তী যামানার চেয়ে নিকৃষ্ট হবে। যেহেতু হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যামানায় অনেক সাহাবায়ে কিরাম তখনও জীবিত ছিলেন, পক্ষান্তরে উমর ইবনে আব্দুল আযীযের যামানায় প্রায় সকল সাহাবা ইন্তিকাল করেছেন। আর যে যামানায় সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা বেশী ছিল, সে যামানা নিশ্চয় সার্বিক বিবেচনায় ও সমষ্টিগতভাবে ঐ যামানার চেয়ে উত্তম যে

যামানায় সাহাবার সংখ্যা কম ছিল। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ, তারপর.....।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِى الْأَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ ـ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ـ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ـ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ ـ

৫৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, পৃথিবীতে 'আল্লাহ-আল্লাহ' বলার মতও কেউ নেই। **ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,** এ হাদীসটি হাসান।

৫৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না .... আনাস রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়ায়াতটি প্রথমটির অপেক্ষা অধিক সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমাম নববী বলেন, হাদীসের মর্মার্থ হল, কেয়ামত সংঘটিত হবে নিকৃষ্ট মাখলুকের ওপর। যেমন, মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে– لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلٰى شِرَارِ الْخَلْقِ মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় আরেকটু বিস্তারিতভাবে এভাবে এসেছে–

ان الله يبعث ريحا من اليمن من الجرير فلا تدع أحد فى قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته (كتاب الايمان، باب فى الريح التى تكون فى قرب القيامة)

অর্থাৎ কিয়ামত যখন একেবারে ঘনিয়ে আসবে, তখন হাদীসে উল্লেখিত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার দুনিয়াতে কাফিররা ছাড়া কোন মুমিন অবশিষ্ট থাকবে না। আর কাফিরদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল। যথা–

(১) দুনিয়ার আয়ূ ও স্থায়িত্ব মূলতঃ উলামায়ে কিরাম, যাকেরীন, সালেহীন ও নেককারদের বরকতেই টিকে আছে। যখন তাঁরা চলে যাবে, তখন দুনিয়ার আয়ূ ফুরিয়ে যাবে।

(২) আল্লাহর যিকির হল দুনিয়ার প্রাণ। দুনিয়ার স্থায়িত্ব তার উপরই নির্ভরশীল।

(৩) শুধু 'আল্লাহ, আল্লাহ' যিকির শরী'আতসম্মত। এখানে 'আল্লাহ,-আল্লাহ' যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহর ذَاتْ তথা সত্তার যিকির। এ জন্য 'আল্লাহ' শব্দটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হাফেয ইবনে তাইমিয়া যে বলেন إِسْمِ ذَات এর যিকির বিদ'আত, একথা সঠিক নয়।

হযরত মনযুর নোমানী বলেন, কতক উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন, إِسْمِ ذَات এর যিকির জায়িয ও শরী'আতসম্মত। তাদের এ দলীল পেশ করা অবশ্যই অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এ মাসআলা নিয়ে ফিকির করার সময় সম্ভব উক্ত হাদীসটির প্রতি তাঁর নজর পড়েনি। (মা'আরিফুল হাদীস ঃ ১)